পুনশ্চ, গত কয়েক বৎসর হইতে যে তাঁহার পুস্তকের পর পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে, তাহাও বোধ হয়, এখনকার অনেক সাহিত্য-সেবীর নয়নাকর্ষণ করিতেছে না। তাহার কারণ এই যে, সেই সকল পুস্তকের সাহিত্য-গুণ-গৌরব সত্ত্বেও তাহারা প্রধানতঃ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পুস্তক। এখন শিক্ষিতদের মধ্যে হিন্দু ধর্ম্মের ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের নেহাত দুঃসময় না হইলেও, তাঁহারা সাধারণতঃ ঐ ধর্ম্মদ্বয়ের বা যে কোন বিষয়েরই হউক, হুজুগ ও কলহ-প্রফুল্ল দলাদলি ভিন্ন আসল ও সার তত্ত্বে বড় বেশী মনোযোগ প্রদান করেন বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না। পক্ষান্তরে অনেক সাহিত্যানুরাগী নব্য পাঠক ও লেখক, যে কোনও ধর্ম্মই হউক,—ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পুস্তক স্পর্শই করেন না। তাঁহাদের ভ্রান্ত ধারণা-বা অনুমান এই যে, ধর্ম্ম কথা যাহার সহিত সংযুক্ত, তাহা উৎকৃষ্ট ও উৎসাহ-আমোদ-প্রদ সাহিত্য নয়, হইতেই পারে না। তবে ধর্ম্ম? সে বিষয়, যদি একান্তই আবশ্যক হয়, পরে পশ্চাতে দেখা যাইবে, আপাততঃ তাহার কোন পার্থিব প্রয়োজনাভাব। তবে, বঙ্কিম বাবুর ধর্ম্মালোচনা যে কিয়ৎ পরিমাণে এই শ্রেণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহার দুই কারণ। প্রথমতঃ সে আলোচনা, আরম্ভে, সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল; দ্বিতীয়তঃ অনেকে হয় ত মনে করিয়াছিলেন যে, ধর্ম্মালোচনাতেও যদি বঙ্কিম বাবুর উপন্যাস-রসের কিছু ভগ্নাংশ পাওয়া যায়। এই প্রলোভনে, এবং তাৎকালিক ধর্ম্ম-কলহান্দোলনে, প্রথমতঃ তাহার পাঠক জুটিয়াছিল, কিন্তু পরে বড় জুটে নাই।

এরূপ অবস্থায়, শিশির বাবুর উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় রচনাবলী যে বঙ্গ-সাহিত্য-সমাজে ও শিক্ষিত সমাজে সাদরে, সোৎসাহে গৃহীত, পঠিত ও আলোচিত হইতেছে না, ইহা বিস্ময়ের বিষয় নহে। তদ্ভিন্ন, আমি ইতঃপূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, যে কারণে বা কারণ পরম্পরার সমবায়ে হউক, সাহিত্য সংসারের এটা পরম ঔদাসিন্যের ও উপেক্ষার সময়। ইহার মাহাত্ম্যে বরং অপকৃষ্টেরই আদর হয়, কিন্তু উৎকৃষ্টের সহিত কেহ আলাপও করে না। উৎকৃষ্টের প্রতি ঔদাসিন্য ও উপেক্ষাই এখন প্রচলিত। পক্ষান্তরে, শিশির বাবুর সাহিত্য অধুনাতন ইংরেজী প্রণালীর নহে, তাহা অনন্য-তন্ত্র, বরং পূর্ব্বতন। ইহাও এক অন্তরায়। "পূর্ব্বতন প্রণালী" শুনিতেই সাত পুরুষ ইংরেজী-অনভিজ্ঞও এখন শিহরিয়া উঠে; কোণের কুলবধূ পর্য্যন্ত ইংরেজী ফ্যাসনের পক্ষপাতিনী; টিকিধারী ভট্টাচার্য্য ঠাকুর পর্য্যন্ত "পূর্ব্বতন প্রথায়" টিকিটী রাখিতে নারাজ; ইংরেজী ফ্যাসনে, তাহার কাটছাট চান! ইহা এক প্রহেলিকা। কিন্তু 'পূর্ব্বতন' পদার্থটা কি, তাহা কেহ বড় দেখে না, বুঝে না। অগ্রেই আতঙ্কে মরে!

কিন্তু, যাহা অধুনাতন, তাহা এত অধিক পরিমাণে এখন প্রচলিত এবং পথে ঘাটে ছড়াছড়ি যে, তাহা আর অভিনব নয়। যদি অভিনবেই তোমার এত অভিলাষ হয়, বরং যাহা পূর্ব্বতন, তাহাই এখন অভিনব, কারণ, তাহা আর এখন কোথায়ও দেখি না। অতএব, আর কিছুমাত্র গুণগৌরব বিবেচনাধীনে গ্রহণ না করিলেও, কেবল অনন্য-তান্ত্রিকতা বা পূর্ব্বতনতা-জনিত অভিনবত্বের জন্য শিশির বাবুর রচনা আমাদের দেখিতে হয়। শিশির বাবু আধুনিক যুগোৎপন্ন বাঙ্গালায় শ্রদ্ধাবান বা বীতশ্রদ্ধ, ঠিক জানি

না; তবে তিনি এখনকার বাঙ্গালা বড় বেশী পড়েন নাই,—এমন কি,বঙ্কিমবাবুর ও কোনও পুস্তক তিনি পড়েন নাই; ইহা শুনিয়াছি। এমন অবস্থায়, এরূপ একটী অধুনাতন রীতি অমিশ্রিত,খাঁটী ও বিশিষ্ট বাঙ্গালী কিরূপ বাঙ্গালা লিখেন, শিশির বাবুর বাঙ্গালা-সাহিত্যের অন্য সব কথা বাদে, ইহাও দেখিবার বিষয় বটে। শিশির বাবু বাঙ্গালীর গৃহজাত বাঙ্গালা ব্যবহার করেন, অথচ শিশির বাবু বিশিষ্ট ইংরেজী-নবিশ বাঙ্গালী। ইহাও একটু রহস্য। যৎকালে ইংরেজী ও ইউরোপীয় ভাষা মাত্র অনভিজ্ঞ বাঙ্গালীর বাঙ্গালাতেও বিলাতী ভঙ্গিমা, সেই মুহূর্ত্তেই একজন আজীবন ইংরেজী লেখকের বাঙ্গালা বিলাতি ভাঁজ বিরহিত খাঁটী বাঙ্গালা, ইহা কিঞ্চিৎ চিন্তার বিষয় নয় কি? শিশির বাবুর বাঙ্গালা ত ইংরেজী ভাবাপন্ন নহে, বরং তাঁহার ইংরেজী,আমার বোধ হয়, ঈষৎ বাঙ্গালা ভাবাপন্ন। রাজাকে দেশের ও দশের অবস্থা বুঝাইতে হয় বলিয়াই, শিশির বাবু ইংরেজীতে অগত্যা লিখেন। নহিলে, বোধ হয়,তাহা স্পর্শও করিতেন না; এমনি বদ্ধ-মূল বাঙ্গালী তিনি। অথচ উদারতায়, অত্যুচ্চ উদার মতের পরিপন্থীও তাঁহার নিকট পরাস্ত, তাহা তল্লিখিত সাহিত্যেই দেখিতেছি। কিন্তু, নেহাত বাঙ্গালী হওয়া, হয় ত, এখন নিন্দনীয় হইবে; তথাচ যাহা সত্য, তাহা গোপনের প্রয়োজন কি? কারণ শিশির কুমার ঘোষ প্রকৃত প্রস্তাবে কি প্রকৃতির পুরুষ এবং তাঁহার প্রতিভা কি প্রকৃতির, তাহাই দেখা আমাদের আবশ্যক। তাঁহার নিন্দা বা প্রশংসার সহিত আমাদের সম্বন্ধ নাই।

আমি, এই প্রবন্ধ, কেবল মাত্র আনুষঙ্গিক কথায় সমাপ্ত করিলাম। অতঃপর, পরপ্রবন্ধে যাহা বলিব, তাহা কেবল এই আলোচ্য কাব্য গ্রন্থ সম্বন্ধেই বলিব। শিশির বাবুর এই গীতি-গ্রন্থ, স্বকীয় সরল স্বভাবে, আদৌ কোন বিশেষণ ব্যাখ্যার আকাঙ্ক্ষা করে না। তাহার সৌন্দর্য্য এত সুস্পষ্ট-দৃষ্ট যে, দেখাইয়া দিতে হয় না। তথাচ উপরোক্ত নানা কারণে তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন। বিশেষতঃ এরূপ একটী উচ্চ কাব্য গ্রন্থের আলোচনা না হইলে, বাঙ্গালা সাহিত্য সমালোচনার সবিশেষ কলঙ্কও বটে।

শ্রীঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।

কবি বলরাম দাস।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ১১শ পরিচ্ছেদে লিখিত আছে—

"বলরাম দাস কৃষ্ণপ্রেম-রসাস্বাদী।
নিত্যানন্দ নামে হয় অত্যন্ত উন্মাদী॥"

শ্রীবলরাম দাস নিত্যানন্দের ভক্ত ও তৎপরিকর ছিলেন; বৈষ্ণব-বন্দনা-গ্রন্থে লিখিত আছে—

"সঙ্গীত-কারক বন্দো বলরাম দাস।
নিত্যানন্দ চন্দ্রে যার অত্যন্ত বিশ্বাস॥"

উভয় গ্রন্থে বর্ণিত এই বলরাম এক ব্যক্তি, উভয়ই নিত্যানন্দ-ভক্ত। বৈষ্ণব-বন্দনায় তিন প্রভুর (মহাপ্রভুর, নিত্যানন্দ, এবং অদ্বৈত) ভক্তগণের নাম পাওয়া যায়। বলরাম দাসের নামের পরেই নিত্যানন্দ শিষ্য মধ্যে মহেশ পণ্ডিত (জগদীশের ভ্রাতা), চৈতন্য-ভাগবত-কর্ত্তা বৃন্দাবন দাস, ও কৃষ্ণদাস প্রভৃতির নাম লিখিত হইয়াছে। বৈষ্ণব

বন্দনার "সঙ্গীত-কারক" বলিয়া বলরামের উল্লেখ আছে; অতএব ইনিই যে স্বনাম-প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা বলরাম দাস, তাহার আর সন্দেহ নাই। অতএব পদকর্ত্তা বলরাম দাস নিত্যানন্দের "গণ।" বলরামও স্বীয় পদে আপন প্রভুর রূপ গুণ প্রকৃষ্ট রূপেই বর্ণন করিয়াছেন, দুই একটি পদ এখানে দিলে বোধ হয় অপ্রীতিকর হইবে না। বলরামের পদ—

"অনুক্ষণ অরুণ নয়ান ঘন ঘুরত,
চরকত লোর বিথার।
কিয়ে ঘন অরুণ, বরুণালয়ে সঙ্কর,
অমিয়া বরিখে অনিবার॥
নাচতরে নিতাইবর চাঁদ।
সিঞ্চই প্রেম, সুধারস জগজনে,
অদ্ভুত নটন সুছাঁদ॥
পদতল তাল, খলিত মণিমঞ্জির,
চলতহি টলমল গঙ্গ।
মেরু শিখরে কিবে, তনু অনুপামবে,
ঝলমল ভাব তরঙ্গ॥
সতত রোয়তই, গতি অতি মন্থর,
হরি বলি মুরছি বিভোর।
খেনে খেনে গৌর, গৌর বলি ধাবই,
আনন্দ গবজত মোর॥
পামর পঙ্গু, অধম জড় আতুর,
দীন অবধি নাহি নাম।
অবিরত দুর্লভ, প্রেম রতন ধন,
যাচি জগতে কর দান॥
অতি চলনোগ্র, প্রেমধন বিতরণে,
নিখিল তাপ দূরে গেল।
দীন হীন সবহু, মনমথ পুরল,
অবলা উনমত ভেল॥
ঐ ছন করুণ, নয়ান অবলোকনে,
কাহু না রহু দুরদিন।
বলরাম দাস, কাহে ভেল বঞ্চিত,
দারুণ হৃদয় কঠিন॥

আর একটি পদ এখানে দিতেছি, বলরাম নিত্যানন্দকে কি ভাবে দর্শন করিতেন, এই পদে তাহা বলিয়াছেন। কেবল বলরাম নহেন, সমস্ত বৈষ্ণব সমাজই তাঁহাকে ঐ ভাবে দেখিয়া থাকেন। বলরামের দ্বিতীয় পদঃ—

"গজেন্দ্র গমনে যায়, সকরুণ দিঠে চায়,
পদভরে মহী টলমল।
মত্ত সিংহ গতি জিনি, কম্পমান মেদিনী,
পাষণ্ডীগণ শুনিয়া বিকল॥
আয়ত অবধূত করুণার সিন্ধু।
প্রেমে গর গর মন, করে হরি সঙ্কীর্ত্তন,
পতিত পাবন দীনবন্ধু।
হুঙ্কার করিয়া চলে, অচল সচল নড়ে,
প্রেমে ভাসে অমর সমাজে।
সহচরগণ সঙ্গে, বিবিধ খেলন রঙ্গে,
অলক্ষিতে করে সব কাজে॥
শেষশায়ী সঙ্কর্ষণ, অবতরি নারায়ণ,
যার অংশ কলায় গমন।
কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা, জগতের হিতকর্ত্তা
সেই রাম রোহিনী নন্দন॥
যার লীলা লাবণ্য ধাম, আগমে নিগমে গান
যার রূপ মদনমোহন।
এবে অকিঞ্চন বেশে, ফিরে প্রভু দেশে দেশে,
উদ্ধার করয়ে ত্রিভুবন॥
ব্রজের বৈদগ্ধ সার, যত যত লীলা আর,
পাইবারে যদি থাকে মন।
বলরাম দাসে কয়, মনোরথ সিদ্ধি হয়,
ভজ ভজ শ্রীপাদ চরণ॥"

নিত্যানন্দের গণ ব্যতীত, অপরের লিখিত এরূপ পদ অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পদকল্পতরুর ২২৫১ সংখ্যক পদটিও এখানে উল্লেখ-যোগ্য। কিন্তু এ সকল পদ অধিক উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। বলরাম নিত্যানন্দের "গণ"—নিত্যানন্দ পরিবার, তাহার নিজের কথাতেই তাহা প্রমাণিত হইবে। পূর্ব্বোদ্ধৃত পদাদি একথারই পোষক মাত্র, বলরামের রচনার পারিপাট্য বা তাহার কবিত্ব প্রদর্শনের জন্য উহা উদ্ধৃত হয় নাই, পাঠক অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইহা স্মরণ রাখিবেন। বলরামের কবিত্বের পরিচয় দিতে এখানে প্রয়াস পাইব না, কেন না, বঙ্গীয় পাঠক এই প্রাচীন কবির কবিতার সহিত বিলক্ষণ পরিচিত।

প্রেম-বিলাস একখানি প্রাচীন গ্রন্থ। ১৫২৯ শকে কর্ণানন্দ রচিত হয়, কর্ণানন্দে প্রেম বিলাসের উল্লেখ আছে। প্রেম-বিলাস প্রায় তিন শত বর্ষ পূর্ব্বে রচিত হয়। প্রেম-বিলাসের রচয়িতার নাম বলরাম দাস। গ্রন্থ শেষে নিম্ন লিখিত রূপে তিনি আত্ম পরিচয় দিয়াছেনঃ—

"মাতা সৌদামিনী পিতা আত্মারাম দাস।
অম্বষ্ঠ কুলেতে জন্ম শ্রীখণ্ডেতে বাস॥
আমি এক পুত্র মোরে রাখিয়া বালক।
পিতা মাতা দোহে চলি গেলা পরলোক॥

অনাথ হইয়া আমি ভাবি অনিবার।
রাত্রিতে স্বপন এক দেখিল চমৎকার॥
জাহ্নবা ঈশ্বরী কহে কোন চিন্তা নাই।
খড়দহে গিয়া মন্ত্র লহ মোর ঠাঞি॥
স্বপ্ন দেখি খড়দহে কৈনু আগমন।
ঈশ্বরী করিলা মোরে কৃপার ভাজন॥
বলরাম দাস নাম পূর্ব্বে মোর ছিল।
এবে নিত্যানন্দ দাস শ্রীমুখে রাখিলা॥
নিজ পরিচয় আমি করিনু প্রচার।
গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব পদে করি নমস্কার॥
(প্রেমবিলাস)।

ইহাতে জানা যাইতেছে যে, বলরামের মাতার নাম সৌদামিনী এবং পিতার নাম আত্মারাম দাস। বলরাম জাতিতে বৈদ্য ছিলেন, এবং বাড়ী শ্রীখণ্ডে ছিল। বলরামের গুরুদত্ত নাম নিত্যানন্দ দাস, ইহাও জানা যাইতেছে। এক্ষণে সাধারণতঃ "ভেকধারী" বৈরাগীগণ গুরুদত্ত নামেই পরিচয় দেন, তদ্ভিন্ন বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী গৃহস্থের গুরুদত্ত নাম কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। কিন্তু প্রাচীন গ্রন্থাদিতে দেখা যায় যে পূর্ব্বে বৈষ্ণব পদাবলীগণের প্রায়ই দুইটি নাম থাকিত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুইজনের কথা বলিতেছি। ১—রাজা বীর হাম্বির বনবিষ্ণুপুরের অধিপতি ছিলেন, তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে তাঁহার নতন একটি নাম হয়, সে নাম চৈতন্য দাস। বীরহাম্বিরের গুরু শ্রীনিবাসাচার্য্য।

"বিষ্ণুপুরে আচার্য্য রহিয়া হুলমান।
* * *
দেখিয়া রাজার ভক্তি পাইল অধিকার।
* * *
রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র দীক্ষা দিলা হর্ষ হৈয়া॥
* * *
দেখিয়া রাজার চেষ্টা কহে বারে বারে।
* * *
শ্রীচৈতন্যদাস নাম থুইলাম তোমার।
শুনিয়া রাজার নেত্রে বহে অশ্রুধার॥"
(ভক্তিরত্নাকর)

ভক্তি-রত্নাকরের নবম তরঙ্গে রাজার বীরহাম্বির ভণিতা-যুক্ত দুইটি পদ উদ্ধৃত আছে; এবং পদকল্পতরুর ২৩৩০ সংখ্যক পদ বীরহাম্বির ভণিতা-যুক্ত। তিনি চৈতন্য দাস ভণিতা দিয়াও বহুতর পদ রচনা করিয়া ছিলেন, পদকল্পতরুতে সে সকল পদ সংগৃহীত হইয়াছে। বহুতর ভক্তিরত্নাকরে উদ্ধৃত হয় নাই। যথা—

"চৈতন্য দাস নামে যে গীত বর্ণিল।
বিস্তারের ডরে তাহা নাহি জানাইল॥"
(ভক্তিরত্নাকর)।

২—কবি প্রেমদাসেরও ঐরূপ আর একটি নাম ছিল। সেইটি তাহার পিতৃমাতৃপ্রদত্ত প্রকৃত নাম। প্রেমদাস তাঁহার গুরুদত্ত নাম। প্রেমদাস নামে তিনি অধিকাংশ পদ রচনা করিয়াছেন বলিয়া, ঐ নামেই তিনি বিশেষ পরিচিত। তবে তাঁহার পুরুষোত্তম নামযুক্ত পদ যে নাই, তাহা নহে; পদকল্পতরুতে পুরুষোত্তম ভণিতা যুক্ত ১২টি পদ দৃষ্ট হয়। এখানে সংখ্যার উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র। প্রেমদাস তাঁহার পিতার কনিষ্ঠ পুত্র, তিনি আত্ম বিবরণে লিখিয়াছেন ঃ—

'কনিষ্ঠ আমার নাম, মিশ্র শ্রীপুরুষোত্তম
গুরুদত্ত নাম প্রেমদাস।
সিদ্ধান্তবাগীশ বলি, নাম দিলা বিজ্ঞ বলি
কৃষ্ণদাস্যে মোর অভিলাষ॥
(বংশীশিক্ষা)।

ভক্তি-রত্নাকর রচয়িতার নামও এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে, তাঁহারও দুইটি নাম ছিল, একটি ঘনশ্যাম দাস; অপরটি নরহরি দাস। উভয় নামের ভণিতাযুক্ত তাঁহার বহুতর পদ আছে।

প্রাচীন মহাজন ও পদকর্ত্তাগণের মধ্যে এরূপ প্রায়ই দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব কবি বলরামেরও আর একটি নাম নিত্যানন্দ দাস ছিল।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর দুই স্ত্রী—বসুধা ও জাহ্নবা। জাহ্নবা দেবী শিষ্যাদি করিতেন। উপযুক্তা স্ত্রীলোক পুরুষকেও শিষ্য করিতে পারেন, ইহা গুরু পরিবারে সর্ব্বত্রই প্রচলিত আছে। কবি বলরাম জাহ্নবাদেবীরই শিষ্য। অতএব তিনি নিত্যানন্দ "পরিবার।" এই জন্যই চরিতামৃতে নিত্যানন্দ শাখা-বর্ণন পরিচ্ছেদে তাঁহার নাম পাওয়া যায়। পদকর্ত্তা জ্ঞান দাস ও * ঐরূপই

* বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত বিশ্বকোষ অভিধানে মৎপ্রেরিত "জ্ঞানদাস" শব্দ দ্রষ্টব্য।

জাহ্নবা শিষ্য ছিলেন, ইহার নামও চরিতামৃতে আছে। বলরাম জাহ্নবা শিষ্য, প্রেমবিলাসে তিনি স্বয়ংই বলিয়াছেন, যথা ঃ—

"মোর দীক্ষাগুরু হয় জাহ্নবা ঈশ্বরী।
যে কৃপা করিলা মোরে কহিতে না পারি।"
(প্রেমবিলাস)।

তিন প্রভুর অন্তর্দ্ধানের পরই খেতরীতে শ্রীমৎ নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের প্রসিদ্ধ বিগ্রহ স্থাপনোৎসব হয়। এই উৎসবে অনেক পার্শ্বদ ভক্ত উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেই উৎসবে জাহ্নবা দেবীর সহিত, নিত্যানন্দ শাখাভুক্ত যে যে ভক্ত গমন করেন, তাহাদের নামের সহিত বলরাম দাসের নামও পাওয়া যায়। যথা—

মুরারী, চৈতন্য, জ্ঞানদাস মহীধর।
* * * *
শ্রীপরমেশ্বর দাস, বলরাম বিজ্ঞবর।
শ্রীমুকুন্দ, দাস বৃন্দাবন আদি কবি॥
(ভক্তিরত্নাকর)।

জাহ্নবা শিষ্য,—জাহ্নবার অনুগামী এই "বিজ্ঞবর" বলরামই আমাদের প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা। প্রেমবিলাসেও (১৯ বিঃ) খেতরীর উৎসব বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার জাহ্নবাসহ ঐ উৎসবে উপস্থিত ছিলেন, এই জন্য অন্যান্য অনুগামী ভক্তগণের নামের সহ নিজ নাম লিখেন নাই, তবে তিনি ("আমি") উপস্থিত ছিলেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব চরিতামৃতের "কৃষ্ণপ্রেম-রসাস্বাদী" নিত্যানন্দ ভক্ত, বৈষ্ণব বন্দনায় লিখিত "সঙ্গীতকারক" আর, ভক্তি রত্নাকরের এই "বিজ্ঞবর" বলরাম দাসই প্রেমবিলাসরচয়িতা ও প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা। নতুবা উৎসবোপস্থিত জাহ্নবা দেবীর অন্যান্য ভক্তগণের ন্যায়, প্রেমবিলাসে তাঁহারও নাম থাকিত। এই প্রসিদ্ধ কবির রচিত প্রেমবিলাস ব্যতীত "বীরচন্দ্র চরিত" নামে আর একখানি গ্রন্থ আছে, কিন্তু উহা আমরা অদ্যাপি দেখি নাই, প্রেমবিলাসে উল্লেখ মাত্র পাইয়াছি।

বলরামের বিবরণ অতি অল্পই অবগত হওয়া যায়, যাহা কিছু জানিতে পারিয়াছি, কথিত হইল। বলরাম দাস বিবাহ করিয়াছিলেন কি না, কোথাও তাহার উল্লেখ নাই। পদকল্পতরুর ২৯৩১ সংখ্যক পদে বলরাম লিখিয়াছেন—

"তৃতীয় সময় কালে, বন্ধন সে হাতে গলে,
পুত্র কলত্র গৃহবাস।
আশা বাড়ে দিনে দিনে, ত্যাগ নাহি হয় মনে,
হরিপদে না করিনু আশ॥"

এই সকল কথা যদি সাধারণ ভাবে না লইয়া, তাহার আত্ম পক্ষে গ্রহণ করা যায়, তবে বলিতে হইবে যে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন এবং পুত্র কন্যাদিও হইয়াছিল। সাধারণতঃ বৈষ্ণব-গ্রন্থকর্ত্তাদিগকে, পরকে উপদেশ দেওয়া অপেক্ষা নিজ মনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কথা বলার রীতি দৃষ্ট হয়, সেরূপ হিসাবে উপরোক্ত কথা গুলি কবির আত্ম পক্ষেই কথিত বলা যাইতে পারে। বলরামের বৃদ্ধকালের আর একটি পদ কেমন হৃদয়স্পর্শী, দেখুন—

"বুঢা কি আর গরব ধর।
এ ভব সংসার, সাগর তরিতে,
হরিনাম সার কর॥
পাকিল কুন্তল, গায়ে নাহি বল,
কাকালি হইয়াছে বাঁকা।
হাতে নড়ি করি, যাও গুড়ি গুড়ি,
ছুড়ি পড়ি বাবে শঙ্কা।
সন্ধ্যায় শয়ন, কাশ ঘন ঘন,
সঘনে ডাকিছে গলা।
মুদিত নয়ান, ঘুচাইয়া দেখ,
উদিত হইয়াছে বেলা॥
শ্বাস যে রোদন, লজ্জি ঘনে ঘন
সঘনে পিবহি পানী।
অতয়ে বদন, ভবি বল হরি,
দাস বলরাম বাণী॥"

এখানে বলরামের কবিত্ব বিশ্লেষণের প্রয়াস বৃথা, তাঁহার দুই একটী ভিন্ন রকমের পদ উদ্ধৃত করিয়া সে চেষ্টা করা যাইতে পারিত। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, বলরাম অপরিচিত হইলেও, বলরাম দাসের পদ বঙ্গীয় পাঠকবর্গের অপরিচিত নহে ; সুতরাং সে চেষ্টা করা গেল না।

শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

প্রমীলা।

(কবি-ভগিনী প্রমীলা নাগের অকাল মৃত্যুতে।)

বঙ্গ কবি-কুঞ্জে তুমি আছিলা বর্ষার
প্রভাতের পিক যেন ; ঝঙ্কারে কেবল
ঝরিত কি আকুলতা বিষাদ ব্যথার,
করিয়া হৃদয় মন উদাস-বিহ্বল।
বাঙ্গালার দগ্ধভাগ্য—খেদে ফাটে প্রাণ!
অকালে নীরব হলো সে ঝঙ্কার হায়!
দু'একটী পথহারা করুণ সে তান
"প্রমীলা" "তটিনী" রূপে রহিল ধরায়!
যে ক'দিন ছিলে হেথা শুধুই কাঁদিলে
বিষাদ-অশ্রুতে রচি' ক্ষুদ্র "এ তটিনী"!
কিন্তু এই "তটিনীর" বিষাদ-সলিলে
কে বলিবে, কত জনে জুড়াবে পরাণী!
যে সুখ শান্তিরে খুঁজে পরিশ্রান্ত হেথা,
অমর সে কবি-কুঞ্জে এবে পাবে সদা।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

কে তুমি গাইয়ে গেলে ?

১

কে তুমি গাহিয়ে গেলে গভীর নিশীথে,
চমকে ভাঙ্গিয়া মোর সুখের স্বপন,
ঝঙ্কারি হৃদয় বীণা কঠিন আঘাতে,
জাগাইয়া জড়প্রাণ ঘুমে অচেতন ?

২

আঁধারের আবরণে কে তুমি নিঠুর
দূর দূরান্তরে থাকি,
আপনা লুকায়ে রাখি
ঢালিলে গো সুধাকণ্ঠে রব সুমধুর ?
চমকে জাগিল প্রাণ,
সেই সুর সেই তান,
হৃদয়ে রহিল মিশি না পারি ভুলিতে ;
কে তুমি গাইয়ে গেলে গভীর নিশীথে ?

৩

কে তুমি গাইয়ে গেলে
কেন মোরে জাগাইলে ?
বিস্মৃতি স্বপন মাঝে ছিনু যে ডুবিয়া !
অচেতন মাঝে হায় !
ছিনু অচেতন প্রায়,
চেতনা, কর্ত্তব্য, জ্ঞান, সকল ভুলিয়া ;
কেন এ মধুর তানে,
পুন জাগাইলে প্রাণে,
সেই সব সুপ্ত স্মৃতি, উৎকণ্ঠা, আকুলি ?
কেন মরু হৃদয়েতে
বহাইলে নব স্রোতে
আশার তটিনী পুন আবেগে উথলি ?
অনন্তের বেলা ভূমে
পড়েছিল ঘোর ঘুমে
কল্পনার শিশুগুলি হারায়ে চেতনা ;
উঠিল জাগিয়া তারা
হইয়া আপন হারা
শ্যামের বাঁশরী-রবে যথা ব্রজাঙ্গনা ;
বসন্তের আগমনে
ফুল যথা কুঞ্জবনে
ব্যাকুলিত জাগে শুনি ভ্রমর-গুঞ্জন ;
সেইরূপ হৃদে মোর
ভাঙ্গিয়া ঘুমের ঘোর
জাগিল নবীন আশা নব আন্দোলন ;
কর্ত্তব্য, কল্পনা, প্রেম, সকলি নূতন !

৪

কে তুমি নিশীথ কালে
সুধা বীণা ঝঙ্কারিলে
পরাণ পাগল করি ভাঙ্গিলে স্বপন ?
ছুটে হৃদি তোমা পানে
প্রেমিক গিরীক গানে
আকুলিত যথা জীব তরুলতাগণ !
কিন্তু না নেহারে পথ অন্ধ যে নয়ন !

৫

কে তুমি জাগায়ে হেন
রহিলে নীরব পুন ?
দেখিতে যাতনা কিগো উদ্দেশ্য কেবল ?
রয়েছি শ্রবণ পাতি
শুনিতে সে সুধাগীতি
শুনাও ;—আকুল প্রাণ করগো শীতল ;
দেখা দাও একবার,
নয়নের অন্ধকার,
ঘুচাও,—পূরাও মম হৃদয় বাসনা ;
জাগাও অতীত স্মৃতি
উৎকণ্ঠা, আকুলি, শান্তি
করগো করগো যদি দিয়েছ চেতনা ;
নীরবে নিঠুর হয়ে দিওনা যাতনা।

শ্রীবিহারীলাল গুহ রায়।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

২৮। বেদান্ত-দর্শন।—মহর্ষি-বেদব্যাস কৃত উত্তর মীমাংসা বা ব্রহ্মসূত্র। সটীক—শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত শ্রীমদ্ গোবিন্দ ভাষ্য এবং শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী সিদ্ধান্ত বাচস্পতি কৃত বঙ্গানুবাদ ও গোবিন্দভাষ্য বিবৃতি সমেত। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোপাল ভক্ত সম্পাদিত। বেদান্ত-দর্শন সকল দর্শনের শিরোমণি। বেদান্ত-দর্শনের রামানুজ, মধ্বাচার্য্য, বিষ্ণুস্বামী ও নিম্বাদিত্য, এই চারি সম্প্রদায়ের চারিখানি এবং শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের একখানি, এই পাঁচখানি ভাষ্যই প্রসিদ্ধ। বৈষ্ণব সমাজে বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত গোবিন্দ-ভাষ্যই বিশেষ সমাদৃত ও প্রচলিত। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোপাল ভক্ত-সম্পাদিত এই গ্রন্থে বলদেব বিদ্যাভূষণের ভাষ্যেরই প্রাধান্য। বৈষ্ণব সমাজের দিক্ হইতে বেদান্তের যে মীমাংসা হওয়া সম্ভব, তাহা অতি বিশদভাবে, অতি পরিস্ফুট ও উজ্জ্বলরূপে এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সম্পাদক মহাশয় এই কাজে ব্রতী হইয়া দেশের মহদুপকার করিয়াছেন। তাঁহার এই গ্রন্থ সর্ব্বত্র সমাদৃত হইলে আমরা নিতান্ত সুখী হইব। এই গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে গভীর গবেষণা এবং পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা সম্পাদক মহাশয়ের নিকট এই উপাদেয় গ্রন্থ উপহার-প্রাপ্তি জন্য বিশেষ বাধিত রহিলাম।

২৯। কবিতামালা।—৺গোপাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু কর্ত্তৃক সংগৃহীত, মূল্য ১৲, গুরুদাস বাবুর দোকান, সংস্কৃত ডিপজিটারি প্রভৃতিতে প্রাপ্তব্য। গোপাল বাবু একজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মুন্সেফের কাজ করিতেন। এই পুস্তকের অধিকাংশ কবিতা তাঁহার পাঠ্যাবস্থায়, ২১ হইতে ২৩ বৎসর বয়সের লেখা। কবিতাগুলি স্বদেশ-হিতৈষণায় এবং প্রেম-মাদকতায় পূর্ণ। কিন্তু সে সকল কথা বলিবার পূর্ব্বে সংগ্রাহক মহাশয় সম্বন্ধে দুই একটী কথা এখানে বলা আবশ্যক।

গোপালবাবু এখন স্বর্গে, তাঁহার বন্ধু, অকৃত্রিম সুহৃৎ দেবেন্দ্রবিজয় বাবু তাঁহার সম্মান প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যতিব্যস্ত। ১২৬২ সালের ৩রা চৈত্র, গোপাল বাবুর জন্ম এবং বিগত ২৫শে আষাঢ়, ১৩০৩, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই দেবেন্দ্র বাবু, গোপাল বাবুর কৃতিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইযাছেন। এরূপ নিঃস্বার্থ ভালবাসা এই মর্ত্ত্যধামে বড়ই বিরল। বাঙ্গালা ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি মাইকেলের প্রতি তদীয় বন্ধুগণের অবহেলা এবং দেবেন্দ্রবিজয় বাবুর আদর স্মরণ করিলে, যুগপৎ ঘৃণা ও শ্রদ্ধার উদয় হয়। দেবেন্দ্রবিজয় বাবু সখা-প্রেমের যে উজ্জ্বল, মনোমুগ্ধকর চিত্র দেখাইলেন, তাহা এ দেশে অক্ষয় হউক। গোপাল বাবুর সম্ভ্রান্ত পরিবারের আত্মীয়বর্গ যাহা পারিলেন না—করিলেন না, দেবেন্দ্র বাবু নিজ অর্থ ব্যয়ে তাহা করিলেন; এ কথা স্মরণ করিলেও আনন্দ পাই। দেবেন্দ্র বাবু গোপাল বাবুর জীবন সম্বন্ধে যে কয়েকটী অমূল্য কথা এই গ্রন্থের প্রথমে লিখিয়াছেন, তাহার প্রতি কথা গভীর সখ্য-প্রেমের পরিচয় দেয়—তাহা যেন উষ্ণ শোণিতের তরল ধারায় লিখিত, তাহা যেন হৃদয়-দ্রাবকে অঙ্কিত, তাহা যেন প্রেম-অমিয়ায় সুচিত্রিত। পড়িতে পড়িতে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, চক্ষু হইতে অলক্ষিতে জল ধারা প্রবাহিত হয়, হৃদয় মনটা যেন কোন্ অদৃশ্য রাজ্যে চলিয়া যায়। আমরা গোপাল বাবুকে কখনও দেখি নাই—তবুও তাঁহার জন্য আজ আমাদের প্রাণ আকুল। ধন্য দেবেন্দ্রবিজয় বাবুর লেখনী।

সংগ্রাহক, গোপাল বাবু কবিতাগুলিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, প্রথম খণ্ড—মধুর ভাবময়ী কবিতা, দ্বিতীয়খণ্ড জাতীয় ভাবোদ্দীপক কবিতা। দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিতা দিন দিনই বঙ্গে দুর্লভ এবং দুষ্প্রাপ্য হইতেছে। জাতির অভ্যুত্থানের পক্ষে জাতীয় সঙ্গীত এবং কবিতার একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু এখনকার কবিগণ সে সকল কথার কোন ধার ধারেন না, ইন্দ্রিয়জ প্রেম-প্রণয়ের গাথা,

অথবা ফুল বা জ্যোৎস্নার সৌন্দর্য্য বা রমণীর রূপ-পিপাসাতেই বিভোর। হেম বাবুর ভারত-সঙ্গীত, বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দে মাতরং, গোবিন্দ রায়ের যমুনা-লহরীর তুল্য কবিতার উচ্ছ্বাস এখন থামিয়াছে, এখন ফুল-জ্যোৎস্নার প্রবল বন্যা বহিতেছে। এ জাতি ডুবিতেছে, না উঠিতেছে, কে বলিতে পারে? কবিতামালার কবি বলিতেছেন—

"ভারতের পরিণাম—কি ছিল কি হলো।
কাজ কি সে পূর্ব্ব স্মৃতি—আহা ভুলে যাই।
ঘটেছে যা ঘটিবার,
কি কাজ ভাবিয়া আর,
ভুলে যাই তাহা—যদি ভুলে সুখ পাই।
হতাশ তিমিরে আজি আচ্ছন্ন জীবন।
আত্মস্মৃত আমি—আহা হই বিস্মরণ।।"

আবার—

"দ্বিধা হও ধরণিগো। লুকাও ভিতরে,
ভারত কলঙ্কীমুখ ও সুঅঙ্কে তব।
কি কাজ জীবনে যদি এত বিড়ম্বনা,
ডুবুক ভারত শ্রী ভারতের জন
অনন্ত সাগর গর্ভে। অনন্ত সলিলে,
ডুবে থাক আর্য্য নাম। ভারতের যশ
ভুলে যাও স্মৃতি—আর করো না স্মরণ,
চিরদাসী ভারতের সৌভাগ্যের দিন।"

এই সকল কবিতা পড়িতে পড়িতে কবির গভীর স্বদেশানুরাগের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ, স্তম্ভিত এবং আত্মহারা হই। এরূপ স্বদেশহিতৈষীর বীণা কেন অসময়ে নীরব হইল, ভাবিয়া শোকে আচ্ছন্ন হই।

কবির ভারত-বিলাপের প্রতি কথায় যে স্বদেশানুরাগ, যে খোলা হৃদয়-আবেগ চিত্রিত হইয়াছে, তাহা এদেশে দুর্লভ। ইচ্ছা হয়, সমস্ত কবিতা উদ্ধৃত করি। কিন্তু স্থান কোথায়? তাহাতে লাভই বা কি? এই কবি যে দেশের দুঃখের কথা ভাবিয়া ২ অনন্ত ধামে চলিয়া গিয়াছেন, সে দেশে এই কবির কি আদর হইবে না? এই কবিতামালা, পুষ্পমালার ন্যায় এ দেশের নরনারী সাদরে গ্রহণ করিয়া গোপাল-ভক্তির পরিচয় কি দিবে না? আমরা আশা-হত নই। আশা আছে, ঘরে ঘরে মাতৃভক্ত গোপালের এই কবিতামালা শোভা পাইবে,—আশা আছে, সকলের সাদর আলিঙ্গন পাইবে।

৩০। রসলীলা।—প্রকৃতি গায়িকা। শ্রীজগদীশ মুখোপাধ্যায় বি-এ কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। এ পুস্তক খানির বিস্তৃত সমালোচনা করিতে একান্ত ইচ্ছা ছিল; কিন্তু স্থানাভাবে তাহা হইল না। প্রেম-বিহ্বল সাধু ভক্তের ভক্তির মাদকতায় এই গ্রন্থ পূর্ণ। নমুনা দেখাইতে হইলে পুস্তকখানি সমস্ত তুলিয়া দিতে হয়। তাহা অসাধ্য সাধন। পরিচয়ের জন্য দুই চারিটী স্থান হইতে কিছু কিছু তুলিলাম,—

১। "পথপানে চেয়ে জীবন গোঁয়ানু;
বঁধু আমার কেন এল না?
আশা প্রপাতে হৃদয় ক্ষরিল,
এ আশা কেন গেল না?"

২। "পাখী তুই ডাকিস্‌নে ডাকিস্‌নারে ডাকিসনে,
সে যে পড়ে মনে।
লুকায়ে অগ্নি করে, সেত ছ'লে গেল মোরে,
সে হ'তে মরি মরম আগুনে।"

৩। "পাগলিনী নাথ তুমি, পাগলিনী আমি তব,
তোমারই সোহাগে, নাথ, ফুটে ফুল নব নব।
গাঁথি বন ফুলমালা, সাজায়ে বরণ ডালা,
এসেছি তোমার কাছে কেন কেন কি তা কব।"

৪। "আমায় দংশেছে কি কাল ফণী গো,
আমার অঙ্গ হইছে ভারী, আমি নাড়িতে যে নারি।"

৫। "ন আলোক ন আঁধার নাহি কিছু পারাবার।
জ্ঞানময়ী মহামূর্ত্তি ধরে শক্তি মূলাধার,
জীবন মরণময়। পায় বিশ্ব স্থিতিলয়
নেহারিব মহাযোগে জাগরণে"

এই পুস্তকের প্রায় সমস্ত কবিতাই তাল মানে গেয়। সমস্ত গুলি গানে শুনি নাই, কিন্তু মনে হয় যেন, গায়ক-লেখকের মুখে, দুটী একটী শুনিয়াছি। যিনি ভক্তিতে পাগল, প্রেমেতে অধীর, সেবায় কাঙ্গাল, তিনি কাহার না ভক্তির পাত্র? এই ভক্তি-বিরহ-মাখা গাথায়, এই পাষাণ সদৃশ আমরা, ক্ষণকালের জন্যও, মোহময় সংসারের অতীত হই, নিত্যানন্দময় ধামের যাত্রীক হই। সুতরাং গায়কের এই গাথা সার্থক হইয়াছে।

নেপালের পুরাতত্ত্ব। (১০)

ললিতপট্টনের রাজা সিদ্ধিনৃসিংহমল্ল ও তাঁহার বংশধরদিগের নামাঙ্কিত দুই খানি শিলালিপির সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইতিপূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে; তাহা হইতে রাজা সিদ্ধিনৃসিংহের ঊর্দ্ধতন ও অধস্তন তিন পুরুষের নাম পাওয়া যাইতেছে। অনুমান ১৬২০ খ্রীঃ সিদ্ধিনৃসিংহ ললিতপট্টনে রাজপাঠ প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই সময়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা লক্ষ্মীনৃসিংহ-মল্ল কাটমাণ্ডুর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া, পৈতৃক রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। ৭৫৭ নেপালী সংবতে (১৬৩৭ খ্রীঃ) রাজা সিদ্ধিনৃসিংহের আদেশে ললিতপট্টনের রাধাকৃষ্ণ-মন্দিরস্থ শিলালিপি খোদিত হয়। আমাদের অনুমান মতে সিদ্ধিনৃসিংহমল্ল ১৬২০-৬০ খ্রীঃ পর্য্যন্ত চল্লিশ বৎসর কাল ললিতপট্টনে রাজত্ব করেন। পণ্ডিত চূড়ামণি প্রিন্সেপ সাহেবের মতে ১৬৫৪ খ্রীঃ রাজা সিদ্ধিনৃসিংহ ললিতপট্টনের রাজাসনে উপবিষ্ট হন। তিনি সিদ্ধিনৃসিংহের পূর্ব্বপুরুষদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও নাম উল্লেখ করিতে পারেন নাই! তিনি ললিতপট্টনের রাজবংশের যে নামমালা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা শাসনলিপি কি বংশাবলীর সহিত মিলিতেছেনা। ইহা হইতে তাঁহার প্রকাশিত নেপালের রাজবংশাবলীর অমূলকতা স্পষ্টরূপে উপলব্ধি হইতেছে। নামমালার ন্যায় তাঁহার নির্দ্দিষ্ট সময়ও একান্ত ভ্রান্ত বলিয়া শাসনলিপি হইতে নিঃসন্দিগ্ধরূপে জানা যাইতেছে। ১৮৩৫ খ্রীঃ তিনি নেপালের নরপতিদিগের যে কাল্পনিক নামমালা প্রকাশ করেন, তাহা কোন মতে ইতিহাসের নিকট গ্রহণীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে না। তাঁহার ভ্রমপ্রমাদ অনিবার্য্য। কারণ সেই সময়ে নেপালী শিলালিপির অস্তিত্বের বিষয়ও কেহ অবগত ছিল না। ডাক্তার ব্র্যামলির সংগৃহীত নেপালী মুদ্রা হইতে তিনি ললিতপট্টনের রাজবংশের সময় নিরূপণের যে চেষ্টা পাইয়াছেন, তাহাও সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছে।

নিম্নে ললিতপট্টনের নৃপতিদিগের নামমালা শিলালিপি হইতে গৃহীত হইয়া, প্রিন্সেপ সাহেবের প্রকাশিত নামমালার সহিত তুলিত হইল। আমাদের অনুমিত সময়ের সহিত প্রিন্সেপ সাহেবের নির্দ্দিষ্ট সময় তুলনা করিলেই, পাঠকবর্গ তাঁহার ভ্রম প্রমাদ সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন।

ললিতপট্টনের বংশাবলী।

(শিলালিপি এবং বংশাবলী।)

মহেন্দ্রমল্ল (১৫৪০-৬০ খ্রীঃ)
শিবসিংহমল্ল (১৫৮০ ১৬০০)
হরিহর সিংহমল্ল (১৬০০-২০)
সিদ্ধিনৃসিংহমল্ল (১৬২০-৬০)
শ্রীনিবাসমল্ল (১৬৬০-১৭০০)
যোগনরেন্দ্রমল্ল (১৭০০-২০)
যোগমতী
যোগপ্রকাশ (১৭২০-৩০)
বিষ্ণুপ্রকাশ (১৭৩০-৪০)
বিশ্বজিৎমল্ল (১৭৪০-৫০)
তেজনরসিংহমল্ল (১৭৫০-৬০)

(প্রিন্সেপ সাহেবের নির্দ্দিষ্ট নামমালা)

জয়ব্রহ্মমল্ল (১৬০০ ?)
কন্যা
সিদ্ধিনরসিংহ (১৬৫৪-৮৫ খ্রীঃ)
নির্ম্মণ ইন্দ্রমল্ল (১৬৮৫-৮৯)
যোগনবেন্দ্রমল্ল (১৬৮৯-৯৫)
মহীপতীন্দ্রমল্ল (১৬৯৫-৯৬)
জয়বীর মহেন্দ্র (১৬৯৬-১৭০৬ ,
জয়ইন্দ্রমল্ল (১৭০৬-১৫)
হৃদয়নরসিংহ (১৭১৫-১৬)
কিষিনির্ম্মলদেব (১৭১৬-২২)
জয়যোগীযোগমল্ল দেব (১৭২২-২৯)
জয়বিষ্ণুমল্ল (১৭২৯-৩১)
জয়যোগপ্রকাশ মল্লদেব (১৭৪২-৪৯)
জয়বিষ্ণুমল্ল আগনি (১৭৪৯-৫৫)

আমরা উপরে শিলালিপি হইতে সাতটী নাম গ্রহণ করিয়াছি। নিম্নতন চারিটী নাম বংশাবলী হইতে গ্রহণ করিয়াছি। কাটমাণ্ডু নগরের চারি মাইল দক্ষিণে বঙ্গমতী নামে যে বৃহৎ গ্রাম বর্ত্তমান আছে, তথায় অব লোকিতেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। সেই মন্দিরের তোরণদ্বারে লোকেশ্বরের তিনটী কাংস্যনির্ম্মিত প্রতিকৃতি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। সিদ্ধিনৃসিংহমল্লের পুত্র শ্রীনিবাসমল্লের আদেশে ও অর্থব্যয়ে দ্বার-দেশ ও তোরণ স্বর্ণমণ্ডিত করা হয়। ৭৯২ নেপালী সংবতের (১৬৭২ খ্রীঃ) মাঘী শুক্লা পঞ্চমীতে এই কার্য্য সম্পন্ন হয়। নেওয়ারী অক্ষরে ও সংস্কৃতভাষায় এই লিপি খোদিত ও রচিত হয়। বংশাবলীর মতে তিনি ১৬৫৭-১৭০১ খ্রীঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। আমাদের নির্দ্দিষ্ট সময়ের অভ্রান্ততা এই ক্ষুদ্র শিলালিপি হইতে প্রমাণিত হইতেছে।

> "নেপালাব্দে লোচন ছিদ্র সপ্তে,
> শ্রীপঞ্চম্যাং শ্রীনিবাসেন রাজ্ঞা।
> স্বর্ণদ্বারং স্থাপিতং তোরণেন,
> সার্দ্ধং শ্রীমল্লোকনাথস্য গেহে॥"

শ্রীনিবাসমল্লের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র যোগনরেন্দ্রমল্ল পৈতৃক সিংহাসনে আরোহণ করেন। দোলপর্ব্বতস্থ বিষ্ণুমন্দিরে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার একবিংশতি পত্নী তাঁহার চিতানলে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। যোগনরেন্দ্র পুত্রশোকে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন বলিয়া বংশাবলীতে বর্ণিত আছে। অনন্তর কাটমাণ্ডুর মহারাজা প্রতাপমল্লের তৃতীয় পুত্র মহীন্দ্রমল্ল ললিতপট্টনের সিংহাসন অধিকার করেন। বংশাবলীর এই উক্তি কতদূর সত্য, তাহা বলা যায় না। ইহা হইতে এই সত্য পাওয়া যাইতেছে যে, রাজা সিদ্ধিনৃসিংহমল্লের সময় হইতেই ললিতপট্টন অল্লাধিক পরিমাণে কাটমাণ্ডুর পদানত থাকে।

শিলালিপি হইতে জানা যাইতেছে যে, রাজা যোগনরেন্দ্রমল্লের সিংহাসন পরিত্যাগের পর তাঁহার কন্যা যোগমতী ললিতপট্টনের রাজাসনে অধিষ্ঠিতা হন। এই যোগমতী দেবী ৮৪৩ নেপালী সংবতের (১৭২৩খ্রীঃ) মাঘী শুক্লা-দ্বিতীয়া তিথিতে সোমবারে রাধা-কৃষ্ণের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করেন।

> 'অব্দে বাণপ্রজেশ্বরাস্য বসুভিন্নাগেসিতে পক্ষকে,
> মাসে চোত্তরফাল্গুনে শশধরে বারে দ্বিতীয়া তিথৌ।
> প্রাসাদং ব্যকরোৎ সুধাংশুবদনা পাষাণ দেবালয়ং।
> কৃষ্ণং রাধিকয়া সহায় দ্বিতীয়ং কৃত্বা প্রতিষ্ঠামকরোৎ॥"

জ্যেষ্ঠপুত্র লোকপ্রকাশ মাতা যোগমতীকে শোকসাগরে ভাসাইয়া অকালে প্রাণত্যাগ করেন। এই লোকপ্রকাশের স্বর্গকামনায় রাজ্ঞী যোগমতী ললিতপট্টনে এক পাষাণময় দেবালয় নির্ম্মিত করাইয়া তন্মধ্যে রাধা-কৃষ্ণের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত করেন। লোক-প্রকাশের কনিষ্ঠ ভ্রাতা যোগপ্রকাশের রাজত্ব-কালে উক্ত শিলালিপি খোদিত হয়। যে পর্য্যন্ত অপ্রাপ্তবয়স্ক যোগপ্রকাশ রাজ্যশাসনে অক্ষম ছিলেন, ততদিন তাঁহার মাতা যোগমতীদেবীর দ্বারাই রাজকার্য্য পরি-চালিত হইত বলিয়া অনুমিত হয়। যোগ-প্রকাশের পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিষ্ণু-প্রকাশমল্ল ললিতপট্টনে রাজত্ব করেন। আমরা উভয় ভ্রাতার রাজত্বকাল ১৭২০-৪০খ্রীঃ পর্য্যন্ত বিংশতিবর্ষকাল অনুমান করিতেছি। বিষ্ণুমল্ল ১৮৫৭ নেপালী সংবতে মূলচকে এক ঘণ্টা স্থাপিত করেন বলিয়া বংশাবলীতে বর্ণিত আছে।

বংশাবলী হইতে জানা যাইতেছে যে,

বিষ্ণুমল্লের পর কাটমাণ্ডুর রাজকুমার রাজ্যপ্রকাশ এক বৎসর রাজত্ব করেন। রাজ্যপ্রকাশ কাটমাণ্ডুর রাজা জগজ্জয়মল্লের তৃতীয় পুত্র। বিষ্ণুমল্ল সম্ভবতঃ তাঁহাকে দত্তকপুত্র রূপে গ্রহণ করিয়া, রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেন। তাঁহার উৎপীড়নে প্রজাকুল ও অমাত্যবর্গ ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠে। অবশেষে রাজ্যের প্রধান ব্যক্তিগণ তাঁহার চক্ষুদ্বয় উৎপাটিত করিয়া রাজ্যপ্রকাশকে পদচ্যুত করে। রাজ্যপ্রকাশের পর তাহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা জয়প্রকাশ দুই বৎসরকাল ললিতপট্টনে রাজত্ব করিয়া, প্রধানদিগের দ্বারা বিতাড়িত হয়। জয়প্রকাশকে বিদূরিত করিয়া, প্রধানেরা বিষ্ণুমল্লের দৌহিত্র বিশ্বজিৎমল্লের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করেন। চারি বৎসর পর বিশ্বজিৎমল্ল বিদ্রোহী প্রধানদিগের হস্তে নিহত হয়। অনন্তর প্রধানেরা নবকোটের রাজা দলমর্দ্দন সাহকে ললিতপট্টনের সিংহাসনে অভিষিক্ত করে। চারি বৎসর রাজত্বের পর দলমর্দ্দনসাহ রাজ্যচ্যুত হয় এবং বিশ্বজিৎমল্লের পুত্র বা ভ্রাতুষ্পুত্র তেজনরসিংহমল্ল রাজপদ প্রাপ্ত হয়। তেজনরসিংহমল্ল তিন বৎসর মাত্র রাজ্যশাসন করেন। অনন্তর ললিতপট্টন নবকোটের রাজা পৃথ্বীনারায়ণের পদানত হয়।

শিলালিপির অভাবে বংশাবলী হইতে এই বিবরণ গৃহীত হইল। বংশাবলীর এই সকল উক্তি কত দূর প্রামাণিক, তাহা অবধারণের কোনও উপায় নাই। ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, বিষ্ণুমল্লের মৃত্যুর পর রাজ্য মধ্যে ঘোর অরাজকতা উপস্থিত হয়। আমাদের অনুমান মতে যোগনরেন্দ্রমল্লের মৃত্যুর পরেই নবাকোটও কাটমাণ্ডুর নরপতিগণের মধ্যে ললিতপট্টনে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপস্থিত হয়। সময় সময় কাটমাণ্ডু ও সময় সময় নবকোট ললিতপট্টনে স্বীয় প্রাধান্য সংস্থাপিত করে।

নবকোট নগরে গোরখাবংশের আধিপত্য খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহারা মেওয়ারের সূর্য্যবংশীয় নরপতিদিগের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। গোরখাবংশ প্রথমতঃ কুমায়ুনে ও পরে নবকোটে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ছয় শত পুরুষ রাজত্বের পর সমগ্র নেপালে তাঁহাদের অধিকার বিস্তারিত হয়। ক্রমে ক্রমে ললিতপট্টন, ভাটগাঁ ও কাটমাণ্ডুর মল্লবংশীয় নৃপতিগণ গোরখাবংশের পদানত হয়। নেপালে গোরখাবংশের আধিপত্য অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে অব্যাহত রহিয়াছে। নেপালের বর্ত্তমান মহারাজ ও অমাত্যবর্গ এই গোরখাবংশ হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন। কাটমাণ্ডুর মহারাজ প্রতাপমল্লের শাসন সময়ের আরম্ভে গোরখাবংশীয় ডম্বরসাহ নবকোটে রাজত্ব করিয়াছিলেন। প্রতাপমল্লের দ্বারা ডম্বরসাহ পরাজিত হইলে, গোরখাবংশের উদীয়মান প্রভুতা কিছুকালের জন্য পর্য্যুদস্ত থাকে। ভাটগাঁর রাজা মহেন্দ্রমল্ল এবং ললিতপট্টনের সিদ্ধিনৃসিংহমল্ল এই ডম্বরসাহের সমসাময়িক। ডম্বর সাহের বংশধর দলমর্দ্দন সাহের আধিপত্য ললিতপট্টনে কিছু কালের জন্য প্রতিষ্ঠিত থাকে। দলমর্দ্দন সাহের পুত্র নরনারায়ণ সাহ অনুমান ১৭৪০খ্রীঃ ভাটগাঁ আক্রমণ করিয়া তথায় স্বীয় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। নরনারায়ণের পুত্র পৃথ্বীনারায়ণসাহ ৮৮৮ নেপালী সংবতে (১৭৬৮খ্রীঃ) কাটমাণ্ডুর শেষ মল্লরাজ জয়প্রকাশকে পরাজিত করিয়া, সমগ্র নেপাল আপনার পদানত করেন। মহারাজ প্রতাপমল্লের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ ও

তৃতীয় পুত্র যথাক্রমে কাটমাণ্ডুর সিংহাসন অধিকার করেন। মহীন্দ্রমল্লের পর তাঁহার পুত্র ভাস্করমল্ল রাজপদ প্রাপ্ত হন। অপুত্রক অবস্থায় সংক্রামক রোগে ভাস্করমল্লের মৃত্যু হইলে, তাঁহার বিধবা পত্নীগণের সাহায্যে মল্ল-বংশীয় জগজ্জয়মল্ল রাজ্যলাভ করেন। কাট-মাণ্ডুর শেষ রাজা জয়প্রকাশমল্ল এই জগতজ্জয়মল্লেরই দ্বিতীয় পুত্র।

প্রতাপমল্লের পরবর্ত্তী কাটমাণ্ডুর কোনও নরপতির নামাঙ্কিত শিলালিপি পণ্ডিত বর ভগবানলাল ইন্দ্রাজীর গবেষণায় আবিষ্কৃত হয় নাই। রাজ্ঞী যোগমতী দেবীর অধস্তন ললিতপট্টনের কোন রাজার নামাঙ্কিত প্রস্তরলিপি পাওয়া যায় নাই। ভাটগাঁর অধিপতিদিগের নামাঙ্কিত এক-খানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। আমাদের অনুমিত সময়ের সত্যতা তাহা দ্বারা দৃঢ়ীভূত হইতেছে। রাজা ভূপালেন্দ্র মল্লের মাতা রাজ্ঞী ঋদ্ধিলক্ষ্মী ৮১০ নেপালী সংবতে (১৬৯০খ্রীঃ) কাটমাণ্ডুর রাজপ্রাসা-দের অনতিদূরে এক শিব মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন। উক্ত বৎসরের কার্ত্তিকী কৃষ্ণা-দ্বিতীয়া তিথিযুক্ত রবিবারে সেই মন্দিরে এক শিবলিঙ্গ স্থাপিত হয়। রাজা ভূপালেন্দ্রমল্ল ভুজঙ্গপ্রয়াত ছন্দে এক স্তোত্র রচনা করেন। এই স্তোত্রের শেষভাগে তিনি আপনাকে "রঘুবংশাবতার" "হনুমদ্ধ্বজ" ও "মহারাজাধিরাজ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই শিলালিপির দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"নেপালাক্ষিতিপালভালতিলকো বিদ্বদ্‌গুণালঙ্কৃতো,
দানোদ্রেককৃতাতিরেকমহিমঃ প্রৌঢ়প্রতাপোন্নতঃ।
দেবো যত্তনয়ো নয়োদয়-লসৎকীর্ত্তিপ্রচারঃ,
শ্রিয়া ভূপালেন্দ্র ইতি প্রথামুপাগতো ভূপো বরীবর্ত্ততে।২
নেপালাব্দে গগন-ধরণী-নাগযুক্তে, কিলোর্জ্জে
মাসে, পক্ষে বিধুবিরহিতে, সুদ্বিতীয়াতিথৌ যা।
কৃত্বা দেবালয়মপি রবৌ ঋদ্ধিলক্ষ্মী প্রসন্না
চক্রে দেবী সুবিধিবিদিতাং শম্ভবস্ত প্রতিষ্ঠাং"।৩।

বংশাবলীর মতে কাটমাণ্ডুর রাজা জগ-জ্জয়মল্ল ৮৫২ নেপালী সংবতে প্রাণত্যাগ করেন। কিন্তু এই জগজ্জয় (মহীপতীন্দ্র) মল্লের নামাঙ্কিত ৮৬৮ নেপালী সংবতের একটী মুদ্রা আসামের অন্তর্গত বরপেটায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা হইতে বংশাবলীর নির্দ্দিষ্ট সময়ের ভ্রান্তি ও অমূলকতা স্পষ্টাক্ষরে জানা যাইতেছে। ভাটগাঁর রাজা ভূপালেন্দ্র (ভূপতীন্দ্র) মল্লের নামাঙ্কিত আর একটী মুদ্রা বরপেটায় পাওয়া গিয়াছে। তাহা ৮১৯ নেপালী সংবতে নির্দ্দিষ্ট হয়।* এই দুই মুদ্রালিপি হইতে জানা যাই-তেছে যে, ১৬৯৯ খ্রীঃ ভূপালেন্দ্রমল্ল ভাটগাঁয় এবং ১৭৪৮খ্রীঃ জগজ্জয়মল্ল কাটমাণ্ডু নগরে রাজত্ব করিতেছিলেন। শিলালিপির অভাবে মুদ্রালিপি আমাদের অনুমিত সময়ের সত্যতা প্রতিপাদন করিতেছে।

ত্রয়োবিংশতি খানি শিলালিপি হইতে নেপালের প্রামাণিক ইতিহাস যথাসাধ্য সং-গৃহীত করিয়া প্রদর্শিত হইল। অতি প্রাচীন সময় হইতে গোরখাবংশের অধিকারকালের আরম্ভ পর্য্যন্ত নেপালের ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত হইল। এক্ষণে নেপালের বর্ত্তমান অধিপতির গোরখা বংশের বিবরণ সংক্ষেপে লিখিয়া বর্ত্তমান সুদীর্ঘ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। বর্ত্তমান প্রবন্ধ পরিবর্দ্ধিত ও পরি-বর্ত্তিত করিয়া শীঘ্রই পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

* Proceedings of A. Society of Bengal for 1893. p. 146.

আত্মা ও বাইওপ্ল্যাজম।

জনন-মরণজয়ী ব্রহ্মভূত শঙ্করাচার্য্য একদিন কোন নৃশংস কাপালিকের ক্রূর কামনা পূরণার্থ স্বেচ্ছাক্রমে স্বীয় গ্রীবা যূপ-কাষ্ঠে বিন্যস্ত করিয়া সহাস্য বদনে বলিয়া-ছিলেন, "কাপালিক! তোমার অসি যতই শাণিত হউক না কেন, আমার তিলাংশও ছেদন করিতে সক্ষম নহে; আমি জড় রাজ্যের সম্পূর্ণ অতীত, মদীয় জড়নির্ম্মোক্ মাত্রই তোমার করবালের ছেদনীয়।"

প্রতীচ্য ভূখণ্ডের অপর একজন তত্বজ্ঞ পুরুষও (সক্রেটীশ) একবার ঠিক ঐরূপ একটি অপূর্ব্ব কথা শুনাইয়াছিলেন। তিনি হলাহল পান করিয়া যখন মৃত্যুর মধুময় আলিঙ্গনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তখন তদীয় শিষ্য-বর্গ বড়ই অধীর হইয়া পড়ে। তাঁহাদিগের শোক মোহ অপনয়নের নিমিত্ত সক্রেটীশ বলিয়াছিলেন "তোমারা অমূলক শোকা-বেশে কেন ধৈর্য্য হারা হইতেছ? আমি যাহা আছি, তাহাই থাকিব। আমার কস্মিন কালেও ধ্বংস নাই। তোমরা এই স্থূল মাংস পিণ্ডকে "সক্রেটিস" বলিয়া কখনও মনে স্থান দিও না।"

শঙ্কর ও সক্রেটীশোক্ত কথার সত্যতা বর্ত্তমান শতাব্দীর বিজ্ঞানালোকে কতদূর প্রতিপন্ন হয়, তাহাই আমাদের আলোচ্য।

বিশ্ব-রহস্যভেদক বিজ্ঞান জীব-জগতের তত্ব সম্বন্ধে যতদূর সন্ধান পাইয়াছে, তাহাতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে যে, "Life proceeds from life" অর্থাৎ "প্রাণ প্রাণ হইতে প্রসূত।" এ পর্য্যন্ত কোন বৈজ্ঞানিক প্রকৃতির রাজ্যে এমন একটী নিদর্শন বা প্রমাণ দেখিতে পান নাই যে, জড় পদার্থ হইতে অজড় বা চৈতন্যের উদ্ভব হইয়াছে। ক্লিন্ন বা গলিত পদার্থ হইতে কীটপুঞ্জের আকস্মিক আবির্ভাব দেখিয়া স্থূলদর্শী বৈজ্ঞা-নিকগণ একদিন সদর্পে বলিত, "ঐ দেখ নির্জীব জড় পদার্থ হইতে সজীব প্রাণীর উৎ-পত্তি, তবে আর জড়াতীত চৈতন্য পদার্থের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ কি?" যে দৃষ্টি লইয়া "জড়োদ্ভূত চৈতন্য"বাদী এই কথা বলিতে সাহস করিত, এখন আণবীক্ষণিক দৃষ্টি প্রভাবে নগ্ন চক্ষুর সেই দৃষ্টি সম্পূর্ণ ভ্রান্তিপূর্ণ বলিয়া সে স্বীকার করিতে প্রস্তুত।

প্রকৃতি-প্রদত্ত সীমাবদ্ধ দর্শনশক্তি দ্বারা সূক্ষ্ম পদার্থের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করা, এখন উপহাসের কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অণু-বীক্ষণ বিযুক্ত হইয়া যে চক্ষু গলিত পদার্থ হইতে কীটোৎপত্তি দেখিয়া উহাকে তৎ-পদার্থের বিকার বলিয়া ভাবিয়াছিল, এখন দৃষ্টি-প্রদীপক অণুবীক্ষণের সহায়তায় সেই চক্ষু দেখিতেছে যে, "ক্লিন্ন পদার্থে বায়ুমণ্ডলস্থ কীটাণু বা উদ্ভিজ্জাণু সমূহ পরিপুষ্ট এবং পরি-বর্দ্ধিত হয় মাত্র। উহারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং উক্ত পদার্থ হইতে অনুদ্ভূত।" যে অবধি এই তত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, তদবধি প্রাচীন পণ্ডিতগণের পরিপোষিত" Spontaneous generation" বা স্বতঃজননবাদ ভ্রান্তিমূলক ও মিথ্যা বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত পাস্তর অণুবীক্ষণের পরীক্ষা ব্যতীত অতি সহজ উপায়ে অবি-সম্বাদিতরূপে প্রমাণিত করিয়াছেন যে, স্বতঃ জনন সম্পূর্ণ অসম্ভব। তিনি পদার্থের স্বাভাবিক পচন বা বিগলন প্রক্রিয়ার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া চক্ষুর অদৃশ্য

বীজাণু সমূহকেই উহার কারণ বলিয়া নির্ণয় করেন।

'He claimed if all germs could be excluded fermentation would be impossible. Again he was met with ridicule and old cry of spontaneous generation.

To prove this he carried out experiments in pure mountain air and he shewed conclusively that at that altitude of mountain where the air was free from germs no fermentation did occur [illegible] and therefore spontaneous generation was as he had all along contended a myth.

SCIENTIFIC AMERICAN
October, [illegible]

অর্থাৎ—"কোন পদার্থ বীজাণু সমূহ হইতে বিমুক্ত বা অনাবৃত রাখিতে পারিলে উহার বিগলন অসম্ভব। পাস্তুরের এই কথার পর তাঁহার বিরুদ্ধে প্রাচীন স্বতঃজননবাদ পোষক প্রতিবাদ ও উপহাসের ধ্বনি চারিদিকে উথিত হয়। নিজ মতের যাথার্থ্য প্রতিপাদন করিবার জন্য তিনি বিশুদ্ধ বায়ুতে পচন ক্রিয়ার পরীক্ষা করেন এবং অবশেষে প্রমাণিত করেন যে, পর্ব্বতের সমুচ্চ প্রদেশস্থ বায় বীজাণু বিহীন বলিয়া তথায় কোন ক্রমেই কোন দ্রব্য পচিতে পারে না। সুতরাং তাঁহার চিরপ্রতিবাদিত স্বতঃজননবাদ একটা অলীক উপকথা মাত্র।"

এইরূপ সন্তোষজনক প্রমাণ প্রাপ্তির পর কোন বৈজ্ঞানিকই আজকাল "স্বতঃজননবাদ" স্বীকার করেন না। ব্রিটিশ বিশ্বকোষ Encyclopaedia Britanica গ্রন্থের "জীবন বিজ্ঞান" প্রবন্ধে আচার্য্য হক্সলি মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন,—

"At the present moment there is not a shadow of trustworth direct evidence that abiogenesis (or spontaneous generation) does take place or has taken place within the period during which the existence of the globe is recorded" (P 689)

তাৎপর্য্য এই,—বর্ত্তমান সময়ে এরূপ কোন বিশুদ্ধ প্রত্যক্ষ প্রমাণের আভাস পাওয়া যায় নাই যে, পৃথিবীর উৎপত্তি অবধি কখনও "স্বতঃজনন" সংঘটিত হইয়াছে বা হয়।

যদি তাহাই হয়, তবে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, চৈতন্য জড়পদার্থনিষ্ঠ গুণ নহে, ইহা নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ বিভিন্নশক্তি। কিন্তু অনাত্মবাদী তাহা মানে কই? সে স্পর্দ্ধা-সহকারে বলিবে যে, জড়পদার্থ ব্যতীত জগতে পদার্থান্তরের অস্তিত্ব নাই। বিস্ময়ের বিষয় এই, জড়বাদী নির্জ্জীব পদার্থ হইতে সজীব পদার্থের উদ্ভূতি বিষয়ক প্রমাণ নাই, ইহা স্বীকার করিয়াও দেহাতিরিক্ত চৈতন্য শক্তিতে অবিশ্বাসী। সে স্বীয় মত সমর্থনের জন্য বলিবে, "যদিও সজীব পদার্থ হইতেই সজীব পদার্থের উৎপত্তি ব্যতীত নির্জ্জীব পদার্থ হইতে সজীবের উদ্ভব বর্ত্তমান জগতে দেখা যায় না, তথাপি ইহা অনুমেয় যে, সৃষ্টির প্রারম্ভে হয়ত পরমাণুপুঞ্জের অবিজ্ঞাত রাসায়নিক সংশ্লেষণে সজীব পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছিল, এখন তাহা হইতেই প্রবাহরূপে প্রাণীব্যূহ উদ্ভূত হইয়া থাকে।" এই স্থলে অবিজ্ঞাত রাসায়নিক সংশ্লেষণ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, কোন রসায়ন বিজ্ঞান-বিশারদ পণ্ডিতই আজ পর্য্যন্ত রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সজীব পদার্থ উৎপাদন করিতে পারেন নাই। কিন্তু তবু বিশ্বাস ও ভরসা, সেই অজ্ঞাত রাসায়নিক সংশ্লেষণ তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইলে, অনাত্মবাদী জড় পদার্থ হইতেই চৈতন্যের উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবেন। কি দুরাকাঙ্ক্ষা!

জড়বাদী যাহাই বলুক, স্বতঃসিদ্ধ সত্য যে, জড়পদার্থের কোন প্রকার সংমিশ্রণ বিমিশ্রণেই তাহা হইতে ইচ্ছা ও জ্ঞানশক্তির আবির্ভাব হইতে পারে না। জড়শক্তি চিরদিনই অন্ধ এবং আগন্তুক শক্তির নিয়ম্য। উহা স্বতঃ পরিচালিত হইতে অসমর্থ এবং

পরতঃ চালিত হইলে স্থগিত হইতে অক্ষম। প্রাণীজগৎ যদি জড় জগতের রূপান্তর হইত, তবে তাহাতে জড়োচিত গুণ ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইতাম না। প্রাণিজগতের প্রকৃতি, ধর্ম্ম, গুণ ও নিয়ম একবার বিশেষণ করিয়া দেখা যাক।

স্থাবর উদ্ভিজ্জ হইতে আরম্ভ করিয়া মনুষ্যাদি শ্রেষ্ঠ প্রাণী পর্য্যন্ত সমস্তের ভিতরই প্রাণের সঞ্চরণ বর্ত্তমান। যাহাতে প্রাণন ক্রিয়া লক্ষিত হইয়া থাকে, তাহাই প্রাণীজগতের অন্তর্গত, এবং যাহাতে তাহা লক্ষিত হয় না, তাহাই সাধারণতঃ জড়জগতের অন্তর্নিবিষ্ট। এখন দেখিতে হইবে, প্রাণ কাহাকে বলে। জীবন-বিজ্ঞান বলেন—"যে শক্তি দ্বারা বাইওপ্ল্যাজম্ (Bioplasm) বা জৈবনিক বীজাণুর কার্য্যক্রম সংসাধিত হইয়া থাকে, তাহাই প্রাণ।" বাইওপ্ল্যাজম্ তবে কিম্বিধ পদার্থ? এতত্তত্ত্বে বিজ্ঞানের যাহা বক্তব্য, তাহা বিবৃত হইতেছে।

কি স্থাবর কি জঙ্গম, যাবতীয় সজীব প্রাণীর দেহেই ত্রিবিধ অবস্থাপন্ন পদার্থ দৃষ্ট হইয়া থাকে। যথা,—

১। Germinal matter বা বীজভূত পদার্থ।

২। Nutrient matter বা পোষণসাধক পদার্থ।

৩। Formed matter বা গঠিত পদার্থ।

দেহের সর্ব্বাংশ কোন প্রাণীরই চৈতন্য শক্তি দ্বারা আবিষ্ট নহে। সমুদ্র গর্ভ হইতে একটী জীবিত শঙ্খ উত্তোলন করিয়া, উহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরীক্ষা কর, চেতন ও অচেতন অংশ সহজেই দেখিতে পাইবে। উহার কঠিন বহিরাবরণ অভ্যন্তরস্থ চেতন শরীরাংশের সহিত সংলগ্ন থাকিলেও সংপূর্ণ রূপে চৈতন্যের আবেশ-বর্জ্জিত। শঙ্খের বহিরঙ্গ পরিণত অবস্থা প্রাপ্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সজীব অন্তরঙ্গের পোষণ ক্রিয়ার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু তবু উহা মৃত জড়পিণ্ড মাত্র। মানব শরীরে শঙ্খের ন্যায় অচেতন কঠিনাবরণ নাই সত্য, কিন্তু হস্ত পদের নখর ঠিক সেইরূপ পদার্থ। এই প্রকার সমস্ত প্রাণী-শরীরেরই চারি ভাগ অচেতনাত্মক এবং এক ভাগ মাত্র চেতনাত্মক।

জীবদেহ অতি সূক্ষ্ম চক্ষুর অগ্রাহ্য কোষসমূহে পরিপূর্ণ। প্রত্যেক কোষের অভ্যন্তরে পরিপোষক পদার্থের স্রোত নিয়ত প্রবাহিত। এই সকল পদার্থ অম্লজানাদি বাষ্প এবং ভুক্ত অন্নরস ভিন্ন আর কিছুই নহে। কোষাভ্যন্তরে পোষক উপাদান সমূহ প্রবেশ করিয়া প্রথমতঃ সজীবতা প্রাপ্ত হয়, পরে গঠিত পদার্থ রূপে পরিণত হইয়া বহির্গত হয়। প্রতি কোষেই এইরূপ দুইটী অন্তর্মুখী পোষক পদার্থ লইয়া অন্তরে প্রবিষ্ট হয়, অপরটী বহির্মুখী গঠিত পদার্থের বহির্নিঃসারক। পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়নের অবোধ্য ও অনন্তুকৃত্য এক প্রকার অলৌকিক ক্রিয়া প্রভাবে কোষাভ্যন্তরে অচেতন পদার্থ সচেতনাবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং তাহাই আবার বহির্ভাগে পেশী, স্নায়ু, ধমনী প্রভৃতি রূপ ধারণ করে।

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে জীবন-বিদ্যা বিৎ পণ্ডিতগণ শরীরের কোষ ব্যূহই জীবনের নিদান বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, আনুবীক্ষণিক দর্শনের উন্নতির সহিত সেই মত পরিত্যক্ত হইয়া ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে কোষগর্ভস্থ বাইওপ্ল্যাজমই জীবনের বীজভূত বলিয়া নিরূপিত হয়।

অত্যন্ত দৃষ্টি-দীপক অনুবীক্ষণ সহ জীব

দেহের অন্তর্দ্দেশ নিরীক্ষণ করিলে দেখিতে পাইবে, দেহ যন্ত্রের যাবতীয় সংবিদ্‌শীল অংশেই বাইওপ্ল্যাজম্ ব্যাপ্ত। এক বর্গ ইঞ্চির পাঁচশত ভাগের এক ভাগেও একটী বাইওপ্ল্যাজমের অভাব নাই। এই জৈবনিক বীজাণু প্রতি অঙ্গেই অনুস্যূত রহিয়াছে।

১। বাইওপ্ল্যাজমই এক মাত্র চৈতন্যের আবাসক্ষেত্র।

২। শরীরের প্রত্যেক অংশই বাইওপ্ল্যাজম্ প্রভাবে সংবিদ্‌শীল এবং যান্ত্রিক বিধান যুক্ত বা Organized অর্থাৎ কোষময় হইয়া থাকে।

যান্ত্রিক বিধান-বিহীন পদার্থের সহিত যান্ত্রিক বিধান যুক্ত পদার্থের সম্পূর্ণ বৈসাদৃশ্য বর্ত্তমান। চৈতন্যের ক্রিয়া প্রভাবে পদার্থে যান্ত্রিক বিধান-যুক্ত না হইয়া থাকিতে পারে না। যে পদার্থে চৈতন্যের সঞ্চরণ বর্ত্তমান আছে, অথবা ছিল, তাহা তদিতর পদার্থ হইতে এই লক্ষণ দ্বারাই প্রভিন্ন হইয়া থাকে। শম্বুকে কিম্বা শঙ্খের বহিরাবরণ যদিও সংবিদ-শীল নহে, কিন্তু উহা কৌষিক অর্থাৎ যান্ত্রিক বিধান যুক্ত, যে হেতুক একদিন বাইওপ্ল্যাজম্ রূপে সংবিদ্‌শীল ছিল। এক খণ্ড প্রস্তর অথবা লৌহ এবং শঙ্খের বহিরাবরণ, ইহাদের সকলই চৈতন্য সঞ্চার-হীন, তথাপি পার্থক্য এই যে, প্রস্তর ও লৌহখণ্ডে যান্ত্রিক বিধানের চিহ্ন মাত্রও নাই, কিন্তু শঙ্খাবরণ সম্পূর্ণ যন্ত্রবিধান সমন্বিত। এক খণ্ড কাষ্ঠের সহিতও লৌহ পাষাণের সেই প্রভেদ। কাষ্ঠ খণ্ড কোন দিন সজীব ছিল, কিন্তু লৌহ ও পাষাণ কস্মিন কালে চৈতন্যের ক্রিয়া-পরতন্ত্র হয় নাই।

তোমার শরীরের মাংস, পেশী, শিরা, স্নায়ু এবং অস্থি প্রভৃতির প্রতি পরমাণুই বাইওপ্ল্যাজমের বিকার। তজ্জন্য সর্ব্বাঙ্গই যান্ত্রিক বিধান যুক্ত।

১। কৌষিক বিধানের প্রতি কেন্দ্রেই বাইওপ্ল্যাজম্ অবস্থিত।

২। বাইওপ্ল্যাজমের পরিপোষক পদার্থ অকৌষিক (Inorganic)।

৩। এই অকৌষিক এবং নির্জ্জীব পদার্থ, বাইওপ্ল্যাজম্ কর্ত্তৃক মুহূর্ত্ত মধ্যেই চেতনাত্মক রূপে পরিণত হয়। চৈতন্যাভাস বর্জ্জিত অন্নরসের স্রোত কোষ গর্ত্তে প্রবেশ করিল, আর জীবন পাইল। কি অলৌকিক ব্যাপার অনুবীক্ষণ সংলগ্ন নেত্রে পাঠক! একবার চাহিয়া দেখ,অতি ক্ষুদ্র, স্বচ্ছ, পিচ্ছিল, অবয়ব-হীন ঐ জীবনাণু কেমন সঞ্চরণশীল! পোষক উপাদান আত্মসাৎ করিয়া ক্রমশঃই উহা বর্দ্ধিত হইতেছে দেখিতেছ না? বৃদ্ধি পাইতে পাইতে নিমেষ মধ্যেই আবার দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পড়িল! সেই খণ্ডীভূত বাইওপ্ল্যাজম্ পুনরায় অন্নরসে পরিপুষ্ট হইয়া আবার খণ্ডিত হইল!

৪। প্রত্যেক বাইওপ্ল্যাজমই পূর্ব্ববর্ত্তী বাইওপ্ল্যাজম্ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

৫। একটী বাইওপ্ল্যাজম্ হইতে এরূপে অসংখ্য বাইওপ্ল্যাজমের উৎপত্তি হয়।

৬। প্রত্যেক বাইওপ্ল্যাজমই মৌলিক বাইওপ্ল্যাজমের ন্যায় শক্তি সম্পন্ন।

৭। একবার মৃত হইলে বাইওপ্ল্যাজম্ আর পুনরুজ্জীবিত হয় না।

জড় পদার্থ হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় চৈতন্যের উৎপত্তি যাঁহারা সমর্থন করেন, তাঁহারা মনে রাখিবেন যে, রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দুইটী বাষ্প (অক্সিজেন ও হাইড্রজেন) সংশ্লিষ্ট করিয়া জল উৎপন্ন করা যায় এবং

বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় পুনর্ব্বার বাষ্প দুইটী পৃথক্‌ভূত করা যায়। এই রূপ বিশ্লেষণ সংশ্লেষণে যতবার ইচ্ছা জলের বাষ্পীকরণ এবং বাষ্পদ্বয়ের জলীকরণ সংসাধিত হইতে পারে, কিন্তু একটী বাইওপ্ল্যাজম্ একবার বিনষ্ট হইলে কখনও কোন কৌশলে উহাকে উজ্জীবিত করা যায় না।

অনুবীক্ষণ তোমাকে অভ্রান্ত রূপে দেখাইয়া দিতেছে যে, বাইওপ্ল্যাজম্ স্পন্দন, সঞ্চরণ, স্ব সদৃশ জীবনাণুর উৎপাদন এবং স্নায়ু পেশী ধমনী শিরা ও অস্থি প্রভৃতির গঠন অদ্ভুত দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিতে সমর্থ।

তন্তুবায়ের বয়ন-প্রণালীর ন্যায় ঐ দেখ শরীরস্থ বাইওপ্ল্যাজমপুঞ্জ আশ্চর্য্য কৌশলে কোথাও পেশী, কোথাও স্নায়ু, কোথাও শিরা, কোথাও কঙ্কাল বিচিত্র শৃঙ্খলার সহিত নির্ম্মাণ করিয়া সতত ক্ষয় শীল দেহের ক্ষতিপূরণ করিতেছে!

বাইওপ্ল্যাজমের এই সকল কার্য্যে অভ্রান্ত জ্ঞানশক্তি দেদীপ্যমান। জীবনিবহের মাতৃ জরায়ু, ডিম্ব এবং বীজকোষ হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত বাইওপ্ল্যাজমের প্রতি কার্য্য অলৌকিক জ্ঞান ও ভবিতব্যভেদিনী দৃষ্টির সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে। চিত্র বা প্রতিমূর্ত্তি যেরূপ চিত্রকর ও কুলালের পূর্ব্বকল্পিত মানসচিত্রের আদর্শে চিত্রিত ও সংগঠিত হইয়া থাকে, প্রাণীপুঞ্জের দেহ গঠনেও বাইওপ্ল্যাজম সেইরূপ এক অলক্ষিত মহামনীষী চিত্রকরের মানসচিত্রানুরূপ কার্য্য সাধন করিয়া থাকে। বাইওপ্ল্যাজমের রচনা চিন্তা করিতে গেলে বুদ্ধি স্তম্ভিত হইয়া যায়।

কোন পক্ষীর অচির-প্রসূত একটী ডিম্ব ভগ্ন করিয়া দেখ, কতকগুলি আকৃতিহীন পদার্থ মাত্র দেখিতে পাইবে। চারি পাঁচ দিবস পর সেই পাখীর একই সময়ে প্রসূত আর একটী ডিম্ব ভাঙ্গিয়া দেখ কত পরিবর্ত্তন!! সেই পিচ্ছিল পদার্থগুলি ঘনীভূত হইয়া চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, চঞ্চু, পক্ষ, পদ, প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন বিহঙ্গরূপ ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখনও অবয়বের পূর্ণতা প্রাপ্তি হয় নাই।

জড়বাদিন্! বলিতে পার ঐ পক্ষীশাবক কাহার গঠিত? তুমি বলিবে জড়শক্তির। কিন্তু একটী কথা তোমার নিকট জিজ্ঞাস্য, যে সকল ইন্দ্রিয়গ্রামে সমন্বিত হইয়া বিহগপ্রণ গঠিত হইতেছিল, তাহার ব্যবহার বা কার্য্য কি ডিম্বগর্ভে চলিতেছিল? নিশ্চয়ই না। তবে কি উহার ভবিষ্য প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত চক্ষু কর্ণাদি অভিব্যক্ত হইতেছিল? বোধ হয়, তাহাই তোমার স্বীকার্য্য। তোমার জড়শক্তি কি ভবিষ্যতের প্রয়োজন বুঝিয়া কার্য্য করিতে সক্ষম? জানি না, ইহার উত্তর তুমি কি দিবে। কিন্তু নিশ্চিতই জানি ও, মননজ্ঞানাত্মিকা পরিণামদর্শী চৈতন্যশক্তির কার্য্য ভিন্ন জড় পদার্থের ইচ্ছা জ্ঞানহীনা অন্ধশক্তি দ্বারা এই কার্য্য সাধিত হইতে পারে না। বাইওপ্ল্যাজমের অন্তগর্ভে লুক্কায়িত থাকিয়া সেই জ্ঞানশক্তিই এই সমস্ত রঙ্গাভিনয় করিয়া থাকেন।

আর একটী বিস্ময়জনক কথা শ্রবণ কর। রাসায়নিক পরীক্ষায় ইহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে নির্ণীত হইয়াছে যে, সকশেরুক, অকশেরুকাদি সমস্ত প্রাণীর এবং দ্বিখণ্ডবীজী, অখণ্ডবীজী প্রভৃতি সমুদয় উদ্ভিজ্জের বাইওপ্ল্যাজমই ঠিক এক উপাদানে নির্ম্মিত। সদৃশ গুণযুক্ত পদার্থের ক্রিয়া সর্ব্বত্রই সদৃশরূপ। কিন্তু বলিতে পার, একটী চটক পক্ষীর বাইওপ্ল্যাজম হইতে একটী গৃধ্র উৎপন্ন হয় না

কেন? যদি জড়পদার্থ-নিষ্ঠ গুণেই জীবদেহ গঠিত হইত, তবে এক ঔপাদানিক পদার্থ হইতে অসংখ্যজাতীয় প্রাণীর সৃষ্টি হইত না। তাহা যখন হয়,তখন স্বীকার করিতেই হইবে যে,স্বাধীন ইচ্ছাবৃত্তিসম্পন্ন এক অজড়শক্তির হস্তে, কুলালের হস্তে একই মৃত্তিকায় বিচিত্র বিচিত্র প্রতিরূপ বিনির্ম্মিত হওয়ার ন্যায়;—বাইওপ্ল্যাজম দ্বারা অসংখ্য আকৃতি প্রকৃতির জীবদেহ গঠিত হইতেছে। শিখণ্ডী, পেচক, সারমেয়, সিংহ, পতঙ্গ, ভুজঙ্গ, ভিন্তিড়ি তমালাদি বিচিত্র এবং বিসদৃশ প্রাণী ও উদ্ভিজ্জ সেই একই হস্তের কারুকার্য্য। সেই অলক্ষিত শক্তির নিয়মেই বাইওপ্ল্যাজম পরিচালিত এবং তদ্বিকার শরীর বিনাশশীল,কিন্তু সেই শাশ্বতী শক্তি অথবা আত্মা অক্ষয়, অব্যয়, অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, অশেষ্য এবং অপরিবর্ত্তনীয়। ইহার ক্রিয়া যত দিন বাইওপ্ল্যাজমে বর্ত্তমান থাকে, ততদিনই জীবন ইহার একমাত্র Animating principle. এখানে অবশ্যই বলা উচিত যে, কেবল মাত্র আত্মার শক্তিতে বাইওপ্ল্যাজামের-কার্য্য সর্ব্বতোভাবে সাধিত হয় না। বাইওপ্ল্যাজমের কার্য্য কিয়ৎপরিমাণে ভৌতিক পদার্থের উপরও নির্ভরশীল। নাবিক যেরূপ বহিত্র চালনায় কর্ণ, অনুকূল স্রোত ও বাতাসের সহায়তার উপর নির্ভর করে, আত্মাও তদ্রূপ বাইওপ্ল্যাজমের কার্য্য সাধনে ভূত পঞ্চকের মুখাপেক্ষী। আত্মা নাবিক স্থানীয়।

কোন কোন সজীব পদার্থের প্রাণনক্রিয়া অবস্থা বিশেষে কিছু কালের জন্য অব্যক্ত ও স্থগিত থাকিতে দেখা যায়। জৈবনিক ক্রিয়ার অনুকূলতাসাধক এবং সন্দীপক কারণ অভাবেই ঐ রূপ ঘটিয়া থাকে। অনেক উদ্ভিজ্জের বীজ চৈতন্যের ক্রিয়া শক্তি প্রভাবে শত শত বৎসর সজীব থাকিতে পারে; কিন্তু ভৌতিক পদার্থের সাহায্য অভাবে অর্থাৎ মৃত্তিকা জলাদির বিহীনতায় ব্যক্ত বা উদ্ভিন্ন হইতে পারেনা এবং প্রাণনক্রিয়াও যথাবিধানে চলে না। মণ্ডুকাদি প্রাণীও, ভৌতিক শক্তির অনুকূলতা অভাবে সজীব অথচ জৈবনিক ক্রিয়া রহিত হইয়া নিশ্চেষ্ট অবস্থায় বাস করে। এ সকল স্থলে একাকী আত্মার শক্তিতে বাইওপ্ল্যাজমের কার্য্য চলিতে পারে না। চৈতন্য—শক্তির সহিত ভৌতিক শক্তির পরিণয় হইলেই জৈবনিক ক্রিয়া চলিয়া থাকে।

আত্মার জ্ঞান শক্তি ভৌতিক শক্তি নিরপেক্ষ; কিন্তু জড় জগতের কার্য্য সাধন করিতে হইলে উহাকে জড় পদার্থের সহিত উদ্বাহ সূত্রে বদ্ধ হইতে হয়। জড় পদার্থ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াও অর্থাৎ দেহাবসানেও আত্মার অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে, কিন্তু জড় জগতের উপর প্রভাব থাকে না।

মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে কোন কথাই বলা হয় নাই। মন আত্মা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক; সুতরাং তাহার আলোচনা অন্য প্রবন্ধের বিষয়ীভূত।

শ্রীগুরুপ্রসন্ন সোম।

আত্ম বা নিগূঢ় বৈষ্ণব দর্শন। (৩)

৩৫। প্রকৃত প্রস্তাবে আত্মস্থ বা স্বরূপস্থ হইবার পূর্ব্বে, বিষয়ীর অন্তরে বৈরাগ্যজাত প্রকৃত আত্ম-চিন্তার—আত্ম-প্রশ্নের কোন না কোনরূপ স্ফুরণ হইতে থাকে। এই চিন্তা

গাঢ় পরিপাক প্রাপ্ত হইলে নিম্ন-প্রদর্শিত কোনরূপ আকারে বিকশিত হইয়া থাকে,—এইত আমি যখন যে বিষয়ের সঙ্গে মনাদি ইন্দ্রিয়যোগে মিলিত হইতেছি, তখনই আমি তদাকারে পরিণত হইয়া—সেই ইন্দ্রিয়যুক্ত বিষয়াকারে আকারিত হইয়া,—আত্ম দৃষ্টি-বিমুখ অবস্থায় বিষয়স্রোতে নীয়মান হইয়া ক্রমাগত বিষয়ান্তরের প্রতি ধাবিত হইতেছি এবং নানা ভাব ও প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া কর্ম্মক্ষেত্ররূপ-রঙ্গভূমিতে কত প্রকার অভিনয় প্রদর্শন করিতেছি। সেই বিষয়পুঞ্জ আমাকে আমার কোন পরিচয় প্রদান করিল না, আমার কোন স্বরূপ দেখিতে দিল না; অথচ তাহারা সর্ব্বদাই আমাকে আত্মসাৎ করিয়া লইতেছে। তাহারা যেন চৌর্য্যবৃত্তি দ্বারা আমার জ্ঞানানুরাগাদি যথা সর্ব্বস্ব সবলে অধিকার করিয়া লইতেছে। আমি ঠিক যেন তাহাদের ক্রীড়নক সামগ্রী—তাহাদের ক্রীত বস্তু—তাহারা যেন ইচ্ছাপূর্ব্বক আমাকে কখনও কাহার নিকট বিক্রয় করিতেছে, কখনও কাহারও নিকট হইতে ক্রয় করিতেছে—আমি নিজের কেহই নই। ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিলে, আমার নিজের অস্তিত্ব, আমি প্রকারান্তরে বুঝিতে পারি। আমি এই পর্য্যন্ত বুঝিতে পারি যে, আমি একজন আছি; নতুবা এই জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছাদি কাহার? শব্দ স্পর্শাদি, রূপ, রস, গন্ধাদির অনুভূতি হয় কার? কিন্তু আমি কোন ক্রমে আমার নিজেকে আমার নিজের বিজ্ঞেয় বা জ্ঞান দৃষ্টির বিষয়ীভূত করিতে পারিতেছি না। আমি কি কেহই নই, কেবল মাত্র চতুর্দ্দিকস্থ বিষয়পুঞ্জের খেলিবার খেলানা? আমার অন্তরে স্বাধীনতার অভিমান আছে, কিন্তু সে স্বাধীনতা কি কলুর ঘানিযন্ত্রযুক্ত বলীবর্দ্দের স্বাধীনতার অনুরূপ নয়? আমি যদি আমার আত্মস্বরূপকে আমার জ্ঞানের বিষয়ীভূত করিতে না পারি, তাহা হইলে আমার জ্ঞানের অভিমানের মূল্য কি? তাহা কি অন্তঃসারশূন্য বৃথা অভিমান নহে? আত্মদর্শনাভাবে আমি নিজে কে, আমি নিজে কার, আর কেই বা আমার, এ সকল স্পষ্ট কিছুই বুঝিতে পারিলাম না! আমি যখন আমার আত্ম স্বরূপকে জ্ঞানগম্য করিতে না পারিলাম, তাহা হইলে আমার ঈশ্বরকে—আমার পরমাত্মাকে আমি কেমন করিয়া আমার জ্ঞান দৃষ্টির বিষয়ীভূত করিব? ওটী না হইলে এটী ত কখনই সম্ভাবিত হইতে পারে না। আমার মানবজন্ম বুঝি বৃথাই হইল? যাহারা সর্ব্বদাই আমাকে আত্ম-সাৎ করিতেছে, তাহাদের নিকট আমার মনের ভাব, আমার আত্ম প্রশ্ন প্রকাশ করিলে—আমার প্রকৃত পরিচয় চাহিলে, তাহারা বিদ্রুপের হাসি হাসিয়া প্রস্থান করে। স্ত্রী পুত্র বন্ধু বান্ধবাদি যাহারা সর্ব্বদাই আমার প্রীতি বা মোহ উৎপাদন করিতেছে, তাহারাও আমার আত্ম প্রশ্ন শুনিলে, "ও আবার কি কথা," বলিয়া বিস্ময়াপন্ন হয় এবং আমাকে মতিচ্ছন্ন মনে করে। আমি যে কথা বলি, তাহারা আমার সে ভাষাও ভাব কিছুই বুঝিতে পারে না। এবং তজ্জন্য তাহাকে 'উন্মাদ-প্রলাপ' বলিয়া মনে করে। এই সংসারে আমি অনুক্ষণ তুমি হইয়া আত্ম বিস্মৃতির সাগরে ডুবিয়া যাইতেছি, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন তুমিও স্বচ্ছ দর্পণ হইয়া আমাকে আত্ম-সাক্ষাৎকার স্বরূপ সাক্ষাৎকার করাইল না। এই আদ্যন্তবিহীন বিষয়-রাজ্যের মধ্যে এমন কি কোন নির্ম্মল বিষয় নাই, যাহার সঙ্গে মিলিলে

যাহার স্বরূপাকারে পরিণত হইলে, আমার স্বকীয় স্বরূপ আমার দৃষ্টি পথের অতিথি হইবে? আমি ইষ্টজ্ঞানে এতদিন যে ঈশ্বরকে উপাসনাদি করিতেছি, তাঁহাকে অনুমান ভিন্ন প্রকৃত জ্ঞানের অভিজ্ঞেয় বিষয় করিতে পারি কৈ? জ্ঞানের বিষয় করিবা মাত্র, আমি ঈশ্বরের স্বরূপাকারে নিশ্চয়ইত পরিণত ও আকারিত হইব—নিশ্চয়ইত মহান্ বিরাট্ পুরুষ, ও শুদ্ধ বুদ্ধ ও মুক্ত হইযা দাঁড়াইব। ঈশ্বর দর্শনের পূর্ব্বেত মানুষকে তদাকারে পরিণত হইতে হইবে, নচেৎ ঈশ্বর দর্শনের কোন অর্থই ত হয় না। কোন মানুষ কি এরূপ হইতে পারিয়াছে?—কোন মানুষ কি ঈশ্বরাকারে পরিণত হইয়া ঈশ্বরস্বরূপ দর্শন করিয়াছে? কিন্তু ঈশ্বরাকারে পরিণত হইয়া ঈশ্বর দর্শন করিবে কে? তাহা অবশ্যই আমাদের মনবুদ্ধি বা অন্তঃকরণ নহে। বোধ হয়, আত্মাই ঈশ্বরকে—পরমাত্মাকে দর্শন করে; তবে আত্ম স্বরূপ অগ্রেই প্রস্ফুটিত হওয়া চাই। সাধুরা বলেন,—শাস্ত্রে বলে আত্ম-তত্ত্বের পর পরমাত্মাতত্ত্ব। এ কথা অসত্য বা অগ্রাহ্য নহে। আমাদের ধারণার অসাধ্যতা-হেতু পরমাত্ম-তত্ত্ব নিশ্চয়ই একেবারে আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে পারে না; একেবারে বিষয়ীকে তদাকারে পরিণত করিয়া, তাহার নিকট পরমাত্ম স্বরূপ উদিত হইতে পারে না। অগ্রে আত্মতত্ত্বের স্ফুরণ হওয়া তজ্জন্য আবশ্যক। নচেৎ যিনি ইন্দ্রিয়াদি মনোবুদ্ধির অপ্রাপ্য ও অবিষয়ীভূত, সেই ইন্দ্রিয়াদি মনোবুদ্ধি কিরূপে—কোন স্থানে তাঁহাকে ধারণ করিয়া, তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিবে? ইন্দ্রিয়গ্রামের মধ্যে সে স্বচ্ছ নির্ম্মল দর্পণ কোথা; যেথানে তাহার প্রতিস্বরূপ অঙ্কিত হইলে—যেখানে তাঁহার ফটো উঠিলে তিনি আমাদিগকে একেবারে স্বকীয় পরমাত্ম স্বরূপে পরিণত করিয়া, আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইবেন? আপাততঃ সেরূপ নির্ম্মল দর্পণ ত ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধির রাজ্য-মধ্যে কোথাও দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। কিন্তু আবার সাধু সজ্জনেরা একবাক্যে ঈশ্বর দর্শনের সম্ভাবনার কথা বলেন। বুঝিতে পারি না, যিনি নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ, তিনি কিরূপে মানুষকে তাঁহার অতীন্দ্রিয় স্বরূপের জ্ঞানে তাহাকে সমর্থ করেন? যেমন মানুষের ইন্দ্রিয় বৃত্তির স্ফূর্ত্তি সম্পাদিত হইয়া, তাহার বহির্বিষয়ের জ্ঞান জন্মিয়া থাকে, তেমনি কি কোন অতীন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়বৃত্তির উৎপত্তি হইয়া, সেই ইন্দ্রিয়াতীত পরমবস্তু সেই নবজাতীয় ইন্দ্রিয়-গ্রামের স্বচ্ছ দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া, আমাদের জ্ঞানের অধিগম্য হন? এইরূপে কি আত্মস্বরূপ ও পরমাত্ম-স্বরূপ মানুষের দৃষ্টিপথগম্য হইয়া থাকে? কোন বিশেষ পন্থানুসারী হইয়া সাধন ভজনাদি দ্বারা এরূপ অভিনব অতীন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়গ্রাম স্ফূর্ত্তি হওয়া, নিতান্ত অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া বোধ হয় না। কোন বিষয়ের সঙ্গে একজাতীয় বা সমশ্রেণীস্থ না হইলে তাহার স্বরূপোপলব্ধি হয় না, এ কথা প্রসিদ্ধ। এইজন্যই বুঝি, বহির্ব্বিষয় বিনির্ম্মিত অনাত্ম ইন্দ্রিয়গ্রামে আমরা শুদ্ধ তজ্জাতীয় বহির্ব্বিষয়ই উপলব্ধি করি। তজ্জন্যই বোধ হয় অতীন্দ্রিয় মনাতীত বিষয় উপলব্ধি করিবার জন্য অতীন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়গ্রাম স্ফূর্ত্তির প্রয়োজন হইয়া থাকে। এইজন্যই বুঝি শাস্ত্রে বলে, নবজীবন লাভ না হইলে ঈশ্বর দর্শন হয় না। পুরাতন জীবনে পুরাতন ইন্দ্রিয়-

গ্রামে ঈশ্বরের লাভ অসম্ভব। ভাল যাঁহারা ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন বলেন, তাঁহাদের নব ইন্দ্রিয়গ্রাম স্ফূর্ত্তি হইয়াছে বলিয়া অনুভব হয় না, তাঁহাদের বাহ্য ব্যবহার দেখিলে ঈশ্বরের সঙ্গে তন্ময়ত্ব লাভ হইয়া, আত্ম ও পরমাত্ম দর্শন হইয়াছে, তাহা ত কোন ক্রমেই অনুমানসিদ্ধ হয় না। জগতের সামান্য সুন্দর মনোজ্ঞ বস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ হইলে মানুষ অনেক সময় এমন আসক্ত ও অনুরক্ত হইয়া পড়ে, তাহার যে মোহশৃঙ্খল হইতে কোন ক্রমেই সহজে আপনাকে স্বতন্ত্র করিতে শক্ত হয় না; সুতরাং যিনি সকল সৌন্দর্য্যের নিদান—পরম উপাদেয়, পরম নিরঞ্জন ও পরম সারাৎসার পদার্থ, তাঁহাকে দৃষ্টিপথের বিষয়ীভূতরূপে প্রাপ্ত হইলে, মানুষের অবশ্যই এমন ঐকান্তিক আসক্তি জন্মিবে, যে, তাহাতে বিষয়মোহের স্থান থাকিবার সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। যখন জগতের সামান্য বিষয়ও কখনও কখনও এমন গাঢ়রূপে আমাদের অন্তরে অঙ্কিত হইয়া যায় যে, সহজে তাহার মোচন হওয়া দুষ্কর হইয়া উঠে,তখন সেই সারাৎসার নিত্যবস্তু,জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইলে, তাহা যে অবশ্যই তাহাতে সহস্র সহস্রগুণে গাঁথিয়া, বিঁধিয়া, লাগিয়া, জ্ঞানাঙ্গে নিত্যধন হইয়া থাকিবে, তাহাতে আর সংশয় কি? ঈশ্বরদর্শীর পক্ষে বিষয়ান্তরের মোহে ও প্রলোভনে পতিত হওয়া এই জন্য নিতান্ত অসম্ভব। যে সমস্ত সাধুভক্ত, তাঁহার প্রেমে আত্মহারা হইয়াছেন,তাঁহাদের ঈশ্বরদর্শন ঘটনা, অবশ্য কখনই মিথ্যা কথা নহে। যদি বর্ত্তমান জ্ঞান-সহায় ইন্দ্রিয়গ্রামে, আত্ম ও পরমাত্ম দর্শনের কোন সম্ভাবনা না থাকে, তবে সাধুশান্তেরা অবশ্যই অন্য কোন উপায়ে অতীন্দ্রিয় কোন প্রকার নূতন ইন্দ্রিয়গ্রাম সম্পন্ন হইয়া আপনাদের আত্মস্বরূপ ও পরমাত্ম স্বরূপ দর্শনে কৃতার্থ হইয়া থাকেন সে উপায়টী কি? তাহার সন্ধান কে আমাদিগকে বলিয়া দিবে? এজন্য আর বৃথা চিন্তা করি কেন? সেই ঈশ্বরদর্শী সাধুরাই নিশ্চয়ই তাহার সন্ধান জানেন। উপায়জ্ঞ মাত্রেই অবশ্যই উপায় প্রদর্শনক্ষম হইবেন, সন্দেহ নাই। তবে, বোধ হয়, অবশ্যই তাঁহাদের সাক্ষাৎ কৃপা ও অনুগ্রহ লাভের অপেক্ষা করে। যাঁহারা কোন উপায় অবলম্বন করিয়া ঈশ্বর স্বরূপের সঙ্গে তন্ময় হইয়াছেন, তাঁহাদের কাহারও সঙ্গে তন্ময় হইতে পারিলে তাঁহার দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া মনস্কামনা সিদ্ধ হইতে পারে। এতদিন এ দিক সেদিক্—স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল "পর্ব্বত পাথর ব্যোমে" যে সুনির্ম্মল স্বচ্ছ দর্পণ অন্বেষণ করিতেছি, তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত সাধু সজ্জন ভিন্ন সেই দর্পণ আর কেহই হইতে পারে না। তাইত সেই অবাঙ্মনস গোচর ঈশ্বরকে সর্ব্বাগ্রে জ্ঞানের সাক্ষাৎ বিষয়ীভূত করিবার বৃথা চেষ্টা অপেক্ষা তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত বা স্বরূপদর্শী সাধু শান্তদিগের সঙ্গে মিলিত হইয়া তদাকারে আকারিত হইয়া তাঁহাদের অন্তরঙ্গ অঙ্গীকারকরিয়া স্বরূপদর্শন চেষ্টা একমাত্র সুসাধ্য বলিয়া বোধ হয়। অথবা উভয়বিধ পন্থার তুলনায় এই শেষোক্ত পন্থাকে অপেক্ষাকৃত সুসাধ্য মনে হইলেও তাহাকে কেমন করিয়াই বা নিতান্ত সুসাধ্য বলিব? কোন সাধু বিশেষের সঙ্গে অন্তরে ঐক্য হইয়া তন্ময়ত্বজাত দিব্যচক্ষু লাভ কখনই নিতান্ত অনায়াস-সাধ্য নহে। নিতান্ত অনায়াস সাধ্য না হইলেও তজ্জন্য আমাকে ত নিতান্তই চেষ্টা পাইতে হইবে, নতুবা আমার অন্তরে এ দুর্নিবার আত্ম প্রশ্নের উদয় কেন?—আত্ম ও পরমাত্মতত্ত্ব লাভের

জন্য এ দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা কেন? কি জন্য অন্তরে এই দুর্নিবার অনুরাগের উদ্দীপনা। এতাদৃশ অনুরাগ কি দরিদ্রের ধনাকাঙ্ক্ষার ন্যায় ব্যর্থ হইবার জন্য জন্মিয়াছে? 'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন' এইভাবে সৎসঙ্গে মিলিয়া পরমধন উপার্জ্জন করিতে হইবে। চিরকালইত সাধু সজ্জন, সাধু সজ্জনের অনুগত হইয়া অভীষ্টসিদ্ধ হইয়াছেন। ইহাত বেদান্তেরই উপদেশ যে "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ্ নিবোধত,—সদ্গুরুসঙ্গ লাভ করিয়া প্রবোধিত হইবে।"নান্যঃপন্থা বিদ্যতে-অয়নায়।" যাহাদের অন্তরে,নিজ নিজ পরম সৌভাগ্য ও সুকৃতি বশতঃ কোন না কোন প্রকার বৈরাগ্যজাত আত্ম প্রশ্ন উদয় হয়, তাঁহারা যথা সময়ে এইরূপ কোন সৎসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া, সদ্গুরু অন্বেষণে অনুরাগী হইয়া থাকেন।

৩৬। বিষয়ী এইরূপে আত্ম প্রশ্নের কোন প্রকার মীমাংসা করিয়া, আত্ম ও পরমাত্ম-তত্ত্ব লাভার্থী হয় এবং যথা কালে সদ্গুরুরূপ বিষয়াশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া, কৃতার্থোন্মুখ হইয়া থাকে। এই জন্য জ্ঞানের অনাত্ম প্রকোষ্ঠে ও অপর প্রকোষ্ঠদ্বয়ে এই উভয়-বিধ স্থলেই জ্ঞানোৎপত্তির নিয়ম প্রণালী সম্বন্ধে অনেক প্রভেদ আছে। জ্ঞানের অনাত্ম প্রকোষ্ঠে এই জ্ঞানের উদয় স্বভাবের ক্রমেই—সতঃই শুদ্ধ বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ীর সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ও তদাকার প্রাপ্তি হইতেই—সহজেই—বিনা আত্ম প্রশ্নে—বিনা প্রযত্নে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এখানে তজ্জন্য বিষয়ীর বিবেক ও বৈরাগ্য, বিষয় সন্নিধানে শিষ্যত্ব ও আনুগত্য স্বীকার, তৎ-সন্নিধানে কৃপাভিক্ষা ও তাহার আনুকূল্য প্রাপ্তি, এ সকল পৌর্ব্বাহ্নিক কোন আয়োজনের কিছুই প্রয়োজন হয় না। বস্তুতঃ এই অনাত্ম প্রকোষ্ঠে বিষয়ীর এই জ্ঞান, কোন আয়োজন সাধন ও সাক্ষাৎ বিষয় কৃপাসাপেক্ষ নহে। এই অনাত্ম জাতীয় বিষয় জ্ঞান, বিনা আয়াসেই—বিনা প্রযত্নেই, বিষয় পুঞ্জের বহিরঙ্গে, ইন্দ্রিয় সংযোগ মাত্রই, ব্যবহারিক ভাবে বিষয়ীর তদাকারে পরিণতি-হেতু তন্মধ্যে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু জ্ঞানের আত্ম বা পরমাত্ম-প্রকোষ্ঠে বিষয়ীর আত্ম বা পরমাত্ম জ্ঞান লাভ পূর্ব্বানুরূপ স্বভাবের ক্রমেই—স্বতঃই সম্পন্ন হইলেও, বিনা আয়াসে, বিনা আনুগত্যে, বিনা দেহ মনঃ প্রাণার্পণে, বিনা সাক্ষাৎ কৃপানুকূল্যে, সহজে সম্পন্ন হইবার নহে। এখানে বিষয়ীকে পূর্ব্বের প্রতিবিম্বে জাগরিত অহং অধ্যাস বা অহং ভ্রান্তি হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া,—সেই প্রতিবিম্বিত সত্তার—জীব সত্তার জীবত্ব সমাধি গর্ভে সমাহিত করিয়া, আত্ম ও পরমাত্ম-তত্ত্ব যথানুক্রমে সম্পন্ন হইতে হইবে। এখানে যথাতত্ত্ব-সম্পন্ন বিষয়ের বাহ্যমূর্ত্তির প্রতি চাহিবা মাত্র তৎ বহিরঙ্গে পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া, যথা-কার্য্য সিদ্ধি লভনীয় নহে। এখানে বিষয়ীকে যথা-কার্য্য-সিদ্ধির উদ্দেশে বিষয়ের অন্তরতম অন্তরঙ্গের সঙ্গে—তাহার পরা-প্রকৃতি-গত রাগ-ভাব ঘন, প্রেম-ঘন নিত্য নিরঞ্জন দেহের সঙ্গে মিলিত হইয়া—তন্ময় হইয়া তদাকারে পরিণত হইতে ও যথাকার্য্য উদ্ধার করিতে হইবে; তবেই যথাযথতত্ত্ব-সম্পন্ন হইতে সাধ্য হইবে। তাহা তাদৃশ সহজ সাধ্য ও অনায়াস লভ্য নহে।

৩৭। এখানে দুইটী সম্পূর্ণ নূতন ব্যাপারের প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে। বিষয়ীকে প্রথমতঃ পূর্ব্বকার সুসজ্জিত স্বস্ব

ও সুপ্রতিষ্ঠিত সংসার নির্ম্মম ভাবে ভঙ্গ করিতে হইবে। পূর্ব্বকার অহং অধ্যাসে প্রবুদ্ধ জীবোপাধি জীবাত্মারূপ প্রতিবিম্বকে নিহত, নির্জ্জীব বা নিঃসত্ব করিয়া, তদঙ্গ-ভাসিত মনোময়, অনাত্মময়, স্বকল্পিত সৃষ্টির তদবস্থাপন্ন অন্তঃ প্রলয় সম্পাদন পুবঃসর বিষয়ীকে প্রকৃত প্রস্থাবে মুক্তিলাভ করিতে হইবে, ভজনে মরিয়া মরণান্তে নব জীবন লাভ করিতে হইবে। জ্ঞানের অনাত্ম প্রকোষ্ঠে এতাদৃশ কোন প্রকার ব্যাপারের প্রয়োজন উপস্থিত হয় নাই। এইজন্য এখন এখানে ইহা সম্পূর্ণ একটী নূতন ব্যাপার। দ্বিতীয়তঃ এখানে বিষয়ীকে এখন যথাযথতত্ব সম্পন্ন হইবার উপযোগী সরাগ ভাব ঘন প্রেমঘন নিত্য নিরঞ্জন দেহ নির্ম্মাণ করিবার উপযুক্ত তুরীয়-ঘন প্রকট উপকরণ সামগ্রীর আয়োজন করিতে হইবে, এবং যথাকালে সেই নিরঞ্জন দেহ, স্থূলাদি দেহাভ্যন্তরে, সুনির্ম্মিত হইলে, তাহাতে যথাযথ নিরঞ্জন ইন্দ্রিয়াদি সংস্থান সম্পাদন করিতে হইবে। ইহাই সদ্‌গুরু সাধুর সরূপত্ব বা তন্ময়ত্ব লাভ। ইহাই তাঁহার অন্তরতম নিরঞ্জন স্বরূপটী, তদাকারে পরিণতি হেতু নিজ দেহাভ্যন্তরে সংস্থান করা। ইহাই নিজের দেহমধ্যে ভাব ঘন নিত্য নিরঞ্জন দেবমন্দির বা দিব্য দেহের প্রতিষ্ঠাগম। জীবের ত্রিতাপক্লিষ্ট জ্বালাময় পাপময় জরা-যুক্ত দেহে নিরতিশয় সুকোমল পরম নিরঞ্জন ভগবৎ-পুষ্প প্রস্ফুটিত হইবার স্থলাভাব। সেখানে সেই তুরীয় পুষ্পের নিরঞ্জন পরা-নন্দঘন প্রকাটাঙ্গ, কোন ক্রমেই তিষ্টিবার—দাঁড়াইবার সম্ভাবনা নাই। এই জন্য ভগবানের প্রকট লীলাবিগ্রহ স্থাপনার্থে, এই মায়িক দেহত্রয় মধ্যে, নিত্য নিরঞ্জন দেব মন্দির পূর্ব্বাহ্নে প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক ও অপরিহার্য্য। এই ভগবৎ-মন্দির বা ভগবদ্দেহ প্রতিষ্ঠাকে আমরা একটী নূতন ব্যাপার বলিয়া প্রতিপন্ন করিলাম। এটীকে নূতন ব্যাপাব বলিবার কারণ এই যে, পূর্ব্বকার প্রতিবিম্বে প্রবোধিত জীবোপাধি বিষয়ীকে, যদিও বহু আয়োজনের পর, স্বকীয় আবাস্থ স্থূলাদি দেহ, যথা বিধানে নির্ম্মাণ করিতে ও তাহাকে মনাদি ইন্দ্রিয়-গ্রাম সম্পন্ন করিতে হইয়াছে; কিন্তু তজ্জন্য যে তাহাকে ব্যাপক কাল অসংখ্য দক্ষযজ্ঞের সম্যক্ আয়োজন করিতে হইয়াছে, তাহা বিষয়ীর সাক্ষাৎ জ্ঞাতসারে সম্পাদিত না হওয়াতে তাহার "না প্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞং" সমাধির অবস্থায় তাহা সংসিদ্ধ হওয়াতে; এক্ষণে তাহার ব্যবহারিক স্মরণ পথে উপস্থিতি নাই। এজন্য এখনকার সরাগ ভাবময় নিত্য নিরঞ্জন দেহ গঠন কার্য্য, দেহাভ্যন্তরে দিব্য মন্দির-প্রতিষ্ঠা কার্য্য,—বিষয়ীব পক্ষে সম্পূর্ণ একটী নূতন ব্যাপার বলিয়া, স্বীকার ও অবধারণা করিতেই হইবে। কেননা এখন বিষয়ীকে এক প্রকার সজ্ঞানে ও সাক্ষাৎ জ্ঞাতসারে, এক প্রকার স্বচেষ্টায় এত আয়োজনের যোজনা করিয়া, স্বকীয় মৃত্যু ফাঁস স্বহস্তে গলদেশে টানিয়া দিয়া, স্বকৃত প্রতিবিম্বিত স্বরূপের স্বযত্নকৃত বিয়োগ সম্পাদন করিয়া, তবে তাহাকে আত্ম ও পরমাত্ম তত্ব সম্পন্ন হইতে হইবে।

৩৮। তাই এখন এই স্বরূপজ্ঞান-ভ্রষ্ট ভ্রান্ত সংস্কার দিশাহারা প্রতিবিম্বাভিমানী বিষয়ীর অন্তরে প্রকৃত আত্ম-প্রশ্নের স্ফূর্ত্তি হওয়া চাই, প্রকৃত বিবেক ও বৈরাগ্যের উদয় হওয়া চাই, আত্ম ও পরমাত্ম তত্ত্ব লাভের প্রকৃত পথ পাইবার জন্য ঐকান্তিকী

ব্যাকুলতার উদ্বোধন হওয়া চাই, ঐহিকের বিষয় বিভব মান সম্ভ্রম, সুখৈশ্বর্য্য ও ধর্ম্মা-ধর্ম্মে ঔদাস্য বুদ্ধির উদ্গম হওয়া চাই; প্রকৃত তত্ত্বদর্শী সদ্গুরুর প্রয়োজনীয়তা প্রকৃত প্রস্তাবে উপলব্ধি হওয়া চাই; গুরু অন্বেষণে ঐকান্তিকতা চাই; সুকৃতি ও সৌভাগ্য চাই; তবেই চৈত্যকৃপাপথবর্ত্তী সদ্গুরুর সঙ্গে শুভ সম্মিলন হইবে। তবেই অন্তরের অন্তরতম অন্তরঙ্গ নিরঞ্জন বিষয়রত্ন তাঁহার অজস্র কৃপাগুণে, তাহার বাহিরে ব্যবহারিক প্রকট ও মূর্ত্তিমান ভাবে তাহাকে সাক্ষাৎ দর্শন ও আশ্রয় দিবেন। তদনন্তর সেই মঙ্গলময় আশ্রয় প্রাপ্তির পর, বিষয়ীর আবার প্রকৃত প্রস্তাবে শিষ্যত্ব ও আনুগত্যের স্থিরতা চাই. অবলম্বিত গুরুদেহের উপর ঐকান্তিকী শ্রদ্ধা ভক্তি ও আস্থা চাই; তাহার নির্দেশ মত নিয়ম ও প্রক্রিয়া, সাধন ও ভজনের অনুবর্ত্তী হওয়া চাই; "পরমার্থ সাধন ও ঐহিক ব্যবহার" (ক) যাবতীয় সম্বন্ধে তাঁহার আজ্ঞা অকুণ্ঠিত ও অকুঞ্চিত চিত্তে শিরোধার্য্য করা চাই; মনোমুখিন্ ও বহির্ম্মুখিন ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক অহরহঃ অন্তর্ম্মুখী ও গুরুমুখী হইয়া থাকা চাই; গুরুদেহের উপর ঐকান্তিকী তদেকানুভূতি ও প্রীতি চাই, তাহার সৎ-সংসর্গবাসী ও অহরহঃ তাঁহার স্নেহময়ী দৃষ্টির পথবর্ত্তী ও বিষয়ীভূত হইয়া থাকা চাই, গুরুর সেবা ও শুশ্রূষায় প্রবল অনুরাগ চাই, একান্তদীন ও অধম (Negative) ভাবে গুরুর শক্তি ও প্রভাবের নিতান্ত অধীন হওয়া চাই; সেই বাহ্যদৃষ্টিভূত অন্তরের ধনকে বাহিরে—দূরে না রাখিয়া ভক্তি ভরে অহরহঃ অন্তরে সংস্থান রাখা চাই; অন্তরে লয় করা চাই; সাধু সঙ্গ, সাধু অনুরাগ, সাধুভক্তি ও সাধু-সেবা চাই; সদ্গুরু সাধু মহাজনের অজস্র সহজ কৃপা-স্রোত-পথে অহরহঃ অবস্থিত থাকা চাই; সর্ব্বদা নানা উপায়ে গুরু-কৃষ্ণ বৈষ্ণবের সন্তোষজাত সহজ আশীর্ব্বাদ লাভ করা চাই; তবেই জীয়ন্তে মরিয়া, এবং মরিয়া, ভজিয়া, সেই সগুদ্রু বা ব্রহ্মাত্মা সাধুরূপ নিরঞ্জন বিষয়-দর্পণে, বিষয়ী প্রকৃত আত্ম ও পরমাত্ম স্বরূপের যথানুক্রমে প্রকৃত দর্শন লাভ করিয়া থাকে। এইরূপে বিষয়ী স্বকীয় ব্যষ্টীভূত স্বরাট্ স্বরূপকে প্রথমে তাহার অভিনব, নিরঞ্জন, অন্তরিন্দ্রিয়ের, এবং তদনন্তর তাহার সমষ্টিভূত বিরাট অখণ্ড পরমাত্মা স্বরূপকে, সর্ব্বত্রে অভিনব, নিরঞ্জন, বহিরিন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত করিয়া, পূর্ণকাম ও সিদ্ধার্থ হইয়া থাকে।

৩৯। জ্ঞানের প্রকোষ্ঠে যে আত্ম-স্বরূপ দর্শন হয়, সেখানে আত্ম-তত্ত্ব-লাভার্থী শিষ্যই বিষয়ী এবং আত্ম বা পরমাত্ম তত্ত্ব-সম্পন্ন সদ্গুরু বা সাধুই বিষয়। আত্মা সচ্চিদানন্দস্বরূপ—আত্মা সৃষ্টির চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের পর পারে, ছায়াগম অনাত্ম জাতীয় ব্যবহারিক জগতের (Phenomenal universe এর) পর পারে সংস্থাপিত। এই আত্মাকে, এই ব্যবহারিক জগতের ক্ষেত্র হইতে, তাহার সচ্চিদানন্দ স্বরূপ দেখাইবার, সেই স্বরূপে তাহাকে উপনীত ও প্রতিষ্ঠিত করিবার, প্রকট বিষয়ও চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের পরপারস্থ—আত্মস্থ হওয়া চাই। সৃষ্টির চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের অন্তর্ব্বর্ত্তী অনাত্ম জাতীয় বিষয়, প্রতিবিম্বে আশ্রয়ীভূত জীবাত্মার

(ক) পরমেষ্টি গুরুর আজ্ঞাবলম্বন করিয়া পরমার্থ সাধন ও ঐহিক ব্যবহার অবশ্য কর্ত্তব্য হয়, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের পথ্য প্রদান গ্রন্থের শেষাংশ দেখ।

জ্ঞানোৎপত্তির কারণ স্থূল হইতে পারে, কিন্তু সেই অনাত্ম জাতীয় বিষয়ের সঙ্গে, তদাকারত্ব প্রাপ্তি হেতু, সেই জাতীয় বিষয়ের চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের অতীত ব্যষ্টি বা স্বরাট স্বরূপের আত্ম বা স্বরূপ-সাক্ষাৎকার করাইবার, কোন ক্ষমতা ও অধিকার নাই। যে নিরঞ্জন ভাবঘন দেহে,—যে অবিনশ্বর ব্রহ্ম-মন্দিরে সেই ব্রহ্মের স্বরাট্ আত্ম-স্বরূপ অনুভাত হইয়া থাকে, সৃষ্টির এই অনাত্ম জাতীয় অসার, নশ্বর বিষয় রাজ্যে, সেই ভাবঘন মন্দির বা দেহ নির্ম্মাণের, অবিনশ্বর প্রকট উপকরণ সামগ্রীর সম্ভাব বা সংস্থান নাই। বহির্জ্জগতের এই অনাত্ম বিষয় রাজ্যের, ইন্দ্রিয় গ্রামাভিমানী জীব রাজ্যের কুত্রাপি সেই নিরঞ্জন প্রকট উপকরণ সামগ্রীর আগম বা উৎপত্তি নাই। সেই অভিনব উপকরণ সামগ্রী তদতিরিক্ত স্থলে অন্বেষণ করিতে ও প্রাপ্ত হইতে হইবে। তাহা অবশ্যই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের অতীত বিষয় হইয়াও কায়স্থ থাকিবার প্রয়োজন, অতীন্দ্রিয় বিষয় হইয়াও ইন্দ্রিয় গ্রামস্থ থাকিবার প্রয়োজন, পারমার্থিক বিষয় হইয়াও ব্যাবহারিক ক্ষেত্রস্থ থাকিবার প্রয়োজন। এমন বিষয় ব্রহ্মাত্মা, ভগবদাত্মা, সদ্গুরু বা সাধু ভিন্ন আর কোন্ বিষয় হইতে পারে? বিষয়ীর আত্ম-স্বরূপ বিকাশোপযোগী মন্দির নির্ম্মাণের নিরঞ্জন উপকরণ সামগ্রী (আনন্দঘন চিৎ-ঘন অনুকণাপুঞ্জে) তদ্ভিন্ন আর কোন্ দেশে উৎপন্ন হইতে পারে? তদ্ভিন্ন আর কোন্ দেশ হইতে তাহার আগম নির্ব্বাহ সম্ভাবিতে পারে? যে বিষয় রত্নের সঙ্গে তদাকারত্ব হেতু বিষয়ীর স্বকীয় আত্ম-স্বরূপ, আত্ম-সমক্ষে স্ফূর্ত্তি লাভ করে, সে বিষয়রত্ন অবশ্যই সৃষ্টির মধ্যে ব্যাবহারিক-ভাবে থাকিয়াও সৃষ্টির অতীত প্রদেশে, পরা প্রকৃতির বরাঙ্গে, বিসদৃশ ও অপ্রকট উভয়বিধ পরিণামের নিত্য-অতীত ভাবঘন প্রেমঘন নিত্য নিরঞ্জন দেব মন্দিরে নিত্য নিরঞ্জন বিগ্রহ হইয়া অচ্যুত পদে বিরাজমান।

৪০। সাধু সম্পদের অন্তরঙ্গ—ভাবাঙ্গ—যে নিত্য নিরঞ্জন উপাদানে নির্ম্মিত হয়, এখানে তাহা বিবৃত করিবার চেষ্টা করিব। এক কথায়, জাগ্রত বা প্রকট পরাপ্রকৃতি বা পরাশক্তি বিবিধ প্রকারে ঘনীভূত ও পরিপাক্ প্রাপ্ত হইয়া, সেই অপরূপ উপাদান উৎপাদন করে। সদৃশ পরিণামিনী প্রকৃতির বরাঙ্গ জাগ্রত পুরুষ প্রভাবে, ওতঃপ্রোত ভাবে—অভিনব ভাবে, জীব-দেহাভ্যন্তরে বিবিধ প্রকার পরিপাক ও প্রগাঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া, তৎসঙ্গে ও তদঙ্গে সেই উপাদান একাত্মক ভাবে পরিণত। সেই নিরঞ্জন দেহ "অন্তঃ-কৃষ্ণ বহিঃগৌর"—তাহার অন্তর চিদ্ঘন, বাহির আনন্দঘন। সেই দেহ, একাধারে একাকারে অপরূপ সমন্বয়ে, যুগল তত্ত্ব, এক অদ্বৈত তত্ত্বে ঘন পরিপাক্-প্রাপ্ত ও সুবিমিশ্রিত। সমাধি-সমুদ্র হইতে ব্যাবহারিক ভাবে উত্থিত, জাগরিত এবং "প্রাপ্তবরাণ্" নিবোধিত অথবা জাগ্রৎ-কুণ্ডলিনীক প্রকট পুরুষের অঙ্গ-স্পর্শ প্রাপ্ত না হইলে, এই পরাপ্রকৃতি কুত্রাপি কখনও জাগ্রত হন না। পুরাণে বর্ণিত আছে, যত দিন শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গস্পর্শ পোপ্ত না হইয়াছিলেন, ততদিন তিনি চক্ষুরুন্মীলন করেন নাই, নয়নযুগল বিস্ফারিত করিয়া চান নাই, ততদিন আর কিছুই দেখেন নাই। এই পৌরাণিক আখ্যায়িকা পরাপ্রকৃতির জাগ্রতাবস্থা প্রাপ্তির উপমা বা উদাহরণ-

হইয়া, সেই তত্ত্ব প্রকাশ করিতেছে। সমাধি-মগ্ন অব্যক্ত অপ্রকট পুরুষের সংস্পর্শে মূল পরমা প্রকৃতি তদবস্থাপন্ন সমাধি সমন্বিত ও তদেকাত্ম হইয়া যায়। ইহাই অন্তরাত্মা-রূপে প্রতি জনের, প্রতি ব্যষ্টির এবং ব্যষ্টি-পুঞ্জের সমষ্টিভূত স্বরূপের স্বতঃই অন্তরস্থ আছেন। এখানে—এই সমাধির অবস্থায় তদীয় পুরুষ সংসর্গে প্রকৃতি যদিও তদেকাত্ম হইয়া থাকে, কিন্তু তদ্দ্বারা তাহার জাগ্রত প্রকট অবস্থায় উপনীত হইবার স্বাভাবিক কোন উপায় ও সম্ভাবনার সম্ভাব নাই। বরঞ্চ সেই অপ্রকট সংস্পর্শে ব্যাপক কাল সংশ্রুত থাকিলে, সে প্রকৃতিতে যে-কিছু যদি-কিছু, বিসদৃশ পরিণাম-নিষ্ঠ অংশ সংলিপ্ত থাকে, তাহা প্রকৃতির মূল দেহ হইতে মল-রূপে নির্ভিন্ন হইয়া সৃষ্টি সাধন ত্রিগুণাত্মক মলিন উপাদানে পরিণত হয়; কিন্তু তদ্দ্বারা কোনক্রমেই তাহা জাগ্রত ভাব লাভ করিতে সক্ষম হয় না। সদৃশ পরিণামিণী প্রকৃতির প্রকট বা জাগ্রতভাব প্রাপ্ত হইবার যন্ত্রই প্রস্ফুটিত জীব-দেহ। এরূপ দেহ যন্ত্র ভিন্ন অন্যত্র এই প্রকট বা জাগ্রতভাব স্ফূরিত হইতে কুত্রাপি কখনও সম্ভাবিত ও পরিদৃষ্ট হয় না। এই দেহ যন্ত্রাভ্যন্তরে এই প্রকট পুরুষের অঙ্গনিঃসৃত প্রকট প্রকৃতির অংশ বিশেষ মন্ত্রশক্তি প্রভাবে জীব দেহের মূলা-ধারস্থ অপান-বায়ুযুক্ত হইলে, তাহা প্রকট জাগ্রত পুরুষ বা তদীয় দৃষ্টি বা মন্ত্র-শক্তি প্রভাবে অজপাযুক্ত ও সহজ অবিরাম অজস্র প্রণব-স্রোতে ও ঘন নাদে পরিণত হইয়া, বিশেষ ভাবে ব্যাপক কাল বিমন্থিত, সঞ্চা-লিত এবং বিবিধ প্রকারে পরিপাক ও প্রগা-ঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া, অবশেষে তাহা ভাব-দেহ গঠনোপযোগী সরাগ, পরানন্দ ঘন, নিরঞ্জন উপকরণে পরিণত হয় এবং তাহা সুষুম্নাদি পথে জীব-দেহের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন ভাবাঙ্গ গঠন ও তাহাকে অভিনব ইন্দ্রিয়গ্রাম সম্পন্ন করে। এতা-দৃশ ঘনীভূত নিরঞ্জন উপকরণে ব্রহ্মাত্মা সাধু সজ্জনগণের ভাবাঙ্গ বিনির্ম্মিত হইয়া থাকে। সমধি সত্তা, সশর্করা সুমিষ্ট দুগ্ধ, ভাবাঙ্গের নিরঞ্জন উপকরণ সশর্করা সুমিষ্ট ঘনক্ষীর। তরল দুগ্ধে কোন গঠন কার্য্য হয় না, কিন্তু ক্ষীরের ঘনতা প্রযুক্ত খাদ্য সামগ্রীর গঠন হইয়া থাকে। এই নিরঞ্জন উপকরণের স্বরূপ-গত স্বভাব-সিদ্ধ প্রগাঢ়তা হেতু পুরাতন অ-প্রকট অব্যক্ত সমাধি সমুদ্রগর্ভে বিলীন হই-বার বা কোন প্রকার বিসদৃশ বিজাতীয় পরিণাম প্রাপ্ত হইবার দুই দিকের দুইপথ নিত্যকালের জন্য অবরুদ্ধ। দুগ্ধ যেরূপ অগ্নিপাকে যথোচিত ঘনীভূত ও প্রগাঢ় হইয়া ক্ষীরত্বে পরিণত হইলে, তাহা পুনরায় দুগ্ধা-কারে প্রত্যাবৃত্ত এবং দধি তক্রাদিতে বিকৃতি প্রাপ্ত হইবার দুইপথ বন্ধ হয়, ইহা তদ্রূপ। ইহাই সাধু সজ্জনগণের ভাবঘন চিন্ময় অন্তরঙ্গ ;—এই অন্তরঙ্গেই তাহাদের অন্তরস্থ নিত্য প্রকটলীলা বিগ্রহ সংস্থাপিত। এই বিগ্রহ হইতে নিত্য অব্যয়, নিত্য অক্ষয়, নিত্য অচ্যুত, নব নব লীলা বিগ্রহ জৈবিক দেহাভ্যন্তরে চিরদিন স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়া থাকে। এই এক একটা স্পর্শমণি হইতে যথাকালে তাদৃশ বহুসংখ্যক স্পর্শমণি সমুৎ-পন্ন হইবার কোন বাধা নাই। যেরূপ সূর্য্য-দেব উত্তমর্ণ বা মহাজনের স্বত্বাভিষিক্ত (Standing in positive relation) হইয়া, অধমর্ণ বা খাতক ভাবাপন্ন (Standing in negative relation) অনুগত গ্রহগণকে উষ্ণ ও আলোকময় কিরণদানে স্বতঃই অনু-

ক্ষণ প্রতিপালন করিয়া থাকেন; সেইরূপ, এই সমস্ত স্পর্শমণির প্রত্যেকটী এক একটী সূর্য্যের ন্যায় সেই ভাবে অনুগত ভক্তবৃন্দকে, স্ব স্ব ভাবময় নিরঞ্জনদেহ নিঃসৃত ভাবঘন চিন্ময় কিরণজাল দ্বারা সস্নেহে সযত্নে অনুক্ষণ লালনপালনাদি করিয়া, স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকেন। তজ্জনিত সেই সময়ে, সেই সেই ভাবময় দেহে, যে ব্যয় ও ক্ষয় হয়, তাহা মূল পরা প্রকৃতির অক্ষয়, নিত্য, অনন্ত, পরিপূর্ণ ভাণ্ডার হইতে অবিলম্বে অননুভূতরূপে স্বতই পরিপূরিত হইতে থাকে। "দানে নৈব ক্ষয়ং যাতি বিদ্যারত্ন মহাধনম্।' এ কথা অন্যে প্রযোগ হইয়া থাকিলেও, এখানে ইহার পরোক্ষতার অবধি নাই,—কোন দিকে কোন অসম্পূর্ণতা নাই।

৪১। উত্তমর্ণ বা মহাজনের স্থাভি ষিক্ত এই আত্মস্থ বিষয়ের সঙ্গে অধমর্ণ বা খাতক ভাবাপন্ন বিষয়ীর পক্ষ প্রদর্শিত গুরু শিষ্য সম্বন্ধ নিবন্ধন তদাকারত্ব, তদেকত্ব, তৎ অন্তরঙ্গত্ব প্রাপ্তি হইতেই এই ব্যষ্টি স্বরাট আত্ম-তত্ত্বের উদয় হইয়া থাকে। এই স্বরাট আত্মজ্ঞানের এক দিকে যথাকাল-প্রাপ্ত স্বস্থান প্রাপ্তীচ্ছু ভাবাঙ্গ-সম্পন্ন বিষয়ী ও অপর দিকে নিরঞ্জন ভাবাঙ্গ-বিহারী সদ্গুরু বা সাধুসজ্জন রূপ স্বস্থান প্রত্যাগত বিষয়। এই দুই তার ভূমিকে আলিঙ্গন করিয়া, প্রকৃত আত্মজ্ঞান স্রোত প্রবাহিত। এই উভয়ের প্রথম সাক্ষাৎকারে শিষ্যরূপ বিষয়ী, জ্ঞানের অনাত্ম প্রকোষ্ঠে স্বকীয় প্রতিবিম্বিত অহং অধ্যাসে আত্মবুদ্ধি স্থাপন করিয়া, সম্পূর্ণরূপে দিশাহারা। সেই অবস্থায় তাহাকে গুরু আশ্রয় অবলম্বন করিতে হয়। যেরূপ জ্বলন্ত অগ্নি-সন্নিধান প্রাপ্ত হইলে, জল-সিক্ত কাষ্ঠ-খণ্ড ক্রমে বিশুষ্ক ও আর্দ্রতা বিমুক্ত হইয়া, জ্বলন্ত অবস্থা লাভ করিবার দিকে অন্তর্পথে যাত্রারম্ভ করে, ভ্রম প্রমাদ-বিশিষ্ট বিষয়ী, আত্ম বা পরমাত্ম তত্ত্ব সম্পন্ন বিষয়ের সন্নিধান ও আনুগত্য প্রাপ্ত হইলে, সে স্বতঃই সক্তাবস্থে স্বকীয় স্বরাট আত্ম-তত্ত্বাভিমুখে স্বরূপাভিমুখে মহা-প্রস্থান করিতে অভিসার করিতে আরম্ভ করে। সময়ে সেই জলসিক্ত কাষ্ঠ খণ্ড, সেই অগ্নি-দগ্ধ কাষ্ঠ সংসর্গে যেমন তদাকারে আকারিত হইয়া, জ্বলন্ত অবস্থা লাভ করে, ভ্রান্ত সংস্কার বিষয়ী, সেই রূপ স্বরূপ ও স্বধাম প্রাপ্ত বিষয়ের সাহায্যে, আনুগত্যে ও সান্নিধ্যে, তদাকারে, অনুরূপ আকারিত হইয়া আত্ম স্থান ও আত্মধাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে, আত্ম-তত্ত্ব রূপ স্বরূপাগ্নিতে প্রজ্জলিত হইয়া উঠে। লৌহখণ্ড এইরূপে চুম্বক-সন্নিধান প্রাপ্ত হইলে, চুম্বক প্রকৃতি লাভ করিয়া থাকে। অথবা আম্রাদির ক্ষুদ্র বৃক্ষ যেরূপ দেশ কাল ও অবস্থার অধীন হইয়া স্ব স্ব জাতীয় উৎকৃষ্টতর বৃক্ষান্তরের সঙ্গে যথা বিধানে মিলিত হইলে, সময়ে স্বজাতীয় কুলধর্ম্ম পরিহার পূর্ব্বক, সেই উৎকৃষ্টতর বৃক্ষান্তরের কুলধর্ম্মে ও স্বরূপত্বে তদাকারিত হইয়া তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যিনি শিষ্য হইবেন, প্রদর্শিত দৃষ্টান্তের অনুমত জন্মসংস্কারলব্ধ স্বভাব পরিত্যাগ করিতে—আমিত্ব, ব্যক্তিত্ব, জাতিত্ব, গোত্রত্ব প্রভৃতি যথাসর্ব্বস্ব বিলোপ করিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া, তাহাকে গুরু আনুগত্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে।

শ্রীকালীনাথ দত্ত।

বরাবর পাহাড় ও সাত ঘর।

গয়া হইতে ১৮মাইল উত্তরে এবং বেলা নামক রেলওয়ে ষ্টেসনের ৬/৭মাইল উত্তর পূর্ব্বে কতকগুলি গ্রেনাইট প্রস্তরময় পাহাড় অবস্থিত আছে। এই সকল পাহাড় কাওয়া ডোল বা কাকদোল, বরাবর ও নগর যোনি নামে খ্যাত। এই সকল পাহাড়ে প্রায় ২০০০ বৎসর পূর্ব্বের প্রাচীন বৌদ্ধ কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ ও মহারাজ অশোকের শিলালিপি ও তৎসময়ের নির্ম্মিত গুহা সকল দেখিতে পাওয়া যায়।

কিছুদিন হইল, আমরা কয়েকটী বন্ধু একত্র হইয়া এই সকল পাহাড় দর্শন করিতে গিয়াছিলাম, তথায় একটী গুহার মধ্যে অল্প-বয়স্ক একজন বাঙ্গালী সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ হয়। তিনি পালী ভাষা কতক জানেন। তাঁহার নিকট আমরা শিলালিপি বিষয়ে অনেক কথা অবগত হইলাম।

কাওয়াডোল বা কাকদোল।—এই পাহাড় বেলা ষ্টেসন হইতে ৬ মাইল দূরে অবস্থিত। রেলগাড়ি হইতেই এই পাহাড় সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে যে, এই পাহা-ড়ের শৃঙ্গদেশে এক খণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর এরূপ ভাবে অবস্থিত ছিল যে, একটী কাক উহার উপর বসিলেই উহা দোলায়মান হইত; এজন্য ইহার নাম কাওয়াডোল বা কাক দোল। ইহার চতুর্দ্দিকে অনেক বৌদ্ধ ও হিন্দু কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। পাহাড়ের উত্তর ভাগে অনেক হিন্দু দেবমূর্ত্তি খোদিত আছে। পূর্ব্বদিকে একটী মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে, তাহাতে একটী প্রকাণ্ড ধ্যান-নিমগ্ন বৌদ্ধ মূর্ত্তি স্থাপিত আছে।

সাতঘর।—কাকদোল পাহাড়ের ৩ মাইল উত্তর পূর্ব্বে বরাবর নামক পাহাড় অবস্থিত। ইহার সংস্কৃত নাম প্রবর গিরি। এই পাহাড়ের মধ্যে ৪ টী গুহা খোদিত আছে। আর অনতিদূরে নগরযোনি পাহাড়ে তিনটী গুহা আছে। এই ৭টি গুহা আছে বলিয়া গুহাগুলি সাত-ঘর নামে খ্যাত। এই সকল গুহা বৌদ্ধ যোগীদিগের অবস্থান জন্য খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে মহারাজ অশোক ও তাঁহার পৌত্র দশরথের সময় খোদিত হয়। তৎপরে খ্রীষ্টের তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দীতে শার্দ্দূলবর্ম্মা ও অনন্ত বর্ম্মা নামক হিন্দু নৃপতিগণ ইহাতে কাত্যায়নী মূর্ত্তি ও শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। হোয়েন-সাঙের সময় এই সকল গুহা হিন্দুদিগের অধিকৃত ছিল এবং ইহাতে হিন্দুমূর্ত্তি স্থাপিত ছিল, এজন্য তিনি ইহাদের উল্লেখ করেন নাই। দ্বাদশ শতাব্দীতে ভয়ঙ্কর নাথ নামক কোন পর্য্যটক ইহা পরিদর্শন করিয়া তাঁহার নাম খোদিত করিয়া যান। তৎপরে ইহা মুসলমানদিগের অধিকৃত হয়। গুহাগুলির নির্ম্মাণ কার্য্য দর্শন করিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

(১) কর্ণবোপরগুহা—বরাবর পাহাড়ের উত্তরাংশে এই গুহা অবস্থিত। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ৩৪ ফিট, প্রস্থে ১৪ফিট। এই গুহার পশ্চিমের কোণের দিকে একটী বেদী আছে। বোধ হয়, এখানে কোন মূর্ত্তি অবস্থিত ছিল। প্রবেশদ্বারের পশ্চিম দিকে প্রাচীন পালী অক্ষরে ৫ ছত্র শিলালিপি আছে, তাহার মর্ম্ম এই যে, অশোক রাজার উনবিংশ বৎসরে (২৪৫ খ্রীঃ পূঃ) এই গুহা খোদিত ও উৎ-

সর্গীকৃত হয়। প্রবেশদ্বারের দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বে পালী অক্ষরে বোধিমূলম, দরিদ্র কান্তার, কর্ম্মচণ্ডাল, মহীত্রাণসার, বিকট-তুঙ্গশিব, এই কয়েকটী নাম খোদিত আছে।

(২) সুদাম গুহা—পূর্ব্বোক্ত গুহার দক্ষিণ দিকে এই গুহা অবস্থিত। বরাবরের সমস্ত গুহার মধ্যে এই গুহা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। প্রবেশ দ্বারের দক্ষিণ বা পূর্ব্বপার্শ্বে প্রাচীন পালী অক্ষরে লিখিত আছে "এজনা পিয় দশিনা দুবারিস বসাভা—(অশোক রাজার দ্বাদশ-বর্ষে)—আর বাকী কতকটা উঠিয়া গিয়াছে, এজন্য আমাদের পূর্ব্বোক্ত সন্ন্যাসী তাহা পড়িতে পারিলেন না। ইহার সংলগ্ন পশ্চিম দিকে আরও একটী ক্ষুদ্র গোলাকার গুহা আছে। বোধ হয়, ইহা যোগাভ্যাসের ছিল। ইহার প্রাচীর ও ছাদের গাত্র অসমান দেখিয়া বোধ হয় ইহা সম্পূর্ণ হয় নাই।

(৩) লোমশ ঋষি গুহা—পূর্ব্বোক্ত সুদাম গুহার ন্যায় ইহাতেও একটী ক্ষুদ্র গোলাকার গুহা সংলগ্ন আছে। ইহাও অসম্পূর্ণ বলিয়া বোধ হয়। ইহাতে পালী অক্ষরে লিখিত সংস্কৃত শোক আছে। তাহার মর্ম্ম এই যে, দুইটী যজ্ঞবর্ম্মার পৌত্র অনন্ত বর্ম্মা এই স্থানে কৃষ্ণমূর্ত্তি স্থাপন করেন।

(৪) বিশ্বামিত্র গুহা—এই গুহা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। ইহাতে অশোক রাজার সময়ের একটী লিপি আছে, তাহার মর্ম্ম এই যে, অশোক রাজার দ্বাদশবর্ষে এই গুহা খোদিত ও উৎসর্গীকৃত হয়।

(৫) নগর যোনি গুহা—বরাবর পাহাড়ের অনতিদূরে উত্তর পূর্ব্বদিকে অনতিউচ্চ একটী পাহাড়ে এই গুহা অবস্থিত, এজন্য এই পাহাড় যোনি নামে খ্যাত। এই গুহা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। প্রায় ৪৭ ফিট দীর্ঘ ও ১৯ ফিট প্রস্থ এবং ইহাদের মধ্য ভাগ ১০॥ ফিট উচ্চ। ইহার গাত্র অতিশয় পরিষ্কৃত ও মসৃণ। ইহা অশোক রাজার পৌত্র রাজা দশরথের সময়ে বৌদ্ধ যোগীদিগের বাসের জন্য খোদিত হয় বলিয়া প্রবেশ দ্বারের উপরিভাগে পালী অক্ষরে লিখিত আছে। ইহার প্রাচীন নাম গোপিকা-কুভা বা গোপিগুহা। প্রবেশ দ্বারের পূর্ব্বদিকে সংস্কৃত ভাষায় একটী শোক আধুনিক পালী অক্ষরে লিখিত আছে। উহার মর্ম্ম এই যে, অনন্তবর্ম্মা এই স্থানে কাত্যায়নী দেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহা এক্ষণে মুসলমানদিগের দর্গায় পরিণত হইয়াছে। ইহার এক পার্শ্বে একটী আধুনিক ইষ্টক নির্ম্মিত বেদী আছে। কথিত আছে যে, এই বেদী এক মুসলমান পীরের বসিবার স্থান ছিল।

(৬) বাপিয়া কা কুভা বা বাপিয়া গুহা—নগর যোনি পাহাড়ের উত্তরদিকে অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমির উপর এই ক্ষুদ্র গুহা অবস্থিত। ইহার নিকট একটী কূপ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, বোধ হয় এই জন্যই ইহার নাম বাপিয়া গুহা। ইহাতে রাজা দশরথের সময়ের খোদিত একটী লিপি আছে। তাহার শেষাংশ নগর-যোনি গুহার শিলালিপির অবিকল অনুরূপ। প্রবেশ দ্বারের পার্শ্বে আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিলালিপি আছে। তন্মধ্যে একটী এই যে—"আচার্য্য শ্রীযোগানন্দ প্রণমতি সিদ্ধেশ্বরং।"

(৭) বদাতি কা কুভা - পূর্ব্বোক্ত গুহার নিকটেই এই ক্ষুদ্র গুহা অবস্থিত। এই গুহাও রাজা দশরথের সময় খোদিত হয়। অনন্ত বর্ম্মা এই গুহায় এক শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন।

সিদ্ধেশ্বর মন্দির—বরাবর পাহাড়ের

শিখরদেশে এই মন্দির অবস্থিত। বাপিয়া গুহার শিলালিপি দেখিয়া বোধ হয়, এই মন্দির খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ কি ৭ম শতাব্দীতে আচার্য্য যোগানন্দের পূজার জন্য অনন্তবর্ম্মার সময়ে নির্ম্মিতহয়। এই মন্দিরে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুহা আছে। বোধ হয় যোগীদিগের তপস্যার জন্য এই গুহা গুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল।

শ্রীমোহিনীমোহন বসু।

দার্শনিক মতভেদ। (১)

সকলেই জানেন, হিন্দুদর্শনশাস্ত্রে নানা মতভেদ আছে। বৈদিক সনাতন ধর্ম্মের প্রকৃতি যাঁহারা বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই কেবল এই মতভেদের প্রকৃত কারণ বুঝিয়া সেই ধর্ম্মের প্রকৃতির সহিত নানা মতভেদের বিলক্ষণ সঙ্গতি দেখিতে পাইয়াছেন। দর্শনে যে নানা মতভেদ হইবে, তাহা বিচিত্র নহে; মতভেদ না হইলেই আশ্চর্য্য জ্ঞান হইত। মতভেদ হইবে কেন, তাহা বুঝা যায়; না হইবে কেন, তাহা বুঝা যায় না। একথা সকলের নিকট যুক্তিসিদ্ধ নহে। এ কথার বিরোধিনী যুক্তি এইঃ—

বেদ বল, দর্শন বল, স [illegible] ঋষিবাক্য। ঋষিবাক্য বলিয়া আপ্ত [illegible] অভ্রান্ত। অভ্রান্ত ঋষিপ্রোক্ত আপ্ত বাক্য মধ্যে মতভেদ কেন হইবে? শাস্ত্রে আপ্ত লক্ষণ এই :—

"আপ্তোনামানুভবেন বস্তুতত্ত্বস্য কাৎস্ন্যেন নিশ্চয়বান্।
রাগাদিবশাদপি নান্যথাবাদী যঃ স ইতি চরকে পতঞ্জলিঃ॥

মঞ্জুষা।

"যিনি অনুভব* দ্বারা সর্ব্ব পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, সুতরাং সমুদায় বস্তুতত্ত্বেই যাঁহার অভ্রান্ত জ্ঞান জন্মিয়াছে, রাগাদির বশীভূত হইয়াও যিনি অন্যথাবাদী নহেন, সুতরাং সর্ব্বাবস্থাতেই যিনি প্রকৃত কথা বলেন, তিনিই আপ্ত নামে অভিহিত।"

ভগবান্ পতঞ্জলি যেরূপ আপ্তলক্ষণ করিয়াছেন, তাহাতে আপ্তঋষিপ্রোক্ত শাস্ত্রে মতভেদ কিরূপে সম্ভবে? আপ্তগণের মধ্যে যদি নানা মতভেদ হইল, তবে তাঁহাদের সহিত সামান্য লোকের প্রভেদ কি? সামান্য জনগণেরই মতভেদ হইয়া থাকে। এই বিরোধিনী যুক্তি ক্রমে ক্রমে খণ্ডিত হইতেছে।

যাঁহারা আমার "হিন্দুধর্ম্মের প্রামাণ্য"* নামক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা যদি সেই প্রবন্ধ বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে পড়িয়া থাকেন, তাহা হইলে উক্ত প্রশ্নের উত্তর পাইয়া থাকিবেন। তথাপি সাধারণের বোধগম্য জন্য সেই উত্তর আরও বিশদ করিয়া লেখা যাইতেছে।

সেই প্রবন্ধেই দৃষ্ট হইবে, আমাদের ঋষিগণ কেহই স্বাধীন বা স্বতন্ত্রভাবে নিজ নিজ মতের প্রণেতা ছিলেন না; তাঁহারা সকলেই বেদেরই ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। বেদ মধ্যেই যে সমস্ত মত ও সাধনতত্ত্ব বিভিন্ন অধিকারীর নিমিত্ত নিবিষ্ট আছে, তাঁহারা এক এক জন সেই সকল কথা গ্রহণ পূর্ব্বক বিশদরূপে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

"ব্রহ্মাদ্যা ঋষিপর্য্যন্তাঃ স্মারকা নতু কারকা।"

শাস্ত্র বলেন, ব্রহ্ম হইতে সমস্ত ঋষিগণ পর্য্যন্ত সকলেই বেদস্মারক ছিলেন, কেহই কারক ছিলেন না।

ভগবান যাস্ক বলিয়াছেন, ঋষিগণ অতীন্দ্রিয়দ্রষ্টা ছিলেন; তাঁহারা তপস্যাবলে সমস্ত

* "গীতার প্রামাণ্য" নামক প্রস্তাবে এই অনুভব শব্দের অর্থ বিশেষ রূপে বিবৃত হইয়াছে।

* ১৩০১ সালের কার্ত্তিক মাসের "নব্যভারত" দেখ।

বস্তুতত্ত্ব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেন। এজন্য তাঁহারা "সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা" ছিলেন। সেই "মন্ত্রদ্রষ্টা" ঋষিগণ যেরূপে যিনি সিদ্ধ হইয়াছিলেন, তিনি সেইরূপ সাধনপথ সাধারণ্যে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।*

ভর্ত্তৃহরিও বলিতেছেন,—

ঋষীণামপি যজ্জ্ঞানং তদপ্যাগমহেতুকম্।"

"ঋষিদিগের সমস্ত জ্ঞানই বেদমূলক।"

সকল জ্ঞানই যদি বেদমূলক, তবে এক বেদ হইতে এত মতভেদ হয় কিরূপে? বেদে যখন সেই ভিন্নতার কারণ রহিয়াছে, তখন সে ভিন্নতা না হইবেই বা কেন? এই ভিন্নতার কারণ বিভিন্ন অধিকার। বেদ নানা অধিকারীর নিমিত্ত নানা পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। ভর্ত্তৃহরি সেই মতভেদের কারণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন:—

"তস্যার্থবাদরূপাণি নিশ্চিত্য স্ববিকল্পজাঃ।
একত্বিনাং দ্বৈতিনাং চ প্রবাদা বহুধা মতাঃ॥" বাক্যপদীয়

বেদের "অর্থবাদ" হইতেই কি দ্বৈতবাদ, কি অদ্বৈতবাদ উভয়ই প্রসূত হইয়াছে। যাঁহারা অদ্বৈত ভাবের অধিকার লাভ করিবার যোগ্য হয়েন নাই, তাঁহারা নিশ্চয় দ্বৈতবাদী। তাঁহাদের সকল জ্ঞানই ঐন্দ্রিয়িক। ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান মাত্রই সমল ও সাপেক্ষ (Relative) ভেদজ্ঞান মাত্র। যতদিন লোক নির্ম্মল (Absolute) জ্ঞানে উপনীত না হয়েন, ততদিন তাহার জ্ঞান দ্বৈতভাব সম্পন্ন। তিনি কোন বস্তুর প্রকৃততত্ত্ব অবগত হইতে পারেন না। তাঁহার বুদ্ধি ও মন এই ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানেরই পরতন্ত্র। এইরূপ বুদ্ধি বিশিষ্ট লোকদিগের প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া নানাবিধ উপদেশ আবশ্যক হইয়াছে। এই রূপ প্রয়োজনানুসারে যে সকল উপদেশের আবশ্যকতা হইয়াছে, তাহাই বেদের "অর্থবাদ" *। "অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি"তে এই কথা আরও বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। "আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ" কার সেই গ্রন্থোক্তবিষয়ের এইরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন:—

"শাস্ত্র প্রকাশক মুনিগণ যে ভ্রান্ত নহেন, তাঁহাদের মত সকল আপাত দৃষ্টিতে পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীত হইলেও কোন ঋষি যে তাৎপর্য্যতঃ অন্য ঋষির বিরোধী নহেন, 'অদ্বৈত ব্রহ্মসিদ্ধি' তাহাই বুঝাইয়াছেন।

অদ্বৈতবাদই যদি সত্যবাদ হয়, তাহা হইলে দ্বৈত প্রতিপাদনপর ন্যায় বৈশেষিকাদি ভ্রান্তমত-স্থাপক শাস্ত্র সমূহ দ্বারা তত্ত্বজিজ্ঞাসুর কি ইষ্টাপত্তি হইবে? না, তাহা নয়, দ্বৈতপ্রতিপাদনপর প্রস্থান সকল নিষ্প্রয়োজনীয় নহে। ন্যায় বৈশেষিকাদি দ্বৈতবাদসংস্থাপক পুরুষেরাও ঋষি ছিলেন, সুতরাং, তাঁহাদের ভ্রম হইতে পারে না। ঋষিদিগেরও ভ্রম হয় বলিলে, অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না; কোন ঋষিই বস্তুতঃ ভ্রান্ত নহেন। মহর্ষিদিগের অভিপ্রায় কি, তাহা হৃদয়ঙ্গম না হওয়াতেই লোকের মনে নানাবিধ সন্দেহ উদিত হইয়া থাকে। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে, উপলব্ধি হইবে, দ্বৈত-প্রতিপাদনপর মহর্ষিদিগের আপাতদৃষ্টিতে বিরুদ্ধরূপে উপলভ্যমান মত সকল বিবর্ত্তবাদেই পর্য্যবসিত হইতেছে। দ্বৈতপ্রতিপাদনপরশাস্ত্রকারেরা তাৎপর্য্যতঃ অদ্বৈতবাদকেই যে আদর করিতেন, এই মতকেই যে তাঁহারা শ্রেষ্ঠ মত মনে করিতেন, তাহার যথেষ্ঠ প্রমাণ পাওয়া যায়। তর্ককেশরী উদয়নাচার্য্য তাঁহার 'আত্মতত্ত্ববিবেক বৌদ্ধাধিকারে' বলিয়াছেন, বিবর্ত্তবাদই যে সত্য, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু আদার ব্যাপারির জাহাজের খবর দরকার কি।"

উদয়নাচার্য্যের অর্থ এই যে, আমি দ্বৈতবাদিদের জন্যই যে কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছি, সে কার্য্যে অদ্বৈতবাদের কথা অনাবশ্যক।

* নিরুক্ত, দৈবতকাণ্ড।

* প্রয়োজন-সিদ্ধি উদ্দেশ করিয়া যাহা বলা যায়, তাহাই অর্থবাদ—(কথিত) "অর্থার প্রয়োজন সিদ্ধিয়ে বাদঃ কথনম্।" ন্যায়দর্শনে চতুর্ব্বিধ অর্থবাদ কথিত হইয়াছে।

এক্ষণে বোধ হয়, অনেক দূর প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আমাদের দার্শনিক মতভেদ ঋষিদিগের অজ্ঞতা, বুদ্ধিবিকৃতি বা ভ্রান্তি বশতঃ নহে; অজ্ঞজনগণকে জ্ঞানপথে আনিবার নিমিত্ত তাঁহারা বেদার্থ বিশদ করিয়া বুঝাইয়াছেন। তাই, আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপকার বলেন, সামান্য পণ্ডিতগণের মতভেদ অজ্ঞতানিবন্ধন, দার্শনিক ঋষিগণের মতভেদ অজ্ঞজনগণকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত। দর্শনের উৎপত্তি কি, তদ্বিষয়ে একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে এ বিষয় আরও পরিস্কৃত হইয়া যাইবে।

বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যের প্রবচনভাষ্যের যে বিস্তৃত ভূমিকা লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি প্রাঞ্জলরূপে দর্শনসমূহের বিরোধভঞ্জন করিয়া দিয়া গিয়াছেন। প্রথমে তিনি দর্শনের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলিতেছেন যে শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে :—

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো, মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্য"—ইত্যাদি।

"শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা সর্ব্বদা আত্ম সাক্ষাৎকার করিবে।"

আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিবার নিমিত্ত এই ত্রিবিধ উপায় শ্রুতিতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসন। অগ্রে গুরূপদেশ-ক্রমে সমগ্র বেদ শ্রবণ, অধ্যয়ন ও অভ্যস্ত করিবে। সমস্ত বেদ হইতে এইরূপ আত্মতত্ত্বের শ্রবণ করিয়া তৎপরে তৎসম্বন্ধে চিন্তার প্রয়োজন। চিন্তা ও যুক্তি সহকারে বেদার্থের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে না পারিলে বেদ পাঠই বৃথা। বিবিধ প্রমাণ দ্বারা পরমাত্মার অনবরত চিন্তা করাই "মনন"। মননদ্বারা সমস্ত বিষয়ের তাৎপর্য্য-গ্রহ হইলে তবে যোগ পথে পদার্পণ করা আবশ্যক। মননদ্বারা পরমাত্মতত্ত্বের ধারণার পর অবিশ্রামে ও অনন্যচিত্তে প্রগাঢ় ধ্যান পরায়ণ হওয়ার নাম "নিদিধ্যাসন"।

বেদোক্ত সাধন পথ এই। এইরূপ সাধন-পথ অবলম্বন করিলে তবে আত্মসাক্ষাৎকার সম্ভাবিত হয়। এই পথ যতদিন অবলম্বিত হইয়াছে, ততদিনই দর্শনশাস্ত্র বিদ্যমান। যতদিন "মননের" অনুষ্ঠান হইতেছে, ততদিন বৈদিক "অর্থবাদ" আছে। ততদিন বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ জন্য নানা প্রমাণপথের চিন্তা ও উপদেশ বিদ্যমান ছিল। দার্শনিকেরা সেই সমস্ত উপদেশ সূত্রাকারে গ্রথিত করিয়া গিয়াছেন; এবং তাহাই এক এক দার্শনিক প্রস্থানে পরিণত হইয়াছে। প্রস্থান সমূহের প্রমাণপদ্ধতিও এজন্য স্বতন্ত্র হইয়াছে। যে প্রস্থানের যেরূপ অধিকার, তাহার প্রমাণ-পদ্ধতিও সেই রূপ হইয়াছে।

বিজ্ঞানাচার্য্য বলেন, কাপিল সাংখ্যের অধিকার আত্মতত্ত্বজ্ঞান; সেই আত্মতত্ত্বজ্ঞান কেবল বিবেকোদয়ে সম্ভব, পরমপুরুষার্থসাধন দ্বারা বিবেকোদয় হয়। এই পুরুষার্থসাধন-পথ প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত, ভগবান্ কপিল, শ্রুতির সার সঙ্কলন করিয়া পরমাত্মজ্ঞান বিষয়ে শ্রুতির অবিরোধিনী নানা উপপত্তির উপদেশ করিয়াছেন। শ্রবণ দ্বারা সাংখ্য যে শ্রুতিবাক্য লইয়াছেন, সেই শ্রুতি সাংখ্যের নিকট আপ্তবাক্য। নানা উপপত্তি বা অনুমানমূলক যুক্তি দ্বারা সেই আপ্তবাক্যকে স্থাপন করিবার নিমিত্ত সাংখ্য সুতরাং প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দ্বিবিধ যুক্তিপথ অবলম্বন করিয়াছেন। সাংখ্য এজন্য ত্রিবিধ প্রমাণে স্বীকার করেন—শব্দ (আপ্তবাক্য), অনুমান ও প্রত্যক্ষ।

সাংখ্যের প্রতিপাদ্য নির্গুণ ব্রহ্ম; ন্যায় ও বৈশেষিকের প্রতিপাদ্য সগুণ ব্রহ্ম। এজন্য ন্যায়দার্শনিকেরা আর এক অতিরিক্ত প্রমাণ গ্রহণ করিলেন। সামান্য বস্তুতত্ত্ব-জ্ঞানের উপমা দিয়া নৈয়ায়িকেরা সগুণ ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপাদনে প্রবৃত্ত হইলেন।* নির্গুণ ব্রহ্ম বিদ্যায় সামান্য বস্তুতত্ত্বের তত উপযোগিতা নাই বলিয়া কাপিলসাংখ্যে তাহা গৃহীত হয় নাই। কিন্তু সগুণ ব্রহ্মবিদ্যায় উপমান অত্যন্ত উপযোগী।

বেদান্ত আরও কতিপয় প্রমাণ স্বীকার করেন; যেহেতু, তাহার অধিকার সগুণ ও নির্গুণ উভয়ই। ব্রহ্মমীমাংসাকার পূর্ণপ্রজ্ঞ, মাধ্বাচার্য্য, বল্লভ ও রামানুজ সগুণ দ্বৈত-বাদী, শঙ্কর নির্গুণ অদ্বৈতবাদী। সৌগত ও জৈনেরা আপ্তবাক্য শব্দকে অস্বীকার করিয়া প্রত্যক্ষ এবং অনুমান গ্রহণ করি-লেন। চার্ব্বাকেরা কেবল প্রত্যক্ষ ব্যতীত আর কিছুই স্বীকার করিতে চাহেন না। তাই আপ্তবাক্য-বিরোধী নাস্তিক দর্শন ষড়বিধ হইল—চার্ব্বাক, চতুর্ব্বিধ বৌদ্ধ এবং জৈন বা আর্হত। আপ্তবাক্যের অবিরোধী আস্তিক দর্শনও ছয় প্রকার—ন্যায়বৈশেষিক ভেদে দ্বিবিধ ন্যায, সাংখ্যপাতঞ্জল ভেদে দ্বিবিধ সাংখ্য এবং পূর্ব্ব উত্তরভেদে দ্বিবিধ মীমাংসা দর্শন।

সগুণ ঈশ্বর কেবল কাপিল সাংখ্যে এবং জৈমিনির পূর্ব্বমীমাংসায় প্রতিষিদ্ধ। কপিল ঘোর জ্ঞানবাদী, জৈমিনি ঘোর কর্ম্মবাদী। একজন জ্ঞান; অন্যজন কর্ম্ম দ্বারা মুক্তি প্রয়াসী। সগুণ ঈশ্বর নাই মানুন, আস্তিক দর্শনকারগণ নিত্যবস্তু নির্গুণসত্তা পরমাত্মার স্বীকার করিয়াছেন। শুদ্ধ উপাসনার নিমিত্ত সগুণ ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠা। আস্তিক দর্শনের বিরোধভঞ্জনাত্মক বিজ্ঞানাচার্য্যের প্রসঙ্গ এক্ষণে অনায়াসে উত্থাপিত হইতে পারে।

দর্শনে জ্ঞানের একটি সীমা নির্দ্দিষ্ট হই-য়াছে; সেই সীমা ইন্দ্রিয় এবং অতীন্দ্রিয়ের মধ্যে স্থাপিত। ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান বাহ্যবিষয়ের দ্বার স্বরূপ। মন ও বুদ্ধি এই ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকিয়া যতদূর যাইতে পারে, সেই স্থলে এই সীমা স্থাপিত। এই জ্ঞান-সাপেক্ষ (Relative) দ্বৈতজ্ঞান। সেই নিমিত্ত প্রকৃত বস্তুতত্ত্বাবধারণে অসমর্থ। প্রকৃত বস্তুতত্ত্ব কি, তাহা এই জ্ঞানের পর-পারে। যোগীগণ বলেন, এই পরপারে যাই-বার একমাত্র উপায়—নিরোধ। পাতঞ্জল যোগসূত্র বলেন, এই নিরোধ কেবল চিত্তলয় করিয়া সংসিদ্ধ হয়। চিত্তে সমুদায় ঐন্দ্রি-য়িক দ্বৈত জ্ঞানের সংস্কার একেবারে বিলীন হইলে এই নিরোধ উপস্থিত হয়। তখন নির্ম্মল ও অখণ্ড (absolute) জ্ঞানের বিকাশ হয়। নির্ম্মল জ্ঞানের বিকাশ হইলে সমুদায় বস্তুতত্ত্ব জানা যায়; তখন একমাত্র ব্রহ্মই প্রত্যক্ষ হইতে থাকে। এজন্য এই জ্ঞানের নাম কেবল বা অদ্বৈতজ্ঞান। এই জ্ঞানই সাক্ষাৎ মুক্তি-সাধক। এই জ্ঞানে উপনীত হইলে জীব সর্ব্ববিৎ হয়, সুতরাং কিছু জানিবার বাকী ও অপেক্ষা থাকে না। যোগশাস্ত্রে এই জ্ঞান-লাভের সাধনপথ নির্দ্দিষ্ট হইয়া হইয়াছে। সাংখ্যে ঈশ্বর-নিরবলম্বযোগ, পাতঞ্জলে ঈশ্বরা-

* কাপিল সাংখ্যে নিত্য ঐশ্বর্য্যের নিরাকরণ জন্য যে সগুণ ঈশ্বরের প্রতিষেধ আছে, কুসুমাঞ্জলিকার উদয়নাচার্য্য এই প্রমাণ বলে সেই ঈশ্বরের স্থাপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। মাধবাচার্য্য সর্ব্বদর্শন সং-গ্রহে সেই যুক্তির সারসঙ্কলন করিয়া দিয়াছেন। বৈশে-ষিকে শব্দ ও উপমান গৃহীত হইয়া অনুমানান্তর্গত হইয়াছে।

বলম্বিত যোগ। শ্রুতিতেও তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দার্শনিকেরা সেই শ্রুতি অবলম্বন করিয়া বলেন, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনই সেই প্রশস্ত সাধনপথ। এই প্রশস্ত সাধনপথেই কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানযোগ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। শ্রবণ ও মনন পর্য্যন্ত সামান্য মানসজ্ঞানের সীমা; নিদিধ্যাসন অবলম্বন করিয়া আমরা যোগপথে অগ্রসর হই। মনকে ধ্যানে নিযুক্ত ও নিমগ্ন করাই নিদিধ্যাসন; সেই ধ্যেয়কে শ্রবণ, অবধারণ, নির্ণয়, প্রতিপন্ন ও অনুচিন্তাদি দ্বারা ধারণ করাই শ্রবণ মননের বিষয়। এই ধ্যেয় দ্বিবিধ, সগুণ ও নির্গুণ। সগুণ স্থূল ও সূক্ষ্ম। স্থূল হইতে সূক্ষ্মে, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতরে এবং সূক্ষ্মতর হইতে সূক্ষ্মতমে যাওয়াই মনন ও দর্শনের বিষয়। এই সূক্ষ্মতত্ত্বের এক সীমা আছে, যেখানে নির্গুণ তত্ত্বের আভাস ও অধ্যাস লাভ করা যায়। সেই সীমায় আসিয়া যোগিরা নির্গুণের ধ্যানে অধিষ্ঠিত হয়েন; সম্প্রজ্ঞাত বা সামান্য ও সম্যক প্রকার সবিকল্পক জ্ঞানরাজ্য হইতে অসম্প্রজ্ঞাত বা সজ্ঞাহীন নির্ব্বিকল্প জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশ লাভ করেন।

সম্প্রজ্ঞাত হইতে অসম্প্রজ্ঞাত যোগরাজ্যে আসিবার অবস্থায় যোগিদিগের একযোগবল বা ঐশ্বর্য্যলাভ হয়। যোগশাস্ত্রে সেই যোগবল ও ঐশ্বর্য্যের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। কোন কোন যোগী এই যোগবলে এত মুগ্ধ হইয়া পড়েন যে, আর নির্গুণধ্যানে প্রবৃত্ত হয়েন না। পাছে সেই ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ হইতে হয়, তাই কাপিলসাংখ্যে সেই ঐশ্বর্য্যের প্রতিষেধার্থ সগুণ ঈশ্বরের অসিদ্ধতা সপ্রমাণ করা হইয়াছে; অন্য কারণে নহে! বিজ্ঞানভিক্ষু বলিতেছেন :—

"এই শাস্ত্রে (সাংখ্যদর্শনে) ঐশ্বর্য্য বৈরাগ্যের নিমিত্তই ঈশ্বরবাদের প্রতিষেধ করা হইয়াছে। যদি বৌদ্ধমতানুসারে নিত্য ঐশ্বর্য্য প্রতিষেধ না কর, তাহা হইলে পরিপূর্ণ, নিত্য, নির্দ্দোষ ঐশ্বর্য্য দর্শনে তাহাতে চিত্তের অভিনিবেশ হইয়া বিবেকাভ্যাসের প্রতিবন্ধক হইতে পারে, ইহাই সাংখ্যাচার্য্যের অভিপ্রায়।" *

অন্যত্র :—

"ঈশ্বর দুজ্ঞেয়, এই নিমিত্তই নিরীশ্বরবাদ ব্যবহারসিদ্ধ হইয়াছে এবং তাহা হইলেই ঐশ্বর্য্য-বৈরাগ্য সম্ভাবিত। যদি ঈশ্বর স্বীকার কর, তাহা হইলেই নিত্য ঐশ্বর্য্যও স্বীকার করিতে হয়, সুতরাং ঐশ্বর্য্য-বৈরাগ্য সম্ভবে না।"

এই কারণে সাংখ্যে ঈশ্বর (সগুণ) অসিদ্ধ। যে তত্ত্বজ্ঞান ও নির্গুণতত্ত্ব সাংখ্যের প্রতিপাদ্য, পাছে সাংখ্যযোগির সেই তত্ত্বজ্ঞান লাভে ব্যাঘাত জন্মে, তাই যোগসিদ্ধি পক্ষে ঈশ্বরবাদ অসিদ্ধ। বিজ্ঞানাচার্য্য আবার বলিতেছেনঃ—

"বিশেষতঃ ব্রহ্মমীমাংসা গ্রন্থে আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত ঈশ্বরই প্রতিপন্ন হইয়াছেন। সেই শাস্ত্রের ঈশ্বর-প্রতিপাদনই মুখ্য উদ্দেশ্য। তাহার সেই অংশের বাধ হইলে শাস্ত্রেরই অপ্রামাণ্য হইয়া পড়ে। যে শব্দের যে উদ্দেশ্য, তাহাই সেই শব্দের অর্থ। ব্রহ্মমীমাংসাতে কেবল ঈশ্বর প্রতিপাদনই শাস্ত্র-কর্ত্তার অভিপ্রেত। সাংখ্য শাস্ত্রে কেবল পুরুষার্থসাধন আত্মসাক্ষাৎকারের উপায় স্বরূপ প্রকৃতিপুরুষে বিবেচনাই মুখ্য উদ্দেশ্য। এই নিমিত্ত সাংখ্যশাস্ত্রের ঈশ্বর প্রতিষেধাংশের বাধ হইলে তাহার অপ্রামাণ্য হয় না। যে হেতু, প্রকৃতি পুরুষ বিচারেই তত্ত্বজ্ঞান ও বিবেক লাভের উদ্দেশ্যসাধন সুনিশ্চিত। যাহার যে উদ্দেশ্য, তাহার সেই উদ্দেশ্য সাধিত হইলেই সেই বাক্যের প্রামাণ্য থাকে। অতএব, সাংখ্যশাস্ত্র অপ্রমাণ না হইয়া ঈশ্বর প্রতিষেধাংশে অন্যান্য শাস্ত্রাপেক্ষা অবশ্য দুর্ব্বল বলিতে হইবে।"

তবেই দেখা যাইতেছে, যে দর্শনকার যে অধিকারে আছেন, সেই অধিকারের যাহা

* । প্রস্তাব-বাহুল্যভয়ে আমরা বিজ্ঞানাচার্য্যের মূলের কেবল অনুবাদ দিতেছি।

প্রয়োজন, সেই প্রয়োজন-সিদ্ধির নিমিত্ত তাহার যুক্তিপথ অবধারিত হইয়াছে। সগুণ ব্রহ্মের প্রতিপাদনে যাঁহারা নিযুক্ত, তাঁহারা একেবারে নিষ্প্রয়োজন নহেন; মোক্ষপথে তাঁহাদেরও গৌণভাবে প্রয়োজন। বিজ্ঞান-ভিক্ষুর মতে, কেবল সাংখ্যাপেক্ষাই তাঁহাদিগের অপকর্ষ। সাংখ্যজ্ঞান দ্বারাই পরম বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়, সুতরাং এই জ্ঞানই সাক্ষাৎ মোক্ষসাধন। যে জ্ঞানের প্রতিপাদন করা তাঁহাদিগের প্রয়োজন, সে জ্ঞান পরম্পরা রূপে মোক্ষসাধন। সাংখ্যশাস্ত্র মতে এই সেশ্বরবাদ ব্যবহারিক এবং ঐশ্বর্য্য-বৈরাগ্য-সাধক নিরীশ্বরবাদ পারমার্থিক; কিন্তু সেশ্বর দর্শনশাস্ত্রে সগুণব্রহ্মমীমাংসাই পারমার্থিক,—গৌণভাবে পারমার্থিক। সুতরাং ব্যবহারিক ও পারমার্থিক বিচারে কি সেশ্বরবাদ কি নিরীশ্বরবাদ, উভয়ই প্রয়োজন সিদ্ধির উপযোগী বলিয়া দর্শনে তাহারা স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে। শুদ্ধ প্রয়োজনানুসারে পরস্পর বিরোধী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেশ্বরবাদ কপিল সাংখ্যের বিরোধী এবং নিরীশ্বরবাদ সেশ্বর দার্শনিকগণের বিরোধী। এই জন্য বিজ্ঞান ভিক্ষু বলিতেছেন :—

"ব্রহ্মমীমাংসা ও যোগসূত্রকার নিত্য ঈশ্বর স্বীকার করেন। সাংখ্য মতে ঈশ্বর স্বীকৃত নহে এবং এমতও স্বীকার করা যায় না যে, ব্যবহারিক পারমার্থিক ভেদে সেশ্বর নিরীশ্বরবাদ অবিরুদ্ধ।"

দার্শনিক প্রস্থানের প্রয়োজন অনুসারে এই সগুণ ও নির্গুণবাদ পরস্পর বিরোধী হইলেও মোক্ষার্থ তাহারা উভয়ই প্রয়োজনীয়।

যে দর্শনকার সেশ্বরবাদ প্রতিপাদনে নিযুক্ত, তিনি সেই বাদেরই পক্ষ সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। পাছে নিরীশ্বরবাদ দ্বারা তাহার প্রয়োজন ব্যর্থ হয়, তজ্জন্য নিরীশ্বরবাদের প্রতি তিনি কটাক্ষপাত করিয়া অজ্ঞজনগণের প্রবোধনার্থ নানা জল্পনার সৃষ্টি করিয়াছেন। নিরীশ্বরবাদেও তদ্রূপ ঘটিয়াছে। নিজ নিজ প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত দার্শনিকগণ যে সকল জল্পনার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে অনেক বেদবিরুদ্ধ বৃথা কথারও আবশ্যকতা হইয়াছে। সেই জন্য বিজ্ঞান ভিক্ষু বলিয়াছেন :—

"পাপীদিগের জ্ঞানপ্রতিরোধের নিমিত্ত আস্তিক দর্শনেও অংশত শ্রুতিবিরুদ্ধ অর্থ ব্যবস্থাপিত আছে এবং সেই সেই অংশের অপ্রামাণ্যও হইয়া থাকে। যে অংশ শ্রুতিস্মৃতির অবিরুদ্ধ তাহাই প্রামাণ্যরূপে মুখ্য বিষয় বলিয়া আদৃত হইয়া থাকে। শাস্ত্র মাত্রেই বিরুদ্ধ ও অবিরুদ্ধ অর্থ বিন্যস্ত থাকে, তন্মধ্যে যে অংশ শ্রুতিস্মৃতি বিরুদ্ধ, তাহা অপ্রমাণজ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া যে অংশ শ্রুতিস্মৃতির অবিরোধী, তাহার প্রামাণ্য জানিয়া গ্রহণ করা যায়।"

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু।

শিশির বাবুর গীতিগ্রন্থ।

(শেষ আলোচনা।)

মানব-স্বভাবের যে অনন্ত মহা গীতি স্বাগত,—স্বতঃ প্রবাহিত,—জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে হৃদয়ে হৃদয়ে ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত; যে মহা গীতির বিশ্ব-বিমোহন, ব্রহ্মাণ্ড-পরিপ্লাবী বিপুল বিরাট উচ্ছ্বাস মানব জাতির ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম-শাস্ত্রে পরিণত; মনুষ্য-জীবনের যে মহা গীতি বেদে, পুরাণে, বাইবেলে, কোরাণে, এবং আরও কত কত, স্বতন্ত্র

স্বতন্ত্র ধর্ম্মগ্রন্থে গীত, বিবৃত এবং বর্ণিত; যে গীতি সার্ব্বভৌমিক ও সার্ব্বকালিক,—যাহা যুগ-প্রলয়ে, মহাপ্রলয়ে এবং প্রলয়ান্তে প্রবাহ রূপে নিত্য, অক্ষয় এবং অবিনষ্ট;—যাহা ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভাবে মনুষ্য-হৃদয়ের অত্যুচ্চ, অবিনশ্বর, অনিবার্য্য এবং অতৃপ্ত আকাঙ্খার বা অনুরাগের উত্তেজনা বা উচ্ছ্বাস;—যেগীতি, মানব জাতির শৈশব, কৈশোর ও যৌবনাদি কাল, ও কমল, কঠোর করুণ, উগ্র বা মধুরাদি বৃত্তি ভেদে,—শ্রুতি স্মৃতি পুরাবৃত্তাদির পূর্ব্বাপর স্তব ভেদে, ভিন্ন ভিন্ন রাগে ও রাগিণীতে উত্থিত—গীত, কভু অস্ফুট, কভু সবল, সহজ, শিল্প-চাতুরী-হীন শৈশবে সুন্দর; কভু, উজ্জ্বল, উন্নত, অভ্রভেদী, প্রদীপ্ত, উগ্র, গভীর, সৌন্দর্য্য-ঐশ্বর্য্যময়;—কভু বা মোলায়েম, মধুর, স্নিগ্ধ; করুণ; কভু ঔদাস্য বা দাস্য ভাবোদ্ভাসিত, কভু বাৎসল্যসখ্য-ময়,-কভু কেবল অবিমিশ্র মাধুর্য্য-ময়;—যে গীতি কখন প্রখর জ্ঞানোদ্দীপ্ত, কখন ললিত হৃদ্বৃত্তি-বিভাসিত, কখন উন্মত্ত মহাসাগরের উত্তাল তরঙ্গ লহরী, কখন সম্ভ্রম-সঙ্কুচিত প্রেমিক প্রেমিকার সংগোপন মিলন সঙ্কেতের সুমিষ্ট নিভৃত নিক্বন; কখন নৈশ সৌরভ-পুলোকিত প্রসূন-নিশ্বাস; আবার কখন প্রশান্ত, প্রফুল্ল, পবিত্র, দিগন্তব্যাপী, তপবন-তরঙ্গিত, সুমহান সাম-সংগীত;—পুনশ্চ, যে গীতি, কখনও ভৈরব, কখনও মালব, কখনও হিন্দোল, কখনও বা দীপক, যুগে যুগে নবীন নিঃস্বনে, নবজীবনে জাগরিত; যুগে যুগে জীব উদ্ধারার্থে যুগাবতার কর্ত্তৃক অভিনব উচ্ছ্বাসে অবতারিত;—ঋষি প্রফেট, সিয়ার পেয়গম্বর ও কবি কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত—মৌলিক রাগে বা মিশ্র রাগিণীতে গীত; যে গীতি প্রভাবে সলিলোপরি শিলা ভাসিয়াছিল, অরণ্যবাসী দুরন্ত পশু-সমাজ প্রেমাকৃষ্ট হইয়াছিল, পরস্পর-বিরোধী বর্ব্বর-জাতি একপ্রাণে একতা-বদ্ধ হইয়া সত্যের সমর্থন ও দুস্কৃতের দমন করিয়াছিল; পরন্তু, যে গীতির ঐন্দ্রজালিক আকর্ষণে সঞ্চালিত, সম্মোহিত হইয়া,—আত্ম-বিস্মৃতা ব্রজ-রমণী অসূর্য্যম্পস্যা কুল-কামিনী, উন্মাদিনীবৎ, বনে বনে ছুটিয়াছিলেন, সংসার-সম্ভ্রম-সতীত্ব পতি-সন্ততি-যথাসর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, গায়কের অনুসন্ধানে গৃহ-বাসিনী, বন-চারিণী হইয়াছিলেন; লজ্জা-রূপিনীগণ বিবসনা উলঙ্গিনী হইয়াও আত্ম সম্বরণে,—প্রেম গীতির গুঞ্জরণ সম্বরণে, সমর্থা হন নাই;—"হা! নাথ" "হা! নাথ!" রবে নিদারুণ করুণ ক্রন্দনে, বিরহ-বিধুরা ব্রজ-বালিকা কালিন্দী সৈকত অশ্রু সিক্ত করিয়াছিলেন; পরমেশ-প্রেম-পাগলিনীগণ কালিন্দি গর্ভে দেহ ভার বিসর্জ্জনে উদ্যতা হইয়াছিলেন; আর আত্মার যে গভীর গীতি উত্তেজনায় শাক্য রাজকুমার যুবরাজ অমিতাভ রাজ-মুকুট, রাজ সিংহাসন, সংসার সুখ, সম্পদ রাশি তুচ্ছ তৃণবৎ ত্যাগ করিয়া, স্নেহ-পারাবার পিতা মাতাকে শোক-পারাবারে ভাসাইয়া, প্রেমময়ী পত্নী, নব-প্রসূত অমিয়াধার পুত্র নিদ্রাবস্থায় পর্য্যঙ্ক-পরে পরিবর্জ্জন করিয়া, নিশীথ প্রহরে পলায়ন ও মায়া-বন্ধন সমূলে ছেদন করিয়া কন্থা কৌপিন-ক্লিষ্ট কঠোর সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছিলেন; পুনঃ, যে প্রকাণ্ড গীতির পূর্ব্ব-রাগে, পরম পণ্ডিত-মণ্ডলী, দিগ্‌দেশ হইতে, ধাবিত হইয়া বৈৎলেহমের গো-গৃহে-স্থিত সদ্য-প্রসূত সূত্রধর-শিশুকে রাজ-উপহারে, ও দেবোপচারে পূজা ও প্রণাম করিয়াছিলেন; এবং যে গীতির পূর্ণ উচ্ছ্বাসে সেই শিশু-সন্ন্যাসী সুমধুর গী-

বনে স্বকীয় উত্তপ্ত পবিত্র শোণিত দ্বারা সমগ্র-পৃথিবীর পাপতাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন; অপিচ,যে মহাগীতির মধুর মূর্চ্ছনায় একদিন নবদ্বীপ নবীন বৃন্দাবনে পরিণত হইয়াছিল; 'দারু পাষাণ গলিয়াছিল, বঙ্গ বিহার, আসাম, উৎকল গৌরাঙ্গ গানে মাতিয়াছিল এবং সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত ও দক্ষিণাপথ প্রেম-হুঙ্কারে প্রকম্পিত হইয়াছিল; যে গীতিতে সাধক, সন্ন্যাসী তাপসাদির ন্যায় সংসারী বিষয়ীও আকৃষ্ট, যাহাতে পণ্ডিত মূর্খ,পুণ্যাত্মা পাপী, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সকলেরই, জীবমাত্রেরই অধিকার,—যাহা জীব মাত্রেরই গতি; যাহাতে কেহ সালোক্য, কেহ বা সাযুজ্য কামনা করে,কেহ ষড়ৈশ্বর্য্য, কেহ অষ্টসিদ্ধি আশীর্ব্বাদ চায়, কেহ বা দৈনিক এক মুষ্টি অন্ন প্রার্থনা করে; কেহ বা কেবল সেই প্রাণেশ্বরের প্রেম ভিক্ষা চায়;—যে গীতি অবিচলিত আস্তিকতার ন্যায় নিরতিশয় নাস্তিকতার দ্বারাও গীত,—সরস ভক্তি প্রীতির ন্যায়, শুষ্ক জ্ঞান বিজ্ঞান দ্বারাও প্রচারিত; যাহা, যে ভাবেই হউক, জীবের জীবনোপায় এবং জগতের মূল অবলম্বন-যষ্টি;—সেই বিপুল, বিরাট, ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপী-সঙ্গীতের—সেই অসীম,অনন্ত, অনাদি, অবিনশ্বর মহা গীতের একটী ক্ষুদ্র, ক্ষীণ, মৃদু মধুর তরঙ্গ,—শিশির কুমার ঘোষের এই গীতিগ্রন্থ। ইহা সুস্নিগ্ধ শিশির বিন্দুবৎ শীতল ও সুন্দর। ইহা ভগবানের সর্ব্ব-শক্তিমত্তার, অসীম ও অতুল ঐশ্বর্য্যের সংগীত নহে,—ইহা তাঁহার নির্ম্মল কমনীয়তার নিরবচ্ছিন্ন মাধুর্য্যময়ী গীতি।

কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, জ্ঞাতি-বধ-বিমুখ অর্জ্জুনকে, তত্ত্ব জ্ঞানের উপদেশ প্রদান কল্পে, স্বকীয় ভগবচ্ছক্তি, শ্রী-ঐশ্বর্য্য ও বিপুল বিস্ময়কর বিরাট বিভূতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সেই অনুপম, অক্ষয় উপদেশ-গীতি, মহা কবি মহর্ষি ব্যাস-দেব বিরচিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। বোধ হয়, কেবল একমাত্র, বেদশাস্ত্র ব্যতীত, সমগ্র শাস্ত্রে ও সাহিত্যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অতুলনীয় ও অদ্বিতীয়। উহা দার্শনিক কাব্য বা কাব্যাকারে দর্শন। উহার অত্যুচ্চ "ফিলজফির" ন্যায় কাব্যাংশও উচ্চ। উহা পণ্ডিত, জ্ঞানী, দার্শনিক, ভাবুক, ও চিন্তকগণেরই জ্ঞানগম্য ও চিন্তার বিষয়; অতএব তাঁহাদিগেরই জ্ঞানপ্রদ, শিক্ষনীয়, উপভোগ্য ও আলোচনীয়। উহার নিগূঢ় তত্ত্ব, প্রগাঢ় রস,অত্যুচ্চভাব এবং অতি গভীর আধ্যাত্মিক গবেষণা সামান্যের সহজ বুদ্ধি হইতে, সংসারী বিষয়ীজনের সংকীর্ণ জ্ঞান হইতে—দূর,অতি দূর। পরন্তু শ্রীমদ্ভগদ্গীতায় শ্রীভগবানের অত্যৈশ্বর্য্যের ও অত্যৌর্জ্জল্যের গীতি; সে অনন্ত ঐশ্বর্য্য, সে অসীম নয়নান্ধকর ঔজ্জ্বল্য, স্বল্পবুদ্ধি ক্ষীণশক্তি সাধারণ লোকে ধারণ ও অনুধাবন করিতে পারে না। তদ্দ্বারা ভীত, বিস্মিত, চমকিত, আতঙ্কিত হয়; বিবশ বিধ্বস্ত হইয়া, তাহা হইতে যেন পলায়ন করিতে চায়। অপিচ, গীতোক্ত অনুপম উপদেশাবলী বিষ্ণু-অবতার মানব-রূপী শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠ-বিনিসৃত হইলেও গীতোক্ত ঈশ্বর পূর্ণব্রহ্ম, উপনিষদের অখণ্ড, অব্যয়, অচিন্ত্য অপার পরমেশ্বর, মহান্ মহিমান্বিত, নিরাকার কূটস্থ চৈতন্য; পরন্তু গীতা-বিবৃতিকালে অর্জ্জুন-সম্মুখে তদীয় দিব্য দৃষ্টিতে, ভগবানের যে মূর্ত্তি প্রতিভাত হইয়াছিল, তাহা তাঁহার অপরিমেয়, দুর্নিরীক্ষ্য, বিপুল, বিশ্বব্যাপী, মার্ত্তণ্ড,বিরাটমূর্ত্তি। সে উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া ত্রিলোক প্রব্যথিত হইয়াছিল; স্বয়ং অর্জ্জুন,—বিশ্ববিজয়ী বীর অর্জ্জুন, অত্যন্ত

আতঙ্কিত ও দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন! অতএব অন্যের আর কথা কি? ভীতির সহিত ভক্তির,—শঙ্কার সহিত শ্রদ্ধার উদ্রেক অসম্ভব না হইলেও, আতঙ্ক ও বিস্ময়, বোধ হয়, মনুষ্যপ্রেম আকর্ষণ করিতে পারে না। অতএব ভগবানের বিরাটরূপ ও স্বরূপ, যদি মনুষ্যহৃদয় আদৌ ধারণ করিতে পারে, তাহাতে কেবল বিস্ময়াবিষ্ট ও ভীত হয়, তাহা সম্ভবতঃ ভালবাসিতে পারে না।

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্য
মনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রং।
*   *   *
রূপং মহত্তে বহুবক্ত্রনেত্রং
মহাবাহো বহুবাহূরুপাদং।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং।
*   *   *
নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং
ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রং।
*   *   *
দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি
দৃষ্টৈব কালানলসন্নিভানি।
*   *   *

ইহা ভয়ানকের ভয়ানক! ভগবানের গীতোক্ত এই বিশ্বরূপ। পক্ষান্তরে, ভগবানের যে অবতার-মূর্ত্তি হইতে ঐ বিশ্বমূর্ত্তি অর্জ্জুন সমক্ষে অভিব্যক্ত, তাহাও চতুর্ভুজ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ধারী, কিরীট-কুণ্ডলধারী ঐশী মূর্ত্তি। ইহাও সামান্য প্রাণীর সম্ভবতঃ শঙ্কাপ্রদ। এ মূর্ত্তি পবিত্রতা ও পূজা উদ্দীপন করিতে পারেন; প্রেম উদ্দীপন করিতে সর্ব্বত্র ও সামান্যতঃ পারেন কি না, বলা কঠিন। গীতোক্ত ঐশী রূপ ও ঐশী স্বরূপ ও ঐশী শক্তিও আধ্যাত্মিক সাধন উপদেশ, অত্যুচ্চ অত্যুগ্র এবং অত্যৈশ্বর্য্য-সমন্বিত। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বক্তা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ—মহাভারতোক্ত রাজনৈতিক শ্রীকৃষ্ণ—কুরুক্ষেত্রকর্ত্তা এক-ছত্র ভারত-সাম্রাজ্য-সংস্থাপক শ্রীকৃষ্ণ।

আমাদের আলোচ্য গ্রন্থ "গীতা" নামে অভিহিত হইয়াছে। উপরোক্তের অনুসরণেই হইয়াছে। এ "গীতা"রও বক্তা এবং উপদেষ্টা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র স্বরূপে এবং রূপে। এ গীতায় ভগবানের ভয়বিস্ময়প্রদ ঐশী শক্তি ও ঐশী ঐশ্বর্য্যের গান নহে, দুরাবগাহ্য গভীর জ্ঞানাত্মক উপদেশ নহে;—ইহাতে শ্রীভবানের সুন্দর, মধুর, সুস্নিগ্ধ, কমনীয়, কান্তরূপের ও কমল শীতল, রসাল শান্ত স্বরূপের সংগীত;—পরন্তু ইহাতে পরমেশ্বরের অবিমিশ্র মাধুর্য্যময় প্রেমাত্মক উপদেশ। এ গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, মোহন, সুন্দর, প্রেমিক, রসিক, কবি, শিল্পী, সুনিপুণ চিত্রকর, চিত্তচোর চটুল নায়ক; মোহনচূড়া ও মধুর মুরলীধারী সুচিক্কণ শ্যামচাঁদ; রমণীয় রভস-রাস-বিহারী, কুটিল কটাক্ষে প্রেমিক প্রেমিকার মন-প্রাণ পরিমন্থনকারী সেই বিনোদ বৃন্দাবনচন্দ্র;—এ গীতায় শ্রীকৃষ্ণ, সেই চিরস্মরণীয় প্রেমলীলা-ভূমি কালিন্দীকূলস্থিত চিরবসন্ত-বিভাসিত, মধুগুঞ্জিত, কোকিল কুজিত নিভৃত নিকুঞ্জ-কুটীরের কালাচাঁদ। এই অর্থে ইহা "কালাচাঁদ গীতা।" বৃহতের সহিত ক্ষুদ্রের তুলনা নহে; তাহা বিদ্রূপকর তাহা "বে আদবী।" কিন্তু বৃহতের আদর্শ লইয়া ক্ষুদ্র চিরকালই আত্মোন্নতির বা আত্মাভিব্যক্তির আত্মোপযোগী পথ প্রস্তুত বা পরিষ্কার করে। শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ সখা অর্জ্জুনকে নিগূঢ় যোগ-তত্ত্বের উপদেশ দিয়াছিলেন; কালাচাঁদ-গীতায় তিনি পঞ্চপ্রেমাসক্ত সখীকে নিগূঢ় প্রেম-রহস্যের উপদেশ দিয়াছেন;—সেই উপদেশ শীতল, সরল সান্ত্বনাপ্রদ, কাম-গন্ধ-বিরহিত; অথচ কামুক অপেক্ষা অধিকতর উদ্দীপ্ত আবেগ অনুরাগযুক্ত, পারমার্থিক প্রেম-সাধনা; তাহা বৈষ্ণব ধর্ম্ম মূলক, উপা-

দেয়, উচ্চ ও অতি মূল্যবান তত্ত্ব। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সহিত এই কালাচাঁদ-গীতার কেবল নামকরণে ও উপদেশ কর্ত্তার একত্বে, যে কিছু ঈষদ্ সাদৃশ্য; নহিলে শেষোক্ত প্রথমোক্ত হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পথে পরিকীর্ত্তিত। কিন্তু, ইহাও বলা আবশ্যক যে, বাঙ্গালী বাবু-বিরচিত এই গীতা-মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত গীতার বা সনাতন ও সমুন্নত গীতা-মতের ও গীতা মহিমার অনুমাত্র অতিক্রম করে নাই; তাহার সহিত সামঞ্জস্যের স্বাধীন স্বাতন্ত্র্য রাখিয়া তাহারই ভক্তি-প্রীতি পারাবারে একটী বিমল বৈষ্ণব তরঙ্গ,—একটী অভিনব প্রেমানুরাগ-উচ্ছ্বাস উত্থিত করিয়াছে।

কালাচাঁদ গীতার আরাধ্য ঈশ্বর,অগ্রেই একরূপ বলিয়াছি, প্রেমিক চূড়ামণি; বহিঃমূর্ত্তি ও অন্তঃস্বরূপে, সুকুমার, সুললিত ও সুমধুর লাবণ্যাধার। এবং সর্ব্বোপরি তিনি,—গ্রন্থকারের নিজের কথায়—"রসিকশেখর।" তিনি রূপ-রস-গন্ধ স্পর্শ-গ্রাহ্য অমিয় শব্দসম্ভার-সমন্বিত শরীরী সত্ত্বা-সৌন্দর্য্য-শেখর-মাধুরীর অতুল নিধি,—কবিতার ও কমনীয়তার অবিশ্রান্ত উৎস, এক কথায় মনুষ্যের কান্ত প্রবৃত্তির অতীব প্রলোভনীয় পদার্থ; অতীব প্রিয়দর্শন ও প্রীতিভাজন পুরুষ; যাঁহাকে দেখিবা মাত্র ও ভাবিবা মাত্র ভালবাসিতেই হইবে; নিপট কঠিন প্রাণীও ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিবে না। পুনঃ এ ঈশ্বর প্রতি মুহূর্ত্তের অতি প্রত্যক্ষ, পারিবারিক ঈশ্বর, সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত বন্ধু, প্রাণেশ্বর, পতি, জীবনবল্লভ, হৃদয়ের রমণীয় নিধি—বুক জুড়াইবার বিনোদ বস্তু। এ ঈশ্বর, ঈশ্বরাবতার অপেক্ষাও একমাত্র অতিরিক্ত মনুষ্য।

পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা   তোমারে ভুঞ্জিব।
তবে দয়াময়   তোমারে বলিব॥
বদন হেরিব   বচন শুনিব।
অঙ্গ-ঘ্রাণ স্পর্শ   আস্বাদন লব॥

পুনশ্চ

পিরীতি করিব   কেমনে তোমায়।
যদি তুমি তার   না"কর"সহায়?
মানুষের সঙ্গে   পিরীতি করিতে।
মানুষ তোমার   হইবে হইতে॥

*   *   *

রূপে গুণে প্রাণ   কাড়িয়া লইয়া।
শীতল চরণে   লও আকরিয়া॥
তবেত কান্দিব   চরণে পড়িয়ে।
যেন নারী কান্দে   পতি মুখ চেয়ে॥
চরণ ধোয়াব   আঁখি-বারি দিয়া।
প্রাণ জুড়াইব   চরণ সেবিয়া॥

ইহা ভগবদ্ভক্তির পরাকাষ্ঠা, সন্দেহ নাই, এবং ইহা ভগবৎসেবার সহজ সাধনও হইতে পারে। কিন্তু, আমার শঙ্কা হয়, ইহা ঐশী স্বরূপের কিঞ্চিদধিক "মানবীকরণ" বলিয়া প্রতীত হইবে। তবে, অল্লাধিক পরিমাণে মানবীকরণ ব্যতীত মনুষ্যের বিশেষতঃ সাধারণ মনুষ্যের উপাস্য ঈশ্বর এক রূপ অসম্ভব, ইহাও অস্বীকার করিতে পারি না। মূর্ত্তির মানবীকরণ বা গুণের মানবীকরণ, যে দিক দিয়াই হউক, মানবীকরণ আছেই সাকার উপাসকের ন্যায়, নিরাকার উপাসকেরও আছে। তাহা যাউক। এ সম্বন্ধে, গ্রন্থকারের যুক্তি ও বিশ্বাস এইরূপ যে, ভগবানে মনুষ্য স্বরূপ এবং মনুষ্যাতীত স্বরূপ সমস্তই বিদ্যমান। কিন্তু মনুষ্য কেবল সেই সকল ঐশী স্বরূপের অনুসরণ ও উপাসনা করিতে পারে, যাহা মনুষ্যের নিজ মনুষ্যত্বে বিদ্যমান। পরন্তু, তাহার অধিক, অতিরিক্ত ও অতীত যাহা, তাহা আদৌ মনুষ্য জ্ঞানের অনায়ত্ত। যাহা হউক, এই

বহু বিতর্কিত বিষয়ে পুনঃ তর্কে প্রবেশ করার আমার প্রয়োজন নাই। অতঃপর গ্রন্থের উপাখ্যান ও উপকরণাদির অনুসরণ করা যাইতেছে।

ভগবানের সৌন্দর্য্যানুরক্তি ও রস কৌতুক-প্রিয়তার সুতীক্ষ্ণানুভূতি হইতে এই গ্রন্থের উৎপত্তি; পরন্তু উহার অভিব্যক্তি ও উপসংহারও ঐ দুই মধুর উপকরণে। *নিভৃত গিরি-শেখরে নীল* বর্ণ-রঞ্জিত এক অরণ্য-কুসুম ফুটিয়াছে। সদ্য প্রস্ফুটিত অদৃষ্টপূর্ব্ব অরণ্য-কুসুম অকস্মাৎ গ্রন্থকারের নয়নপথে পতিত; কুসুমের নীলিমা-লাবণ্যে; তাহার সুরভি-সম্পদে, তাহার কমনীয় কান্তির চিত্র-চাতুর্য্যে গ্রন্থকার সৌন্দর্য্য-মুগ্ধ। এ সৌন্দর্য্যের, এ সুষমার—এ সুললিত নীলিমার নির্ম্মাতা কে? এই বিচিত্র চিত্র বৈচিত্র্যের বিধাতৃ কে? কে এই দুর্গম স্থানে—এই সুকঠিন গিরি-শরীরে এত সুন্দর' এমন কান্ত, এই অমূল্য কুসুম রত্ন, এমন বিমল বর্ণ-বৈভবে বিভাসিত করিয়া লুকাইয়া রাখিলেন! বর্ণরাগ জীবন্ত, তুলিকা-রেখা অত্যন্ত সজীব! এ অতুল ফুল যে এখনি কে আঁকিয়া অন্তরালে গিয়া দাঁড়াইয়াছেন! তিনি কে? তিনি কেমন? আ! তিনি যিনিই হউন, বড়ই সুনিপুণ শিল্পী—বড়ই সৌন্দর্য্যানুরাগী চিত্রকর, বড়ই রসিক কবি, আর মধুর কারিকর!

আপনি আঁকিয়া দেখিছে বসিয়া
নয়নে বহিছে ধারা।
* * *
তুলিতে সুগন্ধ যতনে মাখিয়া
ফুলেতে দিতেছে ছিটে:
* * *
মনে হয় যেন ফুলে রঙ দিয়া
এই মাত্র পলায়েছে।

এইভাব—সৃষ্টি-কার্য্য দেখিয়া স্রষ্টাকে অনুভব ও অনুসন্ধানের "আইডিয়া" অভিনব নয়; প্রত্যুত উহা মনুষ্য-স্বভাব-বৎ বা হিমালয় পর্ব্বতবৎ পুরাতন; ঈশ্বরের অস্তিত্ব সমর্থনার্থে উহা একটি প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু, উপস্থিত স্থলে ইহা অভিনব ভাবে ও সবিশেষ ব্যক্তিগত ভাবে অত্যন্তানুভূত। এবং সেই ঐকান্তিক ও আন্তরিক অনুভূতিই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আলোচ্য *গ্রন্থের উৎপত্তির সর্ব্ব প্রধান উপলক্ষ; এই* জন্য উহার উল্লেখ। জড়-বিজ্ঞানাধ্যায়ী ব্যক্তি গিরি-'পরে নীল বর্ণের নূতন কুসুম দেখিয়া,তাহার জাতি জ্ঞাতি নির্ণয় বা নির্ব্বাচন-কল্পে যাহাই করুন, তদ্দ্বারা কবি মাত্রেই অল্পাধিক পরিমাণে বিমোহিত হইতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ একজন ভগবদ্ভক্ত ভাবুক যে তাহাতে ভগবৎ-সৌন্দর্য্য প্রীতি সুতীক্ষ্ণভাবে অনুভব করিয়াছিলেন, ইহা স্বাভাবিক। পরন্তু,এই গ্রন্থের আর একটী উপলক্ষ ঘটিয়াছিল; সেটীও সহৃদয় প্রকাশক বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন। সেটী গ্রন্থকার কর্ত্তৃক ভগবানের কৌতুক-প্রিয়তার অনুভূতি। যে ঘটনা হইতে উহা উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা সাধারণ দৃষ্টিতে অতি তুচ্ছ ঘটনা, একটা অকিঞ্চিৎকর তামাসা। কিন্তু, দেখিতেছি, যাহা অতি তুচ্ছ, যাহা কেবল হাস্যাস্পদ তামাসা মধ্যে পরিগণিত, তাহারও মধ্যে গভীর আধ্যাত্মিক ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিহিত থাকে। পেচক জাতি অন্ধকার-প্রিয় ও অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতি বলিয়া প্রসিদ্ধ। জগতের যাতনাবাদী ও যাতনাবাদ-বিজ্ঞাপক ইংরাজী "পেসিমিষ্ট" (Pessimist) ও "পেসিমিজম" (Pessimism) প্রভৃতি শব্দ, হয়ত পেচক-প্রকৃতির গাম্ভীর্য্যান্ধকার হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। পেচক অন্ধকার-

প্রবণ, প্রবীণ ও গম্ভীর। কিন্তু, পেচক-পেচকীর পারিবারিক কলহে অতি গম্ভীরেরও গাম্ভীর্য্য নষ্ট হয়, পাঠক অবশ্য জানেন। পেচক-দম্পতীর কলহ, প্রেমের কি অপ্রেমের পরীক্ষা করার অবসর পাই নাই; কিন্তু, তাহা দেখিলে, বেদীস্থ আচার্য্য, যজ্ঞাহুতি-হস্ত-হোতা এবং এজলাসস্থ হাকিম, তিনের কেহই হাস্য-সম্বরণ করিতে সমর্থ হন না, ইহা বলিতে পারি। একদিন আমাদের এই গীতাকারও ঐ দর্শনীয় দৃশ্য দেখিয়া হাস্য-তরঙ্গহিল্লোলে হত-গাম্ভীর্য্য হইয়াছিলেন। পক্ষী-তত্ত্বাধ্যায়ী দারবিন-দৌহিত্র এই পেচক ব্যাপারে বিবর্ত্তবাদের যে স্তরই আবিষ্কার করুন,আমাদের গ্রন্থকার উহাতে সৃষ্টিকর্ত্তার কৌতুকপ্রিয়তা আস্বাদ করিয়াছিলেন।

উপরোক্ত দুই ঘটনায়, শিশির বাবুর মনের উপর মোটের উপর ফল হইয়াছিল এই যে, তিনি হাড়ে হাড়ে মজ্জায় মজ্জায়,বুঝিয়াছিলেন ও বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে পরমেশ্বর পরম সুন্দর ও সৌন্দর্য্য-প্রিয় পরম রসিক ও হাস্য কৌতুকপ্রবণ। নির্ভয়ে তাঁহার নিকট যাওয়া যাইতে পারে; তজ্জন্য সবিশেষ জ্ঞান গাম্ভীর্য্যের ও উৎকট সন্ন্যাস-সাধনার প্রয়োজন হয় না। আন্তরিক প্রীতি লইয়া সরল প্রাণে একটু চেষ্টা করিলেই তাঁহাকে ধরা যাইতে পারে।

ইহা অতি সরল বিশ্বাস, সন্দেহ নাই; কিন্তু ধর্ম্ম বিশ্বাস মাত্রই সরল,—অন্ততঃ সরল হওয়া উচিত ও আবশ্যক,আমার বোধ হয়। যাহা হউক, ঐ বিশ্বাসের উপরেই প্রধানতঃ এই গ্রন্থের আপাদ-মস্তক গ্রথিত। এবং ঐ বিশ্বাস ভিত্তিভূমি করিয়া ও প্রত্যক্ষ জড় জগতের ঘটনাবলীকে সাক্ষ্য মান্য করিয়া, সৃষ্টিতত্ত্ব, সংসার-তত্ত্ব, পরলোক-তত্ত্ব ও সাধন-তত্ত্ব প্রভৃতি এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। আলোচনা এত সাদা কথায় ও সরল গাথায় করা হইয়াছে যে, তাহা সরবতবৎ সুখ-সেব্য ও শীতল।

ইদানীং আমাদের সহযোগী সাহিত্যে আখ্যান-কাব্যের অত্যন্তাভাব এবং খণ্ড কাব্যের অতি প্রাদুর্ভাব। শিশির বাবুর এই গ্রন্থ গীতি কবিতাকারে লিখিত আখ্যান-কাব্য। কালাচাঁদ-গীতা একটী সুসংবদ্ধ স্বপ্ন-উপাখ্যান। উপাখ্যানে কল্পনা নৈপুণ্য-কবিত্ব-সৌন্দর্য্য ও সংগঠন কৌশল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

উপাখ্যানের আরম্ভ কোমল, করুণ,—হৃদয়স্পর্শী। এক তরুণ যুবক গৃহ সংসার ত্যাগ করিয়া গহন-অরণ্যে তপস্যা নিরত। প্রণয়িনী পত্নী,নবজাত পুত্র,--যুবকের সংসার বড় সুখেরই সংসার ছিল। তথাচ তাহার স্নেহ-বন্ধন ছেদন করিয়া যুবক অরণ্যবাসী, অনসনাদি দ্বারা অতি কৃচ্ছ্র-সাধ্য তপ-ব্রতে ব্রতী। পতি-প্রাণা পত্নী পতির অন্বেষণে অরণ্যে উপস্থিত; যোগাসনোপবিষ্ট সন্ন্যাসী স্বামীর নিকটে শিশু ক্রোড়ে করিয়া দণ্ডায়মানা, গ্রন্থের আরম্ভেই এই করুণ দৃশ্য পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত। লিপি-চিত্রের সাহায্যার্থে এই দৃশ্যের একটি তুলিকালেখ্যও পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে। উভয় চিত্রই সুন্দর ফুটিয়াছে।

যুবতী পত্নী, যুবক পতিকে, গৃহে লইয়া যাইবার জন্য—পুনঃ গৃহবাসী করিবার জন্য-প্রাণপণ যত্ন ও চেষ্টা করিতেছেন; যুবক তাহাতে সম্পূর্ণ অসম্মত;—

"গৃহে যাহ তুমি আমি না যাইব"

পত্নী শিশু সন্তানটিকে স্বামী-সম্মুখে ধরিয়া প্রীতি ভরে আদরে ও কাতরে বলিতেছেন;—

"এই দেখ শিশু আনিয়াছি কোলে
" চাহিছে তোমারে শুন কিবা বলে।"

মাতৃ ক্রোড়স্থ এক বৎসর বয়স্ক বালক তখনি অমিয় পূর্ণ আধ স্বরে "বাআ" বলিয়া ডাকিয়া স্বর্গীয় সুধা বিন্দুবৎ সুমধুর শৈশব হাসিটী ফুটাইল। মায়ার এ মোহন আকর্ষণের কল ঐন্দ্রজালিক। সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসীর শুষ্ক হৃদয় তখন স্নেহ-দ্রবীভূত। সন্ন্যাসী চমকিত হইয়া চিত্রপুত্তলীবৎ হস্ত প্রসারণ করিলেন, অজ্ঞাত আগ্রহে পুত্র ক্রোড়ে লইযাবার বার তাহার মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন। কিন্তু এ ভাব অধিকক্ষণ রহিল না, অবিলম্বেই আত্মস্থ হইয়া যুবক যুবতীকে বলিলেন "কেন তুমি এ মায়াজাল বিস্তার করিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিতে আসিয়াছ, আমি যদি কখনও তোমার কিছু প্রিয়কার্য্য করিয়া থাকি, তুমি আজ তাহা স্মরণ করিয়া এ নিষ্ঠুরতা হইতে নিবৃত্ত হও।"

এ চিত্রে স্বামী স্ত্রীর করুণ কথোপকথন স্ত্রীর স্বামী সেবা ও তদ্দ্বারা প্রীতি তত্ত্বের আভাস উপাদেয়। বর্ণনা অত্যন্ত সরল, শিল্প-কৌশলের লেশ মাত্র নাই। কেবল স্বভাবিকতার সৌন্দর্য্যেই ইহা সুন্দর।

পতিপ্রাণা পত্নী পতি-হৃদয়ের গতি অনুভবে সমর্থা হইয়া, প্রকৃত প্রেমের—প্রেমের পরাকাষ্ঠারই পরিচয় দিলেন, পতির ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রতিবন্ধক হইলেন না। পতির আদেশানুসারে গৃহে প্রত্যাগমনে প্রস্তুত হইলেন।

"হেন কালে শিশু "বাআ বাআ" বলে।
ঢাকিল শিশুর বদন অঞ্চলে॥"
"চুপকর বাপ বিরক্ত ক'রনা।
"ধ্যান-ভঙ্গ হবে ও বলে ডেক না॥
গলায় বসন প্রণাম করিল।
শিশু কোলে করি আশ্রমে আইল॥"

সন্ন্যাসী ধ্যান নিমগ্ন—যুগপৎ স্বপ্ন-নিমগ্ন; স্বপ্ন সরল, সুমধুর, সুদীর্ঘ। এই স্বপ্ন কাহিনী কবির স্বকপোল-কল্পিত, ইহাতে বৈষ্ণব ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্বোপদেশের সহিত কাব্যরস ও কাব্যামোদ আছে। ইহাকে বৈষ্ণব সাধন প্রণালীর একটি রূপক বলিলেও বলা যাইতে পারে; কিন্তু দৃষ্টতঃ ইহাকে রূপক বলিয়া বোধ হইবে না, এবং রূপক স্বরূপ ব্যাখ্যা না করিলেও চলে। সুদূর জ্ঞাতিত্বে এ উপাখ্যান কিয়ৎ পরিমাণে "পিলগ্রিমস প্রগ্রেস" ও ঈষন্মাত্রায় "প্রবোধ-চন্দ্রোদয়ের" শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে।

সাধু স্বপ্ন দেখিলেন "পঞ্চসখী সভা।" সখী সভার সংগঠন এই রূপ;—

"ভুবন মোহিনী রূপরস খনি
শৈশব যৌবন মেলা।
মাধবী তলায় কুসুম শয্যায়
অচেতন নববালা॥
বসিয়া নিকটে করিছে বীজন
রূপবতী একজন।
বালার বদনে তরঙ্গ খেলিছে
করিছে তা নিরীক্ষণ॥
আর তিন নারী ক্রমে তথি এল
কোথা হতে নাহি জানি।
দেখিছে চাহিয়া বসি চারিভিতে
মুখে কারু নাহি বাণী॥
রমণীর মেলা দৈবে মিলিয়াছে
কেহ কারে নাহি চিনে।
অচেতন বালা দেখে সবে চাহি
সেবা করে এক মনে॥"

স্ব স্ব প্রাণেশ্বরের বিচ্ছেদে, পরস্পরে অপরিচিতা পঞ্চ সখী পাঁচ দিক্ হইতে এক স্থানে আসিয়া, ঘটনাক্রমে মিলিত হইয়াছেন। এবং একে একে আপন আপন জীবন কাহিনী বিবৃত করিতেছেন। উপাখ্যানের এ গঠনটুকু কিয়ৎ পরিমাণে পারস্য "চাহার দরবেসের" মত বলা যাইতে পারে।

এই "পঞ্চসখী" বৈষ্ণব সাধন প্রণালীর

রস পঙ্কের সাধিকা। প্রথমাসখী,—"রস-রঙ্গিনী" দ্বিতীয়া,—"কাঙ্গালিনী" তৃতীয়া,—"কুলকামিনী" চতুর্থা,—"প্রেম-তরঙ্গিনী" পঞ্চমা—"সজল নয়না"। ইহাঁদের স্ব স্ব জীবন কাহিনীর বিবৃতি তাঁহাদের সাধন প্রণালীরই প্রতিকৃতি। "সাধন প্রণালী" শুনিয়াই কেহ শঙ্কায় শিহরিবেন না। এই সাধন প্রণালীর প্রতিকৃতিতে কল্পনার এমনি সুকুমার ক্রীড়া ও কাব্য রসের এমনি মধুর তরঙ্গ যে, উহা নবন্যাসের মত চিত্তাকর্ষণে সমর্থ। শিশির বাবু যে কিরূপ রসিক লোক, তাহা এ গ্রন্থ পাঠেও বিলক্ষণ বুঝা যায়। তা, এত গুলি, বড় কম নয় পাঁচ পাঁচটি যুবতী, রূপ রসবতী নায়িকার মধ্যস্থলে যখন আরও একটী অনুপমা মহানায়িকা কেন্দ্রীভূতা, আর যখন সর্ব্ববিধ নায়কের অধিনায়ক স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ইহার মহানায়ক, তখন তুচ্ছ নবন্যাসের তরল রসের সহিত ইহার প্রগাঢ় নির্ম্মল রসের তুলনা করাও তত সঙ্গত নহে।

আমি, সখীসভার কথা কহিতেছিলাম। সখীদের মধ্যে "সুস্নিগ্ধ" চোখ চাওয়াচাহি হইয়া ক্রমে সখ্যভাব উপস্থিত হইল। অচেতন বালা" চেতন হইলে—

"পুছে এক সখি" "কেন অচেতন
কিবা নাম কোথা ঘর।
কাহার হৃদয় শীতল করহ
কোথা তব প্রাণেশ্বর?
এ ঘোর বিপিনে আইলে কেমনে
কেন হলে অচেতন
বদন কমল প্রফুল্ল নেহারি
পেয়েছ কি প্রাণধন?"

কিন্তু, এ সখীটি সাতিশয় লজ্জা-শীলা। ইনি প্রেমতরঙ্গিনী, প্রেমাবেশে ও হৃদয়োচ্ছ্বাসে অহরহই অবসন্ন। অতএব তজ্জন্যই বোধ হয়, এত বড় গুরুতর-প্রশ্নটার কোন প্রীতিকর উত্তর দিয়া উঠিতে পারিলেন না, দিতে সাহসীই হইলেন না। প্রশ্নের উত্তরে "ধীরে ধীরে" পুনঃ প্রশ্ন করিলেন।

"তোরা কেগো ধনি ভুবন মোহিনী
পরিচয় দে গো মোরে।"

বড়ই মুস্কিল উপস্থিত হইল। কে আগে আপন কাহিনী কহিবে! সকলেই ত প্রায় সমাবস্থাপন্না! রসরঙ্গিনী সর্ব্বাগ্রে আপন কথা আরম্ভ করিলেন। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, তিনি কিঞ্চিৎ অধিক শক্তিশালিনী বটে।

রসরঙ্গিনী সৌন্দর্য্যাভিলাষিনী, রূপ-বিমুগ্ধা শান্তরস; ফুলটী ফুটিয়া, পাপড়ীটী উঠিয়া, বঙটী হাসিয়া তাহার চিত্ত মন আকর্ষণ করে; সর্ব্বত্রই প্রকৃতির প্রফুল্ল প্রশান্ত সৌন্দর্য্যে তিনি মোহিত হন এবং সে সৌন্দর্য্যের শিল্পকরকে খুঁজেন। খুঁজিতে খুঁজিতে একদিন সেই শিল্পীকে সহজেই পুষ্পবাটিকায় উপবিষ্ট ধৃত করিলেন এবং শিল্পীর সহিত শোভামুগ্ধার এক সুস্নিগ্ধ শান্ত সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইল। তাৎপর্য্য—শান্তরস জড় জগতের শান্তি সৌন্দর্য্যে প্রথমতঃ আকৃষ্ট হইয়া শেষে জগতপতির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সংবদ্ধ হয়। রঙ্গিনীর কাহিনীতে সুখশোক, যোগ-বিয়োগ, ইহকাল, পরকাল, কামনা ও সাধনা প্রভৃতি মানব জীবনের ও মানবধর্ম্মের বহুজটিল সমস্যায় সামঞ্জস্যের চেষ্টা আছে, তাহা শিক্ষা-সান্ত্বনা-প্রদ। কিন্তু তাহার কিছুই এস্থলে স্পর্শ করিবার স্থান ও সময় আমার নাই।

সৌন্দর্য্য-শোভাময় বিপিনে রসরঙ্গিনীর নিকট "রসিক-শেখর" আসেন, আলাপ করেন, উপদেশ দেন; আর রঙ্গিনী তথায় থাকিয়া,—

"প্রতি পদে দেখি তার কারিগিরি।
সুখেতে বিভোর ঘুরে ঘুরে মরি।"

দ্বিতীয়া সখী;—কাঙ্গালিনী, দাস্য রসের সাধিকা,

"তাঁর যোগ্য হব তাঁর কাছে রব
বসিব পালঙ্কতলে।
দুটী রাঙ্গা পদ হৃদয়ে ধরিয়া
দুঃখভাব দিব ফেলে॥"

কিন্তু, কাঙ্গালিনী আপনার কুরূপের জন্য কুণ্ঠিতা। এ কুরূপের অর্থ,—হৃদয় মনের মলিনতা।

"সুবেশ করিতে আনী আগতে
বসিনু গৌরব করি।
আরসী চাহিতে ভয় হল চিতে
আপন বদন হেরি॥
এত কুরূপিনী কভু নাহি জানি
হৃদয় শুকায়ে গেল।
অথবা দর্পণ মলিন হয়েছে
তাহে মুখ হেন হল॥"

না, দর্পণ মলিন হয় নাই। কাঙ্গালিনী যতই যত্নে দর্পণ মার্জ্জিত করেন, কুরূপ ততই অধিকতর কদর্য্য হইয়া উঠে! বণ বসন্তাদি আহা কতই ক্ষত। ষড়রিপুর সহস্র ক্ষত চিহ্ন অঙ্গে, বদনে বিভাসিত। এরূপ কুরূপ লইয়া কিরূপে কাঙ্গালিনী সেই পরম সুন্দরের নিকট যাইবেন! কাঙ্গালিনী কত ব্রত নিয়ম উপবাস কঠোরতা করিলেন; কিন্তু কিছুতেই মনের মালিন্যরূপ কুৎসিৎ মূর্ত্তি ঘুচিল না।

"হলুদ মাখিয়া রোদে বসে রই।
তাহাতে বরণ আর মন্দ হয়।
বেশম মাখিয়া পণ্ডশ্রম হয়।
মলিন বরণ কিছুতে না যায়॥
বাঁকা অঙ্গ ঋজু করি জোর করি।
পূর্ব্ব মত হয় যেই দেই ছাড়ি।"

তাহার পর ভক্তি-রূপিনী যমুনার নির্ম্মল জলে নিয়মিত অঙ্গ মার্জ্জনা করিয়া কুরূপা কাঙ্গালিনী সুরূপা সুন্দরী হইলেন। তখন 'সুন্দর' স্বয়ং তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। সুন্দরী সেবায় নিরত।

"ফুল শয্যা যতনে বিছাই।
নিদ্রা যান সুখে হরি, পদ সেবি মুখ হেরি,
হৃদে রাখি অবশেষে ঘুমাই।
পঁহু সিংহাসনে বসে রাঙ্গা পা মুছাই কেশে,
সেই ধূলা অঙ্গের চন্দন।"

শান্ত-জ্ঞানী ভক্তির বড় পক্ষপাতী নহেন। অতএব কাঙ্গালিনীর এই স্বামী সেবা কাহিনী রস-রঙ্গিনীর কাণে কিছু কঠিন বাজিল। সৌন্দর্য্য-সোহাগ-বিলাসিনী রস-রঙ্গিনী, বোধ হয়, এক মাত্রা এখনকার স্বাধীনতা সত্বাধিকারবাদিনী New woman, অতএব কাঙ্গালিনীর দারুণ দাসীত্বের সংবাদে তিনি শিহরিয়া বলিলেন,—"ছিছি সে কেমন লো! তোর কথা শুনে যে হেসে মরি! এক দিকে এমনতর "ঠাকুরাণী" আর এক দিকে এমনতর দাসীত্বের কথা শুনে যে বাঁচিনে! ছিছি কপালখানা! কর্ত্তৃত্ব প্রিয় আর দাসীত্ব দাতা

"এমন প্রভুর মুখেতে আগুন
যাবে এত কর ভয়।"

"তা, ভাই, কি করে তুই তোর হাবুটীর এতটা হাকিমি-গিরি হজম করিস একবার বল না? উত্তরে কাঙ্গালিনী কহিতেছেন—

"ও তার বুক হতে শ্রীচরণ মধু।
সেত বুক দিয়াছিল, আমি পদ মাগি নিনু,
তাহাতে দুঃখিত আমার বঁধু॥
ও তার পদতলে করি আমি বাস।
বুকে যদি সখি যাই, পড়ি পড়ি হয় ভয়,
চরণে নাহিক সেই ত্রাস॥
ও তার হিয়া মাঝে প্রেমাগুন জ্বলে।
মোর বুকে প্রেম নাই বন্ধুর প্রেমে দুঃখ পাই
তাই যাই স্নিগ্ধ পদতলে॥"

পুনশ্চ, কাঙ্গালিনী কহিতেছেন;—

কেশে পদ মুছাইতে যাই।
পঁহু মোর ধরে হাতে আমি বলি এই কেশ
কিবা অপরাধী তুয়া পায়॥
একবার মুছায়ে দেখ সখি।

তুমি ত মুছাও নি সখি, আমি মুছাইয়া থাকি
দেখ দেখি কেবা বড় সুখী।"

উপসংহারে

"সবে যেতে চায় তার বুকে।
আমি যদি বুকে যাই পদ সেবা নাহি হয়,
পদ সেবা ভার দিব কা'কে॥"

বিরহ ব্যতীত প্রেমে তরঙ্গ উঠে না; প্রেম প্রখর, প্রগাঢ় ও পবিত্র হয় না। পরন্তু, প্রেম ব্যতীত পরমেশ্বরের সহিত সহবাস সুখও কখন সুখদ নয়। বৈষ্ণব ধর্ম্ম-মতানুসারে দাসত্বব্রতী ভক্তের নিকট ভগবান নিয়ত উপস্থিত থাকেন। কিন্তু, বিরহ-অবিচ্ছিন্ন মধুর প্রেমের অভাবে, সে উপস্থিতির উপভোগ্যতাও ক্রমে কমিয়া যায়। প্রেমের মধুর রস-বিহীন দাস্য রস মাত্র উপজীব্য ভক্তের নিকট ভগবান ক্রমশঃ অনুপ ভোগ্য inertia হইতে পারেন। এই কাঙ্গালিনীর ভাগ্যে তাহাই শেষে ঘটিয়াছিল। তজ্জন্য তিনি প্রেমের পরিবর্দ্ধনার্থে বিরহ-বর লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন অর্থাৎ বিধাতা কাঙ্গালিনীর কল্যাণার্থেই সেই বরের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাই এখন কাঙ্গালিনী—

"বুকে যারে আমি রাখি কোথা পলাইল সখি
খুঁজি বেড়াই বিপিন মাঝারে।"

কিন্তু, ভাবুক ভক্ত কি সাধক ভক্তের একথা সহজে শুনিবার পাত্র! আর, বিরহ রস-বিলাসী ভক্তে ভগবানের বিভূতি কি কখনও কম হইতে পারে! অতএব উপরোক্ত উক্তির উত্তরে—

"বলে বলরাম দাসে ঝাঁপিয়া রাখিয়া বাসে
কেন ফাঁকি দিতেছ সখীরে॥"

তৃতীয়া সখী, কুলকামিনী। ইহাঁর ভক্তি ও প্রেম সংমিশ্রিত সাধন। কুলকামিনীর সংগঠনে কবি, কল্পনা নৈপুণ্যের সবিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। স্বামী স্ত্রীর প্রণয়ের আকারে ভগবানের সহিত সাধকের শনৈ শনৈ সংযোগ, এই কুলকামিনীর কাহিনীতে অতি সুন্দরভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। কুলকামিনী কহিতেছেন—

শৈশবে বিবাহ নাহি চিনি নাথ
কাণে শুনি, নাহি জানি।
যৌবন অঙ্কুরে মনে হ'ল তারে
কিসে পাব অনুমানি॥
পতি পরদেশ না জানি উদ্দেশ,
আমি ভাসি নিরাশ্রয়।
ভরণ পোষণ করে কোনজন
কিসে ধর্ম্ম রক্ষা হয়॥"

কুলবালা, "খেলায় ধূলায়" কখন এ কথা ভুলে যান; কখন আবার খেলা ধূলা ছাড়িয়া বিরলে বসিয়া ভাবেন। লজ্জারূপিনী কুল-কামিনী লজ্জায় পতি-কথা কাহাকে সুধাইতেও পারেন না। ক্রমে লজ্জা পরিহার করিয়া নিরুদ্দেশ পতি সংবাদ সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন। নানা জনে নানা কথা বলিল। কেহ বলিল, মন্ত্রৌষধি কর; ছিটা ফোঁটা তন্ত্র মন্ত্র হোম যজ্ঞ কর। কেহ বলিল,হরিনাম জপ কর। কুলকামিনী সবই করিলেন কিছুতে কিছু হইল না। পতি আসিলেন না। সংবাদও আসিল না।

"পুনঃ ভাবি পতি নহে সর্প জাতি
মন্ত্রে বশ হবে কেনে?

আর কেবল নাম জপ করিয়াই বা কি হইবে! তাহাতে কেবল কণ্ঠ শুকাইয়া যায়; নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার কত বাকী আছে, তাহারই দিকে মন ধায়। পরন্তু, সংসারে চিন্তান্তরে মগ্ন থাকিয়া

"তার নাম লই আন কথা কই;
সতীত্বে কলঙ্ক হয়॥"

তারপর কুলকামিনী আর কিছু না করে কেবল পতি চিন্তা আরম্ভ করিলেন। পতির

উদ্দেশে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। "তুমি কেমন, তুমি কোথায় আছ, তুমি আছ কি হায় তুমি নাই" ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন। কিন্তু,

"না পাই উত্তর তবু সুখে ভোর
পতি চিন্তা বড় মধু।"

এক এক দিন "সুবেশ করিয়া, সিন্দুর পরিয়া," পথে যাইয়া বসিয়া থাকেন; যদি পতি আসেন। পতি আসেন না, অভাগিনী কাঁদিয়া প্রত্যাগমন করেন। তারপর এক দিন

"আঁচল পাতিয়া ভূমেতে শুইয়া
কান্দি আমি শূন্য ঘরে।"

এমন সময়ে, পতি-মিলনের ন্যায় মুহূর্ত্তের জন্য, স্বপ্নে ভগবানের সহিত সঙ্গ হইল। সে স্বপ্ন "যবে সত্য ভাবি আনন্দ উথলে, মিথ্যাভাবি যদি ভাসি আঁখি জলে।" তারপর

"করিলা স্মরণ বিচিত্র বসন
সিন্দুরের কৌটা দিয়া।
বিবিধ গহনা মুকতার মালা,
দিল মোরে পাঠাইয়া॥
কলম কাগজ পড়িবার পুঁথি
পাঠাযাছে সেই সনে।
লিখিতে পড়িতে হইবে আমায়
ভাবিলাম মনে মনে।"

তাহার পর কুলকামিনীর কুলিন স্বামীর নিকট হইতে এক পত্র আসিল। কিন্তু সন্দেহ ঘুচে না। ইহা কাহার প্রেরিত বস্ত্রালঙ্কার, কাহার প্রেরিত পত্র, কেহ ত প্রবঞ্চনা করে নাই? স্বামীর পত্র থানিতে লিখিত:—

"যাইতে না পারি এই কয় ছত্র।
পাঠানু তোমারে উপদেশ পত্র॥
চাহ অলঙ্কার পাঠাব তোমারে।
যদি চাহ মোরে যাইব সত্বরে॥
তেমন হইব যেমন হইবে।
যেরূপ বাঞ্ছহ সেরূপে পাইবে॥"

সুতরাং শরীর মন সুন্দর করিতে লাগিলেন। কিন্তু, কুল কামিনীর সেই প্রবাসী স্বামীর রূপখানি কেমন? কখন ত তিনি তাঁকে দেখেন নাই। আর কেমনতর রূপ লাবণ্যই বা কুলকামিনী কামনা করেন? কাজেই দিবানিশি তাঁহার ছবি "মুছি আর আঁকি, আঁকি আর মুছি" এইরূপ চলিতে লাগিল।

"যেন সেই ছবি জীবন পাইয়া
সপ্রেম নয়নে চায়।"

প্রিয়তমের আগমন-আশায় কত কত বার উদ্যোগ হইল। কত বিলাস-বস্তু, কত বাসর সজ্জা হায় বৃথা হইল! কত ভাল ভাল গাঁথা মালা শুকাইয়া গেল। তাহার পরে,—বহুদিনের বিরহ ব্যথার পরে সেই কঠিন-হৃদয় আর আমি বিবেচনা করি, বহুপত্নীকও বটে,— কুলিনটী আসিলেন,— বিদেশীর বেশে। কিন্তু, কামিনী কখনও স্বামী দেখেন নাই। বড়ই বিভ্রাট উপস্থিত হইল। বিদেশী বলিলেন "আমি তোমার স্বামী নই। তাঁহার প্রেরিত পরিচারক; তোমার রক্ষণাবেক্ষণ ও আদেশ পালন করিতে আসিয়াছি। বল, কি করিতে হইবে?" এ আরও যে বিপদ! কামিনী কি করিবেন! বিদেশী পরপুরুষের পানে তাকান্ না; তাঁহার পরিচালনায় চলেন না। কিন্তু, বিদেশী ব্যক্তি সর্ব্বদাই ছায়াবৎ সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেন, কামিনীর কাণের কাছে ঘুন ঘুন করেন হায়! কুলবালার এ কি জ্বালা! বিদেশী ব্যক্তিটী স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিবার জন্য কত স্থানে—কত দেব দেবীর নিকট কামিনীকে লইয়া গেলেন। কিন্তু, কাহাকেই কামিনীর প্রাণ চাহিল না; কাহাকেই তিনি প্রাণনাথ স্বামী রূপে গ্রহণ করিলেন না। অতঃপর প্রকৃত প্রাণেশ্বরের সহিত সম্মিলন হইল।

তখন অতীতের জন্য কামিনীর আক্ষেপ উপস্থিত হইল ;—

"আছে কিনা আছে সমুদয় মিছে
রহিব কি হব লয়।
ইহাই ভাবিয়া তোমা না ভজিয়া
জীবন করিনু ক্ষয় ॥"

উত্তরে কামিনীর কর্ত্তাটী কহিতেছেন ;—

———"বলি প্রিয়া শুন ॥
সন্দেহ কেবল পিরীতি বন্ধন
সন্দেহ জীবের বহুমূল্য ধন
বিয়োগ সন্দেহ যদি না রহিত।
তবে কি সংসার সরস হইত ॥"

চতুর্থী সখী প্রেম-তরঙ্গিনী, কেবল মাত্র অবিমিশ্র প্রেম দ্বারা পরমেশ্বরের পরিচারিকা। ইনিই "মাধবীতলায়" অচেতন অবস্থায় ছিলেন। পরন্তু, পঞ্চমা—সজল-নয়না প্রাণেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে সম্যক্‌রূপে সংপ্রাপ্তা রমণী। ইহারাও স্ব স্ব সমুন্নত সাধন কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। কিন্তু, কর্কশ হস্তে, আমি তাহার বিমল সৌন্দর্য্য-বিভূতি বিলোড়িত করিব না। রুচি হয়, পাঠক নিজেই তাহার অনুসন্ধান করিবেন।

পরন্তু, পঞ্চ-সখী-সভায় সন্ন্যাসীর উপস্থিতি। এই চিত্রে শিশির বাবু পরিহাস রসিকতার সহিত পরমার্থ তত্ত্বের পরিপাটী মিশ্রণ করিয়াছেন। সাধুর সহিত সখীদের কৃষ্ণ কথার একটু আলোচনা হইতেছে। সাধু বলিতেছেন ;—

"উপবাস করি, শরীর শুকাও,
তবে কৃষ্ণ-কৃপা পাবে।
কৃষ্ণের করুণা, ক্রমে বাড়ি যাবে,
যত দেহ শীর্ণ হবে ॥"

সাধু-মুখে এ সংবাদ শুনিয়া সুন্দরীরা ত অবাক্, বিস্মিত হইয়া বলিতেছেন।

"মোরা দুঃখ পাব, কৃষ্ণ সুখী হবে,
এত কভু হ'তে নারে।
দুঃখের কাহিনী, শুনিলেই তিনি,
কাঁদি হন আত্মহারা।
দুঃখ মোরা নিব, তারে কাঁদাইব,
এতজন কেমন ধারা ॥"

সাধু হাসিয়া বলিতেছেন "বাছা সকল! তোমরা বালিকা, সে বৃহৎ ব্যাপারের কি বুঝিবে? তা, ঐ চাঁচর চুলের রাশি রাখ্‌লে ত চোল্‌বে না,—যা'র উপর তোমাদের অত যত্ন—

কেশের মমতা ঘুচাইতে হবে
মুড়াইতে হবে মাথা।
তুলসী তলাতে মস্তক কুটিলে
তুষ্ট হবে কৃষ্ণ পিতা ॥"

সৌন্দর্য্য-সেবী রসরঙ্গিণী, এ কথায়, সর্ব্বাগ্রেই শিহরিয়া বলিলেন। "না ঠাকুর, সেটী হতে পারছিল না,—

"কেশ ঘুচাইব, বেণী না বাঁধিব,
কোথা গুঁজি থোব চাঁপা।
মালতীর মালা, চিকণ গাঁথিয়া,
কেমনে বেড়িব খোঁপা ॥
সে ভঙ্গিম বেণী, রসিক শেখর
দেখি যত সুখ পাবে।
তার মন জানি, রসে যত সুখ,
উপবাসে তা না হবে ॥"

কাঙ্গালিনী কহিলেন।

"রাঙ্গাপদ ধুই, নয়নের জলে,
মুছাইয়া থাকি কেশে।
কেশ মুড়াইব, বন্ধু পদ ধুয়ে,
বল মুছাইব কিসে?"

অতপর রস-শক্তি-রূপিনী রাধিকার উৎপত্তি, কৃষ্ণের সহিত তাঁহার সম্মিলন, বৃন্দাবন লীলা রহস্য, সাধুর সাধনা-সিদ্ধি প্রভৃতি যে সকল নিগূঢ় তত্ত্ব ও নিগূঢ় রস-মাধুর্য্য এই গ্রন্থে আছে, তাহা আমি স্পর্শ মাত্র করিলাম না। তাহা কেবল সম্ভোগেরই বিষয়,—সমালোচনার নহে।

শ্রীঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।

জীবন।

ও কার বিরাট ছায়া
আবরিল বিশ্বকায়া ?
অসাড় বিশ্বের স্পন্দ শুনা নাহি যায় ;
মহা নীরবতা ল'য়ে,
উঠিল সজীব হ'য়ে,
কালান্তের অন্ধকার নিশীথ ধরায়।
কে আছে না আছে ভবে ?
কে ছিল হেথায় কবে ?
এ যে শুধু নীরবতা, শুধু অন্ধকার।
বিশ্ব যেন বিশ্ব নয়,
শ্মশান সমাধিময়,
সচেতনে অচেতন, সবে শবাকার।
এ মহা-ঘুমের দেশে
কে এসে ধরিল কেশে
জাগিয়া চাহিয়া ভাবি—এ কি সে ভুবন ?
এই কি জীবের বাস ?
জীব আঁধারের দাস ?
এমনি কি ঘুমাইতে মানব জীবন ?
জাগিয়া ঘুমায় কেহ,
নড়ে কি না নড়ে দেহ ;
জাগিয়া স্বপন দেখে, জানে না কি করে,
অলস ঘুমের ঘোরে,
আছে যেন বেঁচে ম'রে ;
জীবন কি এরি তরে ? জীব এরি তরে ?

২

খেয়ে ঘুমাইয়ে মরে,
সে.ত পশুতেও-করে ;
পশুতে মানবে তবে প্রভেদ কি নাই ?
জীবনে জীবন নাই,
ঘুম ঘোর সর্ব্বদাই ;
মানব জীবন তাই ? কে বলিবে তাই ?
এমনি নিয়ত কত,
নদীর প্রবাহ মত,
জীবন প্রবাহ কত উঠিয়া মিলায়।
কেই বা গণনা করে ?
কে তাদের নাম ধরে ?
খুঁজে দেখ ইতিহাস, চিহ্ন নাহি তায় ?
এমন জীবন যার
কিবা আশা আছে তার,
কেন সে বাড়ায় মিছে আর ভব-ভার ?
স'রে যাক, স'রে যাক,
তার স্থান শূন্য থাক ;
যোগ্যতর কতজন পশ্চাতে তাহার।

৩

মানব জীবন যার
ইচ্ছা-জ্ঞান ভাবে তার
কেশ হতে নখাবধি পূর্ণ নিরবধি ;
শত ঝড় বয়ে যাক,
সম্মুখে পর্ব্বত থাক,
পড়ুক সে মরুভূমে, শুকাবে সে নদী।
মানব জীবন যার
চরিত্রে জীবনে তার
ঘুচে ভব অন্ধকার মৃতে প্রাণ পায় ;
তার মনোভাব যত
আকারেতে পরিণত ;
কাল-স্রোতে কীর্ত্তি-সেতু রচিয়া সে যায়।
সে কীর্ত্তিতে কীর্ত্তিমান
থাকে চির মূর্ত্তিমান ;
এ ধরণী গরবিনী তারে বক্ষে লয়ে ;
তাহারি গুণের কথা
ইতিহাসে যথা তথা ;
বংশ পরম্পরা ধন্য তার কথা ক'য়ে।

সম্মুখে ঐ তরুবর
কেন এত মনোহর ?
কিবা ইতিহাস তার ? কেন সে এমন ?
ক্ষুদ্র এক বীজ-কণা
প্রসারি অযুত ফণা
দিগন্ত ছাইতে চায়, পরশে গগন।
আলোক উত্তাপ লয়ে,
কর্ষণ বর্ষণ সয়ে,
যুগ-যুগান্তর হতে ধরণী প্রস্তুত ;
প'ড়ে বীজ ভূমিতলে,
ফেটে গেল কুতূহলে,
দেখিতে দেখিতে তার অঙ্কুর প্রসূত।
কি এক দুর্জ্জয় টানে,
কে তারে টানিয়া আনে,
আর কি সে বাধা মানে ? আর স্থির রয় ?
দুই মুখ উচ্চে নীচে
ছুটে যায় আগে পিছে,
এ দেয়, ও পিয়ে রস পরিপুষ্ট হয়।
দিন নাই, রাত নাই,
এক কথা—ছুটে যাই ;
কেন সে এতই ছুটে আকাশের পানে ?
সে দিন সে ক্ষুদ্রতম, .
আজ সে অরণ্য সম,
আজ সে জুড়ায় প্রাণ ফল ছায়া দানে।
এমনি এমনি যেন,
মানব জীবন হেন ;
আরম্ভে সে কত ক্ষুদ্র ? কিবা পরিণাম !
সেদিন সূতিকা-ঘরে,
আজ সে মহাসমরে !
আশা আকাঙ্খার তার কোথায় বিরাম ?
সে জীব আসিবে ব'লে,
রাখিয়া গেলেন চ'লে,
যত দেশে যত সাধু জ্ঞানী মহাজন,
জীবন-আলোক কত,
আলোক-স্তম্ভের মত,
চরিত্র উত্তাপ কত, কত সত্য-ধন।
সে আলোকে, সে উত্তাপে,
সে মহাশক্তির চাপে,
জীব বীজ ফাটে যবে, জীবত্ব সফল ;
ফাটিলে দ্বিজত্ব তার,
দ্বিজত্বে, বীজত্ব সার,
না ফাটিলে প'চে যায়, বীজত্ব বিফল।
অঙ্কুর উদ্গত যবে,
আর কি সে ঘুমে রবে ?
পান করে সত্য রস পায় বিশ্বে যত;
সেই রসে পুষ্ট হ'য়ে,
সে সব আদর্শ ল'য়ে,
অনন্ত উন্নতি তরে আকুল সে কত।
যতই বাড়িয়া যায়,
ততই বাড়িতে চায় ;
আপনাকে আপনাতে পারে না রাখিতে
আত্ম বিকশিত হ'য়ে,
জীবন চরিত্র ব'য়ে
ফুটে সে বাহির হয়, পারে না ঢাকিতে।
সে আশ্রয়-ছায়া তলে,
কত জীব দলে দলে,
আসিয়া জুড়ায় কত তাপ-তপ্ত মন।
এমন জীবন যথা,
নিশ্চয় নিশ্চয় তথা,
জীবন প্রসব করে মানব জীবন।

৬

তবে জীব ঘুম-ঘোরে
কি ভাবিছ চুপ করে ?
জীবন সৌন্দর্য্যময়, ভাবিছ কি তাই ?
মিছে কথা, ভুলে যাও,
ঘুমাবে কি ? জাগ, চাও ;
জীবন কর্ত্তব্যময়, তাকি মনে নাই ?

দায়িত্বের মহাভার
বুঝিবে কবে বা আর ?
দেখনি কি কাল-দূত ঘেরে চারি দিক ?
কি করিতে ভবে এলে ?
কি বল করিয়া গেলে ?
হিসাবের দুই দিক হয়েছে কি ঠিক ?
আপনি ও আপনার,
বুঝেছিলে, এই সার !
গণ্ডী দিয়ে বন্দী হ'লে আপনারি ঘরে !
করিবার কিছু নাই ?
ঘুমায়ে পড়িছ তাই ?
মানব জীবন পেলে শুধু এরি তরে ?
ঘুমাও ঘুমাবে কত,
শোও শুতে পার যত ;
তোমারি প্রকৃতি হবে বিদ্রোহী তোমার ;
সে দিন সুদূরে নয়,
ধীরে অগ্রসর হয় ;
কিছুতেই তার হাতে নাহিক নিস্তার,
প্রকৃতির প্রতিশোধ
কে করিবে প্রতিরোধ ?
যা তোমার প্রায়শ্চিত্ত, করিতেই হবে ;
তুমি চাও, নাহি চাও,
ভয়েই পলাতে যাও,
একগুণে শত গুণ জোর ক'রে লবে।

৭

তবে ও গণ্ডীতে আজ,
পড়ুক পড়ুক বাজ,
ভেঙ্গে যাক, মুছে যাক, সীমা রেখা তার ;
বাঁচ কিম্বা মরে যাও,
খেটে যাও, খেটে যাও,
সর্ব্বস্ব তোমার দাও চরণে ধরার।
সেই ত বেঁচেও মরে,
যে বাঁচে নিজের তরে ;
নিজেরি বিষেতে নিজে জ্ব'লে পুড়ে মরে ;
সেই ত মরেও বাঁচে
সে গড়া দেবত্ব ছাঁচে,
যে বাঁচে যে খাটে—মরে জগতের তরে।
রাখিবার তরে নয়,
জীবন হারাতে হয় ;
বিপরীত শাস্ত্র তার, কয় জন মানে ?
রাখিলে পচিয়া যায়,
হারালে ফিরিয়া পায় ;
পেতে গেলে দিতে হয়, কে না ইহা জানে ?
যে যত করিবে ব্যয়,
তার তত তোলা রয় ;
অমরত্ব তারি তরে চির-অঙ্গীকার,
যে যত করে না ব্যয়,
তার তত হয় ক্ষয়,
কৃমি-কীট-ভোজ্য সে যে, কিবা মূল্য তার ?
তবে এ জীবন নিয়ে,
কে রহিবে ঘুমাইয়ে ?
কেবা তার প্রাণ দিয়ে করিবে না কাজ ?
জয়ী হ'ক নাই হ'ক ;
কীর্ত্তি র'ক নাই র'ক ;
তবু যুঝে ম'রে যাবে, কিবা ভয় লাজ ?

শ্রীকালীনাথ ঘোষ।

ইউরোপ-ভ্রমণ। (৩)

গোথা খাল।

গোতে বোর্জ * হইতে ষ্টক্‌হল্‌ম্ † পর্য্যন্ত একটী খাল-পথ করিবার জন্য বহুকাল হইতে চেষ্টা হয়। পূর্ব্বে দুই একবার উদ্যোগও হইয়াছিল, কিন্তু অল্প আরম্ভ হইয়াই বন্ধ হয়। শেষে ইংরাজ-ইঞ্জিনিয়র টেলফোর্ড * সাহেবের সহকারিতায় স্থানীয় বিশ্বকর্ম্মা

* Goteborg স্থানীয় নাম ; ইংরাজীতে Gothenburg বলে।
† Stockholm.

* Thomas Telford.

প্লাটেন * সাহেব কর্ত্তৃক ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে আরম্ভ হইয়া ২২ বৎসরের অনবরত পরিশ্রম দ্বারা বিপুল অর্থ ব্যয়ে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে এই খাল সমাপ্ত হয়। ৭।৮টী ছোট বড় হ্রদ মধ্যে পাওয়াতেই বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল।

পালাস্ † জাহাজে আমরা নানা দেশীয় ৩০।৩৫ জন যাত্রী বেলা ১২টার সময় আরোহণ করি। কাপ্তেন সুইড জাতীয়, বড় রসিক পুরুষ; ইংরাজী ভাষা বেশ জানিতেন, এবং সিঙ্গাপুর পিনাং প্রভৃতি পূর্ব্বাঞ্চলে অনেকবার যাতায়াত করিয়াছিলেন; সুতরাং আমাদের ভাব গতিক কতকটা তাঁহার গোচর ছিল। জাহাজে আমরা দুই জন মাত্র প্রাচ্য জীব—পঞ্জাবী বুলাকিরাম ও আমি। জাহাজে উঠিবার ২ ঘণ্টা পরে মধ্যাহ্ন ভোজনের আয়োজন হইল। এইখানে প্রথম স্মোর্গাস ‡ প্রথা দেখিলাম। খানায় টেবিল সাজান হইলে, সেখানে বসিবার পূর্ব্বে, ভোক্তাগণ পার্শ্বস্থ এক টেবিলে দাঁড়াইয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করতঃ গলা ভিজাইয়া লইয়া থাকেন। এই সময়ে এক প্রকার অতি তীব্র রকমের সুরা অল্প পরিমাণে সকলেই গলাধঃকরণ করেন। বোধ হয়, ক্ষুধা উত্তেজিত করিবার উদ্দেশেই এই জলযোগ ও সুরাপান। ইহা শেষ করিয়া টেবিলে সাধারণ ভাবে সকলে ভোজনে বসেন। সুইডেন দেশের সর্ব্বত্র এই নিয়ম প্রচলিত। গটেনবর্গে টাবল-ডোটে § আহার আমাদের ভাগ্যে ঘটে নাই, তাই সেখানে উহা দেখিতে পাই নাই। ভোজনান্তে প্রাচীন বোহস * দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখিতে দেখিতে ৩½ টার সময় প্রথম কপাটে † উপস্থিত হওয়া গেল। যাঁহারা কখন এ দেশের খালে ভ্রমণ করিয়াছেন, তাহারা কপাটের ব্যবস্থা অনায়াসেই বুঝিবেন। খালের সম্মুখে উচ্চ বা নীচ সমতলের কোন নদী, হ্রদ প্রভৃতি জলাশয় উপস্থিত হইলে, কপাটের বন্দোবস্ত ভিন্ন খালের জল পরিমাণ ঠিক রাখা যায় না। কপাট পার হইয়া ২০০ হস্ত প্রশস্ত একটী প্রপাতের পার্শ্ব দিয়া বেলা ৫ টার সময় বিখ্যাত ট্রল-হাটান ‡ প্রপাতের নিকট আসা গেল। লক্ প্রবেশের পূর্ব্বে যাত্রীগণ সকলেই জাহাজ হইতে নামিলাম। হাঁটিয়া না দেখিলে এই বিখ্যাত রমণীয় স্থানের দৃশ্য উপভোগ করা যায় না।

ট্রল হাটান প্রপাতের কথা পূর্ব্বে অনেক পর্য্যটকের নিকট শুনিয়াছিলাম যে, ইহা খ্যাতিতে নাএগেরার নীচেই, এখন স্বচক্ষে দেখিয়া বুঝিতে পারা গেল যে, দৃশ্যটী বড় সহজ ব্যাপার নয়। প্রপাত না বলিয়া ইহাকে ৪০০ হাত পরিসরের রাপিড্ শ্রেণী বলিলে ঠিক হয়।§ প্রথম প্রপাত ২৩ ফিট মাত্র খাড়াই। ঐশী প্রভাব ব্যতীত এই ভয়ঙ্কর অপ্রতিহত শক্তিকে আর কিছুতেই অবরোধ করিতে পারে না। প্রপাতের পূর্ব্বধারে অনেক গুলি করাতের কল ও অন্যান্য কারখানা উহা দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। একটী কারখানা হইতে ধাবমান স্রোতের অতি নিকট পর্য্যন্ত একটী মঞ্চ ¶

* Batzar Bogeslaus Von Platen.
† SS"Pallas".
‡ Smorgas.
§ Table d'hote অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট সময়ে সকলের একত্র ভোজন।

* Bohus ruins.
† Lock—কপাট।
‡ Trolhattan Falls.
§ A series of tremendous rapids.
¶ Platform.

প্রস্তুত হইয়াছে। প্রপাতের ঠিক মাঝে একটী ও কিঞ্চিৎ নিম্নে আর একটী দ্বীপ আছে; সেতু দ্বারা তথায় যাওয়া যায়। এই সেতুর মাঝখানে দাঁড়াইয়া নীচেকার ও চারি দিকের কোলাহলময় জলক্রীড়া দেখিতে বড়ই চমৎকার। কিন্তু এই অতীব রমণীয় দৃশ্য উপভোগের জন্য বিশেষ ভাবে প্রাণ মানুষ প্রয়োজন। ঠিক নীচে ৮০ ফিট খাড়া প্রপাত, তাহার ও চারি দিকের জলের ভীষণ শব্দ ব্যতীত আর কিছুই কর্ণগোচর হয় না। সেতুটা তত শক্ত বোধ হইল না, ভাঙ্গিয়া পড়িলে কি দশা উপস্থিত হয়, এ অবস্থায় স্থির চিত্তে সেখানে দাঁড়াইয়া থাকা সহজ পরীক্ষা নয়।

সুন্দর অপরাহ্নে চারি দিকের কল কারখানা, ভীষণ অথচ মনোরম জলকেলি, লকের ইঞ্জিনিয়ারি কৌশল প্রভৃতি পরিদর্শন করতঃ কয়েক ঘণ্টা বিশেষ আমোদ সম্ভোগান্তে আমরা পুনরায় জাহাজে উঠিয়া রাত্রি ৯টার সময় বেনরণ * হ্রদ তীরবর্ত্তী বেনর্সবোর্জ্ † নগরে উপনীত হইলাম। ঠিক এই স্থান হইতে গোথা নদী বাহির হইয়াছে। নগরটীতে ৬ হাজার মাত্র লোকের বাস, ছোট জায়গা, কিন্তু চারিদিকের নৌকা ও জাহাজাদির গতিবিধির মধ্যস্থান বলিয়া একটু গুরুভাব বোধ হইল। এইখানে রাত্রি ৯॥ টার সময় উত্তর পশ্চিম দিকে ‡ সূর্য্যাস্ত হইল, এবং ঠিক পশ্চিমে চন্দ্র দেখা দিলেন।

হ্রদের মধ্যে অনেকগুলি কাঠের মাড় ও দুই এক খানা জাহাজ দেখা গেল। হ্রদটী ৫০ ক্রোশ দীর্ঘ ও স্থানে স্থানে ২৪।২৫ ক্রোশ প্রস্থ, সমুদ্র বলিয়া ভ্রম হয়; কখন কখন ঝড়টড়ও পাওয়া যায়। মানুষের বসতি দুই চারিটী দ্বীপও আছে।

এই হ্রদ অতিক্রম করিয়া পুনরায় খালে প্রবেশ করতঃ পরদিন মধ্যাহ্ন ভুদ বাইকেন হ্রদ* বাহিয়া কার্লস্‌বোর্জ † নগরের নীচে বেট্টর্ণ-হ্রদে ‡ পড়া গেল। বাইকেন হ্রদে প্রবেশের পূর্ব্বে একস্থানে খালটী চক্রাকার হইয়াছে। এইখানে, কাপ্তেন বলিলেন, আমরা এখন খালপথের সর্ব্বোচ্চ স্থানে উঠিয়াছি। তন্নিদর্শন স্বরূপ তীরে এক খণ্ড প্রস্তরে § খোদিত আছে "সমুদ্র হইতে ৩০৮ ফিট উচ্চ"। বাইকেন হ্রদটী খুব ছোট, কিন্তু উভয় তীরস্থ ক্ষেত্রাদি ও বৃক্ষলতাসমূহ এমনি সুন্দর ভাবে সাজান যেন চারিদিকের দৃশ্য ঠিক একখানি ছবি। বেট্টর্ণ হ্রদ ৪০ ক্রোশ লম্বা ও ৬ ক্রোশ চৌড়া। বাইকেন অপেক্ষা এই হ্রদের জল ১২ ফিট নীচে, লক্ হইতে বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। তীরবর্ত্তী দৃশ্য মনোরম ও জল অতি পরিষ্কার কিন্তু প্রায়ই বিষম বাত্যাতাড়িত। কার্লস্‌বোর্জে একটী প্রাচীন দুর্গ ও সামরিক বিদ্যালয় আছে। হ্রদের পশ্চিম পারে একটী সুন্দর পাহাড় ও মধ্যে অনেকগুলি দ্বীপ থাকাতে এই স্থানটীর শোভা বর্দ্ধিত করিয়াছে। কার্লস্‌বোর্জের অপর পারে বাদ্‌স্তেনা ‖ নামক পুরাতন নগর ও ৬ শত বৎসরের একটী প্রাচীন মঠ ‖ প্রথমে ইহা একটী কাস্‌ল্ (@) ছিল, এখানে অনেক রাজা কারাবাস করিয়াছেন।

এই স্থান হইতে অল্পদূর আসিয়া পুনরায় খাল পাওয়া গেল। প্রবেশ করিবার সময় পাঁচ কপাটের লক্ পার হইতে অনেক সময়

* Lake Venun. ‡ N. N. W.
† Venersborg.

* Lake Viken. † Karlsborg.
‡ Lake Vettern.
§ Granite obelisk.
@ Castle.
‖ Wadstena Monastery

লাগিবে, এইজন্য আমরা সকলে নামিয়া মুতালা* পর্য্যন্ত পদব্রজে চলিলাম। পথে দেশীয় নিম্নশ্রেণীর বালকেরা সাধারণ ভাবে সেলাম দ্বারা ও বালিকাগণ হাঁটু ভাঙ্গিয়া আমাদের সকলকে অভিবাদন করিতে লাগিল। ইহাতে বুঝা গেল, এদেশের ছোট লোকেরাও বিনয়ী ও সভ্য। এই ১২০ক্রোশ খালপথের মুতালা মধ্যস্থান। ইহার সন্নিকটে খালের ধারে বিশ্বকর্ম্মা প্লাটেন মহাত্মার সমাধিস্থান। মুতালা সুইডেন দেশের প্রধান কলকারখানার স্থান। এখানকার লেস্ † অতি প্রসিদ্ধ।

সন্ধ্যা ৭টার সময় (বৈকাল বলিলে ভাল হয়, কারণ তখনও ২॥ ঘণ্টা বেশ বেলা আছে) আবার পাঁচ কপাটের লক দ্বারা আর এক হ্রদে ‡ পড়া গেল। ৫ ক্রোশ লম্বা এই জলাশয় পার হইয়া যে খাল পাওয়া গেল, তাহা অনেকটা দূর পর্য্যন্ত চতুর্দ্দিকের জমি অপেক্ষা বহু উচ্চে চলিয়াছে; আমরা বেশ নীচের দিকে তাকাইয়া ক্ষেতখোলা দেখিতে দেখিতে জাহাজ ভাসাইয়া চলিলাম,—এ এক সম্পূর্ণ অভিনব অভিজ্ঞতা সন্দেহ নাই, আর কোথাও এরূপ দৃশ্য ঘটিয়াছে, বলিয়া বোধ হয় না। ইহার পরেই ১৬ কপাটের লক দ্বারা ১২০ ফিট নীচে নামিয়া জাহাজ রক্সেণ § হ্রদে পড়িল। প্রায় ৯ ক্রোশ লম্বা এই হ্রদ পার হইয়া অল্প খানিকটা খাল বাহিয়া একটী অতি ক্ষুদ্র জলাশয় অতিক্রম করতঃ পুনরায় কতদূর খালে গিয়া মেম ¶ নামক স্থানে আসিয়া শেষ লক্ পার হওয়া গেল। এই খানে একখানি মার্ব্বেল পাথরে খোদিত আছে "ঈশ্বর স্বয়ং গৃহ নির্ম্মাণ না করিলে মানুষের সকল চেষ্টা বৃথা।" বাস্তবিক বিধাতা না সহায় হইলে এ সকল কার্য্য ক্ষুদ্র মানুষের দ্বারা সম্পন্ন হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। এইখানে আমরা খাল পথের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম। একটী কথা বলিতে ভুলিয়াছি। খাল পারাপার হইবার জন্য পথিমধ্যে বহুস্থানে এক একটী স্ত্রীলোকের জিম্মায় ছোট ছোট কাঠের পুল আছে; জাহাজ আসিলে তাহারা একটি কল ঘুরাইয়া পুল খুলিয়া দেয় এবং পরে জুড়িয়া লয়।

পর দিন প্রাতে আমরা সমুদ্রের খাড়িতে ভাসিলাম। ক্রমে মধ্যাহ্নে যখন জাহাজ বল্টিকে* পড়িল, তখন বিলক্ষণ সমুদ্র-দোলন আরম্ভ হওয়ায় অনেককে শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। বল্টিক সাগরের এই অংশটীতে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় আছে। বৈকালে একটি ছোট খাল দিয়া মালারণ † হ্রদে প্রবেশ করা গেল। ইহার অপর নাম "সহস্র দ্বীপের হ্রদ", বাস্তবিক এই ৩১ ক্রোশ দীর্ঘ জলাশয়ে ১৪০০ দ্বীপ আছে। ইহার বহুসংখ্যক সুন্দর হর্ম্ম্যোদ্যানাদি সুশোভিত। আমাদের জাহাজ যখন দ্বীপ গুলির পাশ দিয়া চলিতে লাগিল, দ্বীপস্থ বালকবালিকাগণ রুমাল উড়াইয়া আমাদিগকে অভিবাদন করিতে লাগিলেন। এই প্রেমের দৃশ্য দ্বারা হৃদয়ে এক নূতন ধরণের আনন্দ অনুভূত হইল। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যার সময় সুইডেনের রাজধানীর প্রাসাদ ভজনালয়াদির চূড়া দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল এবং অনতিবিলম্বে আমরা ষ্টক্‌হলমে উপনীত হইলাম।

* Motala. † ace. ‡ Lake Boren. § LLake Roxen. ¶ Mem.

* Baltic Sea.
† Lake Malaren—"The lake is one of the most entrancing and delightful regions in Europe".
—Richard Lovett, M.A.

খাল ভ্রমণ ফুরাইল; যাত্রীগণের মধ্যে দুই চারি জন সম্বন্ধে কিছু বলিয়া উহার বৃত্তান্ত শেষ করিব। ইতিপূর্ব্বে পঞ্জাবী ভ্রাতা বুলাকিরাম শাস্ত্রীর বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলা হইয়াছে। এবারে আর কয়েক জনের কথা বলিব। যাত্রীগণ মধ্যে একটী আমেরিকান দল ছিল। ৭।৮টী যুবতী কুমারী ও দুইটী প্রবীণা শিক্ষয়িত্রী ইউরোপ ভ্রমণে একত্র আমেরিকা হইতে বাহির হইয়া এই পথে আমাদের সঙ্গে মিলিত হন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই ইংরাজ জাতির প্রতি বিশেষ বিদ্বেষ প্রকাশ করিতেন, এমন কি, ইংরাজ নাম পর্য্যন্ত ঘৃণা করিতেন। ইঁহাদের মধ্যে এক জন অত্যন্ত হাস্যামোদ-প্রিয় ছিলেন; খানার টেবিলে, আরামের স্থানে, ডেকের উপরে সদা সর্ব্বদা নানাবিধ হাস্য কৌতুকের গল্প দ্বারা যাত্রীগণকে আমোদিত করিতে তাঁহার আলস্য ছিল না। কয়জন আমেরিকান পুরুষও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তাঁহাদের বিশেষত্ব আর কিছুই ছিল না, কেবল ভোজনের সময় ভাল ভাল আহারীয় দ্রব্যাদি হাদেখলের ন্যায় তাড়াতাড়ি হাত বাড়াইয়া আত্মসাৎ করিতে তাঁহারা বড়ই মজবুত ছিলেন। তাঁহাদের দৌরাত্ম্যে ভাল ফলমূল আর কাহারও পাইবার জো ছিল না। ইংরাজ যাত্রীগণ হাঁ করিয়া তাঁহাদের কাণ্ড দেখিতেন, আর অবাক হইয়া থাকিতেন। বলা বাহুল্য, এই মার্কিন যাত্রীগণ ভদ্রলোক।

আর এক জনের কথা বলিয়া পালাস জাহাজের নিকট বিদায় গ্রহণ করিব। আমার পক্ষে ইনি যাত্রীগণ মধ্যে প্রধান ছিলেন। সমস্ত অবকাশ কাল আমি ইঁহার সহিত কথোপকথন দ্বারা রুশিয়া সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহে নিযুক্ত থাকিতাম। ইনি অতি সম্ভ্রান্ত বংশীয় ৺ আড্‌মিরাল কোজাকর ভিশের * বিধবা পত্নী। আড্‌মিরাল মহাশয় বহুকাল মধ্য আশিয়ার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। আমুর নদীস্থ একটী দ্বীপ তাঁহার নামে অভিহিত। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে ৭০ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। রুশমহিলার বয়স আড্‌মিরাল অপেক্ষা ২।৪ বৎসর মাত্র কম হইবে; কিন্তু বেশ শক্ত সমর্থ। ইনি অতি সহৃদয়, আমাদের দেশের গিন্নিবান্নি গোছের লোক। ইংরাজী ও ফরাসি ভাষা উত্তম রূপ জানিতেন, ইতিহাস ও সাধারণ সাহিত্যাদিতে বিলক্ষণ দখল ছিল। ষোড়শবর্ষীয় একমাত্র পুত্র তাঁহার সঙ্গেই ছিলেন। ইংরাজ গবর্ণেস্ † রাখিয়া তাঁহাকেও বেশ ইংরাজী শিখান হইয়াছে। বালক ব্লাডিমির ‡ খুব লম্বা চৌড়া ছোকরা গোঁপ দাড়ির অভাব দ্বারাই টের পাওয়া যাইত, নতুবা ২৫।২৬ বৎসরের জোয়ানের মত আকার প্রকার। ব্লাডিমির মায়ের মত সদাশয় শান্ত প্রকৃতি। এই মাননীয়া মহিলার সঙ্গে যে সকল কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা দ্বারা রুশিয়া সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানা যাইতে পারে। পরিচয়ের পর আমার প্রশ্ন মত তিনি যে সকল উত্তর দিলেন, তাহা অতি প্রাঞ্জল ও সারগর্ভ, ভরসা করি পাঠকগণ উহা দ্বারা রুশিয়ার প্রকৃত অবস্থা অনেকটা বুঝিতে পারিবেন।

প্রশ্ন—ভারতবর্ষ সম্বন্ধে রুশিয়ার কিরূপ লালসা?

উত্তর—তোমাদের দেশের উপর আমাদের কোন প্রকার কুদৃষ্টি নাই।

* Admiral Kozakervitch.
† Governess.
‡ Vladimir Petrorvetch Kozakervitch.

প্র—তবে যে সর্ব্বদা শুনা যায়, মধ্য-আশিয়াতে রাজ্য বিস্তার কেবল ভারতবর্ষ আক্রমণের উদ্দেশে। পিটর সম্রাট * এ সম্বন্ধে আপনার উইলে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, এবং ইদানীং সেনাপতি † স্কুবেলফ্ যেরূপ তাঁহার মতলব প্রকাশ্যভাবে প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে ত আশঙ্কা না করিয়া থাকা যায় না। তিনি ত স্পষ্ট বলিয়াছেন "আমাদের শেষ উদ্দেশ্য বিপুল আশিয়াটিক অশ্বারোহী দল প্রস্তুত করত তদ্দ্বারা তৈমুরলঙ্গের মত রক্তপাত ও লুটপাট করিতে করিতে ভারতবর্ষ আক্রমণ করা।"‡

উ—(সহাস্য বদনে) "পিটরের উইল ত আমার বিবেচনায় জাল। আর সেনাপতি যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, সে সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, ওরূপ আপনাপন মনের কথা বলা অতি সহজ ব্যাপার। তিনি মধ্য-আশিয়ার প্রধান সেনাপতি ছিলেন, তাঁহার নিজের ওরূপ খেয়াল হইতে পারে; কিন্তু সাম্রাজ্যের অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখিলে উহা বাতুলতা ভিন্ন আর কিছু বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে না। আমাদের ঘরের অবস্থা এত খারাপ যে, সর্ব্বাগ্রে তাহা ঠিক করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। যে বৃহদ্রাজ্য হাতে করা হইয়াছে, তাহাই সামলাইবার আমাদের ক্ষমতা নাই, এখন আর বেশী দখল করিবার কথা মনে আনাই পাগ্‌লামী। আসল কথা টাকা, আমাদের দেশের আর্থিক অবস্থা ভাল নয়; সে দিকে উন্নতির চেষ্টা এখন অতীব গুরুতর ভাবে প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রাজধানী হইতে বরাবর সাইবিরিয়ার * ভিতর দিয়া কামট্‌স্কাটকার † সীমা পর্য্যন্ত রেলপথ প্রস্তুত করা আগে চাই; ইহা শীঘ্রই আরম্ভ হইবে।‡ সাইবিরিয়া প্রদেশে যে সকল ধনরত্ন আছে, তাহা করতলস্থ করিতে গেলে ঐ প্রকাণ্ড রাজ্যের মধ্য দিয়া প্রশান্ত সাগর পর্য্যন্ত রেলপথ অত্যাবশ্যক। ঐ রেলপথ চলিলে সাইবিরিয়ার ধনে সাম্রাজ্যের বিলক্ষণ ধনী হইবার সম্ভাবনা আছে। উহাতে আরও এক বিশেষ লাভ এই হইবে যে, প্রশান্ত সাগরের তীরে বন্দর নির্ম্মাণ করত ওখানে নৌ-সেনা স্থাপনের ব্যবস্থা হইবে। বর্ত্তমান সময়ে নৌ-সেনা সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে; রুশিয়ার উত্তর ও পশ্চিমদিকস্থ সমস্ত জল বারমাস ব্যবহারের উপায় নাই, শীতের কয়মাস ঐ সকল স্থান বরফময় হয়। এই কারণে প্রশান্ত সাগর ভিন্ন আমাদের আর এমন কোন জল নাই, যেখানে বারমাস জাহাজ রাখিবার সুন্দররূপ ব্যবস্থা হইতে পারে। এরূপ অবস্থায় বিবেচনা করিয়া দেখ, তোমাদের দেশের উপর এখন আমাদের লোভ করা কিরূপ দেখায়।"

"আমাদের সাম্রাজ্যের প্রধান দোষ এই যে, প্রধান প্রাধান কর্ম্মচারীগণ সাধারণের মত গ্রহণ না করিয়া নিজেদের মনের মত এক একটা খাম্‌খেয়ালি প্রস্তাব করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করেন না। রুশিয়ার সম্রাটগণের নামে যে সকল কলঙ্ক পৃথিবীতে

* Peter the Great.
† General Skobellof.
‡ "It will be in the end our duty to organise masses of Asiatic cavalry, and to hurl them into India under the banner of blood and pillage as a vanguard as it were, thus reviving the times of Tamerlane." ইংরাজিতে এই ভাবে লিখিত আছে।

* Siberia.
† Kamaschtka.
‡ কয়েক বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

প্রচারিত হইয়া থাকে, বাস্তবিক তাঁহারা হয় ত তাহার কিছুই জানেন না। বাহিরের লোকে মনে করে, আমাদের স্বেচ্ছাচারী সম্রাট, আপনার ইচ্ছা মত যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন, কাহারও কথায় কর্ণপাত করেন না; প্রকৃত পক্ষে তাহার ঠিক বিপরীত। সম্রাট যদি সদভিপ্রায়ে কিছু করিতে প্রবৃত্ত হন, এবং তাঁহার পরিষদবর্গ যদি দেখেন, তাহাতে তাঁহাদের কোন প্রকার স্বার্থহানির সম্ভাবনা, অমনি তাঁহারা নানা উপায়ে সম্রাটের হস্ত অবরোধ করিতে চেষ্টা পান। একটা দৃষ্টান্ত বলি। ভরসা করি তুমি ফিনলণ্ড * যাইবে, সেখানে গিয়া শুনিবে। ফিনলণ্ডে স্বায়ত্তশাসন প্রথা প্রচলিত, এবং তাহাদের দত্ত কর সম্রাট দেশের হিতোদ্দেশে তাহাদিগকে ফেরত দেন, বলিয়া সর্ব্বদাই আমাদের মন্ত্রীসমাজে কোলাহল—কেন ফিনলণ্ড সমগ্র রুশ সাম্রাজ্যের নিয়ম বহির্ভূত থাকিবে?—এইরূপে সকল কাজেই জানিবে মন্ত্রীবর্গেরই হাত, জার † বেচারির কেবল দুর্নাম মাত্র।”

প্রঃ—গত বৎসর (১৮৯০) ইংলণ্ডে একখানি পত্র প্রকাশিত হয়। জনৈক পণ্ডিতা রুশ মহিলা কর্ত্তৃক উহা আপনাদের সম্রাটকে লেখা হয়। তাহাতে সাম্রাজ্যের অনেক কলঙ্ক প্রচার করা হইয়াছে। পত্রখানির কথা কি সমস্ত ঠিক? উহা আপনাকে পড়িয়া শুনাই।

Addressed by Madame Tchebrikova, a popular Russian authoress of good family to the Czar of Russia.

"Your Majesty;—The laws of my country punish free speech. All that is honourable in Russia is condemned to see thought persecuted by an arbitrary Administration. We witness the moral and physical massacre of youth, the spoliation and flagellation of a people condemned to remain speechless. But liberty, Sire, is the primordial necessity of a people, and sooner or later the hour will come when the citizens, having, under the tutelage, exhausted their patience will raise their voices, and then your authority will have to yield.

There are also in the lives of individuals moments when they are ashamed of their silence, and then they dare to risk all that is dear to them, so as to say to the person who holds in his hands all the power and all the strength, the person who could put an end to so much evil and so much shame. "Look at what you allow to take place, look at what you are doing either consciously or not."

The Russian Emperors are obliged to see and hear only what their functionaries, the Tchinovniki, allow them to see. The latter form a thick wall between the Czar and the Zemstries—that is the millions of inhabitants who are not in the employ of Government, The terrible death of Alexander II has thrown a lugubrious shadow on your accession to the throne. You were told that this death was the result of the ideas in favor of freedom which had been developed in consequence of the reforms introduced during the previous reign, and you were inspired to take measures by which it was desired to make Russia go back to the sombre epoch of Nicholas I. They frighten you by agitating the spectre of revolution, of a revolution which would suppress monarchy, and this at the present time, and in such a country as yours is a pure illusion. After the catastrophe of the 1st March the regicides themselves did not hope to see the convocation of a Constituent Asssembly. The enemies of the Czar have been executed, every one obeys blindly the will of the monarch. Then by what fatal misunderstanding does the Government suppress all traces of those reforms projected during the best years of Alexander II's reign. It was not the reforms enacted during the previous reign that brought our terrorists into existence, it was their insufficiency.

* * * * *

Do you imagine that because you are an anointed sovereign, you are a divinity possessing knowledge of all things? If you could, Sire, like the sovereign in the fable, pass over the towns and villages so as to know what life the Russian people live, you would see its misery, you would see how the Governors bring up your soldiers to shoot down the peasants and the workmen. You would see that this order, maintained by thousands of soldiers, by legions of functionaries, by an army

* Finland † Czar

of spies—this order in the name of which every word of protestation is suppressed—that this order is not order at all, but a state of administrative anarchy".

উ—এই গ্রন্থকর্ত্রীব নাম আমি শুনিয়াছি। কথা বা লেখার স্বাধীনতা আমাদেব দেশে নাই। যেখানে সেখানে যা খুসি বলিলে অনেক গোয়েন্দা আছে, তাহারা পুলিশকে খবর দিয়া বক্তাকে গ্রেপ্তাব করাইবে। লেখা সম্বন্ধে একজন বিশেষ রাজ কর্ম্মচাবী আছেন, তাঁহার অনুমোদন ব্যতীত কোন প্রকার মুদ্রিত বিষয় প্রকাশ হইতে পারে না।

রাজ কর্ম্মচারীগণের অত্যাচার সম্বন্ধে আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সম্রাটকে বাধ্য হইয়া সর্ব্বদা পরের মুখে ঝাল খাইতে হয়। আমাদের শাসন প্রণালীতে নানা কারণে দোষ প্রবেশ করিয়াছে। রুশিয়ার সিবিল বিভাগের * কর্ম্মচারিগণ এক বিশেষ শ্রেণীর লোক হইতে বরাবর নিযুক্ত হইয়া আসিতেছে। ইহারা উচ্চ বা নীচ কোন শ্রেণীর মধ্যে গণ্য নয়, মাঝামাঝি এক শ্রেণীব লোক, সংখ্যায় অতি অল্প। আমাদের দেশে এক বড় লোক এক ছোট লোক, মধ্যবিৎ লোক বলিয়া কোন শ্রেণী নাই; ইহারা এই দুইয়ের সংশ্রবে উদ্ভূত, কাজেই অল্প সংখ্যক। ইহাদের নিয়োগ, বিয়োগ, পদোন্নতি, সমস্তই প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা, মন্ত্রীবর্গ বা অন্যান্য বিভাগীয় কর্ত্তাদের মরজির উপর নির্ভর করে। চাকরির স্থিরতার অভাব, কখন আছে কখন নাই; তার উপর বেতন বড়ই কম; উপরওয়ালাদের মন সদসৎ সকল উপায়ে সর্ব্বদা যোগাইয়া চলা নেহাত দরকার; ইত্যাদি কারণে তাহারা যারপরনাই অত্যাচারী ও অর্থলোলুপ:—কাজেই দেশ বা প্রজার হিতাহিতের দিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য না রাখিয়া, তাহারা যেন তেন প্রকারেণ কেবল নিজের পেট পূরাইতেই চব্বিশ ঘণ্টা ষোল আনা ব্যস্ত। রাজ-কার্য্য * যে ভাবে চলুক না কেন, সে বিষয়ে বেখাতির।

"১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় আলেক্‌জাণ্ডর অনেক গুলি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন, নানা কারণে সেগুলি শীঘ্রই বন্ধ করা হয়। এ বৎসরও (১৮৯১) সহস্র সহস্র স্কুল বন্ধ করা হইতেছে। আমার বোধ হয় না যে, অন্য কোন হেতু প্রজার শিক্ষা বিস্তার অবরোধ করা ইহার কারণ। বিশেষ কারণ আমি দেখিতেছি এই যে, আমাদের ছাত্রগণ লেখা পড়া শিখিয়া কেবল সরকারী চাকরি দাবী করে, বিদ্যালাভ দ্বারা যেন তাহারা ইহাই বুঝে যে, অন্যান্য কাজ না করিয়া কেবল রাজ সরকারে চাকরি করিবার জন্যই তাহারা উপযুক্ত হইয়াছে। আমাদের মত দরিদ্র রাজ্যে অত বিদ্যার ছড়াছড়ি বোধ হয় অমঙ্গলের কারণ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।

"প্রজার প্রতি অত্যাচার অনেক সময় ঘটিয়া থাকে, সন্দেহ নাই। গুপ্ত চরগণ অন্যায় রূপেও অনেককে গ্রেপ্তার করাইয়া দেয়। এরূপ গ্রেপ্তার মধ্য রাত্রিতেই হইয়া থাকে, কারণ সে সময় সকলকেই বাড়ীতে পাওয়া যায়। অনেক নির্দ্দোষী ব্যক্তি হয়ত কেবল মাত্র সন্দেহের দরুণ বা দুষ্ট কর্ম্ম-

* Civil Service

* তৃতীয় আলেকজাণ্ডর কয়েক বৎসর হইল ইহা নিরাকরণের জন্য বিশেষ যত্নবান হইয়া নিয়োগ বিয়োগাদির ভার অনেকটা নিজের হাতে লন; এবং পরিদর্শনের জন্য একটী বিশেষ বিভাগ স্থাপন করেন। তাহার নাম Special Inspection department.

চারিদের অন্যায় কোপগ্রস্ত হইয়া বিনা বিচারে যাবজ্জীবনের জন্য সাইবিরিয়াতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে। রাজ্যশাসনের গূঢ় রহস্য নিচয় ভেদ করা বড় সহজ ব্যাপার নয়। অনেক সময়ে দারুণ কঠোর শাসন নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়ে এবং সেই শাসন-যন্ত্র সকল সর্ব্বাবস্থায় ঠিক নিক্তির তৌলে ব্যবহার ও প্রয়োগ অতিশয় দুরূহ কার্য্য, সন্দেহ নাই। জাতি, ধর্ম্ম, শিক্ষা, অবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে এরূপ বিভিন্ন প্রকারের নানাবর্ণের প্রজা আমাদের এই বিপুল সাম্রাজ্যে বাস করে, ইহাদের সকলকে লইয়া চলিতে গেলে কোথাও না কোথাও ত্রুটি লক্ষিত হইবেই হইবে।

"রুশিয়ার নিন্দা তোমরা অনেক শুনিয়াছ, কিন্তু আমার গুটিকতক কথা শুনিলে অস্বীকার করিতে পারিবে না যে, আমরা সংসারের হিতসাধনে যত্নবান কি না। দেখ মধ্য-আসিয়া আমাদের অধীনে আসিবার পূর্ব্বে কি ছিল, আর এখনই বা কি হইয়াছে:—কোথায় দিবারাত্রি তুর্কমানদের লুটতরাজ, নানা প্রকার উপদ্রব অত্যাচার, গোলাম ব্যবসায়, আর কোথায় জীবন ও বিভব নিরাপদ জানিয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে আহার বিহার সুখে নিদ্রা এবং কৃষি বাণিজ্যের উৎকর্ষ সাধন। একজন মাত্র রুশীয় কর্ণেল ৮ জন দেশীয় সহকারীর সাহায্যে নির্ব্বিঘ্নে ত্রিশ হাজার প্রজাকে সুশাসনে রাখিতে সমর্থ, ইহা কি আমাদের গৌরবের বিষয় নয়। কর্ণেল আলিখানফ্, যাঁহার আসল নাম আলি খাঁ, একজন তাতার মুসলমান রুশিয়ার অধীনতা স্বীকার করিয়া যুদ্ধবিভাগে চাকরি পাইয়া শত শত গোলামকে মুক্ত করিয়াছেন এবং গোলামী উন্মুলিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। মোটামুটি ফরাসিরা ৬০ বৎসর ধরিয়া আল্‌জিরিয়াতে * যতদূর করিতে না পারিয়াছে, আমরা ২০ বৎসর মধ্যে তাতার মুলুকে তদপেক্ষা অধিক করিতে সমর্থ হইয়াছি। এতকাল পরেও আল্‌জিরিয়ার এমন অবস্থা যে, আজ অবকাশ পাইলে তাহারা ফরাসি শাসনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিতে প্রস্তুত; কিন্তু মধ্য-আসিয়া আমাদিগকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। প্রকৃতিবর্গ অতি সুখে বাস করিতেছে।

তারপর, ভরসা করি, তোমরা ইউরোপের ইতিহাস সম্বন্ধে ভালরূপ জ্ঞাত আছ, আমার কথা কতদূর প্রামাণ্য বেশ বুঝিতে পারিবে যে, সভ্যজগতের হিতে রুশিয়ার হস্ত কতদূর বিস্তৃত। তোমরা "রুশিয়ার দূরকাঙ্ক্ষা ও রাজ্যগৃধ্নুতার কথা অনেক শুনিয়াছ, নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে, অনেক স্থলে আমরা বিপরীত ভাব প্রকাশ করিয়া উদারতার পরিচয় দিয়াছি। নেপোলিয়ন যখন প্রথম বার এল্‌বাতে † তাড়িত হন, তখন রুশিয়া ব্যতীত আর সবাই লম্বা লম্বা হাত বাড়াইয়া দুর্ব্বল প্রতিবাসীর রাজ্যভাগ আপনাপন কোলে টানিতে বসিয়াছিলেন। সে সময়ে ফরাসিদেশে তাহাদের পুরাতন রাজবংশকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার মত সকলেরই হইয়াছিল, কেবল আমাদের সম্রাট তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া ফরাসিদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, তাহারা সাধারণ-তন্ত্র প্রচারের পক্ষপাতী কি না। দুর্দ্দান্ত নেপোলিয়ন রাহু বিনাশের প্রধান সহায় রুশিয়া:—মস্কোদাহ † ও লাইপজিক ‡ যুদ্ধ তাহার

* Algerea † Elba
Burning of Moscow

জীবন্ত সাক্ষী। তারপর নেপোলিয়ন ধ্বংসের পর অবধি ইউরোপের অরাজকতা ও বিপ্লবের প্রধান শত্রু রুশিয়া। গ্রীস, রুমানিয়া *; সর্বিয়া † মনিটনিগ্রো ‡ ও ইটালির স্বাধীনতা ও জর্ম্মনি একীকরণের প্রধান সহায় রুশ সম্রাট। গ্রীস্ ও রুমানিয়ার বন্দোবস্তের সময় ইংলণ্ড পর্য্যন্ত কতক কতক বিপক্ষতাচরণ করেন, কিন্তু রুশিয়া ষোল আনা সহায়। ইংরেজ প্রতিবন্ধক না হইলে গ্রীস্ আরও বেশী পাইতেন, রুমানিয়ার বেলায় তাহার কথা খাটে নাই। অনেকের মনে আছে যে দিনকার কথা, কেবল মাত্র ২০।২২ বৎসর গত হইয়াছে, যুদ্ধাবসানে সন্ধি সংস্থাপনের পর জর্ম্মন সম্রাট উইলিয়ম § আমাদের জার আলেক্জাণ্ডরকে ¶ পত্র লেখেন, "প্রুশিয়া ‖ কখন ভুলিতে পারিবে না যে, কেবল মাত্র আপনার জন্য এই যুদ্ধ ভীষণতর মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে নাই। জগদীশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। আপনার চিরকৃতজ্ঞ বন্ধু।"

প্র—দ্বিতীয় আলেক্জাণ্ডর যেরূপ সর্ব্ব প্রকারে সদাশয় লোক ছিলেন, তাঁহাকে বধ করাটা কি ভয়ানক নৃশংস ব্যাপার।

উ—তিনি যেমন বাহিরের ব্যাপারে উচ্চ উদারতা ও মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন, প্রজাবর্গের হিত সাধনেও তেমনি কায়মনোবাক্যে যত্ন করিতেন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ্চ তারিখে তিনি এক ঘোড়ায় এক খানি গাড়ীতে যাইতেছিলেন, হটাৎ তাহার গাড়ীর নিচে একটি বোম ছুটিল। তাড়াতাড়ি গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িয়া আহতদিগের জন্য ব্যবস্থার আদেশ দিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার পায়ের নীচে নিক্ষিপ্ত একটি বোমের দ্বারা তাঁহার পা দুখানি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। সেই দিনই বৈকালে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইহার পূর্ব্বে প্রথম আলেক্জাণ্ডরের পিতা পাল ও * দুষ্ট প্রজা কর্ত্তৃক হত হন। এ সকল অর্থহীন ব্যাপার এক জন ক্ষিপ্ত লোকের কাজ। পিটর দি গ্রেট † হইতে আমাদের সকল সম্রাটই দেশের উন্নতির জন্য বিশেষ যত্ন প্রকাশ করিয়াও প্রজাদের এরূপ নৃশংস ব্যবহার প্রাপ্ত হন। কেবল মাত্র অসভ্য রুশিয়াকে সুসভ্য করণোদ্দেশে পিটর মহাত্মা হলণ্ড ইংলণ্ড ভ্রমণ দ্বারা নানা বিষয়ে জ্ঞানোপার্জ্জন করিয়া আসিয়াছিলেন। বিদেশে অতি সামান্য লোকের মত দিনযাপন করিয়া ছুতার কামারের কাজ, জাহাজ ও ঘড়ি নির্ম্মাণ প্রভৃতি বহুবিধ প্রয়োজনীয় শিল্প শিক্ষা করতঃ এবং কলকারখানা, চিকিৎসা বিদ্যালয়, হাঁসপাতালাদি পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা জ্ঞান লাভ করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগমনান্তর ঐ সকল বিষয়ে প্রজাবর্গকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। রুশিয়ায় গেলে তাহার অনেক কীর্ত্তি দেখিয়া প্রীতি হইবে।"

রুশিয়ার প্রসিদ্ধ 'নাইহিলিষ্ট' ‡ সম্প্রদায়ের বিশেষ কোন সম্বাদ ইহার নিকট পাওয়া গেল না।

জাহাজের কাপ্তেন ও যাত্রীগণের বিশেষ রূপে উক্ত রুশ মহিলার, নিকট বিদায় গ্রহণান্তর হোটেলাভিমুখে যাত্রা করিলাম। পূর্ব্বে অনেকবার বলিয়াছিলেন, আবার নামিবার সময় কাপ্তেন বলিলেন, "বাথ § অর্থাৎ স্নানাগার দেখিতে যেন ভুলিও না"।

শ্রীচন্দ্র শেখর সেন।

* Roumania † Servia
‡ Montenegro § Emperor William
¶ Czar Alexander II ‖ Prussia

* Paul † Peter the Great
§ Batht ‡ Nihilist

পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামীর উপদেশ। (১৩)

পাঠকগণ! আমাদের শাস্ত্রে লেখা আছে যে, সূর্য্যনারায়ণ কশ্যপ ঋষির পুত্র; এবং হনুমান এক সময়ে তাঁহাকে কক্ষ মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, ও উদরস্থ করিয়াছিলেন। কুন্তী দেবীর আহ্বানে তিনি তাহার সহিত সহবাস করিয়াছিলেন। আপনারা বিচার করিয়া দেখুন যে, অনাদিকাল হইতে ত্রিজগতের একমাত্র প্রকাশক যাঁহার আংশিক তেজে সমগ্র জগৎ সন্তপ্ত হয়, যিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কারণ সেই জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ যাঁহাদের পুত্র; সেই পিতা মাতা কীদৃশী তেজসম্পন্ন হইবেন, তাহা সহজে অনুমান করা দুঃসাধ্য। আর তাঁহাদের বাড়ী ঘর কোথা আছে, তাঁহারা এক্ষণে জীবিত কি মৃত, কেহ বলিতে পারেন কি? আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, বানর একটা হাত পা বিশিষ্ট জন্তু, সূর্য্যনারায়ণ হইলেন অগ্নি ও জ্যোতিঃস্বরূপ, যাঁহার এক কণা তেজে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ভস্ম হইয়া যায়, তাঁহাকে যে একটা সামান্য জন্তু হনুমান গিলিয়া ফেলিল ও বগলে পুরিয়া রাখিল ইহা অতি অসম্ভব কথা! যে হনুমান লঙ্কা দগ্ধ করিতে যাইয়া সূর্য্যনারায়ণের অংশ অগ্নি দ্বারা নিজের মুখ পোড়াইয়াছিল ও যাহার তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছিল, সেই হনুমান পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণকে এতাদৃশী দুরবস্থা করিয়াছিল, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের কথা আর কিছু হইতে পারেনা। রামায়ণে লেখা আছে যে, যখন শ্রীরামচন্দ্র রাবণবধে হতাশ হইলেন, তখন মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত আসিয়া রামচন্দ্রকে কহিলেন যে, আপনি কেন হতাশ হইতেছেন? আপনি জগদ্বিখ্যাত সূর্য্যবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, জগৎ প্রকাশক সূর্য্যনারায়ণ আপনার আদি পুরুষ, আপনি সেই আদি পুরুষকে ভক্তি পূর্ব্বক অর্ঘ প্রদান করুন, তাঁহার পূজা করুন, তাঁহার বরে নিশ্চয় আপনি রাবণবধ করিতে পারিবেন। রামচন্দ্র ভগবান অগস্তের উপদেশানুসারে সেই আদি পুরুষের পূজা করিলেন ও ভক্তি পূর্ব্বক অর্ঘ প্রদান করিয়া যুদ্ধে গমন করিলেন। রাবণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া যেমন তাহাকে বাণ মারিলেন অমনি সেই বাণেই রাবণ বধ হইল। রাবণ নিধন হইলে লঙ্কাবিজয় ও সীতা উদ্ধার হইল। এক্ষণে দেখুন যে, সেই রামচন্দ্রের ভক্ত দাস হনুমান তাহার আদি পুরুষ জগৎ প্রসবিতা সূর্য্যনারায়ণকে বগলে পুরিয়া রাখিয়াছিল ও গিলিয়া ফেলিয়াছিল, ইহা কিরূপ সঙ্গত কথা?

পাঠকগণ! আমাদের শাস্ত্র রূপকে পরিপূর্ণ। সেই রূপকজাল ভেদ করিয়া সারভাব গ্রহণ করা অতীব কঠিন। যাহা হউক, আমি সংক্ষেপে সারভাব বুঝাইয়া দিতেছি, আপনারা সূক্ষ্মভাবে গ্রহণ করিবেন। কশ্যপ শব্দে পূর্ণ পরব্রহ্ম আকাশস্বরূপ বিরাট-ব্রহ্ম। অদিতি শব্দে বিদ্যা—জ্ঞান; যাঁহার মধ্যে দ্বিতীয়ভাব নাই। সেই অদিতি অর্থাৎ জ্ঞান হইতে জ্ঞানী অর্থাৎ দেবতাগণ, যাঁহারা পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপকে জানেন, তাঁহারা জন্মেন। দিতি শব্দে মায়া, অজ্ঞান, অবিদ্যা। দিতির গর্ভে রাক্ষস, অসুর অর্থাৎ পরমাত্মাবিমুখ অজ্ঞানীগণ জন্ম গ্রহণ করেন। নিরাকার নির্গুণ পরব্রহ্ম আকাশ স্বরূপ কশ্যপ পিতা হইতে সূর্য্যনারায়ণ জগৎ প্রসবিতা স্বতঃই প্রকাশ হয়েন ও তিন লোককে প্র

কাশ করেন। হনুমান শব্দে হরিভক্ত জন। যিনি ইন্দ্রিয়গণকে হনন করিয়া জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণকে গিলিয়া ফেলেন, অর্থাৎ ভক্তি পূর্ব্বক ধারণ করেন। ইহাই হনুমান সূর্য্য-নারায়ণকে গিলিয়া ফেলার অর্থ; আর বগলে পূরিয়া রাখার তাৎপর্য্য এই যে ভিতর বাহির সূর্য্যনারায়ণ ভিন্ন আর কাহাকেও দেখেন না। লঙ্কা শব্দে মায়া—অজ্ঞানতা; সীতা পরমাশক্তি জগজ্জননী ব্রহ্মময়ী; রাবণ অহ-ঙ্কার, রাম জীবাত্মা; জ্ঞান বাণ। যখন জীবাত্মা রামচন্দ্র পরমাত্মারূপীসূর্য্যনারারণযকে ভক্তি-পূর্ব্বক হৃদয়ে ধারণ করিলেন, তখন অহঙ্কার মহামোহরূপী রাবণ সহজেই বধ হইল। সোণার লঙ্কা অর্থাৎ সংসার-বন্ধনকারী মনো-হারিণী মায়া জ্ঞান অগ্নি দ্বারা ভস্ম হইয়া গেল। তখন পরমাপ্রকৃতি পূর্ণব্রহ্মরূপিণী জগজ্জননী কুলকুণ্ডলিনী সীতা উদ্ধার হইল। অর্থাৎ—জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন হইল। অর্থাৎ মহামোহ মায়া প্রভৃতি সাধনা-রূপ যুদ্ধে হত হইলে জ্ঞানের উদয় হয়। জ্ঞানের উদয় হইলে সাধকের আর ভেদজ্ঞান থাকে না, অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্ম পৃথক বোধ হয় না। তখন সকলই ব্রহ্মময় বোধ হয় নিজের পৃথক অস্তিত্ব থাকে না।

কুন্তীদেবীর সহিত সহবাস সম্বন্ধে এস্থলে যাহা বিবৃত হইবে, তাহার সূক্ষ্মভাব আপনারা বিচার করিয়া গ্রহণ করিবেন। আপনারা দেখুন যে, জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণের হাত পা ইন্দ্রিয়াদি কিছুই নাই, কেবল মাত্র তেজো-ময়। তিনি একজন স্ত্রীলোকের সহিত সহ-বাস করিলেন, ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? যে স্ত্রীর সহিত তিনি সহবাস করিলেন, সে স্ত্রীলোক ত স্থূলবস্তু। সে ত সূর্য্যণারায়ণের স্পর্শ মাত্রেই ভস্ম হইয়া যাইবে। জ্ঞানীমাত্রেই জানেন যে, জগৎ প্রস বিতা সবিতা নিরাকার ও সাকার অখণ্ডা-কার ভিতর বাহির বিরাটরূপে বিরাজমান আছেন। তিনি ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তু ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে নাই: সমস্ত জগতই তিনি, অতএব দ্বিতীয় স্ত্রীলোক কোথা হইতে আসিল যে, তিনি তাহার সহিত সহবাস করিলেন? পাঠকগণ! তোমরা ভক্তি সহকারে উপা-সনা ও যোগ কর, তাহা হইলে সূর্য্যনারায়ণকে চিনিতে পারিবে ও তাঁহার স্বরূপ অবগত হইতে পারিবে।

ব্রহ্ম ও জগৎ। (৫)

আমরা এই প্রবন্ধের বিগত চতুর্থ সংখ্যায়, বেদান্তদর্শন কি যুক্তি সামর্থ্যে ন্যায়দর্শনের পরমাণুবাদ খণ্ডিত করিয়াছেন, তাহা প্রদর্শন করিয়াছি। পাঠক দেখিয়াছেন, বেদান্তের যুক্তি সমূহ কেমন মনোহর। সাধ করিয়া লোকে বেদান্তকে দর্শন শাস্ত্রের "শিরোমণি" বলে নাই। যাহা হউক, মত-গত গুণ দোষ বিচারের জন্ত আমরা এ প্রবন্ধের অবতারণা করি নাই। যদি বিধাতার ইচ্ছা থাকে, তবে সে সম্বন্ধে সময়ে দুই চারি কথা বলিব। আমরা পূর্ব্ব সংখ্যার শেষাংশে স্বীকার করিয়াছিলাম যে, সাংখ্যের সেই উৎকৃষ্ট প্রকৃতি পুরুষবাদের বিরুদ্ধেও বেদান্ত স্বীয় পরাক্রম প্রদর্শন করিতে ক্রটী করে নাই। সাংখ্যদর্শনের সৃষ্টি সম্বন্ধীয় মত ও যুক্তিগুলিকেও বেদান্ত খণ্ডন করিয়া দিয়াছে। এ সংখ্যায় আমরা কিরূপে ও কি যুক্তিবলে বেদান্ত-দর্শন, সাংখ্যের সেই

অতি সুন্দর প্রকৃতি পুরুষবাদের মূলোচ্ছেদ করিতে প্রয়াসী হইয়া, একমাত্র ব্রহ্মকেই জগতের উপাদান কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছেন, তাহাই সংক্ষেপে প্রদর্শন করিতে চেষ্টা পাইব।

সত্ব রজঃ ও তমঃ এই ত্রিবিধ গুণ ব্যতিরিক্ত জগতে অন্যরূপ গুণের অস্তিত্ব নাই। এই ত্রিবিধ গুণের মিশ্রণ বা অন্যাধিক বৈশিষ্ট্য প্রত্যেক সৃষ্টপদার্থেই পরিলক্ষিত হয়। এই গুণত্রয়, সুখদুঃখ ও মোহাত্মক। এই গুণত্রয় যখন সাম্যবস্থায় থাকে, তখন তাহাকেই "প্রকৃতি" বলা যায়। নির্গুণ চৈতন্যময় পুরুষ, ভোগাপবর্গ সাধনের জন্য, কর্ম্ম বা অদৃষ্ট বশতঃ সেই অচেতন প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত হয়। তাহা হইতেই প্রকৃতির কার্য্যাকারে পরিণাম হয়। সেই সংযোগ ফলে, প্রকৃতির মধ্যে বৈষম্য উপস্থিত হয়। অর্থাৎ সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি হইয়া একটী গুণ অপর অপেক্ষা কিছু বেশী প্রবল হয়;—সেই বৈষম্য ক্রিয়া বলেই মহত্তত্বাদি ক্রমে সমস্ত জগৎ সৃষ্ট হয়। প্রকৃতি অচেতন ও জড়;- পুরুষ, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় ও চেতন। সুতরাং সমস্ত জগতের কারণ সেই অচেতন প্রকৃতি। প্রকৃতির স্বাভাবিক পরিণাম হইতেই এজগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। সংক্ষেপতঃ ইহাই সাংখ্যমত। একথা আমরা এই প্রবন্ধের প্রথম সংখ্যায় বলিয়া আসিয়াছি।

বেদান্ত, সাংখ্য-প্রবর্ত্তিত এই প্রকৃতি-পুরুষবাদের যথাযথ খণ্ডন করিয়া স্বমত প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছেন। বেদান্তের যুক্তি সমূহ প্রধানত নিম্নে বিবৃত হইল।

১। সাংখ্য বলেন, অচেতন সুখদুঃখ মোহাত্মক প্রকৃতিই সৃষ্ট বিষয় বা পদার্থ সমূহের কারণ। যেমন ঘটশরাবাদি জড় পদার্থ সমূহ মৃত্তিকা প্রভৃতি সমন্বিত বলিয়া, মৃত্তিকা প্রভৃতিই ঐ ঘটাদির কারণ;—সেইরূপ বাহ্যিক ও আন্তরিক সমুদয় পদার্থ সুখদুঃখ মোহাত্মক বলিয়া, উহাদের কারণও সুখদুঃখ মোহাত্মক। সেই সুখদুঃখ মোহাত্মক অচেতন ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি চেতন পুরুষের ভোগাপবর্গ সাধনের জন্যই স্বভাবতঃ গুণবিক্ষোভবশতঃ বিচিত্র জগদাকারে স্বয়ংই পরিণতা হইয়া থাকে। কিন্তু এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, এজগতে কোথায় দেখিয়াছ যে, অচেতন পদার্থ, কাহারও কোন প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য, চেতন দ্বারা চালিত না হইয়া স্বয়ংই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে? চেতন দ্বারা প্রেরিত বা অধিষ্ঠিত হইলে, তবে অচেতন কার্য্য করিতে সমর্থ হয়। অচেতনা প্রকৃতি কি করিয়া কেবল স্বভাবতঃই পরিণত হইয়া এজগৎ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইবে? অতএব সাংখ্যের সেই "পুরুষার্থ এবং হেতুঃ, ন কেন চিৎ কার্য্যতে করণং"—এ উক্তি নিতান্তই অসার। সৃষ্টিকার্য্যে কেবলমাত্র পুরুষার্থই (ভোগাপবর্গ) কারণ হইতে পারে না, উহা চেতন দ্বারা চালিত হওয়া নিতান্তই আবশ্যক। অচেতন জড় মৃত্তিকাদি যদি চেতন কুম্ভকারাদি কর্তৃক প্রেরিত বা চালিত না হয়, তবে যুগসহস্রেও সেই মৃত্তিকাদি হইতে একটী ঘট উৎপন্ন হইতে পারে না। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, চেতন দ্বারা অচালিত বা অনধিষ্ঠিত হইয়া, অচেতন প্রকৃতি স্বয়ং এ জগতের কারণ হইতে পারে না।

তারপর, সাংখ্য সমস্ত পদার্থ সুখদুঃখ মোহাত্মক বলিয়া, তাহাদের কারণেও সুখদুঃখ মোহাত্মক প্রকৃতিকেই দেখিয়াছিলেন।

কিন্তু শব্দাদি সমুদয় বিষয় মাত্রই বাহিক। আর সুখ দুঃখাদি বাহিক নহে,—ইহারা আন্তরিক বা মানসিক ধর্ম্মমাত্র। অতএব পদার্থ সমূহ যে সুখ দুঃখ মোহাত্মক, একথা ভ্রান্তিপূর্ণ। কেননা, বাহিক পদার্থ কিরূপে আন্তরিক সুখ দুঃখ মোহাত্মক হইতে পারে? আবার দেখ, একই বিষয়, লোক, বাসনার বৈচিত্র্যবশতঃ কাহারও পক্ষে দুঃখজনক, কাহারও পক্ষে সুখাত্মক, আবার কাহারও নিকটে সেই বস্তুই মোহজনক হইয়া থাকে। একই বনিতা-বদন স্বামীর নিকটে পরমানন্দজনক, আবার উহাই, সপত্নীর মহা বিদ্বেষ ও পরম দুঃখ উৎপাদন করিয়া থাকে। অতএব বিষয় বা পদার্থ সমূহ স্বয়ং সুখ দুঃখ মোহাত্মক—একথা হইতেই পারে না।

তারপর সাংখ্যের আর এক যুক্তি এই যে, সৃষ্ট পদার্থ যখন পরিমিত (Limited), তখন উহার কারণ অবশ্যই প্রকৃতি। কথাটা একটু অনুধাবন করিয়া বুঝিতে হইবে। দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাহারই পরিমাণ আছে (Measure) অর্থাৎ যে বস্তুরই ইয়ত্তা বা সীমা পরিচ্ছিন্ন করা যায়, দেখা যায় যে, দুই তিন বা ততোধিক কারণের সংসর্গে বা মিশ্রণে তাহার উৎপত্তি। যেমন দেখ, বৃক্ষের মূল, অঙ্কুরাদি পদার্থ "পরিমিত" (Limited)। উহারা নিশ্চয় বীজ, ভূমি, ও জলাদির একত্র সংসর্গে বা মিলনে উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব সৃষ্ট পদার্থ মাত্রই যখন পরিমিত, তখন ইহা ঠিক অনুমান করা যাইতে পারে যে, সৃষ্ট পদার্থও দুই তিনটীর সংসর্গে উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ইহাদের কারণ হইতে পারে না। কেননা, অদ্বিতীয় ব্রহ্মের ত আর পরস্পর সংসর্গ সম্ভব হয় না। অতএব পদার্থ মাত্রেই সত্ত্ব, রজ ও তম—এই ত্রিবিধ গুণের সংসর্গে বা মিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু সাংখ্যের এরূপ উক্তি শতিমধুর মাত্র। কেননা, বস্তু পরিমিত হইলেই যদি তাহা অন্য একাধিকের "সংসর্গ" হইতে উৎপন্ন হওয়া নিয়ম হয় তবে সত্ত্ব রজ ও তম—ইহারাও যখন পরস্পর পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন,—তখন ইহারাও ত পরিমিত। সুতরাং সত্ত্ব রজ তমেরও আবার "সংসর্গজন্য" কোন কারণ স্বীকার করা অনিবার্য্য হইয়া উঠে। কিন্তু প্রকৃতির ত আর কারণান্তর নাই। অতএব অচেতন প্রকৃতি পরিণত হইয়া জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে—এ যুক্তি অসার ও অলীক।

২। সৃষ্টির প্রাক্কালে ত্রিগুণের সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটে। সৃষ্টিকালে, প্রকৃতির বৈষম্য হয় অর্থাৎ কোন গুণ প্রধান, কোন গুণ অপেক্ষাকৃত অপ্রধান হইয়া পড়ে, তৎপরে এইরূপ বৈষম্য হইলে পর মহদাদি ক্রমে সৃষ্টি হয়। ইহাই সাংখ্য মত। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, প্রকৃতির এইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্তি হওয়া সম্ভব কি না? মৃত্তিকাদি বা রথাদি, কখনও কুম্ভকারাদি বা অশ্বাদি কর্ত্তৃক চালিত না হইলে, কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। সুতরাং অচেতন প্রকৃতির স্বভাবত কি করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্তি হইতে পারে? প্রবৃত্তি বা কার্য্যের আশ্রয় স্বরূপ দেহাদি সম্বলিত চেতনেরই কার্য্যকারিতা দেখা যায়। কেবল চেতন বা কেবল অচেতন পদার্থের কার্য্যে প্রবৃত্তি হইতেই পারে না। অচেতনে, চেতনের ক্রিয়া বা অধিষ্ঠান না হইলে, কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মিতেই পারে না। যদিও চৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্মের কোনরূপ প্রবৃত্তি নাই, তথাপি, প্রবৃত্তি-

রহিত-রূপাদি যেরূপ চক্ষুরাদির প্রবর্ত্তক, সেইরূপ সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্মও সর্ব্ববিধ কার্য্যের প্রবর্ত্তক। অতএব অচেতন প্রকৃতির প্রবৃত্তি হওয়া অসম্ভব;—সুতরাং সাংখ্য মতে সৃষ্টিও অসম্ভব হইয়া পড়িল।

৩। যেমন গোদুগ্ধ অচেতন হইলেও, গোবৎসের পুষ্টির জন্য, স্বভাবতই ক্ষরিত হয়; যেমন জল অচেতন হইলেও, লোকোপকারার্থ স্বভাবতই স্যন্দিত হয়;—তদ্রূপ প্রকৃতি অচেতন হইলেও, পুরুষার্থ সাধনের জন্য স্বতঃই প্রবৃত্ত হইবে—ইহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? কিন্তু সাংখ্যের এরূপ যুক্তি তত সাধু নহে। উপরোক্ত দৃষ্টান্তে, দুগ্ধ ও জল উভয়েতেই চেতনাধিষ্ঠান রহিয়াছে। ধেনু চেতন;—চেতন ধেনুর ইচ্ছা বা স্বীয় বৎসের প্রতি স্নেহের জন্যই ত দুগ্ধ ক্ষরিত হয়। চেতন বৎসও ত আকর্ষণ করিয়াই দুগ্ধ ক্ষরিত করায়। অতএব নিরপেক্ষ ও নিরবচ্ছিন্ন অচেতনই স্বভাবত প্রবৃত্ত হয়, ইহা ত কোথাও দেখা যায় না। তারপর, সাম্যাবস্থাপন্ন প্রকৃতিতে কে তবে কার্য্য উৎপন্ন করায়? পুরুষ ত সাংখ্যমতে নিষ্ক্রিয় ও উদাসীন। সুতরাং নিষ্ক্রিয় পুরুষ কদাপি প্রকৃতির প্রবর্ত্তক হইতে পারেন না। কে তবে প্রকৃতিতে প্রথম বৈষম্যরূপ বিক্রিয়া উপস্থিত করিল? অদৃষ্ট বা কর্ম্ম ও প্রবর্ত্তক হইতে পারে না। কেননা, সাংখ্যমতে, প্রকৃতি ব্যতিরিক্ত কর্ম্মের সদ্ভাব কোথায়? কর্ম্মও ত প্রকৃত্যাত্মক এবং অচেতন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রকৃতির নিজের যখন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার সামর্থ্য নাই, এবং উহার যখন অন্য কোন প্রবর্ত্তক নাই, তখন সৃষ্টি ক্রিয়াও আরম্ভ হইতে পারে না।

৪। আমরা উপরে দেখিয়া আসিয়াছি যে, প্রকৃতির বিনা কারণে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। প্রকৃতির বিক্রিয়া বা কার্য্য হইতে হইলেই তাহার একটী প্রবর্ত্তক বা কারণ আবশ্যক। আর যদি তর্কের অনুরোধে স্বীকারই করা যায় যে, প্রকৃতি পুরুষার্থ সিদ্ধির জন্য স্বতঃই প্রবৃত্ত হয়;—এরূপ স্বীকার করিলেও বিষম দোষ আসিয়া পড়ে। স্বীকারই করিয়া লইলাম যে, প্রকৃতি স্বভাবতই কার্য্যাকারে পরিণত হয় এবং বাহ্য কোন সাধনের অপেক্ষা করে না;—তাহা হইলেই জিজ্ঞাসা করি, যদি সহকারী কোন রূপ কারণের অপেক্ষা না থাকে, তবে বল যে, কোন "প্রয়োজনেরও" অপেক্ষা নাই। তবে আর তুমি কেমন করিয়া বলিতে পার, যে "প্রকৃতি প্রাণীর ভোগাপবর্গ সাধনরূপ প্রয়োজনের জন্যই কার্য্যাকারে পরিণত হয়।" এরূপ "প্রয়োজন" স্বীকারেরই বা প্রয়োজন কি? তারপর আর এক আপত্তি এই যে, এ কিরূপ প্রয়োজন? 'ভোগ'ই যদি প্রয়োজন হয়, তবে যিনি কূটস্থ, যিনি সুখ দুঃখাদি হইতে বহুদূরে অবস্থিত, সেই অসঙ্গ উদাসীন পুরুষের আবার 'ভোগ' কিরূপ? নিঃসঙ্গ পুরুষের আবার সুখদুঃখ ভোগ কি? আর যদি "অপবর্গের" জন্যই প্রকৃতির প্রবৃত্তি হয় বল, তবে প্রবৃত্তির পূর্ব্বেও ত অপবর্গ বা মুক্তি বর্ত্তমান ছিল। সুতরাং প্রবৃত্তি অনর্থক হইয়া পড়ে। আর যদি "প্রকৃতির ঔৎসুক্য-নিবৃত্তি"র জন্যই প্রবৃত্তি জন্মে বল, তবে একটী দোষ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। অচেতন প্রকৃতির 'ঔৎসুক্য' সম্ভবে না;—এবং শুদ্ধ নির্ম্মল পুরুষেরই বা ঔৎসুক্য আসিবে কোথা হইতে?

৫। সাংখ্যের আর একটী যুক্তি এই

যে, যেরূপ একটী পঙ্গু (যাহার দৃষ্টিশক্তি আছে, কিন্তু চলৎশক্তি বা প্রবৃত্তি শক্তি নাই), অপর একটী অন্ধকে (যাহার দৃষ্টি-শক্তি নাই, কিন্তু প্রবৃত্তি আছে) চালাইয়া লইয়া যাইতে পারে; যেরূপ চুম্বক লৌহকে আকর্ষিত করে, তদ্রূপ পুরুষও প্রকৃতিকে কার্য্যে প্রবৃত্ত করায়। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে সাংখ্যের এ যুক্তিও অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইবে। সাংখ্যমতে পুরুষ উদাসীন। উদাসীন পুরুষ কি করিয়া প্রকৃতিকে চালাইবে? পঙ্গুও ত অন্ধকে বাক্য ইত্যাদি দ্বারা প্রবর্ত্তিত করায়। কিন্তু পুরুষ ত নিষ্ক্রিয় ও নির্গুণ। আর যদি বল যে, চুম্বক যেমন লৌহের সন্নিকর্ষে থাকিয়াই, তাহাতে ক্রিয়া উৎপাদন করায়, তদ্রূপ পুরুষ ও প্রকৃতির সন্নিকর্ষ বা সান্নিধ্য হইলেই প্রবৃত্তি হইবে। কিন্তু ভাবিয়া দেখ, পুরুষ ও প্রকৃতির ত সর্ব্বদাই সন্নিকর্ষ রহিয়াছে। তবে নিত্যই সৃষ্টি হউক না কেন? সুতরাং পুরুষ উদাসীন বলিয়া, প্রকৃতি অচেতন বলিয়া, এবং এতদুভয়ের পরস্পর মিলন বা সমন্বয়ের উপযোগী কোনরূপ কারণের অসদ্ভাব বশতঃ প্রকৃতির কদাচ কার্য্যাকারে পরিণাম হইতেই পারে না। অতএব সাংখ্যমতে সৃষ্টিই হইতে পারে না। অতএব সাংখ্যের প্রকৃতি পুরুষবাদ তত সমীচীন নহে।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

খোকার বিলাতের পত্র। (১)

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু,—

পুনঃ পুনঃ আমার ভ্রমণের বৃত্তান্ত জানিতে চাহিতেছ। পথে যেইখানেই সুযোগ পাইয়াছি, সেখান হইতেই পত্র লিখিয়াছি, যতদূর সম্ভব পথের সংবাদ দিয়াছি। কিন্তু তবুও তাহাতে তোমাদের মনস্তুষ্টি হয় নাই। যাহা হউক, আমার খাতা হইতে যতদূর সম্ভব পথের সমস্ত 'সবিশেষ' কথা লিখিতে বসিলাম। এ বিবরণ বড়ই সংক্ষিপ্ত হইল।

ইংরাজি নবেম্বর মাসের ৭ই, শনিবার-রাত্রে তোমরা আমাকে জাহাজে একাকী ফেলিয়া চলিয়া গেলে। যখন তোমাদের নৌকাগুলি ফিরিতেছিল, আমি তখন ডেকের উপরে। যতক্ষণ সম্ভব, কেবল তোমাদের পানে তাকাইয়া রহিলাম। দুষ্ট অন্ধকার শীঘ্রই তোমাদিগকে তাহার কোলে লুকাইল। আর তোমাদের দেখিতে পাইতেছি না, তবুও তাকাইতেছি খুঁজিতেছি। বোধ হয়, ভুলিয়া তোমরা একটা জিনিষ আমার সঙ্গে দাও নাই। আমার বেশ মনে আছে, আমরা বাড়ী ছাড়িবার সময় অতিকষ্টে সেটীকে জাহাজ পর্য্যন্ত আনিয়াছিলাম; কিন্তু ভুলিয়া জাহাজে তোলা হয় নাই। আমি তুলিতে পারি নাই—তোমরাও দাও নাই। তোমরা ফিরিয়া গেলে, আমার প্রাণটাকেও লইয়া গেলে? কি বিষম ভুল! প্রাণ লইলে কি প্রাণী বাঁচে? আমি ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলাম। ডেকের উপর তখনও দাঁড়াইয়া আছি। ঐ বুঝি তাহারা ফিরিয়া আসে। কই?—কিছুই নয়, আকাশ-কুসুম। ১১টা, ১২টা, ১টা বাজিয়া গেল, তবু তোমরা আসিলে না। তখন নিরাশায় আমার ক্ষুদ্র ঘরে ফিরিলাম।

কেমন সুন্দর ঘর। সাদা দুধের মত পরিষ্কার বিছানা। আয়না, চিরুনি, ক্রস্, তোয়ালে, পিপাসা-নিবারণের জন্য শীতল জল, গ্লাস, সুন্দর, পরিষ্কার, পরিপাটী, কিছুই অভাব নাই। কেমন সুন্দর বৈদ্যুতিক আলো! সবই সুন্দর, কিন্তু আমার কিছুই ভাল লাগিতেছে না। যত গ্রীষ্ম কি আমার ঘরে?--জানালা (Port-hole) খুলিয়া দিলাম বাতাস নাই। বাক্স খুলিলাম, তোমরা যে পাখা দিয়াছিলে, তাহা বাহির করিলাম। বাতাস করিতে করিতে হাত ব্যথা হইল, প্রাণ ঠাণ্ডা হইল না। প্রাণই নাই,—ঠাণ্ডা হবে কি ছাই! বিদায় দিবার সময় তুমি ব'লেছিলে—'কষ্ট হইলে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবে। প্রার্থনাই আমাদের এক মাত্র সম্বল।' সে কথা আমি ভুলি নাই। একবার, দুইবার, কতবার যে তাঁহার নিকটে সান্ত্বনা ভিক্ষা চাহিলাম, ঠিক নাই। রাত্রি প্রায় শেষ হইতে চলিল। ঘড়ি টুন্‌টুন্ করিয়া তিনটা বাজিল। এখন একটু ভাল লাগিতেছে;—রাত্রি শেষে প্রায়ই শীতল বাতাস বহিয়া থাকে। এই সুযোগে কি জানি কখন নিদ্রাদেবী আমার চক্ষের উপরে আধিপত্য বিস্তার করিলেন। ক্ষণেকের জন্য বেশ ঘুমাইলাম। কত কি স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম। যদিও সেই সব স্বপ্ন ঘুমের ব্যাঘাৎ জন্মাইতেছিল, তবুও ক্লান্তির পর ঘুমাইলাম বেশ। এখন ভোর পাঁচটা। আর ঘুম হইল না। ষ্টিমারের শিকল সমূহের কড়-মড় শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। উঠিয়া ঘর হইতে বাহির হইলাম। ডেকের উপরে যাইতেছি, দেখিলাম, (Mr. Rowe) রো সাহেব আমার খোঁজ করিতেছেন; (Steward) কে আমার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। আমি তাঁহার নিকটে গেলেম; সহজেই বেশ আলাপ হইয়া গেল। এমন ভাল লোক আমি অতি অল্পই দেখিয়াছি। তাঁহার সহিত উপরে গেলাম। তিনি আমাকে মিসেস্ রো (Mrs. Rowe) এর সহিত আলাপ করাইয়া দিলেন। তাঁহাদের সহিত কথাবার্ত্তা করিয়া অনেকটা শান্তি পাইলাম। আজ রবিবার, মেটেবুরুজের কাছে আমরা গির্জ্জার ঘণ্টাধ্বনি শুনিতে পাইলাম। মিঃ রো বলিলেন 'প্রায় একমাস আর উপাসনালয় (Church) দেখিতে পাইব না, দেখিলেও যোগ দেওয়া হইবে না।'

আমরা এ জাহাজে (Emden) অনেক লোক নই। জোর ৫০ জন ভদ্রলোক যাত্রী। জাহাজে লোকের সহিত আলাপ হওয়া বড়ই সহজ। সকলেই জানে, মানুষ একাকী থাকিতে ভালবাসে না। জাহাজে তাতে আবার কোন কাজ কর্ম্ম নাই। চুপটী করিয়া কোন কাজ না করিয়া বসিয়া থাকা অসম্ভব। কাজেই সহজেই পরস্পরে আলাপ হয়। কলিকাতা হইতে লণ্ডনের যাত্রী মোটে পাঁচ জন ছিলাম। Mr. Rowe, Mrs. Rowe, Mr. Nutter, Dr. Alock এবং আমি। প্রথম দুইজনকে তোমরা চেন। তৃতীয় ব্যক্তি বোম্বাইতে British Marine Service এ কাজ করেন। বয়স বড় বেশী নয়, ২০।২১। বাড়ী স্কটলণ্ডে। এক বৎসরের ছুটি লইয়া দেশে যাইতেছেন। ইনি আমার অনেক উপকার করিয়াছেন। ক্রমে ক্রমে ইহার অনেক কথা লিখিতে হইবে। তারপর, Dr. Alcock, ইহাকেও বোধ হয় তোমরা জান। আমাদের কলিকাতার যাদুঘরের ইনি তত্ত্বাবধায়ক (Supdt.) পনর মাসের ফার্লো পাইয়া এক বার বাড়ী পানে যাই-

তেছেন। ইনি অত্যন্ত বিনীত, অহঙ্কার-শূন্য। আমি ইঁহাকে চিনিতাম না, কিন্তু ইনি স্বয়ং আসিয়া আলাপ করেন। ইনি যে এত বড় লোক বুঝিতে পারি নাই, কেন না, তিনি স্বভাবত সুমিষ্ঠ আচার ব্যবহারে বুঝিতে দেন নাই। আমাদের দেশী কোন লোক যদি এত উচ্চপদ পান, গর্ব্বে ফুলিয়া উঠেন, আর কাহারও সহিত কথা বলেন না। সভ্যতার তারতম্য কি এই খানে নাহ ?

আগেই বলিয়াছি, রাত্রে ঘুম হয় নাই। সেই জন্য শরীর কেমন কেমন করিতে লাগিল। রো সাহেবের আদেশ মত বেশ করিয়া মাথা ধুইয়া ফেলিলাম। আমাদের ব্রেকফাষ্টের সময় পূর্ব্বাহ্ণ ১০টা। স্নানাদি করিতে প্রায় দশটা বাজিল। এই আমার প্রথম দিন ;—টেবিলে গেলাম। আচার ব্যবহারে যদিও আমি অভ্যস্ত নই, তবুও পুঁথিগত বিদ্যা আমার বেশ ছিল, ওয়েব (Webb) সাহেবের বই খানি পড়িয়া প্রায় মুখস্ত করিয়া ফেলিয়াছিলাম। তাই আমাকে কোন বিশেষ লজ্জায় পড়িতে হইল না। অন্ততঃ ডান হাতে চামচ, বামহাতে কাঁটা ধরিতে জানি। কিন্তু কাটা ধরা জানিলে হইবে কি ?—পেট ভরে কই ? আমার ইচ্ছা করিতেছিল, একবার ধাঁ করিয়া খানিকটা হাত দিয়া খাইয়া ফেলি, কিন্তু পারিলাম কই ? পেট ভরিলনা , ক্ষুণ্ণ মনে ঘরে আসিলাম। সঙ্গে যে সমস্ত দেশী খাবার ছিল, তাহা খাইয়া ক্ষুধা নিবারণ করিলাম।

এখন বেলা ১১টা। জাহাজ এখনও গঙ্গাবক্ষে। একখানা দুইখানা জাহাজ দেখিতে পাইলাম। এখনও জোয়ার আছে। তবুও জাহাজ আস্তে ২ চলিতেছে, কি জানি পাছে ডাঙ্গায় লাগিয়া যায়। ক্লান্তি হেতুও বটে, আর পূর্ব্ব রাত্রির অনিদ্রা হেতুও বটে, গঙ্গার সুন্দর শীতল বায়ুতে, ডেকের উপরে চেয়ারে বেশ ঘুমাইলাম। বড় সুন্দর ঘুম হইল। কতক্ষণ ঘুমাইলাম, জানি না, কিন্তু যখন বেলা প্রায় সাড় তিন, সেই সময়ে নঙ্গর সিকলের ভয়ানক শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। এখনও আমারা নদীতে, নদী নয়, যাহাকে সকলে গঙ্গাসাগর বলে। চারি ধারেই জল, সম্মুখে একটু চড়া দেখা যাইতেছে। হঠাৎ মধ্য নদীতে নঙ্গর করিতে দেখিয়া একটু ভয় হইল। ভাবিলাম, বুঝি চড়ায় ঠেকিয়াছে। কিন্তু তাহা হইলে সকলের মুখ প্রসন্ন দেখাইত না। আমি রো সাহেবকে এইরূপ স্থানে থামিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন,"কোন ভয়ের কারণ নাই। এখন ভাঁটা পড়িয়াছে, এবং এই সমস্ত স্থান তত গভীর নয়, সেই জন্য আবার জোয়ার হওয়া পর্য্যন্ত জাহাজ এইখানে থাকিবে।" ক্রমে আরও দুই এক খানি জাহাজ আসিয়া আমাদের আশে পাশে নঙ্গর করিল। আমাদের জাহাজ নঙ্গর করে প্রায় সাড়ে তিনটার সময়। সূর্য্যের এখন তত তেজ নাই, প্রায় ডুবু ডুবু হইতেছে। আমরা এই সময়ে চা খাইতে আমাদের খাবার ঘরে গেলাম। চা খাইতে আমার বড় কষ্ট হইল না, কেননা ইহাতে বেশী কোন চাল-চলন (etiquette) নাই। ওয়েব সাহেবের বইখানি একবার দেখিয়া লইলাম। চামচ দিয়া চা পান করা নিষেধ। চামচটী কেবল শোভার জন্য ও নাড়িবার জন্য। পেয়ালা ধরিয়া পান করা নিয়ম। এই রীতি দেখিয়া আমার কোন বেশী কষ্ট হইল না, কেননা পেয়ালা ধরিয়া চুমুক দেওয়াত

বেশ সহজ; ঐ একটু২ ক'রে চামচ দিয়ে খাওয়াই কঠিন। হায়, অনভ্যাস হেতু চামচে আবার কিছুই উঠে না, সব পড়িয়া যায়। কোন রকমে কয়েক খণ্ড রুটি, এক প্যালা চা খাইয়া আবার ডেকে গেলাম।

বিদায় গ্রহণের সময় প্রায় সকলেই অতি নম্র, বিনীত হইয়া থাকে। প্রায় ৫॥০টা বাজে। আমাদের গাঢ় অন্ধকারে ফেলিয়া সূর্য্যদেব বিদায় লইবার সুযোগ দেখিতেছেন। এখন আর তাঁহার সেই উগ্র মূর্ত্তি নাই। কত নম্র! দিবসের উগ্রতার জন্যই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক, এখন তিনি লজ্জায় রক্ত-বর্ণ হইয়াছেন। না আর সহ্য হইল না, ধীরে২ সমুদ্রের এক কোণে ধীরে২ মুখ লুকাইতে লাগিলেন। সমুদ্র আনন্দে আট খানা; কেমন প্রফুল্ল মনে তাহাকে স্নেহ কোল দিতেছে, ধীরি২ নৃত্য করিয়া সূর্য্যকে ডাকিয়া লইতেছে। এখন পাখীগুলিও বিদায় দিবার জন্য বাহির হইল। ঝাঁকে২ তাহারা ঘুরিয়া২ উড়িতে লাগিল। কেমন সুন্দর দৃশ্য! তুমি ত এই দৃশ্য দেখিয়াছ, বেশ বুঝিতেছ। আমরা ডেকের উপরে পায়চারি করিতে লাগিলাম ও স্বভাবের এই আশ্চর্য্য লীলা খেলা দেখিয়া মোহিত হইলাম। বেশীক্ষণ দেখিতে পারিলাম না। ডিনারের ঘণ্টা বাজিল। সকলকে নীচে যাইতে হইল। ডিনার ছয়টার সময়। এইবার একটু ভাল করিয়া খাইতে পারিলাম। যাহা তাহা করিয়া খাইয়া অন্য সকলে কি প্রকারে আহার করে, তাই দেখিতে লাগিলাম। এইরূপ দেখিতে২ শীঘ্রই বেশ ভাল করিয়া খাইতে শিখিলাম। ডিনারে খাইতে দেয় একটা ঝোল (soup), বিফ-ষ্টেক, মাটন, কফি, আলু, কলা, লেবু, আপেল, আনারস, কখন২ আতা, নেশপাতী, বাদাম, কিস্‌মিস্, মনক্কা, তারপর কুল্‌পি বরফ, (Ice-cream) শেষে চা কি কাফি। এই জাহাজে মদটা জলের মত ব্যবহৃত হয়। ক্লারেট কিম্বা বিয়ার যে যত চায়, সে তত পায়, কেবল ডিনার সময়ে। অন্য সময়ে কিনিয়া খাইতে হয়। যাহারা মদ না খায়, তাহাদের জল ভিন্ন উপায় নাই, কারণ লিমনেড্ ১টা ছয় পেন্স, সোডা ৩½ পেন্স।

গত রাত্রে ঘুম হয় নাই, গরমের জন্য। আর জানিয়া শুনিয়া কি ঐ পায়রার খুবরীতে ঘুমাইতে পারি? রো সাহেবের কথা মত ষ্টুয়ার্ডকে বলিয়া ডেকের উপরে বিছানা করাইলাম। আমরা সকলেই ডেকের উপরে ঘুমাইলাম। ঘুম বেশ হইল। নদীর শীতল বায়ুতে কার না ঘুম হয়?

সোমবার, ৫ই অক্টোবর, ৯৬। পাঁচটার সময়ে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। এখন জোয়ার আসিয়াছে। জাহাজ ছাড়িবার উদ্যোগ করিতেছে। উঠিয়া যাহাকেই সম্মুখে দেখিলাম, তাহাকেই গুড্‌মর্নিং (good morning) করিলাম, কেননা, এইরূপ যে না করে, সে নিতান্ত অসভ্য। শ্রদ্ধাস্পদ ডাক্তার বাবু ইহা শিখাইয়া দিয়াছিলেন। আধ ঘণ্টা পরে জাহাজ ছাড়িল। প্রাতঃকালের দৃশ্য আরও সুন্দর! কেমন সুন্দর সহাস্য বদনে সূর্য্যদেব শীতল সমুদ্র-জলে স্নান করিয়া পবিত্র ও নির্ম্মল হইয়া উদিত হইতেছেন। সাধে কি আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা ইহাকে দেবতা রূপে বর্ণনা করেন। আমার ইচ্ছা হইল, একবার সূর্য্যদেবকে প্রণাম করি। কিন্তু তাঁহাকে না করিয়া সূর্য্যের সৃষ্টিকর্ত্তা, পিতার পিতা, মাতার মাতা, অসহায় সমুদ্রবক্ষে একমাত্র সহায় সম্বল, ভবার্ণবের কাণ্ডারী, দয়াময় দীন-

বন্ধুকে অন্তরের ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানাইবার জন্য আমার নিজঘরে গেলাম। অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁহার পূজা করিয়া, শান্ত হইলাম। অবশেষে স্নান করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমাকে ফরাসী জাহাজের কষ্টে পড়িতে হয় নাই। এতক্ষণ তাহারা যাহা দিয়াছে, তাহাই খাইয়াছি। আমার কিছুই চাহিতে হয় নাই। এখন তোয়ালে চাই, বোঝেনা, সাবান চাই, দেয় না। তাহাদের দোষ কি, তাহারা ইংরাজি কিম্বা হিন্দি, কিছুই বুঝিতে পারে না। আমি মহা মুস্কিলে পড়িলাম। সেই ফরাসী বই খানি দেখিয়া দুই একটী কথা শিখিলাম। কোন রকমে তাহাদের জানিতে দিলাম, আমি ফরাসী ভাষা জানি না। স্নান করিতে চাই, সাবান তোয়ালে দাও। তোয়ালে দিল বটে, কিন্তু সাবান কই, কি বলে ছাই ভস্ম কিছুই বুঝিনা। তার পর তাহাদের ভাব ভঙ্গিতে বুঝিলাম যে, সাবান দেওয়া তাহাদের নিয়ম নয়। বড় আশ্চর্য্য বোধ হইল। স্নান করিয়া নিজের ঘরে গেলাম। এখন এইরূপ অসময়ে আবার নিদ্রাদেবী কৃপা করিলেন। বিছানায় বেশ ঘুমাইয়া পড়িলাম। ১০টা বাজিয়া গেল, হুস্ নাই। আমার লোক (waiter) আমাকে ডাকিয়া, ব্রেকফাষ্টের সময় হইয়াছে, জানাইল। শরীর ভাল লাগিতেছে না। মন ভাল না থাকিলে কি শরীর ভাল লাগে? কোন রকমে একটু খাইলাম। সেই সিদ্ধ পোড়া মাংস দেখিয়াই বমি আসিতে লাগিল। এখনও আমার রুচি সুমার্জ্জিত হয় নাই। খাইয়া বমি বমি লাগিতে লাগিল। দুই একখানা বেলের মোরব্বা খাইলাম। আবার ঘুমাইব, ভাবিলাম। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে একবার ডেকে বেড়াইতে গেলাম। একি! অকূল—অকূল নীল জল, কেবল নাল। ধু ধু করিতেছে নীল জল। দূরে আকাশ সমুদ্রকে চুম্বন করিতেছে। যে দিকে চাই, কেবল জল আর আকাশ। অতবড় জাহাজখানি এখন যেন অতল অসীম জল রাশির মধ্যে তৃণ কণার ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। দূরে দেখিলাম, তোমাদের Sea Gull আসিতেছে। অনেক ক্ষণ দেখিলাম। দেখিতে দেখিতে ক্লান্ত হইলাম, আর ভাল লাগিল না। Sea-Gull আমাদের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। আমিও সময় বুঝিয়া চেয়ারের উপরে ঘুমাইয়া পড়িলাম। ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া তোমাদের কথা স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম। ঘুমাইয়া ঘুমাইয়াও নিস্তার নাই, কত কাঁদিলাম, জাগ্রত অবস্থায় কখনও এত কাঁদি নাই।

চারিটা বাজিয়া গিয়াছে। ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। জাগিয়া দেখি, Mr Rowe, Mrs Rowe এবং আর অপর ব্যক্তি পাশে গল্প করিতেছেন। আমি সকলের নিকট ক্ষমা চাহিলাম (Excuse me) রো বলিলেন,—বেশ ঘুমাইয়াছ। আমি—হাঁ। রো বলিলেন, 'জানিবে, সমুদ্রে দুই চারি দিন ঘুমাইতে পারিলেই ভাল, পরে সহিয়া যায়। আর কোন অসুখ হয় না।'' তারপর Mr Nutterএর সঙ্গে পাটাতনের উপর পাইচারি করিতে লাগিলাম। জাহাজে অনেক লোক, সকলেই আমাকে আদর করে, তবে আমার নামটা বড়ই বড়। যাহারা অধিক ঘনিষ্ঠ, তাহারা Mr. Ray বলিতে নারাজ, আমিও ভালবাসি না। অবশ্য অন্যান্য সকলেই ঐ নামে ডাকে, তবে আমার বন্ধু গুলি কেন ঐ নামে ডাকিবে? আমার নাম জিজ্ঞাসা করিল। আমি বলিলাম, বড়ই কঠিনা,—প্র-ভা-ত। তাঁহারা সকলে মিলিয়া আমার Patrick নাম দিলেন। আমি ক্রমে

ক্রমে জাহাজে ঐ নামেই চলিলাম। মিঃ রো এখনও চিঠিপত্রে 'My dear Patrick' লিখিয়া থাকেন। বেড়াইতে বেড়াইতে ছয়টা বাজিল। ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রায় মাইল দুই তিন বেড়াইয়াছি। বেশ লাগিতেছিল। কিন্তু ক্ষুধা পাইয়াছে, আর ডাকও পড়িয়াছে। সকলের সঙ্গেই আলাপ হইয়াছে, এখন আর টেবিলে বেশি লজ্জা করে না। সমস্তই বন্ধু 'নাটারের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া লইতে পারি। খাইয়া নিজের ঘরে গিয়া ঘণ্টা দুই আইন পুস্তক পড়িলাম। আর ভাল লাগিল না; গরম বোধ হইতে লাগিল। উপরে গেলাম। অপরাপর বন্ধুগণের সহিত আলাপ করিলাম। অনেক ক্ষণ গল্প করিলাম। তার পর সকলে ডেকের উপর ঘুমাইলাম। বেশ ঘুম হইল, বেশ সুন্দর ঠাণ্ডা বাতাস। আরামে ঘুমাইলাম।

মঙ্গলবার, ৬ই অক্টোবর। যদিও প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সমুদ্র বেশ শান্ত ছিল, যদিও নির্ম্মল জলরাশির মধ্য দিয়া আমাদের তরীখানি ভাসিতে ভাসিতে, দুলিতে দুলিতে কত কি রঙ্গ করিতেছিল, যদিও সূর্য্যদেব নির্ম্মল মেঘশূন্য আকাশ হইতে প্রখর কিরণ বিস্তার করিয়া রাত্রের শীতলতাকে বিনাশ ও দিবসের শোভা বর্দ্ধন করিতেছিলেন, যদিও আজ প্রকৃতি রীতিমত নূতন সাজে রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণা হইয়া জগতকে মুগ্ধ বিমুগ্ধ করিতে কুণ্ঠিত নন; তবুও কি জানি কেন, কোন অজানিত কারণে আমার এ সব ভাল লাগিতেছে না। প্রথম প্রথম সমুদ্র দেখিব বলিয়া কত উৎসাহের সহিত আমি জাহাজে আসিয়াছিলাম। তুমি যখন 'উৎকল-ভ্রমণ' করিয়া ফিরিয়া আসিয়া সমুদ্রের গল্প করিতে, কত ইচ্ছা হইত, একবার দেখিয়া আসি। ঐ নামে পুস্তকখানি বাহির হইলে কত উৎসাহের সহিত সমুদ্র-বর্ণনা পাঠ করিতাম। পুরাতন সাধ পূর্ণ হইবে বলিয়া কত আনন্দ হইয়াছিল। বিধাতা সমুদ্র দেখিবার সুযোগ দিলেন বটে, কিন্তু এই তিন দিনেই আমার সাধ বেশ মিটিয়াছে। আজ আর ভাল লাগে না। শরীর ভাল লাগে না, মন কি চায়, পায় না, প্রাণ উদাস উদাস। সমস্তই অবসাদগ্রস্ত। সুযোগ বুঝিয়া শিরঃপীড়া উপস্থিত হইল। কি করি, কোথায় যাই, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। পূর্ব্ব দুই দিন ডেকের উপরে শয়ন করিয়া একটু একটু সর্দ্দিও লাগিয়াছে, বড় বিশ্রী লাগিতে লাগিল। একবার কেবিনে, একবার সেলুনে (saloon) একবার ডেকের উপর, এইরূপ ছট্‌ফট্ করিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। একবার ভাবিলাম, যাই, সকলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা করি, মন প্রফুল্ল হইবে। কই কিছুই হইল না; বরঞ্চ বাঙ্গালী জাতির বিষম সমালোচনায় আমার বিরক্তি হইল। তাহারা যেরূপ ভাবে আরম্ভ করিল, কি করি, পদে পদে আমাদের নীচতা স্বীকার করিতে হইল। একটু তর্ক করি, আর পারি না। ক্রমে ক্রমে বুঝিতেছি, আমাদের দেশ পাশ্চাত্য জগতের কত পশ্চাতে! শেষে আমি বলিলাম, বেশ, আমি বাঙ্গালী বলিয়া আমাকে ঘৃণা করেন নাকি? তাঁহারা আমাকে বড় ভালবাসেন, এই প্রশ্ন শুনিয়া বুঝিলেন, আমি মর্ম্মাহত হইয়াছি। আর ঐ বিষয়ে কোন কথা (অন্ততঃ সেই দিন) বলিলেন না। আমি তিক্ত বিরক্ত হইয়া নির্জ্জনতার অন্বেষণে, একেবারে জাহাজের পশ্চাৎভাগে চলিয়া গেলাম। সুবিধা পাইয়া চারিদিক হইতেই আমাকে চাপিয়া ধরিল।

তোমাদের কথা মনে পড়িল। স্মৃতি আসিয়া আমাকে পাগল করিয়া তুলিল। জাহাজ সম্মুখে চলিয়াছে; সমুদ্র খুব শান্ত, ঠাণ্ডা; আমি বসিয়াছি,ঠিক হালের উপরে,পশ্চাতে। যতই চলিতেছে,ততই আমি তোমাদের থেকে দূরে, —আরো দূরে পড়িতেছি। পশ্চাতে অনন্ত—কত অনন্ত যেন ফেলিয়া চলিয়াছি। আমি দেখিলাম, যেখান দিয়া জাহাজ যাইতেছে, পিছনে ঠিক একটি পথ ফেলিয়া যাইতেছে। যতদূর চক্ষু গেল, পথটা দেখিলাম। এই পথ দিয়া স্মৃতি আসিয়া রাক্ষসির মত চাপিয়া ধরিল। আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম।

কাঁদিলাম তোমাদের কথা মনে করিয়া, কাঁদিলাম, আমার দেশের দুর্ব্বলতার জন্য, কাঁদিলাম, আমার অপদার্থতা চিন্তা করিয়া, কাঁদিলাম, আরও কত কিছুর জন্য, তাহা লেখা দুঃসাধ্য এবং অযোগ্য। আমি পাঁচটার সময় আমার বন্ধুদের ছাড়িয়া আসিয়া নির্জ্জনে বসিয়াছি। কখন কি জানি, খাবার ডাক পড়িয়া গিয়াছে, শুনিতে পাইনাই। আমার লোক (waiter) আসিয়া আমাকে ডাকিল। একদিন এইরূপ ঘুমাইয়া পড়িয়া আহারের সময় উপস্থিত হইতে পারি নাই। আজ আবার সেইরূপ; বড় লজ্জায় পড়িলাম। আমি বলিলাম,আমার ভাল লাগিতেছে না, আমি টেবিলে যাইব না। আমাকে এক প্যালা দুধ আনিয়া দাও। সামান্য চাকর, তাহার শিষ্টাচার দেখিলে অবাক হইতে হয়। সে বুঝিল, আমার অসুখ হইয়াছে। দেখিলাম, সে চিন্তাযুক্ত হইয়াছে। কিছু পরে সে ডাক্তার সাহেবকে ডাকিয়া আনিল। আমি আশ্চর্য্য হইলাম। বাস্তবিক আমার তেমন কোন পীড়া হয় নাই। আমি ডাক্তারকে বলিলাম "না মহাশয়, আমার বেশী কিছুই হয় নাই, তবে পূর্ব্ব হইতে সাবধান হওয়া উচিত।' 'আমার লোক আমাকে বিস্কুট, দুধ, চা, লিমনেড প্রভৃতি আনিয়া দিল। আমি তৃপ্তির সহিত আহার করিলাম, কেননা, যদিও দুই তিন দিন পোড়া মাংস খাইতেছি,তবু তাহা ভাল লাগে না। আমার যদিও সর্দ্দি হইয়াছে, তবু ডেকের উপরে শুইবার সুখ হইতে বঞ্চিত হইতে ইচ্ছা করিলাম না। সকলে মিলিয়া পুনরায় নির্ম্মল পবিত্র উন্মুক্ত বাতাসে সুখে নিদ্রা গেলাম। গাঢ় নিদ্রার মত আর ঔষধ আছে কি না,জানি না। অন্ততঃ দুঃখের হাত হইতে বিশ্রাম লইবার উহা এক অব্যর্থ ঔষধ।

বুধবার, সাতই অক্টোবর। পূর্ব্ব দিনের মত আজও আমরা বঙ্গোপসাগরের অনন্ত (?) জলরাশির মধ্য দিয়া যাইতেছি। বুঝিতেই পারিতেছ,আমাদের কেমন লাগিতেছে। তবে কিনা, আমার সর্দ্দি কম, মাথাধরা মোটেই নাই, আর আমরা মান্দ্রাজের কাছে আসিতেছি, সেই আশা। স্নান করিয়া, Breakfastএর সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারিতেছি না, এত ক্ষুধা পাইয়াছে। ক্ষুধার চোটে আজ ঐ মাংস বেশ লাগিল। কোন রকমে দিনটা কাটিয়া গেল। আমরা রাত্রি ১২-টার সময় মান্দ্রাজে পৌছি। কিন্তু গভীর রাত্রে বন্দরে প্রবেশ নিষেধ বলিয়া আমাদের বাহিরেই নঙ্গর করিতে হয়। পর দিন প্রত্যূষে উঠিয়া দেখি, আমরা বন্দরে প্রবেশ করিতেছি।

মান্দ্রাজ-বন্দর।

জাহাজ হইতে মান্দ্রাজ সহর অতিশয় সুন্দর দেখাইতেছে। বন্দরটী অত্যন্ত সুন্দর। কেমন চারি দিকে প্রস্তর-নির্ম্মিত দুর্গে

ঘেরা। একটী অতিশয় প্রকাণ্ড মুখ-ওয়ালা চৌবাচ্চা। কত ২ জাহাজ রহিয়াছে। কেহ জিনিষ তুলিতেছে, কেহ নামাইতেছে, কেহ বা নিস্তেজ নিষ্কর্ম্মা হইয়া কেবল বন্দরের শোভা বর্দ্ধন কার্য্য সমাধা করিতেছে। প্রায় সাড়ে ছয়টার সময় আমাদের জাহাজ বন্দরের মধ্যে নঙ্গর করিল। দেখিতে দেখিতে অনেক গুলি নৌকা আমাদের দিকে অগ্রসর হইল! আমাদের জাহাজের মাল সমস্ত নামাইতে আরম্ভ করা হইল। মাল নামিলে আবার মাল লওয়া হইবে। Notice Board এ বিজ্ঞাপিত হইল, জাহাজ রাত্রি ১০ ঘটিকার পূর্ব্বে ছাড়িবে না। এই সুযোগ বুঝিয়া, আমরা মান্দ্রাজে নামিব স্থির করিলাম, কতকটা দেখিবার জন্য, আর বিশেষতঃ (আগেই বলিয়াছি ইহারা সাবান দেয় না) সাবান কিনিবার জন্য। আমরা কেহই সাবান আনি নাই। সকলেই জানিতাম, জাহাজে পাওয়া যাইবে। আবার সাবান ব্যতীত সমুদ্র জলে স্নান করা বিষম দায়। আমরা চা খাইয়া ডেকে আসিলাম। দেখি, ডেকের উপরে এক প্রকাণ্ড বাজার বসিয়াছে। রেশম, পশম, তুলার জিনিষ, জুতা, ফিতা, কালী, রস, মুচি, নাপিত, দর্জ্জি, ধোপা, যত কিছু সমস্তই উপস্থিত। মান্দ্রাজ যাদুখেলার জন্য নাকি বিখ্যাত। আমাদের জাহাজে নানা প্রকার খেলা আসিয়াছিল। সাহেবগণ খেলার আমোদ ভোগ করিবার জন্য তাহাদিগকে নিযুক্ত করিলেন। নানা প্রকার মজার খেলা দেখিলাম। কত প্রকার ধাঁধাঁ সকলে কিনিলেন। তিন দিন পরে আবার জমি আসিয়াছে, সকলেই উৎফুল্ল।

জাহাজ হইতে মান্দ্রাজের হাইকোর্টের উপরিস্থিত নূতন আলোক-মঞ্চ দেখা যাইতেছে। দূরে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাণ্ড বাড়ী। সারি সারি জাহাজ আফিস রহিয়াছে। বৈদ্যুতিক ট্রাম গাড়ী সকল আসিতেছে, যাইতেছে। দূর হইতে আমার মান্দ্রাজ বেশ লাগিতে লাগিল। বড় সাধ হইল, একবার পাড়ে গিয়া দেখিয়া আসি। রো সাহেব ও বন্ধু নাটার পাড়ে যাইবেন, আমাকে লইয়া যাইবেন, বলিলেন। প্রাতঃ ভোজনের পরে আমরা চারিজন মান্দ্রাজে গেলাম। ভাড়া পাইবার জন্য অনেক নৌকা আমাদের জাহাজের নিকটে আসিয়াছিল। এক খানা ভাড়া করা গেল। পাড়ে লাগিবামাত্র কতকগুলি পাণ্ডার মত লোক আসিল। সমস্ত স্থানে লইয়া যাইবে, সমস্ত কথা বলিয়া দিবে। আমাদের ঐ প্রকার লোকে বড় বেশী প্রয়োজন ছিল না। অনেক সময় আছে, প্রায় ১২ ঘণ্টা, ইহার মধ্যে সমস্ত স্থান সুন্দর রূপে দেখিতে পারিব। আমরা পাণ্ডা লইলাম না। সর্ব্ব প্রথমে ডাক ঘরে গেলাম। অতি সুন্দর বাড়ী। তবে আমাদের কলিকাতার ডাকঘরের মত গুম্বজ নাই। পোষ্টকার্ড কিনিয়া চিঠি পত্র লিখিয়া আমরা হাইকোর্টে গেলাম। হাইকোর্ট প্রকাণ্ড অট্টালিকা। ঘুরিয়া ২ অনেক গুলি এজলাস দেখিলাম। দেশী ব্যারিষ্টার এবং উকিল মোক্তার সকলেই শূন্যপদে বিচরণ করিয়া থাকে! তাহারা কেহই পাদুকা ব্যবহার করে না! মন্দ নয়, জুতার অনবরত মস্ মস্ শব্দ হয় না; তবু যেন কেমন আপ্‌ছাড়া দেখায়। চোগা, চাপকান, পেনটুলেন (বা মান্দ্রাজী রেশমী ধুতি) পরা, কিন্তু পা খালি! আমার বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হইল! কত স্থানে কত প্রকার রীতি, দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। তার পর দেখি-

লাম, আলোক-স্তম্ভ; সময়ের অল্পতা হেতু এবং অন্যান্য কারণে আমরা আর উঠিলাম না। সেই স্থান হইতে আমরা ষ্টেসনে গেলাম। ষ্টেসনটি দেখিবার জিনিষ। প্রকাণ্ড, বেশ সুবন্দোবস্ত। কিছুক্ষণ ষ্টেসনে বেড়াইয়া আমরা সাবান কিনিতে গেলাম। এমন ময়লা ও ধূলিময় স্থান আমি নিশ্চয়ই আর কখনও দেখি নাই। সে আর বলিবার নয়। রাস্তায় বোধ হয় কোন কালে জল দেওয়া হয় নাই। চাহিলে, বুঝি বা, সমুদ্রও বুজান যায়। এদিক ওদিক দেখিয়া, সাবান কিনিয়া ফিরিলাম। ফিরিবার সময় অনেক আঙ্গুর কেনা গেল। যদিও মান্দ্রাজ বড় সুন্দর স্থান নয়, অন্ততঃ জাহাজ হইতে যত ভাবিয়াছিলাম, তত নয়, তবুও তিনদিন পরে জমিতে বেড়াইয়া বেশ আনন্দ হইল, সমস্ত বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও তৃপ্ত হইলাম। ফিরিয়া গেলাম, তখন বেলা প্রায় সাড়ে পাঁচটা। আধ ঘণ্টা বিশ্রামের পরই আহার করিতে গেলাম। ক্ষুধা হইয়াছিল, বেশ আহার করিতে পারিলাম। রাত্রি দশটার সময় আমাদের জাহাজ ছাড়ে। আমাদের অনেক বন্ধু এই খানে অবতরণ করেন, আবার অনেকে আরোহণ করেন। যাঁহারা আসেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন উল্লেখ-যোগ্য—Mr. Macpherson, এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্-এ, স্কট্‌লণ্ড বাসী। এমন লোক আমি আজও দ্বিতীয় দেখি নাই। এমন ভয়ানক সমালোচক যে কাহারও সহিত তাঁহার বনিবনাও হইত না। তিনি যত স্থান দেখিয়াছেন, সমস্তই খারাপ। এমন কি, তাঁহার নিজের দেশও তাঁহার ভাল লাগিত না। তিনি তাহারও নিন্দা করিতেন। যে লোক স্বদেশকে ভালবাসিতে না জানে, সে কি নীচ পশুদের মধ্যেও স্বদেশ-হিতৈষণা আছে। সহজেই বুঝিতে পারিবে, তিনি আমাদের দেশকে কিরূপ সমালোচনা করিতে লাগিলেন। আমি একেবারে চুপ, কি করিব, নীরবে ক্রন্দন করা ব্যতীত আর উপায় ছিল না। ক্রমে ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিল। জাহাজে এমন লোক ছিল না, যে তাঁহার উপর বীতরাগ না হইয়াছিল। তিনি অন্য বিষয়ে কথা কহিতে, বোধ হয়, জানিতেন না। শেষে ভয়ে তাহার সহিত কেহ মিশিত না; কাছে গেলেই দেশের নিন্দা, দেশের লোকের নিন্দা। এমন লোক কেহ দেখিয়াছ কি? ক্রমে ২ ইহার দুই এক কথা লিখিতে হইবে, যথা স্থানে লিখিব। কাল আমরা ফরাসী নগর পণ্ডিচারী পৌঁছিব।

আজ অক্টোবর মাসের নয়দিন। ইহার মধ্যে এত সাহেব হইয়াছি যে, আজ আশ্বিন কি ভাদ্র, জানিনা, জানিবার উপায় নাই। তবে বাঙ্গালার জানার মধ্যে জানি আজ শুক্রবার। প্রত্যূষে উঠিয়া দেখি, আমরা ভারতের তীর দিয়া যাইতেছি। মান্দ্রাজের অত্যাশ্চর্য্য পর্ব্বত-মালা আমাদিগকে মোহিত করিল। সমস্ত দিন কেবল দেখিতে লাগিলাম। আহা, সমুদ্রের ঢেউগুলি গড়াইয়া গড়াইয়া অবশেষে সেই পর্ব্বত শ্রেণীতে আঘাত পাইতেছে। অন্ধ তরঙ্গ উৎফুল্ল অন্তরে যাইতেছিল, দুষ্ট পর্ব্বত তাহাকে বেন বাধা দিল। বীর তরঙ্গ গর্জ্জিয়া উঠিল। শত হস্ত ঊর্দ্ধে উঠিয়া ভীম পরাক্রমে পর্ব্বতের উপর পর্ব্বত হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু অহঙ্কার পরক্ষণেই চূর্ণ হইল। ভীষণ গর্জ্জনে পর্ব্বতের উপর ভাঙ্গিয়া পড়িল। লজ্জায় মুখ ধবল হইয়া গেল, সমুদ্রের অর্দ্ধেক লজ্জাব্যঞ্জক ফেন রাশিতে ঢাকিয়া ফেলিল। বন্ধুর

এইরূপ পরাজয় দেখিয়া আরও কত শত বীচিমালা পর্ব্বতকে শাস্তি দিতে চলিল। কেমন ভালবাসা! কেমন সুন্দর একতা!! সমুদ্র দুই দিনের পরে বড়ই কঠোর বোধ হইয়াছিল বটে, কিন্তু এই সমুদ্রের সহিত ভূমির দ্বন্দ্ব বড়ই সুন্দর ও ভয়ানক। যদিও সমুদ্র সর্ব্বদাই জয়ী, তবুও ভূমি স্থানে স্থানে দুর্গাদি দ্বারা বেষ্টন করিয়া কোন মতে সমুদ্র হইতে রক্ষা পাইতেছে। যদি কেহ জল রাশির পরাক্রম দেখিতে চান, তাঁহাকে বেশী দূর যাইতে হয় না। সামান্য পদ্মাই তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত! ঘনঘটাচ্ছন্ন বর্ষাকালে রাক্ষসী মূর্ত্তি পদ্মাকে গোয়ালন্দের নিকট যিনি দেখিয়াছেন, তিনি বিশেষরূপে জলরাশির পরাক্রম অবগত আছেন। সমুদ্র ত কত প্রকাণ্ড!

একটু বেলা হইতে না হইতেই আমরা মনোহর বন্দর পণ্ডিচারীতে পৌঁছিলাম। এখন বেলা প্রায় সাতটা। আমাদের আগমন দেখিয়া দুর্গ হইতে তোপ ধ্বনি হইতে লাগিল। আমাদের জাহাজও তোপ ছুঁড়িল। পরস্পরে এইরূপ অভ্যর্থনা করার পর কোন এক সৈনিক পুরুষ আমাদের জাহাজ দেখিয়া গেলেন। আমাদের জাহাজের অনেক খানসামাই পণ্ডিচারীর লোক, বাড়ীর নিকটে আসিয়া কাহারও অসুখ, কাহারও মাতার পীড়া, কাহারও বিবাহ উপস্থিত হইল। অধ্যক্ষের নিকট ছুটি লইয়া তাহারা বাড়ী গেল। প্রায় পাঁচ জন নামিয়া গেল! মাল নামাইয়া দিয়া ও গ্রহণ করিয়া আমাদের এরিডেন আবার চলিল। জাহাজ ছাড়িল বেলা ১০ টায়। আমরাও আহারাদির পর ডেক-চেয়ারে ঘুমাইলাম।

আজকাল শুক্লপক্ষ। রাত্রে চাঁদ দেখিয়া বুঝিলাম, তৃতীয়া কি চতুর্থী। চাঁদের আলোকে সমুদ্রের খেলা কত সুন্দর, লিখিয়া বর্ণনা করিতে আমার ত সাধ্য নাই। প্রত্যহই রাত্রে আমরা চাঁদের আলোতে বসিয়া গল্প করিতাম। কি সুন্দর, অমন দিন আর হইবে না। গল্পে গল্পে ঘুমাইয়া পড়িতাম, চাঁদও ইত্যবসরে বিদায় লইত। পরদিন শনিবারও আমরা ঐ রূপ ভাবে আনন্দে উপকূল দিয়া চলিলাম। আজ আর ভারতের নয় (?) লঙ্কা-দ্বীপের।

রবিবার প্রাতঃকালে আমরা কলিকাতা ছাড়ি, আজ আর এক রবিবার। দেখিতে দেখিতে আট দিন হইয়া গিয়াছে। এই আট দিনে তোমাদের হইতে নিকট প্রায় ১২০০শত মাইল দূরে! এখনও আমাদের প্রায় ৬০০০ হাজার মাইল যাইতে হইবে!! সমস্ত ভাবিতেছি, দূরে ধূ ধূ অসংখ্য অট্টালিকা দেখিতে পাইলাম। বাড়ীগুলির ছাদ প্রায়ই খোলা টালির। চাল বলিলেই হয়। কিন্তু দেখিতে বড় সুন্দর। আমাদের মত গোল গোল খোলা নয়। আলিপুরের চিড়িয়া-খানায় অথবা হিন্দু হোটেলে যে প্রকার টালির ছাদ, ঠিক সেই রকম। নানা রংদ্বারা চিত্রিত। যথার্থই বড় মনোহর। এখন কেবল ঐ সমস্ত চালই দেখিতেছি। প্রায় নয়টা বাজে। আমরা কলম্বো বন্দরের মুখে। সেই খানেই আমাদের জাহাজ থামিল, আমরা (বিলাত-যাত্রীগণ) সিডনী জাহাজ আসিতেছে কিনা দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইলাম। দূরেই সিড্‌নীকে দেখিতে পাইলাম। শীঘ্রই সে বন্দরে প্রবেশ করিল। আমরা পূর্ব্বে আসিয়াও বন্দরের ডাক্তার সাহেবের অপেক্ষায় পড়িয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরেই একখানি ছোট ষ্টীমারে ডাক্তার সাহেব উপ-

স্থিত হইলেন। খালাসী, খানসামা, ইত্যাদি সকলেই তাহাদের নিজ নিজ সাজে সাজিয়া এক সারে ডেকের উপর দাঁড়াইল। কেমন সুন্দর দেখাইতেছে। ডাক্তার সাহেব রেজেষ্টারি লইয়া এক এক করিয়া পরীক্ষা করিলেন। ষ্টুয়ার্ড আসিয়া আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, কেহ কি বোম্বাই হইতে আসিয়াছেন? বোম্বাই মহামারির ভয় কলম্বো পোঁছিয়াছে! প্রায় এক ঘণ্টা কাল পরে আমরা পাশ পাইলাম। বন্দরের মধ্যে আমাদের জাহাজ প্রবেশ করিল।

১০টার সময় আমরা আহার করিলাম। ইতিপূর্ব্বেই আমাদের জিনিস পত্র যথা স্থানে গুছাইয়া রাখিয়াছিলাম। প্রায় ১১টার সময়ে আমাদের জিনিস পত্র একখানি ছোট জাহাজে(Steam-Launch)এ তোলা হইল। আমরা এরিডেন ছাড়িলাম। এরিডেনের খানসামাগণ বড় ভাল লোক। আমরা তাহাদের কিছু কিছু বক্সিস দিলাম।

সিডনীতে গিয়া দেখি, ইহা জাহাজ নয়, যেন সহর। কত প্রকাণ্ড, তাহা ভাষায় জানান কঠিন। তোমরা এরিডেন দেখিয়াছ, সিডনী তাহাকে ছোট নৌকার মত বহন করিয়া লইতে পারে। এরিডেনে দ্বিতীয় শ্রেণীতে মোটে ৩০।৩৫ জনের থাকার বন্দোবস্ত ছিল, এখানে প্রায় দুই শত লোকের বন্দোবস্ত। উপরে গিয়া দেখি ডেক নয়, যেন গড়ের মাঠ! মহা বাজার বসিয়া গিয়াছে। কলম্বোর ফেরিওয়ালা-গণ সব উপস্থিত। এমন জিনিস নাই, যাহা পাওয়া যায় না। গরু, বাছুর, ভেড়া, মুরগি, টার্কি, পায়রা, ইত্যাদি নানা প্রকার জীবজন্তু দেখিলাম। পি এণ্ড ও কোম্পানীতে রক্ষিত মাংস ব্যবহৃত হয়, কিন্তু এ জাহাজে সব (জীবন্ত) সদ্য। অনেকগুলি আমাদের দেশী বাঁদর, হনুমান ফ্রান্সে চলিয়াছে। ইহা ব্যতীত তিনটী ঘোড়া আমাদের সহযাত্রী। গানের ঘর (Music-Room) ধূমপানের ঘর (Smoking Saloon) নাপিতের ঘর(Hair cutter's saloon) আরো কত কি। কি যে নাই, জানিনা। তাই বলিতেছিলাম, ইহা জাহাজ নয়, ছোট সহর। প্রথম শ্রেণীর খাইবার ঘর (Saloon) দেখিবার জিনিষ। বৃক্ষ লতাদি দ্বারা কেমন সুসজ্জিত! তাড়াতাড়ি করিয়া আমরা জাহাজ খানি দেখিয়া লইলাম। আমাদের ঘরে জিনিষ পত্র রাখা হইল, কলম্বো দেখিতে গেলাম। পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম

কলম্বো সহর

বড় মনোহর। না দেখিলে কোন জিনিস উপলব্ধি করা যায় না। হাজার শোন সন্দেস অতিশয় উপাদেয়, সকলেই বলুক না কেন উহার মত উত্তম জিনিস আর নাই, কিন্তু যতক্ষণ না উহার স্বাদ গ্রহণ করা হইয়াছে, ততক্ষণ কিছুই বোঝা হয় নাই। আমরা অতিশয় ব্যগ্র হইয়া সহরে উপনীত হইলাম। একটু দূরে গিয়াই দেখিলাম, কলম্বোর গ্রাণ্ড হোটেল—প্রকাণ্ড বাড়ী। Mr. ও Mrs Rowe সেখানে গেলেন। আমরাও দেখিতে গেলাম। এত বড় হোটেল আমি আর দেখিয়াছি কিনা, জানি না; অবশ্য আমাদের দেশে।

অষ্ট্রেলিয়ার একজন ভদ্রলোক আমাদের সহিত বরাবর আসিতেছিলেন। বৃদ্ধ হইয়াছেন, বয়স অশীতি বৎসর হইবে! বৃদ্ধ বয়সে ভারত দেখিতে ইচ্ছা হইয়াছিল। এখন পুনরায় অষ্ট্রেলিয়া যাইতেছেন। অষ্ট্রেলিয়া ইহার উপনিবেশ। ইহার বাড়ী ইয়ারলণ্ডে। অষ্ট্রেলিয়ার জাহাজ না আসা পর্য্যন্ত

কলম্বোতে থাকিবেন। আমাদের ছাড়িবার সময় আমাদিগকে (Mr. Nutter কে এবং আমাকে) তাঁহার হোটেলে যাইতে নিমন্ত্রণ করেন। আমরা তাঁহার হোটেলের নাম ভুলিয়া গিয়াছিলাম। সৌভাগ্যক্রমে তিনি যাইতেছেন দেখিতে পাইলাম। আমরা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। তিনি আমাদের জন্যই যাইতেছিলেন। কেবল জাহাজের আলাপ! মানুষ কি এত ভালবাসিতে পারে!! হোটেলের নাম Galle Face Hotel, সুন্দর Billiard খেলিবার টেবিল ছিল। বন্ধু নাটার আর তিনি একবার, দুইবার, তিন বার খেলিলেন। আমি খেলা জানিতাম না। বুঝিতাম বটে। চা, লিমনেড, কেক্, বরফ ইত্যাদি আমাদের জলযোগের জন্য প্রস্তুত ছিল। ডিনার খাইতে আমরা অনুরুদ্ধ হইলাম, কিন্তু সাহস হইলনা, পাছে জাহাজ ছাড়িয়া দেয়। তিনটা পর্য্যন্ত হোটেলে থাকিয়া আমরা বেড়াইতে বাহির হইলাম। তিনখানি মানুষ টানা গাড়ী ভাড়া করা গেল। চড়িতে বড় সুন্দর। অনেক মানুষ টানা গাড়ী। সে গুলকে ইংরাজিতে Rickshaw বলে। Breakwater কলম্বোর দেখিবার জিনিষ। আমরা বরাবর সমুদ্রের পাড় দিয়া চলিতে লাগিলাম। এমন সুন্দর দৃশ্য আমি দেখি নাই। এই জন্যই Empress of the East ইহার নাম হইয়াছে। তারপর সমস্ত স্বাভাবিক হ্রদ দেখিলাম। Chinamon Garden এর নাম শুনিয়াছিলাম। একবার খুব তাড়াতাড়ি দেখিয়া লইলাম। আজ পর্য্যন্ত অনেক জায়গা দেখিয়াছি, কিন্তু কলম্বোর মত ছোট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, স্বাভাবিক শোভায় পরিপূর্ণ, স্থান আর দেখি নাই। স্বভাবের কবিমাত্রেরই কলম্বো দেখা আবশ্যক। যদিই বা লঙ্কা সুবর্ণ মণ্ডিত হইত, তবুও বোধ হয় এখনকার অবস্থা হইতে সুন্দর দেখাইত না। প্রকৃতই কলম্বো স্বভাবের রাজধানী।

সন্ধ্যা হইয়াছে। পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে, আমরা বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। আমাদের বৃদ্ধ অষ্ট্রেলিয়ান বন্ধু ঘাট পর্য্যন্ত আসিলেন। তাহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া আমরা নৌকায় উঠিলাম। জাহাজে গিয়া প্রথমত আমাদের ক্যাবিনে গেলাম। আমাদের ক্যাবিনে পাঁচটি বিছানা, কিন্তু লোক আমরা দুইজন এবং আর এক জনের জিনিস দেখিতে পাইলাম। কিছুক্ষণ পরেই জিনিসের মালিক আসিলেন। তিনি পূর্ব্বোক্ত Mr. Macpherson. যদিও তিনি তত ভাল লোক নন, তবুও অপরিচিত ব্যক্তি অপেক্ষা ভাল বিবেচনা করিলাম। কিন্তু পরের বিবরণে জানিতে পারিবে, তাহা নয়। যাহা-হউক, আমরা মুখ হাত ধুইয়া ডেকের উন্মুক্ত বাতাসে গেলাম। সমুদ্র কল্লোলস্নাত পবিত্র সুবিমল বায়ুতে আমাদের ক্লান্তি কথঞ্চিত দূর হইল বটে, কিন্তু নানা প্রকার চিন্তা আসিয়া অত্যন্ত যন্ত্রণা দিতে লাগিল। ভাবিলাম, এই রবিবার সন্ধ্যাকালে তোমরা কি করিতেছ? না জানি কত লোক আসিতেছে, যাইতেছে। আবার ভাবিলাম, এখানে যদি আমার অসুক হয়, কে কাছে আসিয়া বসিবে? আবার দেখিলাম, এই যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে আমার নবজীবন আরম্ভ হইতেছে, যখন ফিরিয়া যাইব, নূতন মানুষ! আরও মনে হইল, ভগবান আমাকে শিক্ষা দিবার জন্য ম্যক্‌ফারসনের মত লোকের সহিত মিশাইতেছেন। আমি যেন শুনিলাম, হাজার লোকে তোমাকে অবজ্ঞা,

ঘৃণা, নিন্দা, অপবাদ, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা করুক না, তুমি কেবল ক্ষমা কর। যদি না করিতে পার, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে না। আবার মহাত্মা যীশুর কথা মনে হইল, যদি তুমি তোমার ভাই মানবের সামান্য ত্রুটী মার্জ্জনা করিতে না পারিলে, কি করিয়া তুমি ভগবানের নিকটে তোমার প্রতি মুহূর্ত্তের শত শত গুরুতর অপরাধের ক্ষমা চাহিতে পার? তখন আবার হৃদয়ে জাগিল "মেরেছ মেরেছ কলসীর কাণা, তাই ব'লে কি প্রেম দেব না'। এই সব ভাবিয়া মন একটু আশ্বস্ত হইল। ভাবিলাম, যাহা হয় হইবে। ভগবান সহায়!

ক্রমে রাত্রি ১০টা বাজিল। আমাদের জাহাজ ছাড়িয়া দিল। আমরা এতক্ষণ ভারতের নিকটে ছিলাম। এইক্ষণ প্রায় তিন বৎসরের জন্য প্রস্তুত হইলাম। আমি সর্ব্বদাই দেশ ভালবাসি, কিন্তু আজকার মত স্বদেশ-প্রেম আমাতে আর কখনও জাগে নাই। ভাবিলাম, একবার স্বদেশকে চুম্বন করিয়া যাই। তিন বৎসর আর দেখিতে পাইব না। শেষে মনে হইল—

"রেখ মা দাসেরে মনে
এ মিনতি করি পদে—
সাধিতে মনের সাধ
ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন করোনাক তব মনঃ
কোকনদে।"

এইরূপ ভাবিতেছি, এদিকে জাহাজ চলিতেছে। প্রকাণ্ড জাহাজ পরাক্রান্ত অকূল সমুদ্রের ভিতরে সামান্য তৃণকণার মত ভাসিয়ে ভাসিতে যাইতে লাগিল। সমুদ্র কৃপা করিলে এমন শত সহস্র, কোটী কোটী অর্ণবপোতকে ইহার বিশাল গর্ভে নিহিত করিতে পারে। কিন্তু তাহার এইক্ষণ ক্ষুধা নাই, নিস্তব্ধে পড়িয়া ঘুমাইতেছে। কোন আন্দোলন নাই, কোন গোলমাল নাই। আমাদের তরণী নিঃশব্দে বেগে তাহার উপর দিয়া ধাবিত হইল। বস্তুতঃ চারিদিক নিস্তব্ধ। আমাদের জাহাজের যাত্রীগণ, কলম্বো দেখিতে গিয়া ক্লান্ত হইয়াছেন, সকলেই নির্জ্জনতাকে আরো নির্জ্জনতার মধ্যে দেখিবা বিশ্রামের জন্য বিশ্রামাগারে গিয়াছেন। ডেকের উপরে আমি আর দুইএক জন ভদ্র লোক। নূতন জাহাজ, কাহারও সহিত এখনও আলাপ হয় নাই। কিছুক্ষণ নির্জ্জনতার সুখ ভোগ করিলাম, কিন্তু অল্পক্ষণেই ক্ষুধা নিবারণ হইল। নির্জ্জনতার সুখ ভোগ করিতে গেলেই 'স্মৃতি' উদরের পীড়া আসে, জানিতাম না। সুখ ভোগ করিতে করিতেই এই সুযোগে পীড়া আসিয়া উপস্থিত হইল। আমার অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। দুঃখে, কষ্টে, যাতনায় আমি 'নির্জ্জনতার' সম্মুখে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিলাম! কেহই বোধ হয় আমাকে দেখিতে পান নাই। যাহা হউক, সুধার উপরে বীতরাগ হইয়া আমি আমার ভগ্ন হৃদয়ে শয্যায় গেলাম। ভাবিয়াছিলাম, নূতন ঘরে, সাহেবদের সঙ্গে (এই আমার প্রথম সাহেবের সঙ্গে বাস) ঘুম হইবে না। কিন্তু দিবসের ক্লান্তির পর কখন কি করিয়া ঘুম আসিল, জানিতে পারিলাম না। ঘুম ভাঙ্গিলে দেখি, সকাল হ'য়েছে। বন্ধু নাটার তাহার হাত মুখ ধুইতে আরম্ভ করিয়াছেন। অপর ব্যক্তি ম্যাকফারসন এখনও উঠেন নাই। চক্ষু মেলিয়া গুড্‌মর্ণিং বলিলাম, উঠিলাম, হাত মুখ ধুইলাম, কাপড় পরিয়া আহার করিতে গেলাম।

রো সাহেবদের ঘর আমাদের ঘরের নিকটেই। জাহাজে লোক অনেক হওয়ায় তাঁহারা, (তিনি ও তাঁহার স্ত্রী) একটী ঘর পান নাই। তবে অধ্যক্ষ বলিয়াছে, প্রথম বন্দরে লাগিলেই কিছু লোক কমিবে, তখন একটী ঘর দেওয়া হইবে। মিসেস্ রো এক ঘরে কোন এক সন্ন্যাসিনী (Nun) এর সঙ্গে থাকেন। মিঃ রো,ডাঃ এলকক ও অপর একটী ফরাসী ভদ্রলোক আপাততঃ এক ঘরে। প্রথমতঃ যে বন্দোবস্তে আমরা পড়িলাম, তাহাতে সকলেরই কষ্ট হইতে লাগিল। আমার ম্যাকফারসনকে ভাল লাগে না, কেননা বড় খিট্‌খিটে রকমের লোক। কেবলই নিন্দা, কেবল অপর দেশের অপবাদ ইত্যাদি। আমাকে একেবারে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। সবে নূতন আমি সাহেব-সংস্পর্শে পড়িয়াছি,—কোথায় না ভাল করিয়া বলিয়া দিবে, এই কর, ঐ কর; তা না, সে কেবল দেশের নিন্দা, রো সাহেবের নিন্দা, সুধু তাই কি,একদিন মুখ ধুইব,সে জল খরচ করিতে দিবে না! যাক্ পরের নিন্দায় কাজ নাই। মোটের উপর আমি ও আমার বন্ধু নাটার জ্বালাতন হইতে লাগিলাম। মিসেস্ রোয়ের ঘরে সন্ন্যাসিনী, তিনি কখন স্নান কিম্বা গা পরিষ্কার করেন না। নিকটে গেলে পেটের ভাত চাল হ'য়ে যায়, বাঘ পালায়। তারপর বিষম গরমে তিনি জানালা খুলিতে দিবেন না!! আমরা মিসেস রোয়ের বিছানা ডেকের উপরে দুই খানা বেঞ্চের উপরে করিয়া দিতাম। তিনি সেই খানে ঘুমাইতেন। এরিডেনে আমাদের বিছানা ডেকের উপরে করিয়া দিত বটে, কিন্তু সিডনীতে সে নিয়ম নাই। মিঃ রো অনেক লোকের সঙ্গে ঘুমাইতে পারেন না। তাহারও কোন রকমে ডেকে শু'তে হইত! এই সমস্ত কারণে আমাদের কাহারই ঘর মনের মত হয় নাই।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, জাহাজ খানি প্রকাণ্ড। জাহাজে লোকও অনেক। সর্ব্বসমেত তিন শ্রেণী জড়াইয়া প্রায় দুই শত হইবে। প্রথম শ্রেণীতে জন দশ পনর। আমাদের শ্রেণীতেই বেশী, প্রায় শত জন, বাকী সব তৃতীয় শ্রেণীর। আমাদের জাহাজ খানি চীন হইতে জাভাদ্বীপ হইয়া আসিতেছে, জাহাজে এত প্রকার লোক যে, সচরাচর দেখা অসম্ভব। জাপানী, চীনদেশবাসী, জাভাদ্বীপবাসী, বাঙ্গালী, মান্দ্রাজী, সিংহলবাসী, ইটালিয়ান, জার্ম্মান, ডাচ্, নরওয়েবাসী, ফরাসী, আমেরিকার নিউইয়র্কবাসী, সুইজারলণ্ডবাসী, ইংরাজ, স্বটলণ্ডবাসী, গোয়ানিজ্ ইত্যাদি ইত্যাদি প্রায় এককুড়ি জাতি! কখনও এত প্রকার লোক দেখিয়াছ কি? সমস্ত লোকের সঙ্গেই অল্লাধিক আলাপ হইয়াছিল। নানা জাতির ব্যবহার জানিবার ইহা কি কম সুবিধা!!! কাহার সহিত কি প্রকার কথা হইত, আমার লিখিতে বড় ইচ্ছা হইতেছে, কেননা, আমি নানা প্রকার কথায় বড়ই উপকৃত হইতাম। কিন্তু তোমরা শুনিবে কি না, জানি না। যাহা হউক,ক্রমে ক্রমে একটু একটু সকলের বৃত্তান্ত দিব ইচ্ছা আছে। বেশীক্ষণ কষ্ট দিব না। খুব সংক্ষেপেই শেষ করিব।

জাপানকে কে না ভালবাসে? স্বাধীনতা-প্রিয় জন সমাজ মাত্রই জাপানের পক্ষপাতী। নয় কি? আমাদের জাহাজে জাপান-লিগেসনের (দূত) প্রধান সম্পাদক (Primer Secretary to the Lagation of Japan) ছিলেন! তিনি সপরিবারে

ইউরোপের নানা স্থান পরিভ্রমণে যাইতেছেন। তাঁহার পত্নী অতিশয় ভদ্র। আমার সহিত বেশ আলাপ হইয়াছিল। সামান্য ইংরাজি জানেন। তাঁহার একটি একবৎসরের বালক সঙ্গে ছিল। তোমরা জান, আমি ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের বড়ই প্রিয়! আমার মনে হয়, তাহারাই ভগবানের স্বর্গরাজ্য। মহাত্মা যীশুর কথা আমি সর্ব্বথা বিশ্বাস করি (অন্ততঃ এই স্থানে। তিনি বলিতেছেন,—"Suffer the little children to come unto me, and forbid them not; for of such is the kingdom of God" Mark. X. 13 14. তাহারা কেমন সুন্দর, নিষ্কলঙ্ক, পবিত্র, সরল। আমি সেই শিশুর সহিত বেশ আমোদ করিতাম। সে আমাকে বড় ভালবাসিত, কেবল আমার কাছে থাকিত। যাক্ কি বলিতেছিলাম;—সেই ভদ্রলোক একদিন আমাদের দেশের কথা পাড়িলেন,—"আচ্ছা, ভারতে কি বীর নাই,—কেবল পরাধীনতার পরবশ হইয়া রহিয়াছে?"

আমি—"হাঁ, দুই এক জাতি ভয়ানক বলবান, সাহসী। কিন্তু তা হইলে কি হইবে, এক জাতির সহিত অপর জাতির মিল কই?'

ভদ্রলোক (সহাস্যে)—বাঙ্গালীরা বড় ভীরু, নয়?

আমি—"হাঁ, যদিও তাহারা যুদ্ধকার্য্যে, কিম্বা দ্বন্দ্ব বিবাদে বিশেষ পটু নয়, তবুও তাহারা লেখা পড়া, বুদ্ধিচালনা, মস্তিষ্কের কাজ করিতে অদ্বিতীয়। তাহাদের উন্নতি অন্যান্য সমস্ত জাতি অপেক্ষা উচ্চ। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাস করিতে তাহাদের সমকক্ষ কেহই হইতে পারে না। এবৎসর একজন বাঙ্গালী Civil service পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছেন।"

তিনি—"বেশ, আমি জানি, অধ্যাপক বসু অনেক বৈদ্যুতিক বিষয় আবিষ্কার করিয়াছেন। সে ত বেশ; নাই বা হলো সাহসী, নাই বা হলো যুদ্ধপ্রিয়। বাঙ্গালা বুদ্ধি জোগাইতে ত খুব পটু। এখন কেবল চাই একতা, মৈত্রী! এক জন অন্ধ এবং এক খঞ্জ, দুই বন্ধু। অন্ধ খঞ্জকে কাঁধে করিয়া লয়, খঞ্জ পথ দেখাইয়া দেয়। এই ত চাই। আমি আশা করি, শীঘ্রই ভারতের সমস্ত জাতি একত্র হইয়া, এক প্রাণে, এক মনে, এক কার্য্যে লাগিবে।"

আমি--"আজকালকার ভদ্রসমাজ সেই চেষ্টাতেই আছেন, কেবল হিন্দুদের মধ্যেই যে কত প্রকার বিভিন্ন সম্প্রদায়, তাহার গণনা করা দুরূহ। তার পর মুসলমান। তাহাদের মধ্যেও দুই তিন শ্রেণী। হিন্দু মুসলমানে চির বিদ্বেষ!!! কবে যে এই বিদ্বেষ যাইবে, বলা যায় না। তবে ইংরাজ শাসন আমাদের দেশের অনেক উপকার করিতেছে। আমার পিতার মতে অন্যূন পঞ্চাশ বৎসর ইংরাজ আবশ্যক। দেখিয়া দেখিয়া রাজনীতি সমুচিত শিক্ষা করিলে পরে ভারত হয় স্বাধীন, অথবা ইংরাজরাজ্য (British Colony) হইয়া দাঁড়াইতে পারিবে! আজি কাল ইয়ারলণ্ডে যেমন বন্দোবস্ত, কেনেডায় যেমন শাসন প্রণালী, ভারতেও তাহাই হইবে। ভারতে পার্লামেণ্ট, হইবে এবং ভারত শাসন ভারতবাসীর হাতে ন্যস্ত হইবে!!! অথবা সমুচিত উন্নত হইলে ইংরাজ সৈন্য-বিভাগ পরাস্ত করিয়া ভারত স্বাধীন রাজ্য হইবে! হায়, সে দিন অনেক দূর। আমাদের মত তিন চারি জীবন পশ্চাতে লুকাইয়া আছে!!!"

তিনি স্বাধীন মানুষ, লাফাইয়া উঠিলেন। "হাঁ, যথার্থই তখন জাপান ভারতকে সাহায্য

করিতে পারে"। আমি দেখিলাম, স্বাধীন জাতির ও আমাদের ন্যায় দুর্দ্দশাগ্রস্ত পরাধীন জাতিতে কত তফাত। যদিও আমি অত্যন্ত উত্তেজিত ভাষায় অন্তরের অন্তরতম স্থানের প্রকৃত বিশ্বাসের কথা বলিয়াছিলাম, তবু নিশ্চয় বাঙ্গালী ইহাতে কিছু মাত্র উত্তেজিত হইত না। হয়ত "বটে বটে" করিয়া সারিত। কিন্তু এই দৃশ্য কি ভয়ানক! নৈনিক পুরুষ দাঁড়াইয়া তরবারি হস্তে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন—'হা সেদিন জাপান ভারতকে সাহায্য করিতে পারে !!!"

আমি বলিলাম—"আমার বিশ্বাস, ভারত সাদরে জাপানের সাহায্য গ্রহণ করিবে। কিন্তু সে ভবিষ্যতের কথা। আজ কাল আমাদের দেশে ইংরাজ-শাসন বড়ই সুন্দর। যদিও দুর্দ্দান্ত নীচজাতি ইংরাজবর্গ নানা প্রকারে অন্যায় ব্যবহার করে, তবু সে সমস্ত ভারতের পক্ষে বিষম শিক্ষা। রাজনীতি কাহাকে বলে, ভারত জানিত না। জানিলেও বহু দিন পূর্ব্বে। এখন পরিচালনা অভাবে একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল। এখন আবার প্রথম হইতে শিক্ষা করিতেছে। আমার মতে ইংরাজ শাসন হইতে পুনরায় হাতে খড়ি হইয়াছে। ইংরাজ শাসন, রাজনীতির মহা বিদ্যালয়! এখানে দেখিয়া, ভুগিয়া অবশেষে দাঁড়াইতে হইবে। নয় কি?"

তিনি বলিলেন—"হা, শুনিয়াছি, ইংরাজ ভারতকে উত্তম শাসন করিতেছে। আমার ইচ্ছা আছে, আমি একবার ভারতে গিয়া দেখিয়া আসি। আচ্ছা, এখন যদি কোন বাঙ্গালী রাজা হয়, তবে কি হইবে?"

আমি—"রাজনীতি বিশেষ না জানা দরুণ, রাজ্য হয়ত ছারে খারে যাইবে। হয়ত, রাজার মন্ত্রী একজন ইংরাজ হইবেন! রাজা তাহাদের হাতে সমস্ত ন্যস্ত করিয়া, অন্দর মহলে শত শত সুশ্রী মহিলাবর্গ বেষ্টিত থাকিয়া নিজকে সুখী মনে করিবেন। একবারও রাজ্যের বিষয় কিম্বা প্রজার কথা স্মরণ করিবেন না। সুধু তাই কি? তাঁহার উচ্চপদস্থ বাঙ্গালী কর্ম্মচারী পদে পদে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিবে। বিশ্বাসঘাতকতা তাহাদের ধর্ম্ম! সৎ কি অসৎ, যে কোন উপায়েই, স্বীয় কামনা ও বাসনা চরিতার্থতার জন্য অর্থ পাইলেই হইল!"

তিনি—"কি আশ্চর্য্য, আমাদের দেশে সামান্য ঘুষ্ পর্য্যন্ত লয় না। সামান্য কর্ম্মচারী কখনই ঘুষ লইবেনা!!!"

এই প্রকার অনেক কথা হইল। আমি যাহা বলিতেছিলাম, তাহা ভুল হইতে পারে, কিন্তু আমি যত দূর দেখিয়াছি, তত দূর বলি নাই। তোমরা কি মনে কর? আমি কি বড় ভুল করিয়াছি? কেন তোমরাত আগরতলার কথা জান! রাজার না কয় শত কচ্ছ রাণী!! যথার্থই দেশের কথা ভাবিলে কান্না পায়। দুই একটী সুরেন্দ্রনাথ, সামান্য একটী জাতীয় সভা, হায়, তাহা কি দেশ উদ্ধার করিতে পারিবে। বোধ হয় না! চরিত্র কই, জীবন কই? এবারের জাতীয় মহাসভার বিবরণ এখনও পাই নাই; জানি না, কি হইয়াছে। এইবারইত ভাঙ্গিবার উদ্যোগ হইতেছিল। হিতবাদীর হিত বচনে, সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতায় আমাদের কাহার কাহার হিংসাপ্রিয়তায় (?) কিম্বা কোমর-বাঁধা অভ্যাসে আমাদের অতিশয় প্রিয় প্রাণের সভা অসময়ে, অকালে, শৈশবাবস্থায়ই কালগ্রাসে পতিত হইতে চলিতেছিল!! তাহাতে আবার দিন দিন, দরিদ্র ভারতের সহায় সম্বল, উজ্জল নক্ষত্র সকল ধীরে ধীরে অকালে ঝরিয়া পড়িতেছে!' আশা কোথায়!!

উদ্যম কাহাকে বলে, আমরা বড় বেশী জানি, বিশ্বাস হয় না। আমাদের সহিত নরওয়ে বাসী পাঁচজন লোক ছিলেন। তাঁহারা বাণিজ্যের জন্য সাইবিরিয়াতে গিয়াছিলেন। জাহাজ ডুবি হওয়ায় পুনরায় দেশে যাইতেছেন। তাঁহারা সকলেই পুনরায় বাণিজ্যে আসিবেন, বলিতেছেন। তাঁহাদের নিকট সেই সমস্ত গল্প শুনিতে খুব ভালবাসিতাম। যখন জানিলাম, তাঁহাদের মধ্যে একজন ছয়বার জাহাজ ডুবিতে পড়িয়াছিল, তখন আমার আশ্চর্য্য বোধ হইল। আমাদের দেশের একে ত কাহারও জাহাজ নাই। থাকিত যদি, তবু একবার জাহাজ ডুবিলেই ঢের! বাপ্ আবার!! সভ্যতার তারতম্য নয় কি?

আমি এখন আরও দুই একটি ঘটনা বলিব। পাশ্চাত্য পরসেবা যেমন বিখ্যাত, আমাদের পরের ক্ষতি করা সেইরূপ। নূতন জাহাজে আসিবার পূর্ব্বে, আমরা যখন এরিডেনে ছিলাম, তখন আমাদের সঙ্গে কলিকাতা হইতে এক ইংরাজ-মহিলা আসেন। তিনি বোধ করি, কোন প্রচারিকা হইবেন। যাহা হউক, তিনি বেশ বাঙ্গালা শিখিয়াছেন, বেশ সুন্দর লিখিতে পারেন। তাঁহার পণ্ডিচারীতে যাইবার কথা ছিল। কিন্তু মন্দ্রাজে আমাদের জাহাজ আসিলে, এক রুগ্ন মহিলা আমাদের জাহাজে আরোহণ করেন। তাঁহার সহিত অপর কেহই ছিল না। পূর্ব্বলিখিত মহিলা এই নবাগতার সমস্ত ভার লইলেন। তিনি যখন বমন করিতেন, তিনি অম্লান চিত্তে পরিষ্কার করিতেন। সারাদিন তাঁহার বিছানার পার্শ্বে বসিয়া থাকিতেন! রাত্রে খাবার দিলে নিকটে থাকিয়া বাতাস দেওয়া ইত্যাদি নানা প্রকারে তাঁহার সেবা করিতেন। তিনি পণ্ডীচারিতে নামিলেন না। রুগ্না পর্য্যন্ত তাহার সঙ্গে গেলেন!!! কলম্বোতে রুগ্না বায়ুপরিবর্ত্তনে যাইতেছিলেন। তোমরা এই ঘটনাকে কি মনে কর, জানি না, আমি কিন্তু একেবারে স্বর্গের ছবি দেখিলাম! দেশে কটা এই প্রকার ঘটনা দেখিয়াছ?—অপরিচিতের কথা দূরে যাক্, পরিচিতের কথাই জিজ্ঞাসা করি।

টেবিলে আমি, প্রথমে, রো সাহেব এবং সেই ম্যাক্ফার্সনের মধ্যে বসিতাম, আমার সম্মুখে এক ইটালিয়ান-মহিলা বসিতেন। তাহার পার্শ্বে মিসেস রো। মিঃ রো সাহেবের ডানদিকে ডাঃ এলকক বসিতেন। ম্যাকফারসন, খাইবার সময় কেবল জ্বালাতন করিত। এটা নয়, ওটা নয়। এই কাঁটা ধরা হ'ল না। ঐ রকম প্রণালী নয়, ইত্যাদি নানা প্রকার খুঁত ধরিয়া বেড়াইত। পূর্ব্বে বলিয়াছি, দেশের নিন্দা তাহার ব্যবসা। সে টেবিলে বসিয়াও সে কার্য্য হইতে বিরত থাকিত না! মিঃ রো এ সমস্ত ভালবাসিতেন না। আমি যাহা করি, আমার আচার ব্যবহার ইতিমধ্যে এমন হইয়া পড়িয়াছে, যেন ঠিক সাহেব!! সে সমস্তই মিঃ এবং মিসেস রোয়ের অনুমোদিত। তবে যে ম্যাকফারসন বলে, সে কেবল আমাকে বিরক্ত ও নিজের বিজ্ঞতা প্রকাশ করিবার জন্য! সে যে সুধু আমাকেই বলে, তাহা নয়। সকলেই তাহার উপর বীতরাগ। জাহাজে এত লোক, তাহার মধ্যে তাহার পক্ষপাতী, একজন নাই, পক্ষপাতী হওয়া দূরে থাক্, সকলেই বিরোধী!!! "যেমন ব্যবহার করা যায়, তেমন ব্যবহার পাওয়া যায়।" যাক্ কি বলিতেছিলাম। কি বলিলাম,—একদিন সে আমাকে বলিতেছে, একটু মদ্যপান কর। আমাকে

আপ্যায়িত কর্‌লেন আর কি! আমি বলিলাম—"না মহাশয়, আমি কখন ও মদ খাই নাই, প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, কখনও খাইব না। ও সুধারস পান আপনাদের জন্য। আমি পাশ্চাত্য জগতে মদ্যপান শিক্ষা করিতে যাইতেছি না!" তবুও সে ছাড়ে না!!! মিঃ রো পার্শ্ব থেকে বলিলেন,—"No Sir, his father does not want him to take wine." তিনি এমন গম্ভীর স্বরে বলিলেন যে, সব চুপ্। ইহা কি ঠিক পিতার কার্য্য নয়? পর দিন মিসেস্ রো তাঁহার পাশে আমাকে লইয়া বসাইলেন। আমি সেই দুর্দ্দান্তের হাত হইতে রক্ষা পাইলাম। মাতা আর কি বেশী করিয়া থাকে!! যথার্থই মিঃ এবং মিসেস রো আমাকে মা বাবার মত ভালবাসেন। একদিন মিঃ রো খাইবার সময় বলিতেছেন, "Mary, the boy in your left looks like your another child.' কি সুন্দর!

১১ই, ১২ই, ১৩ই, ১৪ই, ১৫ই, ১৬ই, ১৭ই, আজ সাত দিন আমরা কলম্বো ছাড়িয়াছি, কিন্তু এ কয় দিন কেবল জল, একটুও স্থল দেখি নাই। দুই একখানি জাহাজ, দুই একটী পাখী। উড্ডয়নশীল মৎস্য নাম শুনিতাম, কিন্তু কখনও দেখি নাই। এখন কত যে দেখিতেছি, জানি না। এক দিন ভোরে একটা আমার ঘরে উড়িয়া আসিয়া পড়িয়াছিল। আমি ধরিলাম। ষ্টুয়ার্ডকে বলিয়া বাল্‌তিতে জল আনাইলাম। কিন্তু বেচারি জল আনিবার পূর্ব্বেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। মাছটী বড় বেশী বড় নয়। কই মাছের মত বড় হয়। তাহা অপেক্ষা কখন বড় হয় না। দেখিতে কই মাছের মত। অথবা পাশে-মাছের মত। ডানা দুইটী তাহার শরীর হইতে অনেক বড়। আর দেখিতে পাই, অনেক শুশুক। এক এক স্থানে প্রায় পাঁচ ছয় শত দেখিতাম। মনে হইত, সমুদ্র ছাইয়া পড়িয়াছে। এই সাত দিন পরে আজ আমরা জমির কাছে আসিয়াছি। আমাদের জাহাজ এডেনে থামিবে না। আফ্রিকা উপকূলে ফরাসী-বন্দর জিবুটীতে (Djibotil) থামিবে। বেলা ১০টার সময় সেইখানে পৌছিলাম। কেবল মরুভূমি—বালী ধু ধু করিতেছে। আর গরম বিষম। তিষ্ঠান দায়। আমি ভুলিয়া গরম কালের পোষাক আনি নাই। আমার অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল। এখানে আমাদের জাহাজ কয়লা লইবে। কয়লা লইতে প্রায় তিন ঘণ্টা লাগিবে। জাহাজ ছাড়িবে বোধ হয় ৬টার সময়। আমি একবার ভাবিলাম, নামিয়া স্থানটা দেখিয়া আসি। কিন্তু বিষম গরম, তাই গেলাম না। আমাদের সহিত একজন জাবা-দ্বীপবাসী উদ্ভিদতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি জীবুটী দেখিতে যান। তিনি ফিরিয়া আসিলে দেখিলাম, তিনি সাত মাইল ঘুরিয়া পাঁচ প্রকার গাছ আনিয়াছেন। একটীও বড় গাছ নাই। সমস্তই ছোট চারা। ১০টা হইতে ছয়টা পর্য্যন্ত ঘুরিয়া হাত দশেক জাগা দেখিতে পান সবুজ। সেইস্থানে ও তাহার কাছে কাছে এই কয় প্রকার উদ্ভিদ!!! ইহাকেই বলে আফ্রিকার মরুভূমি! তিনি পিপাসায় জলের চেষ্টায় গিয়াছিলেন। মাইল কতক ঘুরিয়া সামান্য জল পাইলেন। হোটেল গিয়া লেমনেড্ চাহিলে, তাহারা হা করিয়া থাকে, লেমনেড্ কি?

বৈকাল ছয় টার সময় জাহাজ ছাড়িল। আমরা শীঘ্রই লোহিত সাগরে আসিয়া পড়িলাম। বিষম গরম! সাহারার উষ্ণ বায়ু আমাদের যেন প্রাণ কাড়িয়া লইতে লাগিল।

১৯শে, ২০শে, এবং ২২শে আমরা এই-রূপ Redseaর ভয়ানক উত্তপ্ত বায়ু সেবন করিয়া চলিলাম। ২৭শে অক্টোবর আমরা সুয়েজে পৌঁছিলাম। সুয়েজ খালের বিশেষ বিবরণ পরসংখ্যায় লিখিব, এইবার এই পর্য্যন্ত।

স্নেহের সেবক প্রভাত।
২৭ শে নবেম্বর, ১৮৯৬, শুক্রবার,
১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৩০৩।

বিদেশী বাঙ্গালী। (৪)

গোলোকনাথ।

যে অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন মহাত্মার নাম এই প্রস্তাবের শীর্ষদেশে উল্লেখ করা গিয়াছে, ইনি বাঙ্গালী খ্রীষ্টান-কুলের অন্যতম ভূষণ ছিলেন। সমগ্র পঞ্জাব প্রদেশে ইঁহার নাম ও গুণাবলী মহাভক্তি ও প্রেমের সহিত সহস্র কণ্ঠে উচ্চারিত হইয়া থাকে; বিদেশী বাঙ্গালী সমাজের পক্ষে গোলোকনাথ কেবল অন্যতম নেতা ছিলেন না, দয়া দাক্ষিণ্য, মমতা, স্বদেশবৎসলতা—সাধুতা প্রভৃতি অসাধারণ গুণাবলীর তিনি আকর ছিলেন। গোলোক নাথ চট্টোপাধ্যায়ের জীবনী চারি অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ১ম বাল্যজীবন, ২য় খ্রীষ্ট-জীবন, ৩য় ধর্ম্মপ্রচারক এবং চতুর্থ শিক্ষক ও পরোপকারক।

গোলোকনাথের পিতা কলিকাতায় নীলকুঠীর কর্ম্ম করিতেন; * এই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ আলেক্‌জান্দর ডফ্ সাহেব কলিকাতা নগরীতে দেশীয় বালকদিগের ইংরাজী শিক্ষার জন্য একটি স্কুল স্থাপনা করেন, গোলোকনাথ এই স্কুলে বিদ্যাশিক্ষার জন্য প্রেরিত হন। এখন এই স্কুলটি ফ্রিচর্চ্চ-মিশন কলেজ নামে খ্যাত। গোলোকনাথের ধর্ম্ম প্রবৃত্তি ক্রমে যিশুখ্রীষ্টের দিকে প্রণত হইতেছে দেখিয়া, তাঁহার পিতা তাঁহাকে স্কুল হইতে গৃহে লইয়া যান এবং বাইবেল পড়িতে নিষেধ করেন। অল্পকাল পরে গোলোকনাথ চট্টোপাধ্যায় গৃহ হইতে পলাইয়া যান, পলাইবার সময় তাঁহার সঙ্গে কয়েকটি মাত্র রৌপ্য মুদ্রা, দু একটা স্বর্ণালঙ্কার, একটা তাম্র পাত্র এবং দুই একখানা পুরাতন বস্ত্র ভিন্ন আর কিছুই ছিলনা। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে সপ্তদশ বৎসর বয়ক্রম কালে গোলোকনাথ গৃহত্যাগী হয়েন। সে সময়ে রেল বা টেলিগ্রাফ ছিলনা। পথের সর্ব্বত্র দস্যুভয় এবং সমগ্র দেশ অশান্তিতে পরিপূর্ণ; পুলীশের বন্দোবস্ত নাম মাত্র ছিল বলিলেই হয়। সন্ন্যাসীর বেশে তিনি বাঙ্গালা দেশ পরিত্যাগ করেন, লেখা পড়া তাঁহার জানা ছিলনা, সঙ্গে সহায় কেহই নাই এবং বঙ্গদেশের বাহিরে যে সকল ভাষা প্রচলিত, তাহারও তিনি কিছুই জানিতেন না। একখানি উর্দ্দু গ্রন্থে, বৃদ্ধ বয়সে পণ্ডিত-প্রবান গোলোকনাথ লিখিয়াছিলেন, "আমি সোণার সংসার পরিত্যাগ করিয়া বিদেশে আসিয়াছিলাম; দেবতুল্য পিতা, দেবীরূপী মাতা, যুবতী স্ত্রী, স্নেহময়ী ভগিনী প্রভৃতিকে ত্যাগ করিয়া আমি দেশত্যাগী হইয়াছিলাম। হিন্দুধর্ম্মে অনাস্থা স্বদেশ পরিত্যাগের প্রধান কারণ।" যাহা হউক, নানা স্থানে নানা প্রকার কষ্টে দিনপাত করিয়া বালক গোলোক বারাণসী

---

* This paper forms the substance of a lecture on the life of the Revd. Golak Nath Chatterjee delivered by the writers at a special meeting of the Chintadripettah Christian Association in, Madras on the 6th day of November, 1896.

ধামে পৌঁছিলেন; তথা হইতে আলাহাবাদ, দিল্লী প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করিয়া তিনি পঞ্জাবের লুধিয়ানা নগরীতে বিশ্রাম লাভ করিলেন। এখানে কোনও কার্য্যালয়ে অতি সামান্য বেতনে তাঁহার একটি চাকুরী যুটিল, শেষে ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে পাদ্রী নিউটন সাহেব কর্ত্তৃক গোলোকনাথের খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম-গ্রহণের চিহ্ন স্বরূপ বাপ্তিস্ম ক্রিয়া সমাপ্ত হইল। হিন্দু গোলোকনাথ খ্রীষ্টান হইলেন।

খ্রীষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া গোলোকনাথের সমস্ত জীবন যেন পরিবর্ত্তিত হইল। শারীরিক ও মানসিক তেজ এবং সৌন্দর্য্যে দিনে দিনে গোলোকনাথ বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন; আধ্যাত্মিক বলেও তিনি শেষে প্রকৃষ্ট রূপে বলীয়ান হইয়া উঠেন। দেখিতে দেখিতে নানা ভাষায় গোলোকনাথ দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন; সুন্দর স্বভাব, নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, অসাধারণ পাণ্ডিত্য, শারীরিক বল, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা,ধন, মান, যশ, আধিপত্য প্রভুত্ব প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার সময়ে পঞ্জাব প্রদেশে কেহই সমকক্ষ ছিল না। গোলোকনাথ চট্টোপাধ্যায় নিজের মানসিক গুণ ও সুন্দর স্বভাবের বলে অতি সামান্য অবস্থা হইতে উন্নীত হইয়া একজন মহাপুরুষ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ভগবানে আত্মসমর্পণ এবং পরদুঃখ-মোচনের জন্য স্বকীয় স্বার্থত্যাগ গোলোকনাথের জীবনের মহা সৌন্দর্য্য।

লুধিয়ানায় অবস্থান করিতে করিতেই গোলোকনাথ সংবাদ পাইলেন, তাঁহার বাল্যবিবাহের সহধর্ম্মিণী পরলোকগতা হইয়াছেন। ইহাতে কিছুকাল তিনি দুঃখিত অন্তঃকরণে যাপন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ভগবানে ভরসা থাকায় তাঁহার চিত্তের শান্তি লোপ পায় নাই। অনন্তর গোলোক নাথ কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলেন। গোলোক নাথ চট্টোপাধ্যায় যে সময়ে খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করেন, সে সময়ে ভারতবর্ষে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সী ব্যতীত খ্রীষ্টান মিশনরীদিগের প্রভুত্ব হয় নাই; পঞ্জাব তখন শিখদিগের শাসনাধীন,সুতরাং পঞ্জাবে খ্রীষ্টান ধর্ম্ম প্রচার করা আর স্বহস্তে স্বপদে কুঠারাঘাৎ করা প্রায় সমতুল্য ছিল। কোন ব্যক্তি বলিয়াছেন—

"Golak Nath became a convert to Christianity when the dawn of Christian religion was yet far below the horizon in the Panjab: He became a Christian at a time when a handfull of European missionaries in Ludhiana stood as watchmen upon the walls of Zion looking expectantly and prayerfully for the first rays of the light of the sun of righteousness amid the surrounding gloom of error and superstition".

যাহা হইক, গোলোকনাথ লুধিয়ানা এবং তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহে খ্রীষ্টের মাহাত্ম্য প্রচার এবং কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদ্যালয়ের পরিদর্শকের কার্য্য করিতে লাগিলেন। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের সন্ধি পত্রের স্বর্ত্তানুসারে শিখ সর্দ্দারগণের অতুলনীয় প্রভুত্ব তখন পঞ্জাবের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত ছিল। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্চনদের চারিদিকে শিখেরা এতদূর যথেচ্ছাচারী হইয়া উঠিল যে, যে দিকেই দেখ "নরহত্যা, ব্যভিচার, সতীত্বনাশ, ডাকাইতি, লুণ্ঠন, সুরাপান, ধর্ম্মহীনতা, কুসংস্কার, মূর্খতা এবং পাশব প্রবৃত্তি ভিন্ন আর কিছুই বিদ্যমান ছিলনা।" সদাচার, শান্তি, ভদ্রতা, ধর্ম্ম, বিনয়, এ সকল যেন দেশ হইতে দূরে পলাইয়া গেল। দুষ্টের দমন করিবার কেহ ছিলনা, যিনি রক্ষক তিনিই ভক্ষক হইয়া উঠিলেন। শিখ-সর্দ্দারগণের হস্তে, রাজা কাঠের পুত্তলিকাবৎ অকর্ম্মণ্য হইয়া বসিয়া রহিলেন। ঠিক

এই সময়ে গোলোকনাথ চট্টোপাধ্যায় পঞ্জাবের সমাজ-সংস্কার এবং পঞ্জাবে শিক্ষা বিস্তার করিবার জন্য লুধিয়ানা পরিত্যাগ করিয়া ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন; খ্রীষ্টের দেবোপম চরিত্রের কথা পঞ্জাবের প্রজাকুলকে শুনাইবার জন্য তিনি প্রথমে উৎসুক হইলেন। যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে শতদ্রু পার হইয়া অপর তটে যাওয়া বড়ই দুষ্কর ব্যাপার ছিল; সরকারী পরোয়াণা ব্যতীত পঞ্জাবী ভিন্ন আর কেহ এই নদ পার হইবার অধিকারী ছিলনা; বিশেষতঃ দেশীয় বা ইউরোপীয় খ্রীষ্টানদিগকে শতদ্রুর অপর পারে যাইতে দেখিলেই শিখেরা তাহার মস্তক ছেদন করিত। নির্ভয়ে গোলোকনাথ শতদ্রু পার হইলেন; অপর পারে গিয়া "বিদ্যা-শিক্ষার আবশ্যকতা" এবং "নির্ম্মল চরিত্রের গুণ" সম্বন্ধে দুই দিন ওজঃস্বিনী বক্তৃতা করিলেন, প্রজারা শতমুখে তাঁহার প্রশংসা করিল, কিন্তু তৃতীয় দিবসে যখন তিনি "খ্রীষ্টের উদার চরিত্র ও খ্রীষ্ট ঈশ্বরাবতার" এই বিষয়ে ব্যক্তৃতা করিতেছিলেন, তখন সমগ্র শিখ, হিন্দু ও মুসলমান তাঁহাকে প্রহার করিতে লাগিল। অবশেষে গুরুতর রূপে আঘাত করিয়া সায়াহ্নে ফিলোর দুর্গের অভ্যন্তরে অশিক্ষিত দুষ্টেরা গোলোকনাথকে বন্দী করিয়া রাখিল, এই দুর্গ শতদ্রু তটে এখনও বর্ত্তমান, সম্প্রতি এখানে একটি রেলওয়ে ষ্টেশনও নির্ম্মিত হইয়াছে। গোলোকনাথের এই অবস্থা সম্বন্ধে জনৈক লেখক লিখিয়াছেন—

"There, while like a brave watchman, he was lifting the lamp of the Gospel amid the surrounding darkness of heathenism, and on a soil where no Gospel messenger's foot had ever trodden, Golak Nath was suddenly seized by the neck from behind, and the infuriated anti-Christian mob dragged him mercilessly towards the part which was built by Ranajit Sing after the treaty of 1809. In this deadly part amidst a forest, Golak Nath was made secure under the crushing weight of two huge stone-mills and deprived (for hours togethers) of food and waters."

সমস্ত রাত্রি উপাসনা ও সঙ্কীর্ত্তনে গোলোকনাথ মহানন্দে যাপন করিলেন, তাঁহার অতুলনীয় ধর্ম্মভাব দেখিয়া দুষ্টেরা ভয় পাইল, দুর্গরক্ষকদিগের পাষাণ হৃদয় বিগলিত হইল; অবশেষে প্রভাতে তাহারা গোলোকনাথকে মুক্তি দান করিল।

১৮৫৭ অব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে গোলোকনাথ "পাদ্রী" বা "রেভরেণ্ড" উপাধি প্রাপ্ত হইয়া জলন্ধরে প্রেরিত হইলেন। জলন্ধর তখন জঙ্গলে পরিপূর্ণ; জঙ্গল কাটাইয়া, পাদ্রী গোলোকনাথ অতি রমণীয় মিশনাশ্রম স্থাপন করিলেন। এই মিশনাশ্রমে গির্জ্জা, দাতব্যখানা, পাঠাগার, পুস্তকালয়, অনাথালয়, প্রভৃতি সংযুক্ত হইল। অথচ গোলোকনাথ মিশন হইতে একটি পায়সাও লয়েন নাই। চাঁদা উঠাইয়া এই সকল বৃহৎ ব্যাপার সম্পাদন করিলেন। সকল শ্রেণীর লোকের নিকট তিনি এতদূর প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, কৃপণেরাও তাঁহাকে সাহায্য দান করিত। গোলোকনাথের সমস্ত জীবন পরোপকারে ব্যয়িত হইয়াছিল। অনাথের সেবা, দরিদ্রের পালন, মূর্খকে শিক্ষাদান, পীড়িতের চিকিৎসা, অধার্ম্মিকের সংস্কার প্রভৃতি কার্য্যেই তাঁহার আনন্দ লাভ হইত। গোলোক নানা ভাষায় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহার নানা ভাষায় বিরচিত গ্রন্থাবলী পঞ্জাব ট্রাক্ট্ সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। ১৮৫৭ অব্দে জলন্ধরে এবং

জলন্দর পার্শ্বে বিদ্রোহী সিপাহীরা শত সহস্র লোকের প্রাণ বধ করে, অনেক দেশীয় খ্রীষ্টান এবং অনেক ইংরাজ তাহাদের হস্তে শমন সদনে প্রেরিত হয়, কিন্তু গোলোক নাথের মস্তকের একটি কেশও কেহ স্পর্শ করে নাই, গোলোকনাথ সর্ব্বত্রই "মহাপুরুষ" এবং "দেবানুগৃহীত মহাত্মা" বলিয়া পরিচিত ছিলেন। এই সময়ে কর্পূরতলার মহারাজা বিদ্রোহী সিপাহিদিগের সহিত মিলিয়া বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষতা করিতে ইচ্ছুক হয়েন, গোলোকনাথ মহারাজাকে অনেক বুঝাইয়া নিরস্ত করেন এবং অবশেষে তাঁহা-রই পরামর্শ মতে কর্পূরতলার মহারাজা গবর্ণমেণ্টের "মদৎগার" অর্থাৎ সহায় হয়েন। বিদ্রোহের শান্তি হইলে, মহারা জাকে পুরস্কার দিবার জন্য গোলোকনাথ গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করেন গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর কর্পূরতলার মহারাজাকে অযোধ্যার অন্তর্গত বরাইচ তালুকদারী জায়-গীর স্বরূপে উপঢৌকন দেন। সেই হইতে কর্পূরতলার রাজবংশের সহিত গোলোক নাথের মহামিত্রতা জন্মিল, ঐ জায়গীর এখ-নও কর্পূরতলা-ষ্টেটভুক্ত। রেভরেণ্ড গোলোক নাথ বহুসংখ্যক ব্যক্তিকে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করেন, পাদ্রী আবদুল্লা এবং তাঁহার সহ-ধর্ম্মিণী এখনও জীবিত, ইঁহারা গোলোক নাথের শিষ্য। বিখ্যাত রেভরেণ্ড মিষ্টর আবদুল্লার এক কন্যা পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট বালিকা বিদ্যালয় সমূহের পরিদর্শিকা, অপর কন্যা একজন সুপ্রসিদ্ধা চিকিৎসিকা। গোলোকনাথের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিষ্যের কথা আ-মরা এখনও বলি নাই; কর্পূরতলার মহা-রাজাধিরাজের জ্যেষ্ঠপুত্র প্রিন্স যুবরাজ হর-নাথ সিংহ বাহাদুর গোলোকনাথ কর্ত্তৃক খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া পিতৃসিংহাসন ও পিত্রা-লয় পরিত্যাগ করেন; পিতা আপন পুত্রকে বরাইচ তালুকদারী দান করিয়াছেন, প্রিন্স হরনাথ সিংহ বাহাদুর বরাইচে এখনও জীবিত। শ্রীমান হরনাথ সিংহ কেবল গোলোকনাথের শিষ্য নহেন, গোলোকনাথের জামাতাও বটেন। ইনি পাদ্রী গোলোকনাথের এক কন্যাকে বিবাহ করেন। প্রিন্স হরনাথ সিংহ এক্ষণে জি, সি, এস, আই, উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি বিলাতে গিয়া শ্রীশ্রীমতী মহা-রাণী ভিক্টোরীয়ার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তথায় মহা সমাদর প্রাপ্ত হয়েন। মহারাজা হরনাথ সিংহের রাণী জীবিতা; তাঁহার কয়ে-কটি পুত্র (অর্থাৎ গোলোকনাথের দৌহিত্র) ইংলণ্ডে বিদ্যাভ্যাস করিতেছে। গোলোক নাথের দ্বিতীয়া স্ত্রী কাশ্মীর দেশীয়া ব্রাহ্মণ-কন্যা ছিলেন; পাদ্রী গোলোকনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র পঞ্জাবে বারিষ্টার, দ্বিতীয় পুত্র অম্বালায় পাদ্রী, তৃতীয় পুত্র লাহোর গবর্ণমেণ্ট কলেজে অধ্যাপক এবং চতুর্থ পুত্র সিভিল সার্ভিসে প্রবিষ্ট। গোলোকনাথ নিঃসম্বলাবস্থায়, বাল্য বয়সে সহায়হীনতায়, মূর্খের ন্যায় বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়াছিলেন, চরিত্র ও সাহস এবং অধ্যবসায় ও স্বয়ম্ভু সমুত্থানশক্তিবলে পঞ্জাবে অদ্বিতীয় পুরুষ হইয়া উঠেন। ধনে, মানে, প্রভুত্বে, বিদ্যায়, তাঁহার সময়ে পঞ্জাবে তাঁহার সমকক্ষ কেহই ছিল না। তিনি লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর হইতে কুলী মজুর পর্য্যন্ত সকলেরই প্রিয় ও সম্মানার্হ ছিলেন; তাঁহার নামে পঞ্জাবে "বাঘে ছাগে" এক ঘাটে জল খাইত। গোলোকনাথ অতুল ধনের অধিকারী হইয়া মৃত হয়েন, তিনি নগদ তিন লক্ষ টাকা রাখিয়া মরেন এবং তদ্ব্যতীত বহুসংখ্যক ভূ-সম্পত্তি নানস্থানে খরিদ করিয়া গিয়াছেন।

গোলোকনাথের চেষ্টায় পঞ্জাবে সর্ব্বপ্রথম শিক্ষার সূত্রপাত হয়। তাঁহার পূর্ব্বে কেহ এ বিষয়ে চেষ্টা করেন নাই। তিনি নানাস্থানে ইংরাজী স্কুল ও দেশীয় ভাষার পাঠশালা স্থাপন করিয়াছিলেন, বহু স্থানে চিকিৎসালয়, লেক্‌চর-হল, রিডিংরুম, লাইব্রেরী, অনাথাশ্রম এবং ধর্ম্মালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে, পঞ্জাবের তদানীন্তন লেঃ গবর্ণর সার রবার্ট মণ্টগমরীর সাহায্যে তিনি পঞ্জাবে স্ত্রীশিক্ষার সূত্রপাত করেন এবং কয়েকটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ২রা আগষ্ট তারিখে জলন্দরে ৭৬ বর্ষ বয়ক্রম কালে গোলোকনাথের মৃত্যু হয়। তাঁহার সমাধি সময়ে তিন সহস্র লোক উপস্থিত ছিলেন; তাঁহার মৃত্যুর পরে পঞ্জাবের খ্রীষ্টান ও অ-খ্রীষ্টান ভদ্র লোকেরা চাঁদা তুলিয়া গোলোকনাথের নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন। জলন্দরের দ্বিতীয় গির্জ্জা Golak Nath memorial Church গোলোক নাথের স্মৃতিচিহ্ন।

মহাত্মা রেভরেণ্ড গোলোকনাথ মরিয়াছেন কিন্তু মৃত হইয়াও তিনি জীবিত। "He died with a nation's weeping" সমগ্র পঞ্জাব প্রদেশের প্রজাকুলের হৃদয়ে তিনি এখনও জীবিত; পঞ্জাবের আজি কালিকার শিক্ষিত যুবকেরা তাঁহার চেষ্টার ফল স্বরূপ। পঞ্জাবের স্ত্রীশিক্ষা, পুরুষ-শিক্ষা, ধর্ম্মচর্চ্চা, সমাজ-সংস্কার, এ সকলের গোলোকনাথই প্রধান ও মূল। পঞ্জাবের দাতব্যালয় সমূহের তিনিই প্রথম উৎসাহদাতা। পঞ্জাবে গোলোকনাথের নাম কখনই লুপ্ত হইবে না; "Golak Nath was the Pioneer of education in the Land of the five waters". Mrs. Mackenzie's Journal. পঞ্জাব প্রদেশে, কোনও বিদেশী পুরুষ গোলোকনাথের স্থানাধিকার করিতে পারে নাই; পঞ্চনদে বাঙ্গালী মাহাত্ম্যের গোলোকনাথই মূল। খ্রীষ্টধর্ম্ম ও খ্রীষ্টসমাজ সম্বন্ধে পঞ্জাবে গোলোকনাথ যাহা করিয়া গিয়াছেন, ইউরোপীয় মিশনরীর শত বৎসরের চেষ্টায় তাহার অর্দ্ধাংশ হওয়াও সুকঠিন।

বিদেশী বাঙ্গালী সমাজের গোলোকনাথ অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা; বঙ্গদেশের বাহিরে দেশীয় খ্রীষ্টান সমাজের গোলোকনাথ ভিন্ন আর কোনও বাঙ্গালী-খ্রীষ্টান বিদেশে এত বড় মহাপুরুষ হইতে পারেন নাই। এই দৃষ্টান্তে বেশ বুঝা যায়, খ্রীষ্টান হউক আর হিন্দু হউক, ধীমান বাঙ্গালী যদি উপযুক্ত কর্ম্মক্ষেত্র পান, যদি মানসিক বলের পূর্ণ স্ফূর্ত্তির স্থান পায়, তাহা হইলে শীতপ্রধান, গ্রীষ্মপ্রধান প্রভৃতি যে স্থলেই হউক না, তিনি স্বজাতির ও স্বদেশের মুখোজ্জ্বল করিতে সম্পূর্ণরূপে সমর্থ হইতে পারেন। বাঙ্গালার বিদেশ গমনের যাঁহারা বিরোধী, তাঁহারা দেশের মহা বৈরী; ঈশ্বর করুন সমুদ্র পারেও—সুদূর ইউরোপ, আমেরিকা ও আফ্রিকা ভূমিতেও—বাঙ্গালীর নামে ফুল চন্দন পড়ুক।

শ্রীগোপালচন্দ্র শাস্ত্রী।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

বিচ্ছেদ।

বেহাগ

জাগিতে ঘুমাতে রে পড়ে মনে
সেই কাল বরণ
ঘুমায়ে স্বপন দেখি, কানাই কানাই বলে ডাকি
মা বলে, কোথায় তোর কানাই এখন,
অমনি মনে পড়ে সেই কালবরণ।
মার ডাকে চেয়েদেখি, লাজে পুন মুদি আঁখি
হৃদয় মাঝারে পুন' করি দরশন
জাগিতে ঘুমাতেরে সেই কালবরণ।
কেমন মোহন কাঁতি, অলকা পূরিত ভাঁতি,
পাশে বসি নত আঁখি মধু পরশন,
জাগিতে ঘুমাতেরে পড়ে মনে সেই কালবরণ।
কুসুম তুলি ভরি ডালা, গাঁথয়ি চিকণমালা,
গলে তোর দিতে যাই ও কাল বরণ
সরমে মুদলি আঁখি, আঁখি পরে চেয়ে থাকি,
আঁখিতে আঁধার করে মুদয়ে নয়ন,
অমনি হৃদয় মাঝে সে কাল বরণ॥
জাগিতে ঘুমাতেরে পড়ে মনে
সেই কাল বরণ
খেলা ঘর বেঁধে আয়, আবার খেলি দুজনায়
আনাদরে পড়ে আছে ছেলেমেয়ে সব এখন।
চিরদিন খেলার সাথী তুইরে আমার
কাল বরণ
লুকোচুরি কত খেলা, কানাইরে সাঁজের বেলা,
বেঁধেছি যে প্রেমের পাশে লুকাবে কি
কাল বরণ।
জাগিতে ঘুমাতেরে পড়ে মনে
সেই কাল বরণ।
ধূলোদিব ধূলোনিব ধূলোয় ধূলোয় সাজাইব,
চড়দিব চুমোদিব, হাসাইব কাঁদাইব
খেলার সাথী খেলি আয় কালবরণ
সাঁজের বেলায় গেলি কোথায়
ফেলে আমায় কালবরণ,
জাগিতে ঘুমাতেরে পড়ে মনে
কাল বরণ।

প্রেমদাস বৈরাগী

দেবপুষ্পরথ।

১

ভূতলে নেমেছে নাকি দেবপুষ্পরথ!
নবগ্রহ তার চাকা,
কনক রজত মাথা,
উজলিয়া উঠিয়াছে উদয় পর্ব্বত!
ভূতলে নেমেছে নাকি দেবপুষ্পরথ!

২

ভূতলে নেমেছে নাকি দেবপুষ্পরথ,
হেমন্তে আগুন মাসে,
মেঘে শীত জমে' আসে,
মরকতে মোড়া যেন নভ নীল পথ!
ভূতলে নেমেছে নাকি দেবপুষ্পরথ!

৩

ভূতলে নেমেছে নাকি দেবপুষ্পরথ,
কমল-কলস চুড়ে,
পলাশ পতাকা উড়ে,
মরাল বাহনে তারে বহে মনমথ!
ভূতলে নেমেছে নাকি দেবপুষ্পরথ!

৪

ভূতলে নেমেছে নাকি দেবপুষ্পরথ,
চন্দ্রসূর্য্য গেছে নিবা,
সেরূপে মলিন দিবা,
চাকায় চাকায় ঘোরে বসন্ত শরৎ!
ভূতলে নেমেছে নাকি দেবপুষ্পরথ!

৫

ভূতলে নেমেছে নাকি দেবপুষ্পরথ,
যে দেশে সে 'রাঙ্গামেলা',
বটতলে করে খেলা,

উল্লাসে 'ধবলেশ্বরী' ঢালিছে রজত!
সে দেশে নেমেছে নাকি দেবপুষ্পরথ!

৬

ভূতলে নেমেছে নাকি দেবপুষ্পরথ,
প্রেমদা দেখেছে তারে,
নেমেছে কুটীর দ্বারে,
আলোকে হাসিল ঘর সুধা স্বপ্নবৎ!
ভূতলে নেমেছে নাকি দেবপুষ্পরথ!

৭

ভূতলে নেমেছে নাকি দেবপুষ্পরথ,
প্রেমদা দেখিল হেসে,
কোলেতে জন্মিল এসে,
সে পুণ্য আনন্দ আলো সৌভাগ্য সম্পৎ!
ভূতলে নেমেছে নাকি দেবপুষ্পরথ।

৮

ভূতলে নেমেছে নাকি দেবপুষ্পরথ!
হুলু দেয় কুলনারী;
আনন্দে ভাসিল বাড়ী,
আনন্দে ভাসিল যেন এ ক্ষুদ্র জগৎ!
ভূতলে নেমেছে নাকি দেবপুষ্পরথ।

৯

ভূতলে নেমেছে নাকি দেবপুষ্পরথ,
সে এক স্বর্গের শিশু,
নহে বুদ্ধ নহে যীশু,
সে আরো পুণ্যের পুণ্য পবিত্র মহৎ!
ভূতলে নেমেছে নাকি দেবপুষ্পরথ!

১০

ভূতলে নেমেছে নাকি দেবপুষ্পরথ,
পিতৃগণ মহোল্লাসে,
চপলা চমকে হাসে,
অশনি—দুন্দুভি বাজে সুর নহবৎ!
ভূতলে নেমেছে নাকি দেবপুষ্পরথ!

শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দাস।

অনন্ত বিরহ।

১

প্রথম বিরহ; রূপগুণ শুনি
লালসা হইল মনে,
কোথা থাকে সেই, কোন্ পথে যায়,
নিরখি তারে কেমনে?
তৃষিত এদুটী, নয়ন চকোর
সে চারু চাঁদ বয়ান
জুড়াইবে হায়, সে লাবণ্যামৃত
বারেক করিলে পান।

২

নিরখি নয়নে, বাড়িল যাতনা
দূরেতে নিরখি তারে,
নিকট না হলে, জুড়ায় না প্রাণ
বিরহ দ্বিগুণ বাড়ে।
কাছে বসি বসি, হেরি মুখ-শশী
দাঁড়ায়ে রূপের ছায়।
নয়ন ভরিয়া, সে রূপ হেরিয়া
এ প্রাণ জুড়াতে চায়।

৩

নিকটেতে পেয়ে, বাড়িল বিরহ
পরশের অভিলাষী,
জুড়াইতে চায়, বুকেতে ধরিয়া
সেরূপ-নির্ম্মাল্য রাশি,
শিরীশ-কোমল, সে তনু পরশি
হারাইয়া আন জ্ঞান;
আবেশে অলস, ঘুমন্ত নয়ন
লাবণ্য করিবে পান।

৪

হইল পরশ, শোণিত জোয়ার
তপত বহিল জোরে,
আঁধার দেখিনু চারিদিক সখি,
অধীরা করিল মোরে।

অবশ শরীর, শিথীল বন্ধনী
দুরুদুরু হিয়া কাঁপে,
"ঘামে তিতি গেল, সব কলেবর
না জানি কেমন তাপে।"

৫

সম্বরি সজনি, বাড়িল বিরহ
যাতনা বুকেতে রাখি,
দেহের বিচ্ছেদ, মিটাই কেমনে
হৃদয়ে হৃদয় মাখি।
মিলনের বুকে, বিরহের বাসা
এ দুখ জানাব কাবে,
বুকের উপরে, মাথাটী রাখিয়া
ডুবিনু বিরহ ধারে।

৬

তখন, একটি চুম্বনে, প্রিয়তম মম
হৃদয় করিলা পান,
তটিনী ডুবিল, সাগর সঙ্গমে
ঘুচিল দ্বৈতের ভাণ।
নাহি পাপপুণ্য, নাহি ধর্ম্মাধর্ম্ম
নাহি সুখ দুঃখ লেশ,
নাহি আমি তুমি, স্বর্গ মর্ত্তাভূমি
মিলন, বিরহ ক্লেশ।

৭

কিন্তু, এভাবস্বজনী, ঘুচিল চকিতে
ভাঙ্গিল ঘুমের ঘোর,
একঅঙ্গে আধা, আধাশ্যাম রাধা
দৈতাদ্বৈত ভাবে ভোর।
হারাইয়া প্রাণ, প্রাণভরে কাঁদি
সাধা'য়ে সাধিয়ে মরি,
মরণের ঘরে, জন্মিল জনম
সবে বলে হরি হরি।

৮

প্রণয়ী বাঁচেনা, অভেদ মিলনে
শ্যাম-সোহাগিনী রাধা,
ক্ষণেক হাসিবে, ক্ষণেক কাঁদিবে
বিরহ মিলনে বাঁধা।
বিরহ ছাড়িয়া, প্রণয় লালসা
প্রেমিক মানয় ভুল,
অনন্ত লীলায়, বিরহ মিলন
এক বৃন্তে দুটীফুল।

শ্রীমনোরঞ্জন গুহ।

অশ্রুজল।

১

কেনই বা অশ্রুজল করি পরিহার,
শোক তাপে দিবানিশি করি হাহাকার।
কেনই বা প্রাণ কাঁদে,
না হেরিলে মৃত চাঁদে,
মরণ স্মরণে কেন হৃদয় বিদার!
কেনবা ভাবনা আসে,
কেনবা কাঁপি তরাসে,
কেন শূন্যময় হেরি শ্মশান-সংসার।
কেহ কারু ভবে নয়
তবু মনে হেন লয়
মায়ায় দেখায় কেন জগত আমার।
ভালবাসিয়াছি যারে
বিনা পণে অকাতরে
হৃদয় সর্ব্বস্ব যেই হৃদয় মাঝার,
নাহি পাব ভবে আর
প্রাণধনে পুনর্ব্বার,
যদি পাই, তবু নয় শরীরে তাহার।
তথাপি সান্ত্বনা পাই ফেলি অশ্রুধার।
মন যার যার সনে
নিদারুণ, প্রতিক্ষণে,
জীবনে মরণ জ্বালা সহি অনিবার,
তথাপি সান্ত্বনা পাই ফেলি অশ্রুধার।
সে গেল, সে গেল, আহা ফিরিবেনা আর,
রহিল আহার নিদ্রা এ শরীর-ভার।

রহিল লোচন, কিন্তু গেল যে চন্দ্রমা,
রহিল জগত, গেল প্রকৃতি সুষমা,
রহিল শ্রবণ, গেল রব মধুরিমা,
রহিল সকলি, গেল পরশ গরিমা,
পঞ্চ ইন্দ্রিয় বিহীন
দিনে দিনে দেহ ক্ষীণ
রহিল কেবল ছায়া অতি কদাকার,
তথাপি সান্ত্বনা পাই ফেলি অশ্রুধার।

২

কেন ঝরে অশ্রুজল অতি নিরমল,
কোথায় প্রেয়সী আহা হৃদয় কোমল!
হৃদয়ের আধখানি! প্রণয়ের খনি!
জীবন-পরশ-মণি! আশা-সৌদামিনী!
জীবন মরণ সম তোমার বিহনে,
এস প্রিয়ে একবার এস গো স্বপনে।
জীবনে বুদ্ধুদ তুমি জীবনে মিলেছ,
প্রতিধ্বনি সমতুমি পবনে মিলেছ,
আমি শশী তুমি ত আকাশ,
আমি ভানু, তুমি পরকাশ,
আমি তরু, তুমি পল্লবিনী
আমি মেঘ, তুমি সৌদামিনী,
আমি পিক তুমি কুহুরব,
আমি ফুল, তুমিত সৌরভ।
আমি গিরি তুমি নির্ঝরিণী,
আমি দেহ জীবন রূপিনী।
কলকণ্ঠ রাজহংসি মানসে আমার,
প্রেম তামরস মাঝে দিতে গো সাঁতার।
স্মরিলে সে সব কথা
হৃদয়ে দারুণ ব্যথা
পাশরি কেমনে,
এস গো প্রেয়সি! এস এস গো স্বপনে।
তপন-তাপিত ধরা ফেলে গো নীহার,
আয়ের গিরির শিরে জমাট তুষার,
নয়নে কেন না বহে মম অশ্রুধার।
কেজানে হইবে কিনা দোঁহার মিলন
কোন কালে,
হইবে আবার ফিরে প্রণয় তেমন
মম ভালে?
দেহ দুই; এক সূক্ষ্ম, স্থূলতম আর,
কেমনে সে হেন প্রেম ঘটিবে আবার,
তথাপি সান্ত্বনা পাই ফেলি অশ্রুধার।

শ্রীশরচ্চন্দ্র গুপ্ত, এম এ।

দেখা।

"প্রেমের তড়িৎ বেড়ায় ছুটিয়া
অলখিতে হৃদি ছুঁয়ে;
যেচে যেচে প্রাণ ছুঁয়ে।"
স্মৃতির মলয়ানিলে কি ছবি জাগিল,
সোহাগে জড়ায়ে বাহু বাহু-লতা-পাশ.
প্রেমালস, স্বপ্নাবেশ, ঘুমাইতেছিল
অন্তস্তলে; বিম্বাধর চুম্বিত প্রয়াস।
সমাধি সুরভি যথা, কুসুক মরিয়া,
বায়ু বুকে ছবি খানি; যেন ভোলা গান,
ভাষাহীন সুর বাজে রহিয়া রহিয়া,
বিদিত তাহার যা'র স্মৃতি অবসান।
বিথারি বৈদ্যুতি টানে যাদুকর মন,
সরল মোহিনী মন্ত্র, পরশনে টুটে,
লক্ষ যোজনেতে গ্রহ-বিশ্ব আকর্ষণ,
তাড়িত-প্রবাহ হৃদি কূলে কূলে ছুটে।
প্রেমময় ছায়াময় ঘুমঘোর মাখা,
যেন স্থির সৌদামিনী সচকিত দেখা।

শ্রীমতী সুরবালা বসু (কাহালগাঁ)।

প্রাণের দেবতা।

তাহারে ছোঁবনা আমি সেযে গো দেবতা
এসেছি পূজিব বলে, পূজিব হৃদয় খুলে,
নাইবা কহিল কথা—না কহিনু কথা।
কথাত কথার কথা কাজ প্রাণে প্রাণে,
দরশ স্বর্গের ধন, পরশে কলুষ মন,
দরশনি চাহে লোক দেবতার স্থানে।

দরশ দেবের ভোগ্য, পরশ পিশাচ যোগ্য
দরশে জ্বলিয়া ওঠে ধরমের ভাতি,
পরশন হতে ভাল দরশন জাত।
আঁখিতে রাখিয়া আঁখি, দূর হতে চেয়ে দেখি
দাওগো এ বুকে বল অগতির গতি।
অনুদিন অতৃপ্ত, পাই যেন দরশন,
শুধু দরশন দিও প্রিয় প্রাণপতি।
নাইবা ছুঁইলো অঙ্গ না কহিল কথা,
বুকে রাখি সদা শুচি, ভকতি প্রসূন পূজি,
দূরে দূরে ভালবাসি প[illegible] [illegible]।

শ্রীমতী সুখদা দাস।

সন্ধ্যা।

প্রতিদিন কি মোহন সুরে দাঁড়ায়ে গগন তটে তীরে,
মোহময় অব্যক্ত ভাষায়, সে [illegible] কি সঙ্গীত গায়।
সে সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে জগত নীরব হয়ে যায়।
স্নেহময়ী জননীর মত স্নেহ হস্ত বুলাইয়া শিরে,
আঁধার অঞ্চল দিয়া ঘেরি জগতের দেহখানি ধীরে।
নীরব সুধীর পদক্ষেপে ধীরে ধীরে স্বপন মতন,
যে নব মোহন মন্ত্র গাহি সন্ধ্যা যবে করে আগমন,
কি গভীর কবিত্ব মাধুরী ফুটে উঠে এ বিশ্ব মন্দিরে,
কি এক মহান [illegible] তারকা গায় ধীরে ধীরে।
[illegible] স্নিগ্ধ ধব[illegible] [illegible] উঠে স্বপন [illegible],
[illegible] [illegible] হয় ধীরে গো[illegible] প্রকাশ।
কি গভীর গাম্ভীর্য্য গৌরবে ভরে উঠে বিশ্বের আনন,
[illegible] যেন শুষ্ক প্রাণে শুনে কার আশীষ বচন।
সন্ধ্যার গৌরব গীত গাহি উথালিয়া বাহিগো তটিনী,
সুগভীর অরণ্য হইতে উঠে মহা বন্দনার ধ্বনি।
দিবসের কনক চুম্বন ফুটে উঠে সন্ধ্যার ললাটে,
চুম্বিতে ও রক্তিম বরণ মেঘগুলি আসে ধীরে ছুটে।
[illegible] নীরবে আধফুট সুমোহন তানে,
যেন কোন রহস্য কাহিনী বলে সন্ধ্যা ধরণীর কানে।
[illegible] শুনি পদধ্বনি জাগিয়া নিদ্রিত আঁধার,
[illegible] যায় সুধীর গমনে [illegible] স্নান [illegible] তার।

শ্রীমতী লজ্জাবতী বসু।

ভারতের দুর্ভিক্ষ সমস্যায় জাতীয় মহা-সমিতি।*

অনুরাগী দলের আনন্দ হিল্লোল এবং বিরাগীদলের নিন্দা প্লাবন মস্তকে বহন করিয়া, এবার কলিকাতা নগরে, জাতীয় মহা সমিতির দ্বাদশ অধিবেশনের কার্য্য সুচারু রূপে নির্ব্বাহ হইয়া গিয়াছে। আমরা পূর্ব্ব হইতে শুনিয়া আসিতেছিলাম যে, এবার কার দারুণ দুর্ভিক্ষের জন্য জাতীয় মহা সমিতির অধিবেশনের একান্ত প্রয়োজন। আশা করিয়াছিলাম, নিরন্ন ক্ষুধা-কাতর অসংখ্য নরনারীর রক্ষা ব্রত গ্রহণ করিয়া মহাসমিতি সর্ব্ব সাধারণের আশীর্ব্বাদ-ভাজন হইবেন। মনে করিয়াছিলাম, এই মহা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জাতীয় মহাসমিতি স্বীয় অস্তিত্ব-প্রতিষ্ঠার সুন্দর, অক্ষয়, অটল কারণ-ব্যূহ রচনা করিবেন। কিন্তু বুঝিয়াছি, সকল আশা বৃথা। এখন বুঝিতেছি, দরিদ্রগণের প্রোথিত অস্থি-স্তুপের উপর, বাহ্যাড়ম্বর, কথা, উপদেশ ও বক্তৃতারূপ অঙ্কুর ভিত্তিতে মহা সভা এদেশে দাঁড়াইয়া থাকিবে। অহো দুর্ভাগ্য!

আমরা জাতীয় মহা সমিতির অকৃত্রিম বন্ধু। বন্ধুর নিকটও মানুষ মত বিরুদ্ধ উপদেশ শুনিতে চাহে না। কোন কথার প্রতিবাদ করিলেই মানুষ শত্রু বলিয়া মনে করে। পূর্ব্বে জাতীয় মহা সমিতি সম্বন্ধে কয়েকবার আমরা কিছু লিখিয়াছিলাম বলিয়া নিন্দিত এবং তিরস্কৃত হইয়াছিলাম। অনেকে আমাদিগকে জাতীয় মহা সমিতির শত্রু বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। তা করুন এই ভারতের উন্নতির জন্য যিনি যে কোন সৎকাজে ব্রতী, তিনিই আমাদিগের কৃতজ্ঞতার পাত্র। সকল সৎকাজের সহিতই আমাদের প্রাণের যোগ। দূরে থাকি, আর কাছে থাকি—সকল কাজের সাফল্যের জন্যই বিধাতার নিকট আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া থাকি।

* জাতীয় মহাসমিতি সম্বন্ধে ঠাকুরদাস বাবুর একটা বড় প্রবন্ধ আগামী বারে বাহির হইবে।

কিন্তু কি জানি কেন, কাজের পরিবর্ত্তে বৃথা জল্পনা, হিতৈষণার নামে প্রতারণা, ধর্ম্মের নামে ভণ্ডামী দেখিলেই আমাদের প্রাণ অস্থির হয়! এই মহা সভার মহা আনন্দের ব্যাপার দেখিয়া কত লোকের নাকি উৎসাহ বৃদ্ধি হয়, কিন্তু এই হতভাগ্য আমাদের কেবল অশ্রুপতন হয়! এবার পীড়ার নিদারুণ কষাঘাতে প্রথম তিন দিন সভায় যাইতে শক্তি ছিল না।— একদিন সময় বৃদ্ধি হইয়াছিল, তাই চতুর্থদিনে যাইতে পারিয়াছিলাম। যখন এক একজন প্রবীণ বক্তার মঞ্চ-আরোহণের সময় "হিপ্ হিপ্ হুররে৷" রবে চতুর্দ্দিক আন্দোলিত হইতেছিল, তখন কি জানি কেন, আমাদের কেবলই দীর্ঘ নিঃশ্বাস নির্গত এবং অশ্রু পতন হইতেছিল। অনেকক্ষণ, স্থানাভাবে, দাঁড়াইয়া দেখিলাম, ভারতের প্রবীণ ব্যক্তিগণ মিলিয়া যাহাকে মহাসভা বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন, তাহা যেন অস্থায়ী বক্তৃতার উচ্ছ্বাস তরঙ্গ মাত্র! বুঝিলাম, মহা ব্যাপার নয়, যেন মহা ছেলেমী। বাঙ্গালীদিগকে বম্বের পার্শী সম্প্রদায় কথা-সর্ব্বস্ব জাতি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। ক্রমে ক্রমে বাঙ্গালীর অনুকরণে ভারতের কর্ম্মদক্ষ অন্যান্য জাতি সমূহও কি বাক্যবাগীশ হইয়া উঠিবে?

একটী গল্প শুনিয়াছি। এক বন্ধুর একটী ছোট ছেলে একদিন প্রাঙ্গণে কতকগুলি বালি স্তূপাকার করিয়া তদুপরি একটী ঝাটার কাটী পুতিয়া বাড়ীর সকল লোককে ডাকিয়া বলিয়াছিল—"দ্যাখ এসে আমি কি করেছি" এই অদ্ভুত ব্যাপার মানুষকে না দেখাইলেই নয়! বাড়ীর লোকেরা বালকের এই ক্রীড়া দেখিয়া হাসিয়া আকুল! জাতীয় মহা সমিতির এই কথা সর্ব্বস্ব ব্যাপার-টাও আমাদের মনে সেইরূপই মনে হয়। পৃথিবীতে এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহারা কোন কাজ করিবে না, কেবল উপদেশ দিবে। জলে ডুবিয়া লোক মরিতেছে দেখিলে বিদেশে লোক আনিতে সংবাদ পাঠাইবে! আগুণে বাড়ী পুড়িয়া যাইতেছে, যখন তখন কমিটী ডাকিয়া পরামর্শ করিতে বসিবে। এবার দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে মহাসমিতির ঘণ্টাব্যাপী বক্তৃতা এবং উপদেশ পড়িয়া আমাদের এই সকল কথাই মনে হইতেছে। মহা অপদার্থতার মহা মেলা—হৃদয়হীন হুজুগপ্রিয় লোকের মহা হুজুগ—সম্মান-প্রত্যাশী লোকের স্বার্থ-জালবিস্তার। হা ভগবান, এ দেশের উদ্ধার তুমি এমন সকল লোকের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছ !!

মহা সমিতিতে এবার প্রতিনিধি বড় অল্প উপস্থিত ছিলেন—বড় জোর ৮০০। এজন্য কেহ কেহ টিটকারী দিতেছেন। ইহাতে শক্তি-লঘুতার পরিচয় নাই। ৮০০ লোকের মধ্যে শতটী লোকও যদি প্রকৃত হৃদয়বান, চরিত্রবান, স্বার্থ-হীন দেশ-হিতৈষী থাকেন, তাঁহাদের শক্তি অপরিমেয়। একা ম্যাটসিনি যদি একটা দেশ স্বাধীন করিতে পারে, শত অঘোরনাথ কি তাহা পারে না? অবশ্যই পারে। কিন্তু অঘোরনাথের ন্যায় প্রকৃত স্বদেশ হিতৈষী এ দেশে বড়ই বিরল। এই যা দুঃখ। সুরেন্দ্র নাথ হিতবাদীর সাহায্যে নৃত্য করেন, কি আনন্দ মোহন সঞ্জীবনীর সাহচর্য্যে উল্লাস করেন, তাহা শোভা পায়, কেননা, তাঁহারা যাহাই হউন, দেশের বড় লোকত বটেন! একসময়ে লর্ড ক্রসের ভারত-কাউন্সিল বিলের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া থাকিলেও, তাঁহারা আজ কাউন্সিলে বসিয়া "মাননীয়" উপাধি পাইয়াছেন ত, তাঁহাদের সকলই শোভা পায়। কিন্তু তুমি, আমি, সে, যাহারা কখনও দেশের জন্য ভাবে না, যাহারা এক মুষ্টি ভিক্ষা দেওয়াকে পাপ মনে করে, যাহারা আত্মীয় পোষণকে অলসতার প্রশ্রয় দেওয়া রূপ মহাপাপ মনে করিয়া, একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা সর্ব্বনাশের মূল ভাবিয়া, বিচ্ছিন্নতার রাজ্যে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া মহাসুখে আছে, তাহারা যদি এহেন মহারথীগণের সহিত নৃত্য বা উল্লাস করে,

তবে তাহা সাজে কি? যাত্রার সং বলিয়া কি মনে হয় না? হিতৈষণার ভেঙ্গান-সাজ পরিলে হিতৈষণা গজাইতে পারে, কেহ কেহ বলেন। তাহা অসম্ভব। ময়ূরপুচ্ছ পরিয়া কখনও কাক ময়ূর হইতে পারে না। না— কখনও ভেক ধরিয়া, ভস্ম মাখিয়া ভণ্ড ভক্ত-সন্ন্যাসী হইতে পারে না। ব্রাহ্মসমাজের মাঘোৎসবে অনেকের ক্রন্দন শুনিয়াছি—কি পরক্ষণেই দেখিয়াছি, যে চরিত্রহীন, সেই চরিত্রহীন। কনগ্রেস্ মণ্ডপ পরিত্যাগের পর অনেক প্রতিনিধি দেখিয়াছি, পূর্ব্বে যেরূপ উপহাস প্রিয় ছিলেন, সেইরূপ উপহাস-প্রিয়ই আছেন। এমন লোক সকল দ্বারা দেশ উদ্ধার হয় কি? তুমি ভাই আশা কর, তোমার পদধূলি দাও, মস্তকে লই। আমাদের একজন জমীদার বন্ধুকে প্রতিবৎসর প্রতিনিধি হইতে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছি। তিনি সহৃদয়, পরোপকারী, প্রজারঞ্জক, ধর্ম্ম পিপাসু ব্যক্তি, তিনি প্রতিবারেই বলেন—"আমি কি প্রতিনিধি হওয়ার যোগ্য? দেশের কথা কি ভাবি, দেশের জন্য কি করি যে, প্রতিনিধি হইব?" একারও তাঁহাকে প্রতিনিধিরূপে সভায় উপস্থিত করিতে পারি নাই। তাঁহার এই কথাটী যখনই ভাবিয়াছি, তখনই প্রাণ ভক্তিতে পূর্ণ হইয়াছে। ভাবিয়াছি, প্রকৃত হিতৈষণা এইখানে। কিন্তু অনেক প্রতিনিধি কি-রূপ দরের লোক? কনগ্রেসের বন্ধু, বুকে হাত দিয়া বলত?

সকল কথা বলিতেছি কেন? যে ব্যক্তি যেমন, তাহার কাজও তেমনি। বাক্যবাগীশ কাজ দেখিলেই ভয় পায়। বক্তৃতা করা যার ব্যবসায়, বক্তৃতান্তে তার হিতৈষণা আর থাকিবে কেন? যে ব্যক্তি তামাসা দেখিতে, বক্তৃতা শুনিতে থিয়াটারে বা সভায় যায়, তামাসা বা বক্তৃতা অন্তে তাহাকে আর কে পাইবে? এবারকার জাতীয় সভার অধিবেশনের পূর্ব্বে দুই জন বন্ধুকে বলিয়াছিলাম যে, এবার দুর্ভিক্ষের জন্য কলিকাতা, বম্বে, মান্দ্রাজ প্রভৃতি ভারতের প্রধান প্রধান সহরে দুর্ভিক্ষের কমিটী গঠন করিয়া সমিতির দরিদ্রসেবাব্রত গ্রহণ করা উচিত। আমাদের দেশের একজন সহৃদয় ব্যক্তি কনগ্রেসের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া থাকেন। তাঁহার নিকট এসংবাদ লোক দ্বারা পাঠান হইয়াছিল, তিনি হৃদয়বান ব্যক্তি, কিছু চেষ্টাও করিয়াছিলেন, শুনিয়াছি, কিন্তু হইলে কি হইবে—প্রধান পাণ্ডাদের আসরে তাঁহার চেষ্টা পরাস্ত হইয়াছে। রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য জাতীয় মহাসমিতি প্রতিষ্ঠিত, দরিদ্রের জন্য চেষ্টা করিবে? উহা যে রাজনীতির বাহিরের কাজ!! বিলাতে টেলিগ্রাম পাঠাও, দুর্ভিক্ষের জন্য গবর্ণমেণ্টে লেখ, তারপর মহাসুখে নিদ্রা যাও! কে এখন সুখসেব্য আহার পরিত্যাগ করিয়া, জীবন-সার বক্তৃতা বিসর্জ্জন দিয়া দরিদ্রের পাছে পাছে বেড়াইবে মূর্খের চিৎকার শুনিও না, মহাশান্তিতে নিদ্রা যাও এবং মধ্যে মধ্যে জাগিয়া জাগিয়া, উঠিয়া উঠিয়া গবর্ণমেণ্টের কাজের সমালোচনা করিও এবং উলুবেড়েতে প্রজাসভা ডাকিয়া হই-হই রই-রই করিও!! কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়া গবর্ণমেণ্ট প্রজা রক্ষা করুক, অন্নাভাবে লক্ষ লক্ষ লোক মরিতেছে, গবর্ণমেণ্টের রক্ষা করা কর্ত্তব্য, গবর্ণমেণ্ট করুন, আমরা বক্তৃতা করি আর সুখে নিদ্রা যাই!! আমাদের নিদ্রা ভাঙ্গিও না। আমরা কংগ্রেসে যাইব না, অভিমান করিয়াছিলাম, দেখ কত কষ্টে সে অভিমান ত্যাগ করিয়াছি। আমাদের ন্যায় স্বার্থত্যাগী কি আর আছে! আমাদিগকে এখন বিপুল পরিশ্রমান্তে একটু বিশ্রাম করিতে দাও। অনেকের মুখে এইরূপ কথা শুনিতেছি। এরূপ করিয়াই নাকি ভারত জাগিবে!! অহো দুর্ভাগ্য! জাতীয় মহাসমিতির মহা ধুমধামের অধিবেশনের পর ক্রমাগত ভাবিতেছি হায়, এ কি হইল? শুনিতেছি, ইতিমধ্যে নাকি দেড়লক্ষ লোক অনাহারে ভারতে মরিয়াছে। মহাসমিতি চেষ্টা করিলে দশ-সহস্র লোকের প্রাণ কি রক্ষা করিতে পারিতেন না!! অথবা কাজ করে, এমন লোক কোথায় মিলে? হাট ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, বক্তাগণ নীরব হইয়াছেন, কাজ করে কে? এখন ভাবিতেছি, যেমন সব লোক লইয়া মহাসমিতি গঠিত, তাহাদের

উপযুক্ত কাজই হইয়াছে! দয়াশূন্য বীর, মায়াশূন্য বক্তা, হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য পণ্ডিত মণ্ডলীর মহাসম্মিলনের মহাফল—"বিলাতে লর্ড মেয়রকে চাঁদাসংগ্রহের জন্য টেলিগ্রাম কর!!" এরূপ হৃদয়হীন প্রস্তাব এখন কেবল এই ভারতবর্ষেই শোভা পায়! ইহা ঠিক কাজই হইয়াছে। যা কিছু বুঝিবার ভুল আমাদের, এবং যা কিছু কপালের দোষ এই দগ্ধ দুঃখী দরিদ্রদিগের। জন সংখ্যা বৃদ্ধি দারিদ্র্যের প্রধান হেতু, এবার ভারতের ত্রিশকোটী লোকের দশকোটী লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করুক, আগামী বৎসর "অমরাবতী"তে তাহাদের অস্থিরাশির উপর দাঁড়াইয়া মহাসভা প্রায়শ্চিত্ত এবং স্বস্ত্যয়ন করিবেন!! সুরেন্দ্রনাথের জয় হউক, রণদের জয় হউক, তদুপরি মহাত্মা সিয়ানীর জয় জয় কারে দেশ পূর্ণ হউক, মহাসভার মহাকার্য্য পরিসমাপ্ত হইয়াছে। সকলে হরি হরি বল।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

৩১। সচিত্র শিশুরঞ্জন।—দ্বিতীয়-ভাগ, কুচবিহারের নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র সেন প্রণীত, মূল্য /৫। শিশুদিগের কি রূপ শিক্ষা উপযোগী এবং উপকারী, তাহা যেমন পণ্ডিতগণ বুঝিতে পারেন, এমন আর কেহ নহেন। প্রসন্ন বাবু এই পুস্তক শিশুদিগের বিশেষ উপযোগী করিয়া রচনা করিয়াছেন। সুন্দর সুন্দর ছবি দ্বারা পুস্তকখানিকে আরো মনোরমা করিয়াছেন। আমরা পুস্তকখানি পড়িয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। এখন শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তাদিগের ইহার প্রতি অনুরাগ দৃষ্টি পড়িলে হয়।

৩২। পাঠশালা পাটীগণিত, মূল্য ।৷০। এখানিও উক্ত গ্রন্থকারের প্রণীত। এ পুস্তক খানি প্রাইমারি বিদ্যালয়ের বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। নিয়মগুলি বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং উদাহরণ গুলি অতি সুন্দর হইয়াছে। সর্ব্বসাধারণের নিকট আদৃত হইলে আমরা বিশেষ সুখী হইব। পুস্তক খানিতে প্রায় ৩৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য অতি সুলভ।

৩৩। শারদীয় সাহিত্য।—ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ১৲ গুরুদাস বাবুর পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। ঠাকুরদাস বাবু একজন সাহিত্য-জগতের বিশেষ পরিচিত ব্যক্তি। নব্যভারতের পাঠকগণ এই বিশেষ শক্তি-সম্পন্ন গ্রন্থকারকে বিশেষ রূপ জানেন। সাহিত্য মঙ্গল নামক গ্রন্থে ইনি যে অসাধারণ ক্ষমতা,—কৃতিত্ব, লিপি কৌশল, নিরপেক্ষতা এবং প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা আমাদের অন্তরে চিরমুদ্রিত রহিয়াছে। এই শারদীয় সাহিত্য এক অভিনব গ্রন্থ:—ইহাতে পূর্ব্ব গ্রন্থের ক্ষমতার সহিত লেখকের হাস্য রস উদ্দীপনের বিশেষ ক্ষমতা সংযুক্ত হইয়াছে। কাঠিন্যে কোমলতা, গাম্ভীর্য্যে তরলতা, ধর্ম্মভাবে রসিকতা বিমিশ্রিত হইয়া এই গ্রন্থ এক উপাদেয় সামগ্রী হইয়াছে। গদ্য এবং পদ্য, দুয়েই গ্রন্থকার বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। এরূপ প্রবীণ সাহিত্য সেবকের গ্রন্থ, এই বঙ্গে, এই নূতন যুগে এক নূতন সামগ্রী। আমরা পড়িয়া কখনও হাসিয়াছি, কখনও কাঁদিয়াছি, কখনও মাতিয়াছি। শ্রাবণের অনর্গল বর্ষণের পর নব ভানুর কিরণ যেমন মধুর, কণ্টক বেষ্টিত গোলাপের সৌরভ যেমন মিষ্ট, এ পুস্তক তেমনি। এ বঙ্গে এ গ্রন্থের আদর না হইলে দুঃখের সীমা থাকিবে না।

৩৪। প্রবন্ধলহরী।—শ্রীজ্ঞানেন্দ্র লাল রায়, এম এ, বি-এল প্রণীত, মূল্য ৸০। গুরুদাস বাবুর পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। বাবু জ্ঞানেন্দ্র লাল, "বঙ্গবাসী"র প্রথম যুগের সম্পাদক। যখন বঙ্গবাসীর আদর দেশময় ব্যাপিয়াছিল, তখন জ্ঞানেন্দ্র বাবু অসাধারণ প্রতিভা বিকীরণে বঙ্গবাসীর সেবায় তৎপর

ছিলেন। ঘটনা-চক্রে, বঙ্গবাসী যখন অভ্যুন্নতির পরিবর্ত্তে অবনতির সুর ধরিলেন, তখন জ্ঞানেন্দ্র লালের সহিত আর বঙ্গবাসীর সম্বন্ধ রহিল না। তারপর জ্ঞানেন্দ্র লালের প্রতিভা"পতাকায়" প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। এ দেশে যে ভাল জিনিসের আদর হয় না, পতাকার জীবনে তাহার উদাহরণ লিখিত হইল। উপহারের কুহকে মাতিয়া সস্তার বাজারে যখন এ দেশের শিক্ষিত এবং অর্দ্ধ-শিক্ষিতগণ মাতোয়ারা, তখন পতাকা আদর পাইবে কেমনে? পতাকা গেল, নবজীবন গেল, প্রচারও গেল। যাঁহারা বঙ্গদেশের উন্নতিতে আনন্দিত,এবং অবনতিতে দুঃখিত, তাঁহারা এ সময়ের ইতিহাস স্মরণে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন না। আজকাল বঙ্গভূমির সাপ্তাহিক পত্রিকা সকল অধিকাংশই স্বার্থ-কুহকে, পরনিন্দায়,পরকুৎসায়,পরশ্রীকাতরতায় পূর্ণ। একজন হৃদয়বান ব্যক্তি এক সময়ে বলিয়াছিলেন, এখন আর সাপ্তাহিক হাতে করিতে ইচ্ছা হয় না, কেবল গালাগালি,কেবল পরনিন্দা। উজ্জীবনের সুন্দর যুগ উপস্থিত। এখন ভাল জিনিসের অনাদর, কুৎসিৎ, কদাকার,অশ্লীল জিনিসের আদর। থিয়েটরের আদর বৃদ্ধির সহিত উপহারের আদর বাড়িতেছে—প্রকৃত সাহিত্য এখন অল্পে অল্পে লোপ পাইয়াছে। এই দারুণ দুর্দ্দিনে জ্ঞানেন্দ্র বাবু বহুদিনের অনাদৃত ও উপেক্ষিত জিনিস লইয়া উপস্থিত। হা কপাল, ইহার আদর কে করিবে?

নব্যভারতের পাঠকগণ জ্ঞানেন্দ্র বাবুকে —বোধ করি, উত্তম রূপই জানেন। তাঁহার লেখনী ফাটিয়া যেন রক্তস্রোত—দুঃখস্রোত বহিতেছে—তাঁহার হৃদয় যেন কেবল দেশের জন্য কাঁদিতেছে। খাটী হৃদয়ের খাটী জিনিস কেহ দেখিতে চাও—জ্ঞানেন্দ্র বাবুর লেখা পাঠ কর। প্রতিভা-যমুনা যেখানে দয়া-গঙ্গায় সম্মিলিত হইয়া অতি সুন্দর, অতি মধুর, অতি স্নিগ্ধ, অতি সুশীতল সুবিমল সাহিত্য-পানীয় রচনা করিয়াছে, সে স্থানে অবগাহন করিয়া জীবনকে ধন্য করিতে কেহ লালায়িত থাক যদি, তবে প্রবন্ধ-লহরীর পানে তাকাও। ইহার প্রতি কথায় স্বদেশানুরাগ,প্রতি তরঙ্গে প্রতিভা স্ফূরণ। এই লহরীতে শৈত্য এবং স্নিগ্ধতা, মাধুর্য্য এবং দয়া, দেশানুরাগ এবং প্রাঞ্জলতা, জ্ঞান এবং প্রেম,শক্তি এবং কর্ম্মানুরাগ তরলাকারে পরিশোভিত। লেখায় হৃদয় পাঠ করিবার কাহারও ইচ্ছা থাকিলে,প্রবন্ধ-লহরীতে অবগাহন করিলে বিমুগ্ধ হইবেন। আমরা জ্ঞানেন্দ্রবাবুর লেখায় অনুপ্রাণিত, তন্ময়; আমরা তাঁহার অনুরাগী ভক্ত। কিন্তু একথা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি,যিনি এই প্রবন্ধ লহরী পাঠ করিবেন, তিনিই তাঁহার ভক্ত হইবেন, তিনিই মোহিত হইবেন।

৩৫। সাহিত্য-চিন্তা।—শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু প্রণীত,মূল্য ১৲। গুরুদাস বাবুর পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। আমরা জ্ঞানেন্দ্রবাবুর পুস্তক সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছি, পূর্ণবাবুর এই পুস্তক সম্বন্ধে তাহার অনেক কথাই খাটে। সাহিত্য-সিন্ধু মন্থন করিয়া (১) সাহিত্যের আদর্শ,(২) সাহিত্যে খুন,(৩) সাহিত্যে প্রেম,(৪)সাহিত্যে বীরত্ব (৫) সাহিত্য দেবত্ব, এই পঞ্চরত্ন পূর্ণ বাবু উদ্ধার করিয়াছেন। তাঁহার গভীর গবেষণা এবং পাণ্ডিত্যের পরিচয়ে আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। পূর্ণবাবুর লেখা সজীব, প্রাঞ্জল, মধুর এবং গাম্ভীর্য্য পূর্ণ। যিনি এই পুস্তক পড়িবেন, তিনিই মোহিত হইবেন। একজন বন্ধু লিখিয়াছেন যে, পূর্ণ বাবুর ন্যায় কৃতী লেখক একখানি চিন্তাপূর্ণ বড় পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিলে ভাল হয় আমরা বন্ধুর সহিত একবাক্যে বলি,পূর্ণবাবুর নিকট বাঙ্গালা ভাষা অনেক উচ্চ জিনিষ পাইতে আশা রাখে। কালে নিশ্চয় যে আশা পূর্ণ হইবে।

কঙ্গ্রেস্, উহার শক্তি ও সাহিত্য এবং শরীর-গঠন।

(সমালোচনা)

কঙ্গ্রেস্ দ্বাদশ অতিক্রম করিয়া ত্রয়োদশ বৎসরে পড়িয়াছে। উহার "কনিষ্টিটিউসন্" নির্ম্মিত, লিখিত বা নিয়ম বদ্ধ না হইলেও, বয়সে বিকাশ লাভ করিয়াছে। উহার শারীরিক ক্রিয়া আছে, অতএব শরীরও আছে। শক্তিও কিঞ্চিৎ জন্মিয়াছে। সর্ব্বোপরি উহার সাহিত্য সবিশেষ পুষ্ট হইয়াছে। কঙ্গ্রেসের বিগত দ্বাদশ অধিবেশন-উৎসব উপলক্ষে, উহার সাহিত্য, শক্তি ও শরীর গঠন এ স্থলে কিঞ্চিৎ আলোচ্য।

কঙ্গ্রেস্-জাত সাহিত্যের কলেবর কৃশ নয়, উহা, ক্রমে স্থূল স্থূলতর, বৃহৎ বৃহত্তর হইয়া চলিয়াছে। দ্বাদশ বৎসরের বক্তৃতা-রাশি একত্র সংযুক্ত হইলে, বোধ হয়, অর্দ্ধ ক্রোশ পরিমিত স্থান অধিকৃত ও আবৃত করিতে পারে। তদ্ভিন্ন, পত্র, প্রবন্ধ, অনুবন্ধ, মন্তব্য, মিনিট্, বিচার-বিশ্লেষণ ও সমালোচনা প্রভৃতি, কঙ্গ্রেসের অন্যান্য অবয়বে ও অঙ্গে, ঐ সাহিত্যের শরীর, দীর্ঘে প্রস্থে, এখনি বড় কম প্রকাণ্ড হয় নাই। কঙ্গ্রেসের কার্য্যক্ষেত্রের বিপুলতা ও কর্ম্মিবর্গের বহুলতার ন্যায়, উহার সাহিত্য-শরীরও যে অতি বিস্তীর্ণ হইবে, ইহা অবশ্যম্ভাবী। ফলত কঙ্গ্রেস্ কল্পে, এ দেশীয়দিগের কর্ত্তৃক যে রাজনৈতিক সাহিত্যের সৃষ্টি হইতেছে, তাহা কেবল সাহিত্যের হিসাবে ধরিলেও সুবৃহৎ বটে। তবে আক্ষেপ এই যে, কঙ্গ্রেস্ কৃত এই রাজনৈতিক সাহিত্য-সৌধের আপাদ মস্তক ইংরেজী। উহার গঠনে ভারতীয় ভাষা-নিচয়ের একটী বর্ণেরও ব্যবহার নাই;— একটী শব্দেরও সংস্পর্শ নাই। সুতরাং "ভারতীয় জাতীয় মহা-সমিতির" সাহিত্য, ইংরেজী অনভিজ্ঞ ভারতীয় মহাজাতির অবোধ্য। সুতরাং "ভারতীয় জাতীয় মহা সমিতির" রাজনৈতিক আলোচনা আন্দোলনে ভাবী ভারতবর্ষের ধন ধান্যের ও সুখ শান্তির সমৃদ্ধির যতই সম্ভাবনা থাকুক, ভারতীয় জাতীয় মহা-সমিতির সুবৃহৎ সাহিত্য দ্বারা ভারতীয় ভিন্ন ভিন্ন জাতির কোন ভাষা পুষ্ট, পোষিত ও উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা, আপাতত বড় দেখা যাইতেছে না।

ভারতীয় জাতীয় সমিতির সাহিত্য ভারতীয় জাতির অবোধ্য, ইহা অস্বাভাবিক বটে। এরূপ সমিতি এবং এবম্বিধ সাহিত্যের কথা শুনিবা মাত্রই তাহাকে অসম্ভবের সাধনা—অস্বাভাবিকের উপাসনা বলিয়াই বোধ হয় বটে। কিন্তু, মানব জীবনে ও মনুষ্য জাতির ইতিহাসে, অভিনব ও অদৃষ্টপূর্ব্ব ঘটনা কখনও যে না ঘটে, এমন নহে। "ইতিহাস অপনাকে আপনি পুনরুক্ত করে" এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে, ইতিহাস অপর দিকে, অভূতপূর্ব্ব অভিনবত্বও অঙ্গীকার করে, তাহাতে সন্দেহ নাই। উত্থান-পতন ও উক্ত পুনরুক্তের ন্যায় অপূর্ব্বত্ব এবং অভিনবত্বও মানব-জাতির জাতীয় ইতিহাসের অঙ্গ ও উপাদান।

অভিনব কার্য্য-কারণ-পরম্পরার সমবায়ে অসম্ভব হইতে সম্ভব ও অস্বাভাবিক হইতে এক প্রকৃতির স্বাভাবিকতা উৎপন্ন হইতে পারে। আমার বোধ হয়, এ স্থলে তাহাই হইতেছে। দৈনিক জীবনের অতি সাধারণ ঘটনা-স্রোতে অভিনব কার্য্য কারণ-পরম্পরা

এমন ধীরে ধীরে, আসিয়া সমবেত, সম্মিলিত ও সমষ্টি-নিবন্ধন শক্তিসমন্বিত হয় যে, লোকে তাহা সবিশেষ লক্ষ করে না; অজ্ঞাতে তাহার মাধ্যাকর্ষণে কেন্দ্রাকৃষ্ট হয়, কার্য্য করে, চিন্তা করে না, চিন্তার কারণ উৎপন্ন করে।

মানুষ, কলের পুতুলের মত কাজ করে, সম্ভবের বা অসম্ভবের কেন্দ্রাকৃষ্ট হইয়া ঘোরে, পূর্ব্বাপর বড় বেশী চিন্তা করে না। ইহার এক মাত্র ব্যাখ্যা,—'প্রকৃতির রহস্য।' অসম্ভব হইতে সম্ভব উৎপন্ন হওয়ারও এক কথায়, 'কৈফিয়ৎ' তাই।

"জাতীয় মহা-সমিতির" ভাষা, বিজাতীয়—মহা বিজাতীয়! সে ভাষা, নবাবিষ্কৃত ভাষা বিজ্ঞানানুসারে "ইণ্ডোয়ুরোপীয়" পরিবারস্থ হইলেও, নিশ্চয়ই ভারতবর্ষের কোন ভাষা নয়। তাহা বরং "সেমিটিক্" সংসারের কোন ভাষা হইলে উর্দ্দু পারসীর পাশাপাশি পড়িয়া ভারতবাসী বহু সংখ্যক হিন্দু মুসলমানের বোধগম্য হইতে পারিত। কিন্তু, তাহা যাউক।

ভারতবাসীর ভারতবর্ষীয় সমিতির ভাষা-ও সাহিত্য ভারতবর্ষীয় নয়,—ইংলণ্ডের ইংরেজী। জাতীয় সংযোগ ও সংমিলনের মূল গ্রন্থিই এ স্থলে, বিজাতীয়। ইহা বিসদৃশ বটে। ইহা বিপর্য্যয়করও হইতে পারে। কিন্তু, এ স্থলে, বিসদৃশ হইতে সাদৃশ্য ও বিপর্য্যয়-বীজের মধ্য হইতে পর্য্যায় উৎপন্ন হইয়াছে। কথাটীর তাৎপর্য্য প্রহেলিকার মত অপরিষ্কার, আত্ম-বিরোধী ও কঠিন হইলেও, অবস্থাও ঘটনা-পরম্পরা ক্রমে এত সর্ব্ববাদিসম্মত ও এত অবিসম্বাদিত স্বীকার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, ব্যাখ্যা করিয়া না বলিলেও চলে। সোজা কথা ছিঁড়িয়া ও ব্যাখ্যা করিয়া বুঝিতে গেলেই বরং তাহা বিলক্ষণ বাঁকা হইয়া দাঁড়ায়।

ইংরেজী ভারতবর্ষের কোন পুরুষের প্রচলিত ভাষা নয়। উহা বিদেশীয়—বিজাতীয়। কিন্তু, প্রকৃত প্রস্তাবে, উহা হইতে—ঐ বিদেশীয় ও বিজাতীয় হইতেই, আমাদের এই স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় প্রজা-সৃষ্ট মহাসমিতি। ইংরেজের ইংরেজী, ইংরেজের স্কুল, ইংরেজের রেলপথ প্রভৃতিই এই "ইণ্ডিয়ান ন্যাসন্যাল্ কংগ্রেসের" আদি কারণ এবং সর্ব্বপ্রধান সাধারণ সম্মিলন ও বন্ধন-গ্রন্থি। পরন্তু, ইংরেজের রাজনীতি-বিজ্ঞান—মিল্টন বেকান, মিল বেন্থামই—কংগ্রেস কৃত প্রজা-নীতির উপাদান ও প্রাণ স্বরূপ। এক কথায়, ইংলণ্ডের ইংরেজী ব্যতীত ভারতবর্ষের এবম্বিধ কংগ্রেস্ কখনও সম্ভবপর হইত না। সম্ভবপর হইত না বলিয়া যে অসাধ্যই হইত এমন বলি না। এরূপ সহজসাধ্য হইত না, ইহাই বলা যায়। যাহা সহজ-সাধ্য, তাহার শক্তিও সহজ—যাহা দুঃসাধ্য বা বহু আয়াস সাধ্য, তাহার শক্তি দুরন্ত। ইংরেজী-বিচ্ছিন্ন ও ইংরেজ-বিরহিত, ভারতবর্ষীয় রাজনৈতিক সম্মিলন যদি বহু আয়াস ও আয়োজনেও সাধ্য হইত, তাহা হইলে, সে কংগ্রেসের প্রকৃতি ও শক্তি অন্য প্রকারের হইত, ইহা বলা বাহুল্য। কিন্তু, সে কথা বলিতেছি না।

একমাত্র ইংরেজী হইতেই এই কংগ্রেস্ উদ্ভূত। ইংরেজী ইহার শক্তি, সম্বল, যথা-সর্ব্বস্ব,—ইহার অবলম্বন-যষ্টি, ইহার সম্মিলন আলোক। ইংরেজী হইতে ইহা বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না, ইংরেজী ব্যতীত এক মুহূর্ত্ত কাল বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। ইংরেজী হইতে কংগ্রেসের সৃষ্টি, ইংরেজীতেই স্থিতি;

অতএব ইংরেজীর বিরহে উহার বিলয়। ইণ্ডিয়ান্ ন্যাসানাল্ কঙ্গ্রেসে ইংরেজী অনিবার্য্য।

অতএব, এস্থলে দেখিতেছি, বিজাতীয় হইতেই স্বজাতীয়তার জন্ম। বিসদৃশ হইতে সাদৃশের, অসম্ভব হইতে সম্ভবের, ও অস্বাভাবিক হইতে স্বাভাবিকতার সৃষ্টি। অন্য ব্যাখ্যার অপেক্ষা না করিয়া, ইহাকে হিন্দু মায়াবাদের "অঘটন পটিয়সী লীলা" এবং মহম্মদীয় "কিস্‌মতের" "ক্যাখুবি কুদ্‌রত্" কহা যাইতে পারে।

ইংরেজ রাজার বৈচিত্র্য-বিহীন শাসন-প্রণালী, ইংরেজী শিক্ষা প্রণালী এবং তাড়িত বার্ত্তা ও বাষ্পীয়পন্থা-প্রণালী, ভারতবর্ষের ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ব্যষ্টির বিরাট সমষ্টি সঙ্কলন করিয়াছে। অতি দূরস্থকে অতি নিকটস্থ করিয়াছে; পৃথক্ পৃথক্ পরমাণু-কণা এক কেন্দ্রে আকৃষ্ট করিয়াছে;—এক কথায় আমাদের কঙ্গ্রেস্‌টীকে খাড়া করিয়াছে; আমাদের 'রাজনৈতিক জাতীয়তা যোড়া দিয়া জুড়িয়া দিয়াছে;—কিন্তু, জোড়া দেওয়াইবা বলি কেন? এ জাতীয়তার জন্ম, বিজাতীয় ইংরেজীতেই দিয়াছে।

বৃহৎ ব্যাপার! বিপুল বিপ্লব! কঠিন সাধনা! একটু ডুব দিয়া দেখিলে, প্রকৃতিই "অঘটন পটিয়স্" কার্য্য,—ইহা ইংরেজের বা অদৃষ্টের! আবার, অপর দিকে, ভারতবর্ষবাসীর দৈনিক জীবন-স্রোতে ইহা এমন শনৈ শনৈ, অতি সাধারণ ঘটনার ন্যায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে,—এমন সহজ-সেব্য শরবৎ পানের ন্যায়, এই অপরিমেয় পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে যে, উহার ঐকান্তিক অভিনবত্ব সত্ত্বেও উহা আর অভিনব নয়; উহার বিরাট বিস্ময়কারিতা সত্ত্বেও, উহা আর বিন্দু মাত্র বিস্ময়কর নয়! উহা, এখন একান্ত অভ্যস্ত, ইতরীকৃত;—নিশ্বাস প্রশ্বাস-প্রবাহের মত অতীব সহজ, স্বাগত, সচারাচর সংঘটিত; অতএব শিক্ষিত অশিক্ষিত উভয় সম্প্রদায়স্থ লোকেরই প্রায় একই রূপ অলক্ষণীয়! আসল কথা, এই যে উহার তল দেশে আর আমরা তাকাই না, তাকাইবার প্রয়োজনই মনে করি না। অতীত ও ভবিষ্যত্ প্রায়ই আমাদের চিন্তার বিষয় হয় না। আমরা বর্ত্তমান্ লইয়াই ব্যস্ত আছি। পরন্তু, উহার আরও একটী কারণ এই যে, উপরোক্ত সিদ্ধির যে কঠোর সাধনা, সে সাধনা আমাদের নয়,—সে সাধনার শক্তি আমাদের নয়, কিছুই আমাদের নয়,—সে সাধনার সংযমও আমাদের নাই। সুতরাং স্বভাবতই আমরা সে সাধনার প্রতি তত লক্ষ করি না; তৎপ্রদত্ত সিদ্ধিকে স্বাগত ও সহজ মনে করি; আর সেই সিদ্ধির কথঞ্চিৎ সুবিধা উপভোগ করিয়া কিঞ্চিৎ লাফাই ঝাঁপাই। সাধক সে দৃশ্য দেখিয়া কি বিবেচনা করেন, বলা যায় না।

কোথায় ইংলণ্ড, ইংরেজ ও ইংরেজী ছিল? আর কোথায় ছিল ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী, পুরাতন হিন্দুজাতি ও পরবর্ত্তী মুসলমানগণ! ঘটনা-স্রোতের কি বিচিত্র, কি বিস্ময়কর তরঙ্গাঘাতে আজ উভয়ে এই উপন্যাসবৎ চিত্তোন্মাদক সংযোজন-সংঘর্ষণ-ইতিহাস! এবং সেই ইতিহাসের এক অধ্যায়ের একটী অক্ষর আমাদের অদ্যকার এই কঙ্গ্রেসের এই দ্বাদশ বার্ষিক অধিবেশনোৎসব। ইহা প্রধানত ইংলণ্ডের ও ইংরেজীরই নিজের ইতিহাস। ভারতবর্ষের ও ভারতবাসীর ইতিহাসের সহিত ইহার যে কিছু সংস্রব, তাহা কঙ্গ্রেসের অভিনয়-সূত্রে, অতএব গৌণকল্পে।

"কঙ্গ্রেস্ কিছু নয়" যাঁরা বলেন, যদি কেহ বলেন, তাঁরা হয় আহাম্মক, নয় উন্মত্ত নয় ঈর্ষাপরতন্ত্র, তাঁদের সমালোচনা বা শ্লেষ উভয়ই নিরর্থক। "কঙ্গ্রেস্ কিছু নয়"নহে — বিলক্ষণ কিছু। কঙ্গ্রেসের কৃতিত্ব আছে। কিন্তু, সে কৃতিত্ব ইংলণ্ডের নিজের, ভারতবর্ষের নিজের নহে।

ভারতবর্ষীয় ভাবে কঙ্গ্রেস্ "জাতীয়" জিনীস নহে—হইতেই পারে না। তথাচ যদি সেই ভাবে "জাতীয় সমিতি" বলা হয়, সে কেবল জোর করিয়া বলা। কারণ, কঙ্গ্রেস যে প্রকৃতির জাতীয় সমিতি, সে প্রকারের প্রকাণ্ড ও 'পাঁচ মিশিলি' জাতি ও জাতীয়তা হিন্দুস্থানে পূর্ব্বে কথনও ছিল না; হিন্দুর বেদ ও মুসলমানের কোরাণে তাহা নাই এবং বেদ ও কোরাণ উভয়ের কাহারও আদেশানুসারে এখন তাহার উৎপত্তি হইতে পারে না; তথাচ এই কঙ্গ্রেস্ "জাতীয় সমিতি"ই বটে। কিন্তু সে 'জাতি' বা 'জাতীয়তা' ইংরেজের শাসন প্রণালী ও ইংরেজী ভাষা কর্ত্তৃক সৃষ্ট অভিনব ও আধুনিক জাতি বা জাতীয়তা। তাহা, সম্যক রূপে শাসননৈতিক জাতীয়তা, আপাতত সামাজিক ও ধর্ম্ম-নৈতিক জাতীয়তা নহে। পুনশ্চ, আপাতত উহা ইংরেজী শিক্ষিতেরই জাতীয়তা, অশিক্ষিতের জাতীয়তা নহে। কারণ অশিক্ষিত ইংরেজ শাসনাধীন হইয়াও ঐ সভার সদস্য ভাবে নাই বা অতি-অল্পই আছে।

কিন্তু, সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য ক্রমে (যাহাই বল) এই আপাত-শাসন-নৈতিক জাতীয়তা ও ইংরাজী শিক্ষিতের জাতীয়তা যদি অচিরাৎ বা কালক্রমে,সামাজিক ও ধর্ম্ম-নৈতিক জাতীয়তায় সংযুক্ত ও সম্মিলিত হয়, এবং ইংরেজী-শিক্ষিতের এই কাঙ্গ্রেসিক জাতীয়তা ইংরেজী অশিক্ষিত অগণিত জন সাধারণের জাতীয়তায়ও পরিণত হয়, তাহা হইলেই, য়ুরোপীয় হিসাবে, ভারতবাসীর পূরাপূরী একজাতিত্ব—ঐতিহাসিক অথণ্ড একজাতিত্ব সাব্যস্ত হইতে পারে। এবং সেই অসম্প্রদায়িক, আকাশভেদী ইংরেজী বা যাবনিক একজাতিত্বে জীবন্ত ও বলীয়ান হইয়া যদি হিন্দুস্থান এক দিন দণ্ডায়মান হইতে পারে তাহা হইলে, যে যৎসামান্য রাজনৈতিক অধিকারের জন্য কঙ্গ্রেস্ আজ কোলাহল ও কাঁদাকাটা করিতেছেন, তাহা পাইতে ক্ষণ মাত্র বিলম্ব ত হয়ই না, তাহা অপেক্ষা আরও অনেক উচ্চাধিকার আসিয়া আপনা হইতে উপস্থিত হইতে পারে।

কিন্তু, সে রূপ অথণ্ড ও পূর্ণ একজাতিত্ব অন্তত, আপাততঃ কঙ্গ্রেসের অভিপ্রেত নয়। কারণ সে অভিপ্রায় হইলে, কঙ্গ্রেস্ এখন, মূহুর্ত্ত কালও টিকিতে পারে না। পরন্তু, ইংরাজী শিক্ষা এখনও তাদৃশ বিস্তার ও বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই, যাহাতে করিয়া তদ্রূপ অসাম্প্রদায়িক ও সামাজিক ব্যবধান-বিরহিত একজাতিত্ব, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সংস্থাপিত হইতে পারে। ইংরাজী শিক্ষা যে পরিমাণে বিস্তৃত ও ইংরেজী শিক্ষার শক্তি যে পরিমাণে বিকাশিত হইয়াছে, তাহারই ফল এই শাসননৈতিক একজাতীয়তা-মূলক এই "জাতীয় মহা সমিতি" বা কঙ্গ্রেস্। অগ্রেই বলিয়াছি এ জাতীয়তা অভিনব ও ইংরেজী-মূলক। যে প্রকৃতির জাতীয়তা এদেশে কথনও প্রচলিত ছিল না, ইংরাজী শাসন ও ইংরেজী শিক্ষা তাহা অন্তত, আমাদের কতক লোককে দিয়াছে। একটী জাতিকে বা ভিন্ন ভিন্ন কতকগুলি জাতিকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র

প্রকৃতির একটী জাতিত্ব প্রদান করা বড় সোজা কথা নয়। অতএব এস্থলে ইংরেজী-রই শক্তি শরণীয়।

কিন্তু, ইংরেজ ইতিহাস লেখক ও সংবাদ পত্র-সম্পাদক যে বলেন, হিন্দু জাতি কখন এক জাতি ছিল না; ইহাও মহা ভ্রম। হিন্দু হিন্দু-জাতিই ছিল এবং এখনও আছে এবং ধর্ম্ম-বিপ্লবে বিপর্য্যস্ত ও বিজাতীয় বর্ণ সঙ্করত্ব প্রাপ্ত না হইলে, বোধ হয়; ভবিষ্যতেও থাকিবে। তবে, হিন্দু মুসলমানে ও খ্রীষ্টা-নাদিতে মিলিয়া এক জাতি ছিল না বটে। নহিলে হিন্দু, হিন্দুই ছিল ও মুসলমান মুসলমানই ছিল। তাহা, যুরোপীয় হিসাবে, এক-জাতিত্ব না হইতে পারে; কিন্তু, এদেশীয় হিসাবে, এক জাতিত্ব ভিন্ন দ্বিজাতিত্ব নহে। তবে, হিন্দু জাতির মধ্যে বহু শাখা বহু সম্প্রদায় আছে, আচার ব্যবহার আহারাদি গত পার্থক্য আছে. ইহা সত্য। কিন্তু কেবল এক আহার ব্যতীত আর সকল বিষয়ে সে রূপ পার্থক্য মুসলমান ও খ্রীষ্টান জাতির মধ্যেও বিলক্ষণ বিদ্যমান।

শিক্ষিত হিন্দুদিগের মধ্যে অল্প সংখ্যক ও মুসলমানদিগের মধ্যে বোধ হয় তদপেক্ষা অধিক সংখ্যক এমন অনেক আছেন, যাঁহারা বলেন "যে কঙ্গ্রেসের রাজনৈতিক আন্দোলন অনুষ্ঠানে এদেশীয়দের জাতি ধর্ম্ম নষ্ট হইবে, যাহা আছে "শাসন নৈতিক জাতীয়তা, তাহা ক্রমে সামাজিক ও ধর্ম্ম-নৈতিক এক জাতিত্বে মিশিয়া গিয়া সব "একাকার" হইয়া যাইবে, অতএব কঙ্গ্রেস্ যত শীঘ্র ক্লক প্রাপ্ত হয়, ততই এ দেশীয়দের কল্যাণ, কেহ কঙ্গ্রেসের কাছে ঘেঁষিও না, কঙ্গ্রেস্ জাতি খাবার কল, তাহা জাতি ভ্রষ্ট করা কুহক, লোকের কুহক বই আর কিছুই নয়, ইংরেজীও জাতি মারা বিদ্যা, অতএব, ইংরেজী না পড়াই উচিত।" কঙ্গ্রেস্-বিরোধী মুসলমান বলেন, ইংরেজী স্পর্শেও পাপ আছে। হিন্দু বলেন, ইংরেজীই এদেশীয়দের অধঃপাতের কারণ। জাতি নাশ করিয়া সব একশা করার শক্তি ইংরাজীতে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে আছে। ইংরাজ রাজনীতির গৌণ ও গুপ্ত উদ্দেশ্য সব একাকার করা,—ম্লেচ্ছ খ্রীষ্টান করা। কারণ, তাহা হইলেই রাজ্য শাসনের সুবিধা হয়, ও কোনও কালে রাজ্য নাশের শঙ্কা থাকে না। সমগ্র হিন্দুস্থান, এখনি ম্লেচ্ছ হউক্, দেখিবে, রাজনৈতিক সত্ত্বাধিকারের কোন অভাব থাকিবে না। রাজা তখন প্রত্যয় করিবেন, রাজ-প্রসাদ দিতে ইতস্ততঃ করিবেন না। ইংরাজী 'বিস্তারের' 'পলিসি' জাতি নষ্ট করা, কঙ্গ্রেসের পলিসিও জাতি ধর্ম্মের বিলয় করা। অতএব সাবধান, এ উভয় হইতেই দূরে থাক। অপার্য্যমাণে ইংরাজী যদিও পড়, খবরদার কঙ্গ্রেসের কাছে কেহ ঘেঁষিও না। হিন্দুর হিন্দুত্ব ও মুসলমানের মুসলমানত্ব বজায় থাকিলে, অটুট অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিলে, এক দিন না এক দিন তাহাদের সময় আসিলেও আসিতে পারে, পরাধীনতার দাসত্ব শৃঙ্খল ছিন্ন হইলেও হইতে পারে, জাতি ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ থাকিলে, তাহা হওয়াই খুব সম্ভব, তবুও যদি তাহা না হয়, তাহাতেও অনিষ্ট নাই। জাতি ধর্ম্ম অব্যাহত থাকিলে, আপাতত ঐহিক মঙ্গল না হউক্, ভবিষ্যতে পারত্রিক কল্যাণ, —আধ্যাত্মিক উন্নতি,—স্বর্গ, অপবর্গ, বৈকুণ্ঠ-বাস বা 'ভেহস্ত' নিশ্চয়ই হইবে। অতএব, প্রলোভে পড়িয়া পতঙ্গবৎ পুড়িয়া মরিও না। ঐহিক পারত্রিক উভয়ই হারাইও না। ঐহিক

উন্নতির জন্য জাতি ধর্ম্ম নষ্ট করিলে পরকালে নরকে পুড়িয়া মরিবে। ইংরেজীর উন্নতি-আকর্ষণ ও কঙ্গ্রেসের কুহক কুমন্ত্রনায় কেহ অনন্ত নরকের পথে উঠিও না।' ইত্যাদি।

কখন কিছু স্পষ্ট, প্রায়শঃ অস্পষ্ট স্বরে উপরি-উক্ত মর্ম্মাত্মক উক্তি শুনিতে পাওয়া যায়। ইহা, 'অর্থোডক্স' হিন্দু বা মুসলমানের উক্তি। হিন্দু, হিন্দুভাবে, ও মুসলমান তাঁহার নিজের মুসলমানীয়ভাবে, কঙ্গ্রেস্ ও ইংরেজী শিক্ষা সম্বন্ধে ঐ রূপ বলিয়া থাকেন ও ঐ প্রকারের অভিমত পোষণ করিয়া থাকেন। মুসলমান অভিমতের আর এক মাত্রা অতিরিক্ত আছে, তাহা থাউক্। কঙ্গ্রেস্-ক্যাম্পে এ মত, অশিক্ষিতের অভিমত বলিয়া উক্ত। আমরাও আপাতত এ মত রীতিমত পরীক্ষা করা প্রয়োজন মনে করিতেছি না। সংক্ষেপত ইহা বলিলেই এখন প্রচুর হইবে যে, উপরোক্ত অভিমত শিক্ষিতের বা অশিক্ষিতেরই হউক্, 'অর্থোডক্স' বা অতিরঞ্জিত হউক, ইহা এ দেশীয় অসীম রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের মত এবং এক মাত্রা কূটনীতি প্রবণও তাহাতে সন্দেহ নাই। পরন্ত, ইহার অনুদারতাও উগ্র এক-দেশ দর্শিতা সত্ত্বেও ইহাতে আত্ম রক্ষা-মূলক এক মাত্রা উচ্চ"পলিটিক্সের" আভাস দেখিতে পাওয়া যায়। অপিচ, এবম্বিধ অত্যুগ্র অভিমত যতই অনুদার ও একদেশদর্শী হউক্, ইহা সঞ্চালিত হইতে দেখিলে রাজ-শক্তি কিঞ্চিৎ শঙ্কিত হন, সুতরাং শাসন-দণ্ড সম্প্রসারণ করিয়াও ইহাকে সম্ভ্রম করিয়া থাকেন। তাহার কারণ এই যে, এই রূপ ঐকান্তিক আত্ম-কেন্দ্র-পরতন্ত্র সংযত সংকীর্ণ নীতি হইতে সহসা সংক্ষোভ উপস্থিতির সম্ভাবনা। সঙ্কীর্ণতাতে স্বভাবত সুতীক্ষ্নতা অধিক ; অনুদারতার উগ্রতা উদারতার অপেক্ষা অনেক অধিক। রাজনৈতিক ইতিহাসে, ধর্ম্মোন্মত্ততার পরাক্রম ও প্রসার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রমাণিত। সুতরাং আশ্চর্য্য নহে যে, রাজ-শক্তি রাজনৈতিক আন্দোলন অপেক্ষা ধর্ম্মান্দোলন ও ধর্ম্মাভিমতের প্রতি অধিকতর সতর্কতা, সম্ভ্রম ও শঙ্কার সহিত লক্ষ করেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বিশাল কঙ্গ্রেস্ অপেক্ষা সামান্য গোরক্ষিণী সভা গবর্ণমেণ্টের অধিকতর মনোযোগ, সতর্কতা ও সম্ভ্রম আকর্ষণ করে। ফলত রাজনীতির নিকট সর্ব্বজন-বিদিত, সম্ভ্রান্ত ইণ্ডিয়ান্ ন্যাসানাল্ কঙ্গ্রেস্ অপেক্ষা একটী অপরিচিত নগণ্য গোরক্ষিণী সভার শক্তি অধিক। অতএব সর্ব্বজাতির জাতীয় কঙ্গ্রেস্-সভা গবর্ণমেণ্টের বরং উপেক্ষণীয় হইতে পারে ; কিন্তু, অজ্ঞাতনামা কোন হিন্দু গোরক্ষিণী সভা বা তৎসদৃশ কোন মুসলমান সমিতিকে উপেক্ষা করিবার অবসর নাই। কঙ্গ্রেস্ যাহা কিছু করিয়াছেন ও করেন, তাহা সমস্তই ইংরেজীর সহায়তা দ্বারা হইয়াছে ও হয়, কিন্তু, গরিব গোরক্ষিণী সভার ন্যায় কোন সভা যাহা করিতে পারে, তাহাতে ইংরেজ ও ইংরেজীর এক বিন্দুও আবশ্যক হয় না। তাহা আপনার আভ্যন্তরীণ শক্তিতেই সমূহ শক্তিমান, স্বকার্য্য-সাধনে পরকীয় শক্তির উপর নির্ভর করে না। কিন্তু, কঙ্গ্রেস্ ভারতীয় শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সম্মিতি হইয়াও, সর্ব্বাংশে, ইংরেজের ও ইংরেজীর শক্তি সাপেক্ষ। তোমার আমার তুচ্ছ, ইংরেজী-শিক্ষিতের উপেক্ষিত ক্ষুদ্র গোরক্ষিণী সভা আপনার অশিক্ষিত ও অমার্জ্জিত শক্তি সঞ্চালনে, অল্প-সময়ে ও অত্যল্প ব্যয়ে বা বিনা ব্যয়ে সমগ্র হিন্দুস্থানের হিন্দু একত্র করিতে পারে, উত্তেজিত ও

রণোন্মত্ত করিতে পারে। কিন্তু, কঙ্গ্রেস্ বার বৎসর কাল বহু ব্যয় ও বহুতর বক্তৃতা করিয়াও স্বল্প সংখ্যক ইংরেজী অভিজ্ঞ লোক মাত্র এক স্থানে একত্র করিতে সমর্থ হইয়াছেন। অথচ কঙ্গ্রেস্ কত বড় প্রকাণ্ড কাণ্ড এবং গোরক্ষিণী সভা কতই ক্ষুদ্র অনুষ্ঠান।

অতএব রাজনৈতিক দৃষ্টিতে,'অর্থোডক্স' অভিমত, আন্দোলন ও অনুষ্ঠান আদৌ উপেক্ষণীয় ও অগ্রাহ্য নয়। প্রত্যুত তাহাই অধিকতর অনুধাবন ও আলোচনার বিষয়। কারণ, তাহার শক্তি চিরন্তন ও সনাতন সংস্কার মূলক,সুদৃঢ় স্বাভাবিক শক্তি। পক্ষান্তরে, কঙ্গ্রেসের শক্তি ইংরেজী সাহিত্য ও য়ুরোপীয় রাজনীতি হইতে অনুকৃত artificial) বা অল্পাধিক পরিমাণে কৃত্রিম শক্তি। কঙ্গ্রেসের রাজনৈতিক অন্দোলনে গবর্ণমেণ্ট অনায়াসে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন, নিশ্চিন্তই আছেন। কারণ, তাহা constitutional, রাজ বিধি ও আইন কানুনানুবর্ত্তী, অতএব, নির্বিঘ্ন। কঙ্গ্রেস যাহা চাহে, আপাতত যে শাসন সংস্কার ও প্রজাই সত্বাধিকার প্রার্থনা করে, তাহা এমন কিছু বৃহৎ বিষয় নয়, যাহা একেবারেই দেওয়া যাইতে না পারে,—অনুগ্রহ ও দয়া করিয়া তাহার কিছু কিছু ক্রমে ক্রমে দিলেই চলিবে। আর তাহার কিছু মাত্রও না দিলেও কোন অনিষ্টাশঙ্কা বা সাধারণ সংক্ষোভের সম্ভাবনা নাই। কেবল, কাঁদাকাটা, constitutional agitation মাত্র করিবে; তাহার অধিক কঙ্গ্রেসের সম্বল নাই; সামর্থ্যও হইবেনা। কঙ্গ্রেস্-[illegible] অক্ষম; নিরস্ত্র সমগ্র জাতির [illegible] emasculation [illegible] উহার

ইংরেজী শিক্ষা, অবাধ চিন্তা, ও য়ুরোপীয় আদর্শ ও অভ্যাসের প্রভাবে, স্বদেশীয় সংস্কার সম্বন্ধেও তাহার চিত্ত মনের emasculation সংঘটিত; অতএব অত্যুগ্র স্বধর্ম্ম-বিশ্বাস জনিত যে প্রাণপণ প্রতিজ্ঞা, ঐকান্তিকতা-জনিত সুপ্ত শক্তির উত্তেজনা, তাহারও সম্ভাবনা নাই। অপিচ, কঙ্গ্রেসের অত্যুচ্চ আকাঙ্ক্ষা,-সে রূপ-আকাঙ্ক্ষা যদি কস্মিন্ কালে কখনও আদৌ অভিব্যক্ত হয়—আর্য়লণ্ডের আকাঙ্ক্ষিত "হোম রুল" ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন-তন্ত্রের ন্যায় ভারতীয় পার্লামেণ্ট, বড় জোর "ইংলিস্ সিটিজন সিপের" অনুরূপ সত্বাধিকারের অধিক নয়। কল্পনা যত দূর যাইতে পারে, কঙ্গেসের চরম আকাঙ্ক্ষা-এই,—ইহার বেশী নয়। কিন্তু, এ আকাঙ্ক্ষা বিকাশ লাভ করা বহুকালের কথা, আগামী নূতন শতাব্দী সমাপ্ত হওয়ার পরে ভিন্ন পূর্ব্বে নহে, কঙ্গ্রেস্ যদি ততকাল থাকে ও আত্ম-ক্ষেত্রে তদনুরূপ উন্নতি দেখাইতে পারে, তবেই, নহিলে নহে। ফলত কঙ্গ্রেসের চরম উদ্দেশ্য ও আকাঙ্ক্ষা-কল্পনা করিয়া লইলেও তাহা constitutional ও ইংরেজী পন্থা পরতন্ত্র, অতএব কঙ্গ্রেস্ সময়ে সময়ে, ইংরেজ কর্ম্মচারীদিগের বিরক্তির কারণ হইলেও, ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের কোন চিন্তার কারণ হইতে পারে না। কারণ কঙ্গ্রেস ইংরেজের স্বকীয় শক্তি হইতেই উদ্ভূত এবং সর্ব্বাংশে সেই শক্তি-সাপেক্ষ। ইংরেজী শক্তি ব্যতীত কঙ্গ্রেসের আত্ম-শক্তি অল্পই আছে, অথবা কিছুই নাই।

উপরে উল্লেখ করিয়াছি, "কঙ্গ্রেস্ আপাতত শাসননৈতিক জাতীয়তা-মূলক জাতীয়-মহা-সমিতি। সমগ্র বৃটিশ ইণ্ডিয়া ও তাহার অধিবাসী ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী

ও ভিন্ন ভিন্ন সমাজ ও সম্প্রদায়স্থ প্রজা জাতি একই রাজ-শক্তিতে, একই রূপ শাসন-প্রণালী দ্বারা শাসিত, প্রায়ই এক প্রকার বিধি ব্যবস্থায় বদ্ধ; অতএব সমগ্র বৃটিস ভারতের প্রজা মাত্রের সকলেরই সুখ দুঃখ, সমান ও মোটের উপর এক, সকলেরই অভাব, আকাঙ্ক্ষা ও অভিযোগ, রাজনৈতিক হিসাবে, প্রায় একই রূপ। কাজেই সম শাসন-সূত্রে ইহারা সকলেই পরস্পরে সম-বেদনা যুক্ত। এখন, সম-শাসনের একতা ও তজ্জনিত সমবেদনার একতা নিবন্ধন যে জিনীস তাহাই আপাতত ইহাদের জাতিত্বের একতা, অর্থাৎ প্রজানৈতিক রাজনৈতিক বা শাসন নৈতিক জাতীয়তা,—কি না Political Nationality. এ দেশীয়েরা যখন রাজার জাতি নহে, এবং এখন রাজ-শক্তি-বিহীন, তখন এ জাতীয়তাকে রাজনৈতিক বা শাসননৈতিক জাতীয়তা না বলিয়া বরং প্রজানৈতিক জাতীয়তা বলা বোধ হয়, বরং প্রকৃত অর্থপ্রদ। যাহা হউক, এই জাতীয়তা-সূত্রে আমাদের এই কঙ্গ্রেস্ এবং কঙ্গ্রেসে শুভ সম্মিলন ও সৌভ্রাত্রালিঙ্গন। একই দায়ে ঠেকিলে, একই দণ্ডে দণ্ডিত হইলে, ও একই পাকে পড়িলে, যেমন হস্তী ও পিপীলিকা, সিংহ ও শশক, ব্যাঘ্র ও মৃগ, সর্প ও ভেক, মার্জ্জার ও মূষিক মিলিত হইয়া এক জাতি হইতে পারে, এ স্থলে, অবশ্য ঠিক সে রূপ নয়; তবে ইষন্মাত্রায় সেই রূপ বটে; নহিলে জমিদারে রায়তে, খাদকে ও খাদ্যে, ধন-কুবেরে ও কাঙ্গালে, সম্পদে ও শ্রমে, হুজুরে ও তাঁবেদারে, গোঁসায়ে ও গোলামে, ব্রাহ্মণে ও যবনে কি রূপে এক জাতির জাতীয় কঙ্গ্রেস্ হইতে পারিত?

একদায়ে দায়গ্রস্ত হইয়াই এই জাতীয়তা। অতএব সেই দায় যতটা যায়, ততটা পর্য্যন্ত এই জাতীয়তার সীমা, তাহার অধিক নয়। এখন সেই সীমাই আমরা গ্রহণ করি ও তাহারই অভ্যন্তরে থাকিয়া আলোচ্য বিষয়ের পরীক্ষা করি। সে সীমার বাহিরে বেশী যাইব না; গেলে, পরস্পর-বিরোধী-স্বার্থের ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া সঙ্কটাপন্ন হইতে হইবে।

প্রজানৈতিক, অথবা অপর কথায়, বৈষয়িক সমবেদনা হইতে এই জাতীয়তা বা একতা উৎপন্ন হইয়াছে। সামাজিক সমবেদনার সহিত আপাতত ইহার সংস্রব নাই; পূর্ব্বে বলিয়াছি, পরে আরও কিছু বলিব। আপাতত বৈষয়িক সমবেদনাই ধরা যাউক্;—সমতা নহে, তাহা নাই; তাহা প্রায় স্বভাবতই অসম্ভব।

এখন, এই বৈষয়িক স্বার্থের সমবেদনা যতটা ধরিয়া কঙ্গ্রেসের জাতীয়তা সংস্থাপিত ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণীত করা হইয়াছে, তাহা, ভাবিয়া দেখিলে, অতি অল্পকালই টি'কিতে পারে। জমিদারে ও রায়তে মূলধনে ও শ্রমে বৈষয়িক স্বার্থের সমবেদনা, কতটুকু ও কি রূপ বলুন দেখি? দৃষ্টান্ত স্বরূপ জমিদার ও কৃষকই এ স্থলে গ্রহণ করুন। ইহাদের বৈষয়িক স্বার্থের সমবেদনা ইণ্ডিয়ান্ পেনাল্ কোড, অস্ত্র আইন, লবণাদির কর, পুলিষের অত্যাচার,—সামরিক ব্যয়, শাসন ও বিচারের বা দেওয়াণী ও ফৌজাদারির একতান্ত্রিকতা প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে, অবশ্যই অল্পাধিক পরিমাণে আছে। কিন্তু, সেই স্বার্থগত সমবেদনা বেঙ্গল টেনেন্সী অ্যাক্ট সম্বন্ধীয় স্বার্থগত বৈষম্য বিরোধের তুলনায় প্রায় কিছুই নয়। স্বায়ত্ত রক্ষার

উদ্দেশ্যে যখন ঐ প্রজাস্বত্ব আইনের অনুষ্ঠান হয়,—(বেশী নয় ১৩।১৪ বৎসরের কথা) তখন জমিদার পক্ষ হইতে কিরূপ আকাশ-পাতালভেদী আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, আমাদের অনেক পাঠকেরই মনে থাকিতে পারে। রায়ত পক্ষ সমর্থনের কেহই প্রায় ছিল না ; ছিলেন কেবল গবর্ণমেণ্ট। তথাচ, লর্ড রীপন, এঙ্গলো-ইণ্ডিয়ানী ইলবার্ট বিল আন্দোলনে যেরূপ,জমিদারদের কর্তৃক,বেণ্ট বিল আন্দোলনেও, সেইরূপ হাড়ে হাড়ে কাঁপিয়াছিলেন। ইলবার্ট বিলের ন্যায়, বেণ্ট বিলেরও অনেক অত্যাবশ্যকীয় ধারা আন্দোলনের বিরাট ঝটিকায় ঝটিত বিষ্ণু-লোকে গমন করিয়াছিল। বেণ্টবিল, বিকলাঙ্গ হইয়া পাশ হইয়াছিল। তাহরা রায়তি-স্বত্ব যতটুকু রক্ষিত হইয়াছিল, সেই পাপে, লর্ড রিপন প্রস্তর-মূর্তি পাইলেন না, অথচ কত সিধু নিধু তাহা পাইয়াছে। সেইপাপে লর্ড রিপন ভূস্বামী ধনকুবেরদের নিকট হইতে এক বিন্দু বিদায়-অভিনন্দন পান নাই, বিষাক্ত নিন্দার বিদায়-নৈবিদ্য পাইয়াছিলেন। রিপন ভক্ত ও রিপন-কলেজ-কর্তা সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বঙ্গের "প্রিমিয়ার জমিদার" প্রিন্স, দ্বারভাঙ্গার মহারাজা ত এখন কোলাকুলি করিয়া কঙ্গ্রেসের প্রজা-নৈতিক বৈষয়িক একজাতীয়তা সংস্থাপন করিতেছেন,—(অতি সুন্দর পেট্রিয়টিক দৃশ্য সন্দেহ নাই) কিন্তু উপরোক্ত কথা কি এখন তাঁদের কিছু কিছু মনে পড়ে ? অবশ্য পূর্ব্ব ও বিগত বৈষম্য-বিরোধ বিস্মৃত হওয়াই মহত্ত্বের লক্ষণ। কিন্তু এখনি যদি বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট দুর্ব্বল রায়তের রতি পরিমিত উপকারের জন্য বেঙ্গল টেনান্সী-অ্যাক্টের এক বিন্দু পরিবর্ত্তন করিতে উদ্যত হন, তাহা হইলে অবস্থাটী কি রূপ দাঁড়ায়, কঙ্গ্রেস কোন্ পক্ষ অবলম্বন করেন ? অসংখ্য দুর্ব্বল ও নিরন্ন কৃষক রায়তের পক্ষ কঙ্গ্রেস অবলম্বন করিলে, কঙ্গ্রেসের কোটি বন্ধ ও স্কন্ধ স্তম্ভ রাজা মহারাজাদি ভূমি কুবের—কঙ্গ্রেসের ক্যাস বক্স গুলি কোথায় থাকেন ? কঙ্গ্রেসের "কর্ম্মকাণ্ডের" বিরাট ব্যয় কিরূপে নির্ব্বাহিত হয় ? "জ্ঞান কাণ্ড" প্রকৃত ও পরমার্থ-প্রদ পদার্থ হইলেও, কঙ্গ্রেস-ক্ষেত্রেও ত কর্ম্ম কাণ্ড, জ্ঞান কাণ্ডের উচ্চে এবং অগে। অতএব অবস্থা যেরূপ দাঁড়ায় বেশ জানা যাইতেছে, সে দিন গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক বিহার কেডাষ্ট্রাল সার্ভের প্রবর্ত্তনের সময়ে বিলক্ষণই জানা গিয়াছিল। কঙ্গ্রেসের প্রথর রাজনৈতিকগণ প্রজা-মেধ-যজ্ঞে জমিদারের যজমানত্ব গ্রহণ করিয়া ঋত্বিকের আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। পবিত্র প্রজাই-স্বত্বের নামে, প্রজার শোণিত-সিক্ত স্বার্থ জমিদার যজ্ঞের জলিত হোমানলে আহুতি অর্পিত হইতেছিল। সে হোমের প্রধান হোতা যিনি হইয়াছিলেন এবং সেই কৃষক মেধ যজ্ঞের সর্ব্ব প্রধান যজমান যিনি ছিলেন, কে না জানে ? কে না জানে, সে মহাযজ্ঞে, বঙ্গে ও বিলাতে কত অধ্যাপক বিদায় হইয়াছিল এবং পদ-বিদলিত বিহারী কৃষকের দাস বৃত্তি বদ্ধমূল রাখিবার জন্য, বেণ্টবিল আন্দোলনের ন্যায়, সেদিনকার সার্ভে সেটেলমেণ্ট-আন্দোলনেও কৃষাণ শোণিত-শোষিত কি বিপুল অর্থ রাশি বাষ্প হইয়া উড়িয়া গিয়াছিল।

স্বার্থ-বৈষম্যের ও স্বার্থ বিরোধের ইহা যদৃচ্ছা গৃহীত একটী দৃষ্টান্ত মাত্র। এমন অনেক আছে। এখন উল্লেখের আবশ্যক নাই। এই যে স্বার্থের কথা বলা হইল, সে

স্বার্থ কৃষক রায়ত সমাজের প্রাণের স্বার্থ—জীবন ও মৃত্যু সম্বন্ধীয় স্বার্থ, মনুষ্যত্ব ও পশুত্ব সম্বন্ধীয় স্বার্থ, স্বাধীনতা ও দাসত্ব সম্বন্ধীয় স্বার্থ, সুভিক্ষ ও দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধীয় স্বার্থ; কোনও সখের স্বার্থ নহে, নাম মাত্র রাজনৈতিক অধিকার-সূচক স্বত্বও নহে। বরং সামাজিক বৈষম্য সত্ত্বেও,যবনে, ব্রাহ্মণে,চণ্ডালে ও চূড়ামণি মহাশয়ে এক জাতিত্ব সম্ভবে, (বিষয় ব্যাপারে সম্যক সদ্ভাব ও স্বার্থ-সমতা জনিত তাহা বিস্তর আছেও) কিন্তু, এবম্বিধ বৈষয়িক স্বার্থ-বৈষম্য বিরোধে ও খাদ্য খাদক সম্বন্ধে জাতিত্বের একতা কদাচিৎ সম্ভবপর। তথাচ, যে সকল স্থলে, এবম্বিধ বিরোধী সম্প্রদায়ে স্বার্থের সাধারণত্ব,সমতা বা একতা থাকে, সে সকল স্থলে,কাঙ্গ্রেসিক জাতীয়তা সূচিত ও সংস্থাপিত হইতে পারে, হউক, উত্তম। কিন্তু, অতঃপর কঙ্গ্রেস হইতে, কৃষক রায়ত সমাজের কৃষি স্বার্থের কথা, একেবারেই ছাটিয়া ফেলা শ্রেয়। গত দুই বৎসরের বাৎসরিক অধিবেশনে, এ সম্বন্ধে কঙ্গ্রেস, কিয়ৎপরিমাণে, আত্ম সীমা নির্ণয় করিয়া বড় ভাল করিয়াছেন। উহা অধিকতর স্পষ্ট ও পরিষ্কার ভাবে করিলে আরও ভাল হইবে; তাহা হইলে আর কাহারও কোন কথা থাকিবে না। "কঙ্গ্রেস শিক্ষিত ভারতবাসীর জাতীয় সমিতি" কঙ্গ্রেস এত দূর এখন স্বীকার করিয়াছেন। অতঃপর, আর গুটী দুই কথা স্পষ্ট স্বরে ব্যক্ত করিলেই যেমন এক দিকে বিষয়টী বিশদ হয়, অপর দিকে তেমনি কঙ্গ্রেস কর্ত্তৃক কখনও কঙ্গ্রেস-বহির্ভূত কোনও সম্প্রদায়ের স্বার্থে আঘাত লাগিলে, কেহ কলঙ্ক আরোপ করিতে পারিবে না; অপিচ, আঘাত-প্রাপ্ত সম্প্রদায়েরও তাদৃশ অনিষ্টাশঙ্কা থাকিবে না। নহিলে, অপ্রকৃত প্রতিনিধিত্বে, পদে পদে, লোকের বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। কঙ্গ্রেসের বিধিবদ্ধ "কনষ্টিটিউসন" নির্দ্দিষ্ট না হওয়াতে, সময়ে সময়ে, বাহিরের লোকেরও নেতার গোল বাঁধিতেছে। কঙ্গ্রেসের একাদশ অধিবেশনে উহা হয় নাই; দ্বাদশ অধিবেশনেও হইল না। যাহা হউক, কোন কোন প্রেসিডেন্টের মুখে ব্যক্ত হইয়াছে "কঙ্গ্রেস ইংরাজী শিক্ষিতের সভা।" ইহা সত্য এবং প্রকৃত। অতঃপর যে সত্য ও প্রকৃত কথা বাক্যে (কার্য্যে হইয়াছে ও হইতেছে) ব্যক্ত ও ঘোষিত হওয়া উচিত, তাহা এই—"কঙ্গ্রেস শিক্ষিত ও ধনীদিগের বৈষয়িক স্বার্থের প্রতিনিধি।" "কঙ্গ্রেস কৃষিজীবী রায়তের জমি জমা সম্বন্ধীয় স্বার্থের প্রতিনিধি নহে।" এই একটী মাত্র কথা কঙ্গ্রেস কর্ত্তৃক স্বীকৃত এবং প্রকাশ্য ও বিশ্বস্ত ভাবে ব্যক্ত হইলে, অনেক গোল মিটিয়া যায়।

দেশের উপস্থিত অবস্থায় ও কঙ্গ্রেসের নিজের বর্ত্তমান গঠনে কঙ্গ্রেস যেমন হিন্দু বা মুসলমান সমাজের সামাজিক প্রতিনিধিত্ব করিতে অসমর্থ, তেমনি অসীম কৃষক সম্প্রদায়ের জমি জমা সংক্রান্ত স্বার্থের প্রতিনিধি হইতে অপারক। পরন্তু, উপস্থিত ক্ষেত্রে কঙ্গ্রেস বরং Capital বা মূল ধনের প্রতিনিধি হইতে পারেন, কিন্তু, কার্য্য শক্তিকে Labor বা শ্রম ও নিম্ন শ্রেণীর শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের স্বার্থের প্রতিনিধি হইতে পারেন না। এ কথাও স্পষ্ট করিয়া বলা কঙ্গ্রেসের কর্ত্তব্য। তবে, এদেশে, এখনও য়ুরোপের ন্যায় ও য়ুরোপীয় অর্থে capital এর ও Labor এর তাদৃশ বিস্তার এবং (নীল ও চা ক্ষেত্রের অত্যাচার ও কুলী-চালানী পৈশাচিক ব্যভিচার ব্যতীত) ততটা বিরোধ উপস্থিত

হয় নাই। কন্‌গ্রেসে কুঠিয়াল সম্প্রদায় যোগদান না করা পর্য্যন্ত (বোধ হয় করিবে না) কন্‌গ্রেস কুলী স্বার্থ সমর্থনে সমর্থ হইবেন। কিন্তু কৃষক-স্বার্থ, বিশেষতঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তী মহাল নিচয়ের কৃষক স্বার্থ (যাহা এদেশে Labor এর অপার নাম) সমর্থন ও সংরক্ষণে কন্‌গ্রেস কখনও অন্ততঃ আপাততঃ সামর্থ্য সংগ্রহ করিতে পারিবেন না। অতএব সে কথা স্পষ্ট স্বীকার ও প্রচার করা একান্ত উচিত। নহিলে সেই নিরন্ন, নির্ব্বাক ও আজীবন অন্ন কষ্ট-পীড়িত অসংখ্য প্রাণীর মহা অনিষ্ট ঘটিবে এবং কন্‌গ্রেসের নিজেরও দুরপনেয় কলঙ্ক রটিবে। নির্ব্বাকের নিজের কথা যাহা নহে, তাহা যদি তুমি তাহারই নিজের প্রাণের কথা বলিয়া প্রতিপন্ন ও প্রচার কর, তাহা হইলে সে তাহার প্রতিবাদ করিতে পারক হইবে না, কেহই তাহার প্রতিবাদ করিবে না, কৃষকের কে আছে? তোমার প্রমাদপূর্ণ প্রতিনিধিত্বে তাহার সর্ব্বনাশ ও তোমার কলঙ্ক হইবে। উপকার তোমার ও তাহার, কাহারই হইবে না। দুঃখীর দুঃখ ভার, দেশের দারিদ্র্য-ভার অধিক বর্দ্ধিত হইয়া কেবল বিলাসীর বিলাস-স্রোত আরও বেগে বহিবে।

পক্ষান্তরে, তুমি স্পষ্টাক্ষরে তোমার প্রতিনিধিত্বের প্রতারণা পরিত্যাগ করিলে তোমার নিন্দা হইবে না; প্রত্যুত প্রশংসাই হইবে। এবং সেরূপ স্থলে, কন্‌গ্রেস যে স্বদেশীয় কৃষি-বলের একেবারেই কোন উপকার করিবেন না বা করিতে পারিবেন না, তাহাও নহে। সাধারণ কল্পে, পৃথক পথে, কন্‌গ্রেস কৃষি-বলের প্রভূত উপকার করিতে পারিবেন। যে সকল স্থলে, কৃষক রায়তের স্বার্থ দেশের অন্যান্য স্বার্থের সহিত সংলিপ্ত বা সমান, সে সকল স্থলে, সাধারণ কল্যাণের সহিত কৃষক শ্রেণীরও কল্যাণ হইবে। কেবল যে সকল স্থলে, জমীদারী স্বার্থের সহিত কৃষকের জমী জমা সংক্রান্ত স্বার্থের জীবন মরণ বৈষম্য ও বিশেষ বিরোধ, সেই সকল স্থলে কন্‌গ্রেস জমিদার শ্রেণীর প্রকৃত প্রতিনিধি হওয়াতে ও কৃষক সম্প্রদায়ের অপ্রকৃত ও অনভিজ্ঞ প্রতিনিধি না হওয়াতে, কন্‌গ্রেসের কথায় শেষোক্তের তত অসুবিধা হইবে না এবং তাহাদের কথঞ্চিৎ স্বার্থোন্নতি পথে বাধা পাইয়া গবর্ণমেণ্টও তত গোলে পড়িবেন না।

"বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন" প্রকাশ্যত জমিদার-স্বার্থ সংরক্ষী সভা হইয়াও কি কখনও রায়ত শ্রেণীর কোন উপকার করেন নাই? কেন করিবেন না? জ্ঞাতে ও অজ্ঞাতে অনেক উপকার করিয়াছেন। কেবল যে সকল স্থলে জমিদারী স্বার্থের সহিত রায়তী স্বার্থের সংঘর্ষণ উপস্থিত হয় ও হইয়াছে, সেই সকল স্থলেই, স্বীয় স্বভাব ও অঙ্গীকারানুসারে প্রথমোক্তের ইষ্ট ও শেষোক্তের অনিষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন ও করিয়া থাকেন। ইহাতে উক্ত অ্যাসোসিয়েসন তত অপরাধী হইতে পারে না, কারণ জমিদারী স্বার্থ রক্ষাই তাহার অঙ্গীকৃত সংকল্প ও অস্তিত্বের কারণ। কিন্তু পক্ষান্তরে "ইণ্ডিয়ান-অ্যাসোসিয়েসন" প্রজা-স্বার্থ সংরক্ষণের প্রতিজ্ঞা করিয়াও ক্রমে ক্রমে এখন প্রায় দ্বিতীয় "বৃটিশ-ইণ্ডিয়ান" বা বিহার-ল্যাণ্ড-হোলডারস-অ্যাসোসিয়েসনে পরিণত হইতেছে।

অতএব, বোধহয়, য়ুরোপের ন্যায়, এদেশে, অদ্যাবধি আসল "ডেমোক্রেটিক অ্যাসেমব্লী" সংগঠিত হওয়ার সময় উপস্থিত হয়

নাই। "সামাজিক সাম্য" যেমন এদেশে আদৌ অসম্ভব (এবং সম্ভবতঃ অশুভকর) তেমনি বৈষয়িক 'ডেমোক্রেসী' শুভকরী হইলেও, হয় ত এখনও অসম্ভব। কঙ্গ্রেস নিজে যে গণনা গ্রহণ করিয়াছেন, তদনুসারেই, অস্মদ্দেশে কৃষিজীবীর সংখ্যা শত করা ৮০ জন। অতএব এই কৃষিবল লইয়া প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ এবং এই কৃষিবলই ভারতবর্ষের প্রকৃত সম্বল। কিন্তু, ভারতের এই ভগ্নাবশিষ্ট শক্তির যেরূপ সাংঘাতিক শোচনীয় অবস্থা তাহার সবিস্তার বৃত্তান্ত কঙ্গ্রেস বিলক্ষণই জানেন। পরন্তু, তাহার প্রত্যক্ষ প্রজ্জলিত, দুরন্ত দেদীপ্যমান প্রমাণ,—এই করালমূর্ত্তি বর্ত্তমান—বর্ত্তমানের বহ্নি এবং বিষ—১৩০৩ সালের, সর্ব্বগ্রাসী মহা মন্বন্তর।

ভারতবর্ষের কৃষিবল বৎসরের প্রায় বার মাসই দুর্ভিক্ষ পীড়িত, অভুক্ত, অর্দ্ধভুক্ত, পরন্তু, এ বৎসরের সমগ্র ভারত-ব্যাপী বিপুল দুর্ভিক্ষ বহ্নিতে তাহারা, কৃষাণ কৃষাণী, কঙ্কালসার মানব মানবী, শ্রমোৎপন্ন শস্য মাত্র উপজীব্য অসংখ্য প্রাণী কিরূপে পতঙ্গবৎ পুড়িতেছে, তাহার হৃদয়-বিদারক চিত্র আমি এস্থলে অঙ্কিত করিতে বসিব না। সহৃদয় পাঠক প্রতিদিনই তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া মর্ম্মাহত হইতেছেন, হয় ত হাতের অন্নগ্রাস নিজের মুখে না দিয়া, অশ্রু-সিক্ত করিয়া, তাহা বহুদিন অভুক্ত ক্ষুধাতুরের মুখে তুলিয়া দিতেছেন! হয় ত অভাগা, সাগ্রহে প্রদত্ত আপনার অন্নগ্রাস গ্রহণ করিয়া গলাধঃকরণ করিতে পারিল না; কোটরস্থ নয়ন বহুদিনের পর অন্ন দেখিয়া উৎফুল্ল হইল, অভাগার আত্মা নিঃশব্দে আপনাকে আশীর্ব্বাদ করিল, কিন্তু, হায়! শুষ্ক কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়াছে, শীর্ণদেহ অবশ হইয়াছে; প্রাণ বায়ুর অল্পাবশিষ্ট নিশ্বাসটুকু তখনি নিবিয়া গেল! আপনি, হয়ত, পুনঃ অন্ন লইয়া অন্য এক অভাগার মুখে তুলিয়া দিতে লাগিলেন। দুর্ভিক্ষের নিদারুণ দৃশ্য দিগ্বিদিকে আজ কাল দৃষ্ট, তাহার আলেখ্য উঠাইয়া দেখাইতে চাই না।

পরন্তু, কঙ্গ্রেস এই উপস্থিত বিপদে যে ব্যবস্থা করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, তাহাও উল্লেখ করিব না। লজ্জার কথা, হৃদয়হীনতার কথা উল্লেখের অযোগ্য।

কঙ্গ্রেস কৃষক সমাজের চিরস্থায়ী অন্ন ক্লেশ নিবারণ কল্পে যে কয়েকটী বাঁধা প্রস্তাব উক্ত ও পুনরুক্ত করেন, এবং এ বৎসর সে সম্বন্ধে যাহা কিছু ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা প্রচুর নহে। কেবল, সামরিক ব্যয় কমিলে, বা হোম চার্জ্জ না থাকিলে, বা বাটা বৃত্তি না দিলে বা ধনীর ধনের টেক্স কমিলে বা ঐ প্রকৃতির অন্যান্য "ইকনমিক" প্রশ্ন উত্থিত বা মীমাংসিত হইয়া অসম্ভব সম্ভব হইলে, আমাদের আর যতই উন্নতি হউক, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে, কৃষক শ্রেণীর ক্লেশ ও দেশের সংক্রামক দুর্ভিক্ষ প্রশমিত হইবার সম্ভাবনা নাই। পরন্তু, গবর্ণমেণ্টের খাসমহল ও অস্থায়ী বন্দোবস্ত মহলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া, জমিদার ও জমিদারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিলেও (যাহার জন্য কঙ্গ্রেস অতিশয় ব্যস্ত হইয়া বার বার রেজলিউসন পাস করিতেছেন) কৃষককুলের দুঃখ ঘুচিবে না, তদ্দ্বারা সে দ্রব্যটা বরং আরও অধিক স্ফীত হইয়া দাঁড়াইবে। অবস্থাভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই ইহা জানেন। ইহার প্রমাণও প্রভূত আছে। অতএব কৃষক-শ্রেণীর অর্থাৎ দেশের [illegible]তের আনা বকম, অথবা তাহারও অধিক

সংখ্যক লোকের সংক্রামক অন্ন কষ্ট নিবারণ বা প্রশমন করিতে হইলে প্রথমতঃ যে যে দিকে ব্যবস্থা করিতে হয়, কঙ্গ্রেস সে দিক স্পর্শ করিতেই সাহসী হইবে না। পক্ষান্তরে, অজগব গবর্ণমেণ্ট, পুনর্ব্বার সিপাই মিউটিনীর মত, অথবা তাহার অপেক্ষা বহু বিস্তৃত সমগ্র দেশময় আর একটী মিউটিনীর মুখ না দেখা পর্য্যন্ত, বোধ হয়, সেদিকে তাকাইবেন না। অতএব সে কথা এখন উপর-পড়া হইয়া, উত্থাপন করা, অরণ্য মধ্যে বৃথা রোদন করা মাত্র। অতএব সে কথা যাউক।

যে দেশে কৃষিজীবী লোকের সংখ্যা শত করা ৮০ জন, সে দেশ প্রকৃত প্রস্তাবে কাহাদের? হায়! যাহাদের দেশ, যাহাদের নিঃশব্দ নিরলস অবিশ্রান্ত শ্রমে দেশ রক্ষা হইতেছে, দেশের দশদিকে বিলাস-স্রোত বেগে বহিতেছে, তাহারাই কেবল, তাহারাই অহরহ অন্ন-কষ্টে কাতর, তাহাদের আপনার নিজের বলিতে কিছুই নাই! নিজের শ্রম-লব্ধ অন্নগুলির অগ্রভাগ, অধিক ভাগ, অপরের মুখে তুলিয়া দিয়া, আপনারা অর্দ্ধাশনে অনশনে কাটাইতেছে! অতীত, বিস্মৃত মুসলমান আমল হইতে, উপস্থিত বর্ত্তমান ইংরেজের আমল পর্য্যন্ত, দেশের বিপুল কৃষিবল দেশের সর্ব্বপ্রধান শক্তি পদদলিত, লুণ্ঠিত, প্রতারিত হইয়া আসিতেছে! যাহাদের দেশ, যাহাদিগকে লইয়া দেশ, তাহাদেরই দশা সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয়, তাহারাই সম্বলহীন, সম্মানহীন। কঙ্গ্রেসের পেট্রিয়ট বাবুও কৃষককে বলেন operative! কৃষক, কুলী, কলের চাকা, হালের গরু, গোলামের গোলাম, ভারবাহী গর্দ্দভবৎ ব্যবহৃত, অপমানিত, নিপীড়িত। কিন্তু, দেখুন! যত কালই হউক, প্রকৃতির প্রতিশোধ আছেই। বহু শতাব্দের সুপ্ত শক্তি এক সময়ে না এক সময়ে জাগিবে, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ করিবেন না। নিদ্রিত ও নির্জীব যে দিন জাগিবে, সে দিন যে দুরন্ত আগুন জ্বলিবে, তাহা সহজে নির্ব্বাপিত হইবে না। তদ্দ্বারা, হয়, কৃষি শক্তির স্বাভাবিক স্বত্বাধিকার সংগঠিত ও সংস্থাপিত হইবে, নতুবা সমগ্র দেশ ভস্মসাৎ হওয়ার পর পুনঃ নূতন রাজ্যের পত্তন হইবে। সে দিনের বড় বেশী বিলম্ব আছে, তাহাও মনে করা যায় না। ভারতবর্ষের বিপুল কৃষি-বল যদি একান্তই আত্মশক্তিতেও সচেতন না হয়, য়ুরোপীয় উদার "ডেমোক্রেসী" তাহাকে উত্থিত করিবে। ইহা নিশ্চয়।

ইংরেজ শাসন ও ইংরেজী শিক্ষার বিস্তারে অস্মদ্দেশে য়ুরোপীয় ধরণে নানা বিষয়ক স্বত্বের ও স্বার্থের সভা সমিতি উত্থিত হইলেও এবং সর্ব্বোপরি, রাজনৈতিক আন্দোলন ও প্রজানৈতিক স্বার্থের মহা কেন্দ্র কঙ্গ্রেস সভা আজ দ্বাদশ বৎসর কাল সংস্থাপিত হইলেও, অদ্যাবধি কৃষি-স্বার্থের ও কৃষক স্বত্বের কোন সভা সমিতি দেখা যাইতেছে না; অথচ দেশীয় লোকের শতকরা ৮০ জন কৃষক। ইহার কারণ, কৃষক য়ুরোপীয় রাজনীতি আজও চিনিতে পারে নাই। হিন্দু ও মুসলমান কৃষক তাহাদের ধর্ম্ম কর্ম্ম চিনে; কিন্তু, রাজনীতি চিনে না; তাহার কোন সংবাদ রাখে না। যাহা তাহারা চিনে, তাহার জন্য প্রাণ লইয়া হাজির হয়। এই কারণেই হিন্দুর গোরক্ষিণী সভার এত জোর, মুসলমানের মহরমে মসজিদে এত মায়া, যে তজ্জন্য তাহারা মৃত্যুকে অতি তুচ্ছ মনে করে। তাহাদের মুখের অন্ন পরে কাড়িয়া খায়, ইহা যে তাহারা খুব

পছন্দ করে, তাহাও নয়; মুখের অন্নে যদি কাহারও মমতা থাকে, দরিদ্র কৃষকের তাহা বিলক্ষণই আছে; কারণ তাহার প্রত্যেক শস্য কণা কৃষকের স্বেদ ও শোণিত হইতে উৎপন্ন। কিন্তু, অদৃষ্ট ও অদৃষ্টবৎ অপরিজ্ঞাত রাজনীতির ও দুরন্ত দেশাচারের কিরূপ বৈষম্যে, কোন বিভ্রাটে যে তাহাদের অনন্ত দুঃখ, তাহা তাহারা জানে না। আপন আপন দুর্দ্দশাকে প্রারব্ধে ও কিসমতের ক্রোড়ে শোয়াইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকে। রাজবিধি, শাসন নীতি ও বিসদৃশ বৈষয়িক লোক-ব্যবহারাদিকে তাহারা অদৃষ্ট বলিয়াই বুঝে, তাহাদের প্রতারক ও প্রপীড়কগণ, ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়াও দেয় তাই, আবহমান কাল হইয়া আসিতেছে তাই। কাজেই তাহারা অলড়, অচল। কিন্তু, রাজনীতি অন্ততঃ ইংরেজ রাজনীতি যে একেবারে প্রারব্ধবৎ অপরিবর্ত্তনীয় নহে, শাসন নীতি যে ন্যায় ও প্রজা সাধারণের অভিমত মানিয়া চলে, বিসদৃশ ব্যবহার, ভূমির স্বত্বাধিকার ও তন্নিবন্ধন অত্যাচার যে ভগবানের নিয়ম নহে, মনুষ্য-কৃত কৌশল, অতএব একান্ত অখণ্ডনীয় নয়; পরন্তু, রাজদ্বারে যে সমষ্টি ভাবে কৃষক কুলীরও সম্ভ্রম আছে, গুরুত্ব আছে, সুবিচার প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে, তাহা তাহারা জানে না; এক কথায় রাজ-নীতি তাহারা চিনে না। কাজেই স্রোতের শৈবালবৎ ভাসিয়া বেড়ায়। তারপর রাজশক্তি, আইনের সহায়তা নিকটস্থ করিয়া দিয়াছেন, বিচার গৃহের দ্বার খুলিয়া রাখিয়াছেন সত্য, কিন্তু, হায়! কত সময়ে আইন নিজেই ভ্রান্ত, পদে পদে বিভ্রাট-ময়! বিচারালয় চাতুরীর বারদ্বারী গৃহ। উকিল ঠকায়, মোক্তার ঠকায়, আমলা ঠকায়, পিয়াদা ঠকায়, ধর্ম্মাধিকরণ প্রতারণার পঙ্কতীর্থ! তথায় সবল মিথ্যার জয়, দুর্ব্বল সত্যের পরাজয়। তথায় উৎকোচ ও শঠতা ও কৌশল জাল দিনকে রাত্রি, রাত্রিকে দিন করে। শস্য-ক্ষেত্রের সরল শ্রমজীবী তাহা একবার দেখিয়াই আজীবন আতঙ্কে শিহরে; মনে করে, উহাও তাহার কিসমত। শত অত্যাচার, পীড়ন, প্রবঞ্চনা নীরবে সহ্য করে, প্রতিকার প্রত্যাশায় পার্য্যমানে আইনের পানে তাকায় না। আইন, তাহার নিকট, অত্যাচারের অন্যতম যন্ত্র, অত্যাচারীই তাহাকে আইনেও আকৃষ্ট করিয়া নিষ্পেষণ করে।

ইহা রাজবিধির ব্যভিচার, বিচার গৃহের অবৈধ বিড়ম্বনা,—রাজশক্তির উদ্দেশ্য নহে, রাজনীতি আরও উচ্চে, তাহার নিকট এ ব্যভিচার বিড়ম্বনারও প্রতিকার আছে, শাসন সঙ্কট একেবারেই অচিকিৎস্য ব্যাধি নহে, অত্যাচার, অনাচার, অবৈধ অন্যায় ও অস্বাভাবিক ব্যবহার মাত্রই প্রজাপুঞ্জের সমষ্টিত শক্তি দ্বারা প্রতিকার-সাধ্য; রাজশক্তি সমষ্টিত প্রজা-শক্তি উপেক্ষা ও অবহেলা করেন না এবং কৃষি-বলই এদেশের সর্ব্ব প্রধান প্রজা শক্তি, কৃষক সমাজ ইহা জানে না; তাহারা নিজের অপরিমেয় শক্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, প্রজা-শক্তি বুঝে না, রাজনীতি চিনে না! কন্‌গ্রেসের উচিত ছিল চিনাইয়া দেওয়া, বুঝাইয়া দেওয়া। কিন্তু, কন্‌গ্রেস তাহা দেন নাই, দিতে পারেন না, দিতে সাহসী নন। দিতে হইলে, কন্‌গ্রেসের কতক গুলি স্কন্ধ-স্তম্ভ খসিয়া পড়ে, ক্যাসবাক্স বাহির হইয়া যায়। পরন্তু, [illegible] ও সম্পদ-আকাঙ্ক্ষী শিক্ষিতের স্বার্থে আঘাত লাগে। সুতরাং তাহা [illegible]।

সুতরাং কঙ্গ্রেসের সহিত সুবৃহৎ কৃষক সমাজের খাঁটী-স্বার্থের সংস্রব ও সম্বন্ধ নাই। তাহা থাকিলে এই দ্বাদশ বৎসরে কঙ্গ্রেসের শক্তি যেরূপ দাঁড়াইত, তাহা কেবল অনুমেয়।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, কৃষি-বল অর্থাৎ দেশের সর্ব্ব প্রধান শক্তি কঙ্গ্রেসের সংশ্লিষ্ট নহে। অর্থাৎ প্রকৃত প্রস্তাবে সংশ্লিষ্ট নহে। তবে কল্পনা করিয়া, জোর করিয়া যদি সে শক্তি সংশ্লিষ্ট আছে,বলা হয়, সে স্বতন্ত্র কথা। শক্তি শক্তির পরিচায়ক, বাক্য বা কল্পনা নহে।

কঙ্গ্রেস হইতে কৃষিবল বাদ দিলে, দেশের লোকের শত করা৮০জন লোক বাদ পড়ে। অবশিষ্ট থাকে ২০ জন। এই ২০ জনের মধ্যে যদি পাঁচ জনকে শিক্ষিত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও বোধ হয় বিস্তর। এখন ইংরেজী শিক্ষিত মাত্রেই যে কঙ্গ্রেসে যোগ দিয়াছেন বা উহার সহিত সমবেদনা যুক্ত, নানা কারণে এমন,বোধ হয়, বলা যায় না। ঐ পাঁচজনের মধ্যে যদি এক জনকেও "কঙ্গ্রেস ম্যান" বলিয়া ধরা যায়,তাহা হইলে প্রকৃত সংখ্যা অপেক্ষা বোধ হয় কম হইবে না, কিছু বেশীই হইবে। অতএব কেবল সংখ্যার হিসাবে ধরিলে কঙ্গ্রেসের শক্তি এই। দেশের লোক-সাগরের অনুপাত ধরিলে,এ সংখ্যা খুবই কম, নেহাতই microscopic minority, তাহাতে সন্দেহ নাই। অর্থাৎ এই শত করায় স্বল্প সংখ্যকেরও সমষ্টি করিলে সঙ্কলন-ফলটা বড়কম দাঁড়ায় না। তাহার উপর যখন দেখা যায় যে,সেই সমষ্টি, ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ক্ষীর এবং সার স্বরূপ, শিক্ষিতের মধ্যেও অধিকতর শিক্ষিত বাছা বাছা বিদ্বান লোক, গুণীও সম্ভ্রান্ত লোক, এবং ধনবান লোক, তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়, পরম শত্রুও স্বীকার করিতে বাধ্য হন যে, কঙ্গ্রেস শক্তিহীন সামগ্রী নহে। শক্তি যতই অল্প হউক, যতই ক্ষীণ হউক, যতই অস্পষ্ট ও অপ্রাপ্ত বিকাশ হউক, শক্তি অবশ্যই উহাতে কিছু আছে। সাজ শক্তির সাগরের সমীপে উহা গোষ্পদবৎ,সলিল বুদ্বুদবৎ বটে, তথাচ সলিল-বুদ্বুদ সলিল হইতেই উদ্ভূত, গোষ্পদস্থ বারি বারিধিরই ক্ষুদ্রায়তন। অপিচ, বিপুল বারিধি ক্ষুদ্র বৃষ্টি বিন্দুরই সমষ্টি, শিশির বিন্দু সন্নিপাতে বহু শস্য বর্দ্ধিত হয়। কঙ্গ্রেসের কিঞ্চিৎ শক্তি সর্ব্বথা স্বীকার্য্য। তবে, সে শক্তি, কঙ্গ্রেসের সাহিত্যের ন্যায় সম্পূর্ণ রূপে ইংরেজী। কঙ্গ্রেসের প্রবর্ত্তক, পরিচালক, প্রতিনিধি কঙ্গ্রেসী মাত্রই ইংরেজী-উৎপন্ন জীব। Representative men এই আখ্যা যদি ইংরেজী শিক্ষার ও শিক্ষিতের প্রতিনিধি অর্থে ইহাঁদের প্রতি প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে, তাহা কতকাংশে প্রকৃত বটে। কিন্তু, যে অর্থে দেশীয় দলপতি, সমাজপতি, পঞ্চায়ৎ চালক, বা প্রধান প্রভৃতি এ দেশে ব্যবহৃত হয়, অধ্যক্ষ, অধ্যাপক ও ব্যবস্থাদাতা প্রভৃতি অধিনায়কত্ব বাচক বাক্য স্ব স্ব জন-সাধারণ-মান্য শক্তি সহ দেশের বা দ[illegible] নর[illegible] সামাজিক বা শাস্ত্রীয় বা বৈষয়িক [illegible]র্য্য সম্বন্ধীয় পরিচালকত্ব ও প্রভুত্ব ধারণ বা বহন করে, সে অর্থে ইহাঁদের অধিকাংশই Representative men নহেন। এক জন দরিদ্র ব্রাহ্মণ, এক জন অশিক্ষিত ইতর শ্রেণীর লোক পল্লীবাসী কাজী, হল চালক কৃষাণও হয় ত সে অর্থে সাধারণ মতের ও মন্ত্রণার Representative man হইতে পারেন; কিন্তু আমার এক জন অতি

সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিত, ধনী বা পদস্থ ব্যক্তি তাহা হইতে পারেন না, ইহা বলা বাহুল্য। পরন্তু, ইংরেজী শিক্ষিত, অত্যুচ্চ পদস্থ, ধনী, উকিল, বারিষ্টার, জমিদার, জজ, প্রভৃতি বড় লোকেরা ধনে মানে বিদ্যায় যথেষ্ট সম্ভ্রম আকর্ষণ করিলেও তাঁহারা অশিক্ষিত ইতর সাধারণের সহিত অতি অল্পই (in touch) সংস্পৃষ্ট; ইহাও উহার আর এক কারণ। এদেশীয় অশিক্ষিত ও ইতর সাধারণের আন্তরিক বিশ্বাস ও প্রাণের বশ্যতা আকর্ষণ করা অতীব কঠিন। বরং যিনি যত বেশী বিদ্বান, ধনী ও বড় লোক, তিনি তাহা হইতে তত অধিক দূরে। ফলতঃ আজ কাল Representative man, Leading man, Natural leader প্রভৃতি প্রতিনিধি ও পরিচালক বাচ্য ইংরেজী শব্দ এদেশীয় ও য়ুরোপীয় লেখকদিগের কর্তৃক প্রায়ই বড় অসংযত ও অর্থ শূন্য অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়, তাহাতে সময়ে সময়ে বিলক্ষণ অনিষ্টও ঘটে।

কিন্তু, অভিনব ও য়ুরোপীয় অর্থে, কংগ্রেসীদিগকে অন্ততঃ উহার উচ্চতর স্তরের লোকদিগকে কুলীন বলিয়া অবশ্যই স্বীকার ও সমুচিত সম্ভ্রম করিতে হয়। বল্লালী কুলীন, [illegible] প্রায় অধঃপাতে গিয়াছেন। কিন্তু এক সময়ে, তাঁহারাও গুণের কুলীন ছিলেন এবং গুণ গৌরবে কৌলীন্য পাইয়াছিলেন। কংগ্রেসীগণও গুণের কুলীন, তবে, তাহার সহিত ধনের কৌলীন্যও মিশিয়াছে। ফলতঃ কংগ্রেস্ কুলীন সভা বটে। বিদ্যা বুদ্ধির কৌলীন্য, বাক্‌শক্তির কৌলীন্য, লিপি-কুশলতার কৌলীন্য, সম্ভ্রম-সম্পদ ও পদের কৌলীন্য, একত্রে কংগ্রেস-ক্ষেত্রে মিলিত। অতএব ইংরেজী কথায় বলিলে, ইহাকে অবশ্যই Aristocratic সমিতি বলা যাইতে পারে। উহা আমাদের প্রজানৈতিক পার্লামেণ্টে House of Lords বা তদনুরূপ। House of Commons আজও জন্মে নাই। যদি কখনও এ দেশে শ্রম-স্বত্বাধিকার ও কৃষক স্বার্থের কংগ্রেস হয়, তাহাই হইবে "হাউস অব্ কমন্‌স" বা কোটী কোটী লোকের অকুলীন সভা। কিন্তু, এখনও তাহার কিছু বিলম্ব আছে। যদি য়ুরোপীয় শক্তির সবিশেষ সহায়তা গ্রহণ করিয়া ও তদ্দ্বারা সঞ্চালিত, সতেজ ও সুদৃঢ় হইয়া তাহা সংগঠিত হয়, তাহা হইলে তাহা আংশিক অঙ্কুরিত হইতে এখনও অন্ততঃ আরও অর্দ্ধ শতাব্দীকাল লাগিবে। এ দেশীয় ইতর সাধারণের উদ্ধার সাধনকল্পে, ইংরেজ শাসন ও য়ুরোপীয় "ডেমোক্রেসী" অধিকতর কার্য্যকরী ও ফলোপদায়ক হইবে ইহা বলা বাহুল্য। অতএব এ সম্বন্ধে তাঁহাদেরই উপর নির্ভর করা নির্বিঘ্ন, এবং তাঁহাদের প্রদত্ত পথ ও সুবিধা সর্ব্বতোভাবে অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। দেশীয় অ্যারিসটোক্রেসী দ্বারা ইতর সাধারণের ও কৃষি স্বার্থের অনেক উপকার হইতে পারে, এবং হইযাছে, কিন্তু, তদ্দ্বারা তাহাদের চিরান্ধকার বিমোচন ও দাসত্ব-গ্রন্থি ছেদন হইবে না। তাহা, যত দিনেই হউক, ইংরেজ শাসন ও ইংরেজ প্রবর্ত্তিত শিক্ষা দ্বারাই হওয়া সম্ভব। নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে—অপার কৃষক সমাজ-সাগরে সমধিক পরিমাণে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য গবর্ণমেণ্ট (তাহার শত ত্রুটী ও অসাবধানতা সত্ত্বেও) যেরূপ সযত্ন ও সতর্ক সচেষ্টিত, এমন ত আর কেহই নহে—এমন কি তথাকথিত প্রজা-বন্ধুবর্গ নহেন! কংগ্রেস্ ত এই বার বৎসর হইয়াছেন; কই, এ সম্বন্ধে

কয়টী কথা কহিয়াছেন ? কতটুকু যত্ন করিয়াছেন ? কয়টী রেজলিউসন পাস করিয়াছেন ? একথা কি রাজনৈতিক কথার অন্তর্গত নহে ? ইহার সহিত সংক্রামক দুর্ভিক্ষের ও সর্ব্বজন-বাঞ্ছনীয় সুভিক্ষের কি কোন সম্বন্ধ নাই ? দেশের কয়টী সভা সমিতি,কয়খানি সংবাদ পত্র,নিম্ন শিক্ষা-বিস্তারের পোষকতা করিয়া থাকেন ? সুলভ মূল্যের সংবাদ পত্র, যাঁহাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইহাতে সবিশেষ স্বার্থ আছে, ভুলিয়াও কি ইহার উন্নতি কল্পে কখনও একটী কথা লিখিয়া থাকেন ? শিক্ষিত কুলীন সম্প্রদায় উচ্চ শিক্ষার জন্যই ত যাহা কিছু ব্যস্ত, নিম্নতর শ্রেণীর সুলভ শিক্ষার জন্য প্রায়ই ত কখনও একটী বাক্যব্যয়ও করেন না। গবর্ণমেন্টের অভিযোগানুসারে (যদিও সে অভিযোগ গবর্ণমেন্টের পক্ষে শোভনীয় নয়) উচ্চ শিক্ষার অত্যধিক ব্যয়ই বরং নিম্ন শিক্ষার অন্তরায় স্বরূপ। উচ্চ শিক্ষা সর্ব্বথা অতীব প্রার্থনীয় ; কিন্তু, নিম্নশিক্ষা বা নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষা ঠিক সেইরূপ অথবা উপস্থিত অবস্থায় ততোধিক বাঞ্ছনীয়। নয় কি ? বাল্যকালে শুনিতাম,উচ্চ শিক্ষা নিম্ন শিক্ষার ফিল্‌টার স্বরূপ কার্য্য করিবে। কিন্তু, কই এত কালে ত সে সাধের ফিল্টার হইতে নিম্নদিকে বড় বেশী কিছু চোঁয়াইতে দেখা গেল না ! বিন্দু-পাতও, হায়, হইয়াছে কি ? অথবা-কেবল গর্জ্জন, বর্ষণ নাই।

কেশব বাবুর সমৃদ্ধি সময়ে ইতর শ্রেণীর শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের শিক্ষার প্রশ্ন শিক্ষিত মহলে, বিলক্ষণ একটু প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজ এ বিষয়ে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। স্ত্রী-শিক্ষার ন্যায় নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষাও উক্ত সমাজের সুবিশেষ মনোযোগের বিষয় হইয়াছিল। পূর্ণ বয়স্ক কৃষক,কারিকর, মুটে মজুর প্রভৃতির জন্য এই সহরের ও, বোধ হয়, মফঃস্বলের স্থানে স্থানে রজনী পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছিল এবং সর্ব্বোপরি, এ বিষয়ের আন্তরিক আন্দোলন ও উদ্যোগ আয়োজন চলিয়াছিল। বঙ্গের সর্ব্ব প্রথম সুলভ সংবাদ পত্র, "সুলভ সমাচার" এই উপলক্ষেই, বোধ হয়, প্রবর্ত্তিত হইয়া, সুলভ পত্রের পথ দেখাইয়া দেয়। "সুলভ সমাচার" সুমহৎ ও পবিত্র পন্থার কার্য্য করিয়া, অতি অল্প দিনে, জ্ঞানান্ধ গরিব লোকের যে উপকার করিয়াছিল, সে পন্থার ও সে মহত্ত্বের সহিত, একাল পর্য্যন্ত কিছু কার্য্য হইলেও নিম্নশিক্ষা অনেক উচ্চ হইত, শ্রমজীবীদের মধ্যে যুগান্তর উপস্থিত হইত বলিয়া বোধ হয়। কেশবচন্দ্রের "ইণ্ডিয়ান রিফরম অ্যাসোসিয়েসন" হইতেই,মনে হইতেছে, এই সব সদনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। কিন্তু তাহার পর, শিক্ষিতদের মধ্যে, সংস্কারক সম্প্রদায়ে, ব্রাহ্মসমাজে, সর্ব্বত্রই যেন এ প্রশ্ন নিবিয়া গিয়াছে। এ ক্ষেত্রে কেবল গবর্ণমেণ্ট, ও স্থানে স্থানে খ্রীষ্টীয় মিশনরী ব্যতীত আর কোথায়ও কেহ আছেন বলিয়া জানি না।

পুনশ্চ, বঙ্গ ও বিহারের লক্ষ লক্ষ রায়তের যাঁহারা অধীশ্বর,সেই রাজা, মহারাজা, হুজুর জমিদার মহাশয়েরা, তাঁদের নিরক্ষর রায়তের শিক্ষা সম্বন্ধে কিরূপ মনোযোগী ? অবশ্য ইঁহাদের কেহ কেহ হয় ত স্বগ্রামে বা এলাকা মধ্যে এক আধটা "এডেড্ স্কুল খুলিয়া নাম কিনিয়া থাকিবেন ; কিন্তু তাহাই কি প্রচুর ? তাহাই কি প্রকৃত কর্ত্তব্য পালন ? তাহার পর আমাদের ভূস্বামী মহোদয়গণ মোটের উপর নিম্ন শিক্ষার সপক্ষ,—না বিষম বিপক্ষ ? আমরা কোনও

মহারাজা বাহাদুরের বিস্তৃত রাজ্যে এ বিষয়ের যেরূপ ব্যবস্থা, কিঞ্চিৎ অবগত আছি। উক্ত রাজ্য যখন কোর্ট অব্ ওয়ার্ডের শাসনাধীনে ছিল, তখন এষ্টেটের কোন কোন স্থানে স্কুল ও পাঠশালা স্থাপিত হইয়া কতক কতক রায়ত বালকের কথঞ্চিৎ শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কোর্ট অব্ ওয়ার্ড, এষ্টেটের ব্যয়ে, জনৈক ডেপুটী ইনেস্পেক্টর নিযুক্ত করিয়া স্কুল পাঠশালা গুলি পরিদর্শনের ও পরিচালনের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু, রাজ্যের মালিক মহারাজার বয়ঃপ্রাপ্তি ও রাজ্য প্রাপ্তির কিছু কাল পরেই, একে একে স্কুল পাঠশালা কয়টীর প্রায় সবই সাফ করিয়া দেওয়া হইয়াছে !! কেন ? কেন তাহা আবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন ? রাজ্যের ব্যয়ে রাজ্য মধ্যে শিক্ষা-শালা রূপ সাংঘাতিক অস্ত্র- অমন অহিতকর আবর্জ্জনা কি রাখিতে আছে। রায়তের চক্ষু ফুটিলে, রায়ত আলোক দেখিলে যে, রাজ্যের অকল্যাণ। অন্ধকার। অন্ধকার ! এস অন্ধকার, থাক অন্ধকার—আমার প্রিয় পদার্থ ! আমার ঐশ্বর্য্যের, আমার একাধিপত্যের, আমার অত্যাচারের অনন্ত সঙ্গী।

মহাশয়। মার্জ্জনা করিবেন। নিজের দেশ, নিজের দেশীয় প্রভু—নিজের গৃহের পানে বারেক চাহিয়া গবর্ণমেণ্টের উপর গালি পাড়িলে ভাল হয়।

নিম্ন—নিম্নতর স্তরে শিক্ষালোক প্রবিষ্ট হইয়া কথঞ্চিৎ কার্য্য করিতে এখনও সময় লাগিবে,৫০—৬০—৭০ বৎসর ; প্রায় শতাব্দ কাল। এ কংগ্রেস্ যদি ততকাল জীবিত থাকার পথ, ক্রমোন্নতির দ্বারা, পরিষ্কার করিয়া লইতে পারেন, তখন উহাতে প্রকৃত প্রজা শক্তি পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইবে। তখন আমাদের "হৌস অব্ কমন্স" সৃষ্টি হইবে। কংগ্রেস্ এখন কুলীন-সভা। প্রথমত উহাতে "কমন্স-সভা" হইবার উপক্রম হইতেছিল। কিন্তু, তাহা নানা কারণেই হইতে পারে নাই। অনিবার্য্য নিয়তি বশে, উহা অভিনব তন্ত্রের কুলীন সমিতিতে পরিণত হইয়াছে।

অগ্রেই একাধিক স্থলে উল্লেখ করিয়াছি, কংগ্রেস্, শাসন একতায়, জাতীয়তা-মূলক জাতীয় সমিতি। সামাজিক জাতীয়তা, অজাতীয়তার সহিত এ পর্য্যন্ত উহার সংস্রব নাই। "সোস্যাল কনফারেন্স" বা সামাজিক মজলিস, উহা হইতে আপাততঃ একরূপ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। তবে উহার পশ্চাতে আছে বটে। তা, থাকিলেও উহার সহিত একত্র হইতে; অঙ্গে অঙ্গ মিলাইতে পারিতেছে না। গত বৎসর পুনায় উহা কংগ্রেসের প্যাণ্ডাল পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে পারে নাই। মারহাট্টী ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায় সজোরে লাঠি ধরিয়াছিলেন। কলিকাতায় এবার "কনফারেন্স" শুনিলাম, প্যাণ্ডালে প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু কংগ্রেসী হিন্দুপত্রিকাদিতে তাহার নাম গন্ধও প্রকাশিত হয় নাই।

যে কারণে কংগ্রেস্ সমাজ সম্পর্কীয় প্রশ্নে, সামাজিক সমতায়, সামাজিক একজাতীয়তা অগ্রসরে সংলিপ্ত হইতে পারেন না ; কতক-কটা তদ্রূপ কারণেই প্রকৃত কৃষি-স্বার্থের সহিত উহা আপনার একত্ব স্থাপনে অপারক। কিন্তু প্রথমোক্ত কারণ দ্বিতীয় অপেক্ষা অনেক প্রবল ও প্রচণ্ড। এজন্য সামাজিকতা হইতে একরূপ সম্পূর্ণরূপে ও প্রকাশ্যভাবে স্বতন্ত্র থাকিতে ও স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এবং দ্বিতীয় বিষয়টীর

সহিত কার্য্যতঃ পৃথক থাকিয়া, কার্য্যতঃ কৃষি-স্বার্থের ও কৃষক-সত্ত্বের বিপক্ষে থাকিয়া ও বিরুদ্ধাচরণ করিয়া, বাক্যতঃ তাহার সপক্ষতা ও তাহার সহিত একত্ব দেখাইতেছেন, নহিলে বড় বিসদৃশ দেখাইবে, বোধ হয়, এই কারণেই ঐ সপক্ষতা। অগ্রেই বলিয়াছি, এই আবৃত আচরণে উক্ত স্বার্থের ও সত্ত্বাধিকারের অনিষ্ট ঘটিতেছে।

কিন্তু উপরোক্ত দুই বিষয়ে সমাজ ও ভূমিস্বত্ব সম্বন্ধে কঙ্গ্রেস্ এখন যে স্থান গ্রহণ ও যেরূপ স্পষ্ট ও অস্পষ্ট নীতি সংগঠন করিয়াছেন বা করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহা বহুকাল স্থায়ী হইতে পারে না। সে স্থান ও সে নীতি হইতে কঙ্গ্রেস্‌কে অগ্রসর বা পশ্চাৎপদ বোধ হয় হইতেই হইবে। অমন সঙ্কট স্থানে বহুদিন টিকিয়া থাকা সম্ভব নহে। পরন্তু, সাধারণ রাজনীতি ও শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে কঙ্গ্রেস্ এখন যে নীতিচক্র পরিক্রমণ করিতেছেন এবং যে প্রকৃতির নম্র ও কভু ঈষদুগ্র পলিসি প্রচার করিয়া রাজদ্বারে আত্মপরিচয় দিতেছেন, কেবল তাহাই উপজীব্য করিয়া বহুদিন বাঁচিয়া থাকিতে পারিবেন না। এখনকার নির্দ্দিষ্ট নৈতিক কেন্দ্র হইতে ক্রমে অগ্রসর হইতে হইবে, কার্য্যের ও পলিসির প্রসার বৃদ্ধি ও প্রকৃতি পরিবর্ত্তন ও শক্তিবহ ও শক্তিপ্রদ করিতে হইবে, নতুবা স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক পঞ্চত্ব অবশ্যম্ভাবী। ইহা আমরা বুঝি বা না বুঝি, ইংরেজ রাজশক্তি বিলক্ষণ বুঝেন। কথা হইতে পারে যে, কঙ্গ্রেস্ ইংরেজ রাজনীতির ও শাসন ব্যবস্থারই পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিবে এবং উহা যে সময়ে যেরূপ আকার ধারণ করে বা [illegible], তাহার বিচার, বিশ্লেষণ, [illegible] ও সমালোচনা করিবে। কিন্তু, এই কার্য্য—কেবল এই কার্য্য কঙ্গ্রেসের মত সমিতির অস্তিত্ব বহন পক্ষে প্রচুর নহে। এইরূপ কার্য্যের জন্য স্থানীয় সভা সমিতি ও সংবাদ পত্রই প্রচুর। কঙ্গ্রেস্ ঐরূপ কার্য্য উপজীব্য করিয়া কেবল সমালোচক স্বরূপ জীবিত থাকিতে পারে না। প্রজাশক্তি সংগ্রহ, সঙ্কলন ও সৃজন করা, তাহা নৈতিক পরিধির ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রে সঞ্চালিত ও সংস্থাপিত করা উহার প্রথম ও প্রধান কার্য্য ও উহার অস্তিত্বের মৌলিক আবশ্যকতা। রাজশক্তি সম্ভূত প্রজাশক্তি পরিচালিত ও নিয়মিত করা যেমন উহার এক কার্য্য, তেমনি প্রজার আয়ত্ত ও অনায়ত্ত শক্তি বিকশিত ও জাগরিত করিয়া, প্রয়োজন মত প্রস্তুত করিয়া রাজশক্তির সাহচর্য্যে, সহায়তায় ও সংস্কারে প্রেরণ করা আবশ্যক—কেবল আবশ্যক নহে, উহার অস্তিত্ব ধারণের মূল কারণ।

কংগ্রেসের সামাজিক নিরপেক্ষতা, অন্তত আপাততঃ অনিবার্য্য স্বরূপ এবং উহার অত্যুৎকৃষ্ট নীতি। এ নীতি যত সুদৃঢ় ও অটল থাকে ও হয়, ততই উহার মঙ্গল। কিন্তু, এ নীতি ধরিয়া, উহা থাকিতে পারিবে কি, এবং পারিলেও সম্যকরূপে উহার স্বকার্য্য উদ্ধার সম্ভব হইবে কি? ইহা এক সমস্যা। এ সমস্যা পূরণ করিতে বসা এখন বৃথা। অবস্থায়, কালে ও তদুপযোগী কর্ত্তব্যে উহাকে যে দিকে লইয়া যাইবে, সেই দিকেই উহাকে যাইতে হইবে। সে বিষয়ের কোন শুভ বা অশুভ কল্পনা আনয়ন করাতে ফল নাই। তাহা তোমার আমার ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের উপর নির্ভর করে না। তাহার গতি সে নিজেই স্থির করিবে। হইতে পারে, সে গতি ও তাহার পরিণাম শুভ বা অশুভ।

কিন্তু, সে শুভাশুভ কাহারও হস্তায়ত্ত নহে। তাহা, কাল-স্রোতে কার্য্য-কারণ পরম্পরার ফল। প্রকৃতির সে স্রোত বোধ করা মানুষের অসাধ্য; বিশেষতঃ উপস্থিত অবস্থাপন্ন হিন্দুস্থানের একান্ত অসাধ্য। অনিবার্য্য য়ুরোপীয় প্রভাবে যদি এমনি ঘটে যে,সমগ্র হিন্দুস্থান কালক্রমে একই জাতি, একই ধর্ম্ম ও বর্ণে পরিণত হইয়া সমস্ত "একাকার" হইয়া যায়, হিন্দু মুসলমানাদির চিহ্ন মাত্র না থাকিয়া, তাহার নাম মাত্র কেবল পুরাবৃত্তের বিষয় হয় এবং সেই একীকৃত সংমিশ্রিত জাতি য়ুরোপীয় শক্তিতে সতেজ হইয়া ইংলণ্ডের অন্যতম "কলোনী" স্থান অথবা ইংলণ্ড হইতে স্বতন্ত্র রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়,—তাহা সে সুদূর পরিণাম, তোমার আমার ইচ্ছাধীন নহে; তোমার আমার ক্ষুদ্র প্রতিবাদ ও প্রতিবন্ধকে রহিত হইবে না। অতএব যদি অদৃষ্টবাদী হিন্দু হও বা কিসমৎবাদী মুসলমান হও, সে পরিণতিকে "নিয়তি কেন বাধ্যতে" বলিয়া কাজেই স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং এখন কংগ্রেসের সমাজ-নিরপেক্ষতা বা তাহার সংস্কার-সপক্ষতার আসক্তি চিন্তা-পোযোগী বিষয় হইলেও practical politics এর বিচার্য্য হয় না। কংগ্রেস্ এখন কার্য্যত, বাক্যত ও দৃশ্যত সমাজ ও ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ; ইহাই যথেষ্ট। তবে তাহার পার্শ্বেও পশ্চাতে এমন সকল শক্তি ক্রিয়া করিতেছে, যাহা ঐ দুই পুরাতন পদার্থের সংস্কার-প্রার্থী ও নূতন সংগঠন-প্রবণ, ইহাও প্রত্যক্ষ। যেমন গবর্ণমেণ্ট জাতি ও ধর্ম্ম নিরপেক্ষ হইলেও তাহার পার্শ্বে, পশ্চাতে, চতুর্দ্দিকে, এমন সকল শক্তি কার্য্য করিতেছে,যাহা লোকের জ্ঞাতে ও অজ্ঞাতে পুরাতনের পরিবর্ত্তে নূতন সংগঠন করিতে সচেষ্টিত। ফলতঃ গবর্ণমেণ্টের রাজশক্তি ও কংগ্রেসের প্রজাশক্তির সহগামী যে ঐ সকল অবান্তর শক্তি ও তাহাদের কার্য্য,—উহা অনিবার্য্য। পক্ষান্তরে, উহাদিগকে পরাভূত, প্রশমিত ও খর্ব্বীকৃত করিবার জন্য যে সকল সংরক্ষণশীল শক্তি ও তাহাদের প্রতিঘাত, তাহাও সম্পূর্ণরূপে স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যকর, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। প্রকৃত উন্নতি ও তাহার স্বাভাবিক স্বাস্থ্য পূর্ব্ব সংরক্ষণ ব্যতীত কখনও সম্ভবে না। এখনকার উন্নত জাতির অতীত ইতিহাস ও বর্ত্তমান অবস্থাও ইহার সাক্ষী। ইংলণ্ড ত অত্যুন্নত ও প্রথম শ্রেণীর শক্তি, কিন্তু, সামাজিক রক্ষণশীলতায় এমনি সুদৃঢ় যে, হিন্দুও তাহার নিকট হার মানে। রক্ষণশীলতার প্রতি সংকীর্ণতাপবাদ দেওয়া তাদৃশ উদারতার পরিচায়ক বলিয়া বোধ হয় না।

স্বয়ং উন্নতিও এক পদ অধিক অগ্রসর হইলে উচ্ছৃঙ্খলতা। রাজনৈতিক উন্নতির যে প্রকার পরিণতির মূর্ত্তি উপরে কল্পনা করা হইয়াছে—তাহা হিন্দু দৃষ্টিতে ঐ স্বরূপ-সমন্বিত। উহা সম্ভব। পক্ষান্তরে ইহাও অসম্ভব না হইতে পারে যে, হিন্দুস্থানের জাতি নিচয়, বিশেষতঃ হিন্দু জাতি যদি হিন্দুত্বের আভ্যন্তরিক আত্ম-সংরক্ষণ শক্তি দ্বারা, পূর্ব্ববৎ দৃঢ় থাকিয়া বহিঃবিপ্লবে বিচলিত না হইয়া, আপনার বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম অব্যাহত রাখিতে পারে,তাহা হইলে ইহাও অসম্ভব নহে যে, হিন্দু হিন্দু থাকিয়া বিভিন্ন জাতি ও বর্ণ সঙ্করাদিতে বিলুপ্ত বা বিকৃত না হইয়া, বর্ত্তমান শাসন শক্তির ন্যায়, ভবিষ্যতে বৃটিশ রাজ-নীতির সর্ব্বোচ্চ [illegible]— প্রজানৈতিক ... প্রকৃত [illegible]

প্রাপ্ত হইতে পারে। তাহা অপেক্ষা আরও উচ্চতর উন্নতিও লাভ করিতে পারে। যাহা হউক, বিদেশীয় ও বিজাতীয় শাসনের যদি এরূপ পরিণাম কোনও কালে—দূর ভবিষ্যতে, এদেশে সম্ভব হয়, তাহা হইলে, পৃথিবীর ইতিহাসে একটি অপূর্ব্ব ও সম্পূর্ণ অভিনব অধ্যায়ের আবির্ভাব হইবে।

কংগ্রেসের সমাজ-সংস্কার-নিরপেক্ষতা-নীতি সমীচীন। সমাজ নীতির এস্থানে, কংগ্রেস, কত দিন দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিবেন, দূর ভবিষ্য কাল তাহার মীমাংসা করিবে। কিন্তু, কংগ্রেসের কৃষি-স্বার্থ সম্বন্ধীয় নীতিকে অচির-কাল মধ্যেই, হয় পশ্চাতাকুঞ্চন, নয় অগ্র-প্রসারণ করিয়া অসন্দিগ্ধ ও অন্ধকারহীন পরিষ্কার স্থান গ্রহণ করিতে হইবে। 'উভয় সঙ্কট' মধ্য স্থলে দাঁড়াইয়া, কার্য্যত সমর্থন ও বাক্যত দুর্ব্বলের রক্ষণাভিনয় কবিলে চলিবে না। এ সম্বন্ধে হয়, অকপটে কৃষক পক্ষে, নয় কুলাচার্য্যবৎ কুলীন পক্ষ অবলম্বন করিতে হইবে। কোনও না কোনও দিন রাজনীতি নিজেই তাহা করাইবে। ইংরেজ রাজনীতির যে ন্যায়পরতা ও নিম্নোত্তলন-কারিণী শক্তি প্রভাবে আজ এই কংগ্রেস্ ও কংগ্রেসে, মধ্যবিত্ত ও বৃত্তিহীন ভদ্র সন্তান-দিগের সহিত অসূর্য্যম্পশ্যা, অগাধ সম্ভ্রমা-হঙ্কার উদ্ধত, অভিমান-স্ফীত রাজা মহা-রাজ, নোবাব জমিদার মহাশয়দের মিলন, হস্ত কম্পন, মিষ্টহাসি—মিশামিশি ; পরন্ত রাজনীতির যে শক্তি প্রভাবে কংগ্রেস্ আজ সাধারণ অভিমতের মুখপাত্র সাজিয়া চন্দ্র সূর্য্য বংশীয় দুর্দ্ধর্ষ দেশীয় দিকপালদিগের সম্বন্ধেও "রেজলিউসন" প্রচার করিতে পারেন, সেই ঐন্দ্রজালিক শক্তিই ক্রমে কংগ্রেসকে শিখাইয়া দিবে, কিসে কি ; আমরা অনবধানে অন্ধ, তাই সে শক্তির প্রচ্ছন্ন প্রক্রিয়া দেখিয়াও দেখি না। আত্ম বিস্মৃতির মযূজে আপনাদিগকে "মস্ত" মনে করি। তা, তত বেশী বিলম্বও করিতে হইবে না ; ভূস্বামী ও রায়তের সম্বন্ধ নিয়া-মক এক বিন্দু উদার ব্যবস্থার একটী বিল কখনও ব্যবস্থাপক বৈঠকে উঠিলেই বুঝা যাইবে, কংগ্রেস্ কেমন গরিব কৃষকের বন্ধু এবং তখন কি করেন।

ইণ্ডিয়ান কংগ্রেসের আবিষ্কর্ত্তা—আদি জোটক ও ঘটক মিষ্টার হিউম—ইংরেজ হিউম—ডেমোক্রেটিক হিউম চিরস্থায়ী বন্দো-বস্ত-সমর্থন-নীতি ও দেশীয় রাজগণ সম্বন্ধীয় নীতি কংগ্রেসে প্রবেশ করিতে দেন নাই। বোধ হয়, তাঁহার শঙ্কা ছিল যে, উহার দ্বারা কংগ্রেস পাছে কৌলীন্য সভায় পরিণত হয়। উপস্থিত প্রকৃতির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনি-বার্য্য অনিষ্টের মূল বলিয়া হিউমের ধারণা ছিল। কিন্তু, হিউমের অনুপস্থিতিতে ঐ উভয় নীতিই কংগ্রেসের অঙ্গালিঙ্গন করি-য়াছে। গত কয়েক বৎসর হইতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুকীর্ত্তি কীর্ত্তন ও বিস্তারাকি-ঞ্চন চলিয়া আসিতেছে, এবৎসর দেশীয় রাজন্যবর্গও, আমাদের অনুগ্রহ ও পেট্রনেজ প্রাপ্ত হইয়া কংগ্রেস রেজলিউসনের বিষয়ী-ভূত হইয়াছেন !!

দেশীয় রাজা ও রাজ্য, হায়! আমাদের অতীত, বিস্মৃত জাতীয় জীবনের ভগ্নাবশিষ্ট উপল খণ্ড! নব্য হিন্দুস্থানের পুরাতন স্বপ্নের শেষ স্মৃতি! অতএব তাহার শত অশাসন, অশান্তি ও পূর্ব্বপদস্খলন সত্ত্বেও হিন্দু (এবং মুসলমানেরও বটে) মাত্রেরই উপাস্য সামগ্রী, বড় আদরের ও এখনও একটু অহঙ্কারের বস্তু। তা, তাঁদের প্রতি কংগ্রেসের মত

প্রজা সভার এই স্পদ্ধান্বিত পেট্রনেজটুকু—এই অযাচিত অনুগ্রহ টুকু কি কিছু স্থান, কাল পাত্রানুপযোগী, অতএব বিলক্ষণ কি বিদ্রূপকর ও সম্ভবতঃ অনিষ্টকর নহে? ইহাতে দেশীয় রাজাদের ইষ্টাপেক্ষা অধিক অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই কি? ইহাতে কংগ্রেসেরও নিজের কোন আশঙ্কা নাই কি? বৃটিশ রাজনীতির অপর একটী অঙ্গ আছে, যাহা রাজশক্তির আদিম ও অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ,—কঙ্গ্রেস কি তাহাও ইদানীং বিস্মৃত? হইতে পারে, স্বদেশীয় রাজন্য বর্গ কঙ্গ্রেসে মিলিত হইলে, কঙ্গ্রেস বিপুল বলশালী হইতে পারে। কিন্তু, তাহা কি সম্ভব? সম্ভব হইলে দেশীয় রাজন্যবর্গ আপনারাই কি আপনাদের একটী কঙ্গ্রেসও করিতে পারিবেন না? পাটনা গোয়ালিয়রের সমর্থন কি মিলিবে না, হলকর, হয়দ্রাবাদ, বরদা, ত্রিবাঙ্কোর বা আর কেহ বা সকলে মিলিয়া করিতে পারিতেন না? বড়ই কঠিন কথা। রাজনীতি এস্থলে সাহিত্য লীলা নহে। কঙ্গ্রেস আমাদের নমস্য; কিন্তু, রাজনীতিও ক্রীড়নক নহে। অতএব এ কথা যাউক

ফলতঃ কঙ্গ্রেস্ কার্য্যগতিকে, ক্রমে প্রায় কৌলীন্যেরই প্রতিনিধি হইয়া দাঁড়াইতেছেন। এদেশীয় গবর্ণমেণ্ট "বরোক্রেসী" বলিয়া উক্ত। কঙ্গ্রেসকে, "অ্যারিষ্টক্রেসী," যদি এক মাত্রা অত্যুচ্চ হয়, বরং বাবু-ক্রেসী বলা যাইতে পারে। বরোক্রেসীতে যতটা "ডেমোক্রেসী" আছে, বাবু-ক্রেসীতে তাহারও কম। কিন্তু, অকৃত্রিম ও আসল ডেমোক্রেসীর উত্থান ব্যতীত শাসন সংস্কার ও রাজনৈতিক সবিশেষ কোনও স্বত্বাধিকার উদ্দেশে সাধনা-সিদ্ধ হইবে না।

কঙ্গ্রেসের সাহিত্য-স্পর্শ মাত্র করিয়া উহার কথা উঠান গিয়াছিল, এখন সেই সাহিত্যেই কথা শেষ হউক। দেখা গিয়াছে, কঙ্গ্রেসের বিপুল সাহিত্য ও বিন্দুমাত্র শক্তি, উভয়ই ইংরেজী। নানা কারণে ইংরেজী, তাহা অনিবার্য্য, আবশ্যকীয়। অতএব আপত্তি করা অন্যায়। সংস্কৃতে বা অন্য কোনও স্বতন্ত্র প্রদেশীয় ভাষায় কঙ্গ্রেসের মধ্য কেন্দ্রের কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না। ইংরেজী ব্যতীত এরূপবিধ কঙ্গ্রেস সম্ভবই হইত না, তাহা সকলেই জানে। তবে, যে সকল স্থলে না হইলেও চলে, ও ইংরেজীরই অধিকতর উপযোগীতা ও ইষ্টকারিতা, সে সকল স্থলেও যে ইংরেজীর উপদ্রব, ইহাই আক্ষেপ। আক্ষেপ, কেবল দেশীয় ভাষার আয় বৃদ্ধি না হওয়ার জন্য নহে, কঙ্গ্রেসের নিজের উন্নতি ও আত্ম মত বিস্তারে বাধা পড়ার জন্যও বটে। কঙ্গ্রেস-সাহিত্য ও কঙ্গ্রেস বক্তৃতায় ইংরেজীর এই আবশ্যকাধিক অতিরিক্ত ব্যয় ও ব্যবহারও ইতর-সাধারণের মধ্যে কঙ্গ্রেস কথা ব্যাপ্তি লাভ করিবার প্রবল অন্তরায়। কঙ্গ্রেস আপাততঃ ইংরেজী হ্যাটকোটে জন সাধারণের মধ্যে জায়গা পাইবেন না, পাইতেছেনও না। উহা বস্তু কি, তাহারা বুঝেই না। জন-সাধারণের সংস্পর্শ-বিরহে কঙ্গ্রেসের জাতীয়ত্ব ইংরেজী শিক্ষিতদের মধ্যেই আবদ্ধ রহিয়াছে। ইংলণ্ডের উদার রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের সহিত কঙ্গ্রেসের কুটুম্বিতা। তাহারই অনুরূপ আপনার অভিমত ও আকাঙ্ক্ষা অঙ্গীকার করেন, অথচ জানি না কিরূপে কার্য্যতঃ ইতর সাধারণে উপেক্ষা করিয়া ক্রমে কুলীন সভা হইয়া দাঁড়াইতেছেন। দেশীয় প্রজা শক্তির [illegible] ক্ষীণ ও হীন অবস্থায়, অথচ অকুলীন কুলীন

উভয় শক্তিরই সংযোজন আবশ্যক। উভয়ের কাহাকেই ত্যাগ করা যায় না, তাহা জানি। কিন্তু, প্রকৃত প্রস্তাবে, তাহা হইতেছে কি? উভয়ের সমবায় সম্ভব, সত্য ও সফল করিতে হইলে, দরিদ্রের, পদদলিতের ন্যায়ানুমোদিত স্বার্থের দিকে বারেক তাকাইয়া ধন কুলীনদিগের সম্প্রদায়-গত স্বার্থ কিয়ৎ পরিমাণে প্রশমিত করিতে হয়; এবং তাহাই প্রকৃত "পেট্রিয়টিজম" পদবাচ্য হইতে পারে। নহিলে কেবল বহু কালের পরিপুষ্ট ও প্রবল স্বার্থের পরিপোষণার্থে ও পীড়ন ক্ষমতা-বর্দ্ধনার্থে পেট্রিয়ট সাজিয়া কংগ্রেসে যোগ দেওয়া পাপের উপর আরও পাপ, তাহাতে কেবল কংগ্রেসকে কলুষিত করা হয়। অতএব কংগ্রেসকে জন সাধারণের ইতর ভদ্রের—কুলীন অকুলীনের জাতীয় সভা করিতে হইলে, আপাততঃ উপরোক্ত পক্ষে দৃষ্টি রাখিয়া ইংরেজীর ন্যায় দেশীয় যাবতীয় প্রদেশীয় প্রচলিত ভাষার সবিশেষ সহায়তা গ্রহণ করিয়া, তাহার পথ প্রশস্ত ও পরিষ্কার করিতে হয়। পরন্তু, কংগ্রেসের যেখানকার ও যখনকার যে অধিবেশনই হউক, ব্যাপারটা বিলাতী সার্কাস থিয়েটারের মত একান্ত পেশাদারী ও সংকীর্ণ টিকেটী কাণ্ড না করিয়া, অন্ততঃ দেশীয় বারইয়ারীর মত উদার সার্ব্বজনীন প্রথায় জাতীয় উৎসব বা স্বদেশ পূজা সম্পন্ন করা ভাল। কথাটা খুব তুচ্ছ, কিন্তু, অনেক সময় তুচ্ছ ঘটনাতেই বৃহৎ ব্যাপার বেশী বাধা পায়, উন্নতির অনেক সুবিধা ও সহানুভূতি হারায়। যখন যে প্রদেশে কংগ্রেসাধিবেশন হয়, অন্ততঃ একটী দিনও সেই প্রদেশীয় ভাষায় কংগ্রেসের কার্য্যাদি লোকসাধারণকে মোটামুটি রকম বুঝাইয়া দিলে মন্দ হয় না। এবং তাহা বোধ হয় একান্ত অসম্ভবও হয় না। এই যে সে দিন বিডনবাগানে দ্বাদশ কংগ্রেস হইয়া গেল, কলিকাতার প্রায় পোনেরো আনারও অধিক ইতর লোক বুঝিল না যে, উহা বস্তুটী কি। কেহ বলিল "ঘোড়ার নাচ" কেহ বলিল, "আগজিবিসন"—আমরা স্বকর্ণে কংগ্রেসের নিকটবর্ত্তী স্থানে ঐ দুটী কথা অনভিজ্ঞের মুখে শুনিয়াছিলাম। অথচ তাহারা বুদ্ধিমান বিষয়ী লোক; যে কথাই হউক, বাঙ্গালা কথায় বুঝাইয়া দিলে বুঝিতে পারে।

কিন্তু "কংগ্রেস ক্যাম্পে, অভ্যাসে ও অজ্ঞাতে ইংরেজীই এখন আমাদের আপনাদের নিজের; যেমন কাহারও কাহারও কাছে ইংলণ্ড আমাদের "হোম।" এবং যেমন আমাদের কেহ কেহ সর্ব্বাংশেই (Thoroughly English) দ্বাদশ কংগ্রেসাধিবেশন সভার বর্ণনা উপলক্ষে প্রকৃত স্বদেশপ্রাণ, কংগ্রেসের সবিশেষ পৃষ্ঠপোষক আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ "পত্রিকা" লিখেন,—

"English is a foreign tongue to an Indian — is it not? But the orators delivered themselves as British orators, trained in the British Parliament would have done under similar circumstances * * * And after making the gifted Indians so thoroughly English, the Anglo-Indians want to keep them slaves."

ইহা প্রকৃত বর্ণনা। যিনি কংগ্রেস সভা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন, তাঁহাকে এ কথায় সায় দিতেই হইবে। অন্ততঃ আমাদের কতক লোক কংগ্রেসের শক্তিশালী সদস্য ও বক্তাগণ, ইংরেজীকে অবিকল ইংরেজেরই মত, অনেক ইংরেজ অপেক্ষাও অধিক পরিমাণে আয়ত্ত করিয়াছেন। কংগ্রেসের বক্তৃতা, বস্তুতই বৃটিশ পার্লামেণ্টের বক্তৃতার মত বৃটিশ এবং বক্তাগণ বিচক্ষণ, বহুদর্শী, স্বাভাবিক বাগ্মীতা-সম্পন্ন এবং সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণরূপে বৃটিশবৎ

নহে, বৃটিশ। অভ্যাসে, আচরণে, হাবভাবে, ধীরতায়, গাম্ভীর্য্যে, পরিচ্ছদে, পারিপাট্যে, প্রাজ্ঞতাদি সকল বিষয়েই সর্ব্বতোভাবে তাঁহারা Thoroughly English, ইহা সম্পূর্ণরূপে সত্য। পরন্তু, পত্রিকার উপরি-উদ্ধৃত বর্ণনাংশ বিদ্রুপাত্মকও নহে। উহা সুধীর ভাবে সুখ্যাতিব্যঞ্জক সত্য বিবৃতি। কংগ্রেস এবং কংগ্রেসী Thoroughly English কিন্তু, তথাচ হায়! Slave গোলাম—পরাজিতপদ-দলিত, ক্রীতদাস!! "পত্রিকা" দৃষ্টান্ত দিয়া, নাম ধরিয়া পুনঃজিজ্ঞাসা করিতেছেন, ও তাহার উত্তর দিতেছেন ;—

"What is W. C. Bonerjee ? He is slave."

তা, এমনই যথন, তখন আমাদের যে এই ইংরেজী ও এত ইংরেজী ও ইংরেজত্ব, ইহাকে কি বলিব? ইসফ্ উদ্ধৃত করিয়া কাক ও ময়ুর-পুচ্ছের কথা কি বলিব? না, তাহা ঠিক নয়। আমাদের এই ইংরেজী, ইংরেজত্ব, শিক্ষা, স্বার্থ ও আসক্তি-প্রণোদিত অভ্যাস। অভ্যাস "দ্বিতীয় প্রকৃতি" হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃতি নহে। হাঁ ইহা অভ্যাস বটে। কিন্তু বিলক্ষণ আত্ম-বিস্মৃতিও বটে। নহিলে আমরা slave কেন? এত ইংরেজী শিখিয়াও এমন ইংরেজ হইয়াও গোলাম নফর কেন? নফর গোলাম থাকিয়াও ইংরাজ সন্ধি কেন? ময়ুর না হইয়াও ময়ুর পুচ্ছ ধারণ করি কেন? অতএব ইহা আত্ম বিস্মৃতি বই কি? পরন্তু, ইহা বৃথা আত্ম-বর্জ্জনও বটে। নহিলে "বন্দ্যোপাধ্যায়" বর্জ্জন করিয়া "বোনার্জী" গ্রহণ করি না? আমার আত্মবংশ—আমরা বায়স-কুলায় পরিত্যাগ করিয়া ময়ূরালয়ে যাইয়া অপমানিত হই কেন? আপন বাসায় বসিয়া, না মরিয়া ময়ুর সাজিয়া মরিতে যাই কেন? মরণই যথন নিশ্চিত, ব্যক্তিগত স্বার্থের দুটী পুঁইশাকের পাতার প্রলোভে যখন আমি এমন অস্বাভাবিক মরণ মরি, আত্ম বিসর্জ্জন দিই, আত্মবংশ, পুরুষ পরম্পরাগত পবিত্র স্মৃতি, সম্মান, গোত্র, জ্ঞাতিত্ব, জাতিত্ব, সংস্কার, হায়, সবই অনায়াসে অম্লান বদনে বিশদৃশ বা বর্ব্বরোচিত ভাবিয়া বর্জ্জন করি এবং যথন সম্পূর্ণরূপে আত্মবিস্মৃত হইয়া অভ্যাস ও আকাঙ্ক্ষার দাস হইয়া পরস্বের প্রাপ্তি কামনা করি, তখন মহাশয় আমি slave হইবারই কি উপযুক্ত নই? master হইবার মত মালমসলা আমাতে কই, তদনুরূপ মনই বা আমার কই? এ মন্তব্য, মনের এই অনিবার্য্য মর্ম্মান্তিক ক্রন্দন কেবল সাধারণ ভাবেই প্রযোজ্য। নহিলে সম্মানভাজন "পত্রিকা" যে কয়টী নামের উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মনুষ্যত্বের মাহাত্ম্যে ও মনস্বীতার আদর্শ স্থানীয়। বিশেষতঃ যে মহাত্মার নামটী আমরা উদ্ধৃত করিয়াছি, ভগবান তাঁহাকে মনুষ্যত্বের অত্যুচ্চ উপাদানে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অসাধারণ মানসিক শক্তি ও ধীরতা সর্ব্বজন-বিদিত। কিন্তু তদীয় বদান্যতা, স্বজন-প্রিয়তা, স্বাভাবিক মুক্তহস্ততা, সর্ব্বোপরি তদীয় অপরিসীম মাতৃভক্তি ও পারিবারিক প্রীতি-স্নেহের কথা ও পরদুঃখকাতরতার কথা সকলে হয়ত শুনেন নাই। বস্তুতঃ তাহা শুনিয়া বিমোহিত হইতে হয়। পরন্তু স্বজাতির জাতিধর্ম্মে তদীয় সংরক্ষণ-প্রবণতার বিষয় শুনিয়া আমরা বিস্মিত হইয়া থাকি। তদীয় সামাজিক অবস্থায় অবস্থিত কোন ব্যক্তির যদি হিন্দুসমাজে প্রতিষ্ঠা থাকে, তাহা কেবল তাঁহারই আছে। অন্ততঃ তাঁহার যাদৃশ প্রভূত পরিমাণে আছে, তাদৃশ প্রায় আর কাহারও নাই। অথচ যে

এই মহাত্মা স্বকীয় সম্ভ্রান্ত সমাজের, স্ববংশের ও স্ববান্ধবের বিপরীত ও বিসদৃশ, বিজাতীয় অবস্থায় অবস্থিত, ইহা শিক্ষারই প্রভাব ও হিন্দুসমাজের ও ব্রাহ্মণকুলেরই দুরাদৃষ্ট। দুরাদৃষ্ট নহিলে এমন দুর্লভ রত্ন নিকটস্থ থাকিয়া দূরস্থ হইবে কেন? শিক্ষার প্রভাব নহিলে স্বভাবের বিরোধী ঘটনা ঘটিল কেন?

যাহাই হউক, এখন আমাদের এই ইংরেজী ও ইংরেজাভিনয় ও ইংরেজীকে আপনার জ্ঞান আর কিছুই নয়—আত্মবিস্মৃতি, আত্মবর্জ্জন ও অস্বাভাবিক অভ্যাস। উহার আত্মার অভ্যন্তরে "পেট্রিয়টিজম্" থাকিতে পারে, স্বদেশ-প্রীতি থাকিতে পারে এবং আছেও; কিন্তু উহার আপাদমস্তকে, অঙ্গে, অঙ্গে, উহার আচরণে ও আহার ব্যবহারে স্বদেশ-দ্রোহিতা, স্বজাতি-অশ্রদ্ধা বিদ্যমান।

আমরা কঙ্গ্রেস করিয়াছি। কিন্তু, কঙ্গ্রেস কাহার? ইংলণ্ড ও ইংরেজী যাঁদের, এ কঙ্গ্রেসও তাঁদেরই। যাঁদের প্রসাদে ইহা প্রস্তুত হইয়াছে, তাঁদেরই পদাঘাতে ইহা চূর্ণ হইয়া এখনি পঞ্চত্ব পাইতে পারে। ইংলণ্ড ও ইংরেজী যেমন আমাদের, কঙ্গ্রেসও তেমনি আমাদের; তথাচ যে উহাকে আমাদের বলি, ইহা আত্ম-বিস্মৃতি। অদ্বৈত মতের মায়া মোহের আত্ম বিস্মৃতি, অপ্রত্যক্ষ দার্শনিক মিথ্যা। আমাদের এ আত্ম-বিস্মৃতির কুহক প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক মিথ্যা। এই মুহূর্ত্তে সম্মুখস্থ সংবাদ পত্রে দেখিতেছি,—আমাদের সর্ব্বোচ্চ আত্মশাসন-কেন্দ্র রাজধানী কলিকাতার মহামুনিসিপাল স্বায়ত্তশাসন মেকেঞ্জি [illegible] ক্রোধানলে কত লাঞ্ছিত হইয়াছে। [illegible] রাজবিধি-সংস্থাপিত নিত্য পূজিত [illegible] যখন এই পরিণাম, তখন রাজবিদ্রোহী [illegible] কঙ্গ্রেসকে অপমানিত [illegible] লাগে? মুনিসিপাল মেকেঞ্জি-বিতণ্ডায় কমিসনরদিগকে লক্ষ্য করিয়া পাওনিয়র বলিয়াছিলেন "They are riding for a fall" কঙ্গ্রেস সম্বন্ধেও কোন্ একথা পুনরুক্তর না করা যায়? আত্মবিস্মৃত হইয়া অতিবেগে অশ্ব চালনায় পতনের সম্ভাবনা পদে পদে। এ তবুও বরং ক্ষুদ্র পতন; আত্মাবিস্মৃতি অনন্ত পতন সংঘটন করে। বৃটিশ প্রজা-নীতি, বৃটিশ "কনিষ্টিটিউসন," বৃটেন ভূমির উদারতা মূলক আইন কানুন—সর্ব্বোপরি বৃটিশ পার্লামেণ্টের উপর আমরা নির্ভয়ে নির্ভর করি, তাহাদের অনুকরণ ও অনুসরণ করিয়া সেই আদর্শে কার্য্য করিতে যাই বটে, কিন্তু আসল ইংরেজ প্রজায় যাহা সম্ভবে ও শোভনীয় হয়, তাহা কি এখন আমাদিগের পক্ষে সম্ভব ও সমীচীন? আত্ম-স্মৃতি ও সাবধানতাই আমাদের প্রধান ও প্রথম পলিটিক্স হওয়া উচিত। "কনষ্টিটিউসন" উত্তম বটে। তথাচ তদনুমোদিত কার্য্যও অনেক সময়ে আমাদের পক্ষে নির্ব্বিঘ্ন নহে। তাহা প্রায় নিত্যই ত দেখা গিয়া থাকে। ফল কথা এই যে, দৈহিক "কনষ্টিটিউসন"টী সবল ও কর্ম্মঠ না থাকিলে, আইনের বা আর কিছুর কনিষ্টিটিউসন বড় বেশী উপকার করিতে পারে না। কঙ্গ্রেসের কনিষ্টিটিউসন এখন যেরূপ, পূর্ব্বেই বিচার করা হইয়াছে।

তথাচ, যদি ইংরেজী আমাদের হয় ও ইংরেজত্ব আমরা কতক লোকে প্রাপ্ত হইয়া থাকি, তাহা হইলে শাসন-সংস্কার বা দেশোদ্ধারের ত তাদৃশ প্রয়োজন দেখা যায় না। দেশ ইংরেজ শাসনাধীন। আমরাও thoroughly English, অতএব দেশ ও তাহার উভয়ই ত আমাদের নিজেরই আছে। অতএব "কি তার উদ্ধার!"

নতুবা আমরা যদি সত্য সত্যই পত্রিকা-কথিত স্লেভ সকলেই হই, তাহা হইলে অনর্থক ইংরেজ হইব কেন? "স্লেভ" গিরি ঘুচাইতে যদি দেশ শুদ্ধ সকলেরই সাহেব সাজিতে হয়, একান্তই thoroughly English হইতে হয়, সময়ে সকলে একত্রেই তাহা হইলে হইবে; অগ্রে কাহার কাহারও হওয়াতে ত কিছু উপকার হইতেছে না।

আমরা দেখিলাম কঙ্গ্রেসের কনিষ্টিটিউসন অদ্যাবধি লিখিত না হইলেও কার্য্যতঃ তাহা মোটের উপর কিরূপ দাঁড়াইতেছে, কঙ্গ্রেসের শক্তি কি পরিমাণে ও কি প্রকৃতির জন্মিয়াছে, পরন্ত তাহার সাহিত্যের স্বভাব সাধারণতঃ কীদৃশ। কঙ্গ্রেসী সাহিত্যের বিস্তৃতি ও ব্যাপ্তি যেরূপ বৃহৎ,বৈচিত্র্য অবশ্য তেমন অধিক নহে, হইতেই পারে না। একই প্রণালীর শিক্ষা, একই প্রকৃতির দীক্ষা,একই দিক্ দিয়া দৃষ্টি,একই রূপ শাসন ও নিয়মে পরিপুষ্ট,অতএব ভারতবর্ষের ভিন্ন প্রদেশের ব্যক্তিগত মানসিক সত্তা এখন প্রায় একই রূপ উপাদানে নির্ম্মিত, একই গঠনে গঠিত; সুতরাং তদ্রূপ চিত্ত-স্বরূপে সাধারণতঃই বোধ হয় বৈচিত্র্য তত বেশী থাকা সম্ভাবিত নয়। তবে উৎকর্ষের অনুশীলনের অবস্থাগত মানসিক স্ফূর্ত্তির এবং স্বাভাবিক শক্তি প্রতিভাদির ইতর বিশেষে যাহা অল্পাধিক বৈচিত্র্য। এইরূপ বৈচিত্র্য-বিহীন একই প্রকার শিক্ষা-সংগঠিত মানসিক সত্তার বা শক্তির ব্যষ্টির সমষ্টি হইতে কঙ্গ্রেস। তাহার উপর কঙ্গ্রেস উহার স্বভাবতঃ ও প্রয়োজন বশতঃ একই প্রকৃতির ও প্রণালীর চিন্তা-প্রসূত, একইরূপ সিদ্ধান্ত-সমন্বিত অভিমত মন্তব্যাদি প্রচারের সভা। সুতরাং কঙ্গ্রেস-মণ্ডপে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন জাতিগত ও ভিন্ন ভিন্ন আচার ব্যবহার-সমন্বিত বিভিন্ন বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের, মূর্ত্তির ও পরিচ্ছদাদির বহু বৈচিত্র্য সত্বেও বক্তৃতাদিতে অতি অল্পই বৈচিত্র্য দেখা যায়। অতএব কঙ্গ্রেসের সাহিত্য সাধারণতঃ বৈচিত্র্যহীন। মত বৈচিত্র্য কার্য্যতঃ অসম্ভব। মন্ত্রণা বৈচিত্র্যেরও অবসর নাই। তবে, নিরূপিত মত, পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট মন্তব্যাদির অবতারণ, সমর্থন ও পরিপোষণ প্রভৃতিতে যুক্তি তর্ক নূতন তথ্য ও বাক্য-বিন্যাসাদির বৈচিত্র্য বিকাশের অবসর আছে। অতএব কঙ্গ্রেস-সাহিত্যে সচরাচর সেই পক্ষেই অল্পাধিক বিশেষত্ব দেখা যায় না। কঙ্গ্রেসের রাজনৈতিক রেকর্ডকে সাহিত্যের হিসাবে লইয়া সাহিত্য-দৃষ্টিতেই এ কথা বলা যায়। নহিলে কার্য্যের ও অভিমতের একতা এবং সিদ্ধান্তের সামঞ্জস্য সর্ব্বথা শুভ-দায়ক। এবং বিভিন্ন ও বহুলোক সমষ্টিত এরূপ বৃহৎ সভায় এমন মতৈক্য যারপর নাই প্রশংসার বিষয়। সভ্য দেশের শক্তিজাত অনেকানেক জাতীয় সমিতি বাক্‌বিতণ্ডা, কলহ, চপলতা প্রভৃতি অসংযম ও অভদ্রতা-দির জন্যও কম প্রসিদ্ধ নহেন। ধীরতা ও গাম্ভীর্য্যে আমাদের এ কঙ্গ্রেস তাঁহাদের আদর্শ স্থল। ইহা এদেশীয়ের সুশীলতা ও সংযত স্বভাবেরই এক অংশ। তবে কেবল করতালির মাত্রা, উহার সঘনতা ও শব্দ কিছু কমিলে বোধ হয় ভাল হয়; সভা আরও শিষ্টভাব ধারণ করে; বক্তা ও শ্রোতা উভয় পক্ষেরই সুবিধা হয়।

কঙ্গ্রেস-সাহিত্য সবিশেষ বৈচিত্র্যবিহীন হউক,—তথাচ ইহা নব্যভারতের, সমগ্র শিক্ষিত হিন্দুস্থানের শ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তি-

প্রসূত ফল, একস্থানে একত্রে গ্রথিত। ইহা দেখিয়া চিত্ত পুলকিত হয়, ইহা ভাবিয়া চিত্ত বিস্মিত হয়—ইহা পাঠ করিতে করিতে নব্যভারতের সজাগ অস্তিত্ব উপলব্ধি হয়, মনে হয়, স্বজাতীয় ও সমবেদনাযুক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সকলেরই সহিত আলাপ করিতেছি—তাঁদের আন্তরিক স্বদেশ ভক্তির আবেগময় উচ্ছ্বাসে যেন ভাসিয়া চলিযাছি, ক্ষণে ক্ষণে আপনার ক্ষুদ্র সংকীর্ণ স্বার্থপরতাময় অস্তিত্ব বিস্মৃত হইয়া তাহাতে যেন মিশিয়া যাইতেছি। উদ্দীপনাংশে কংগ্রেসের কোন কোনও বক্তৃতা উচ্চ স্থানীয়।

কংগ্রেস-সাহিত্য আধুনিক ইংরেজী আর্য্যভূমির রাজনৈতিক চিন্তার এক বৃহৎ অট্টালিকা—এক বিস্তৃত স্রোতস্বিনী। কঠিন সমালোচনা শিলে, সে চিন্তা পূর্ণ করিলে, হয়ত, তাহার কতক কাটছাট পড়িতে পারে, অত্যল্প আঘাতেই হয়ত তাহার কতকাংশ স্খলিত গলিত হইয়া যাইতে পারে, তাহার অপরিপক্কতা, তাহার অন্তঃসারশূন্যতা, তাহার দূরদর্শন ও সূক্ষ্ম দর্শনের অভাব, বা তাহার পরিণাম দর্শনের অপ্রাচুর্য্য প্রভৃতি বাহির হইতে পারে; পরন্তু, সে চিন্তা-স্রোত পরিমাপ করিলে, হয় ত তাহার গভীরতা খুব অল্পই দৃষ্ট হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া এবং তর্কস্থলে, ক্ষণেকের জন্য স্বীকার করিয়া লওয়া সত্ত্বেও এমন কথনও হইতে পারে না যে, স্বদেশের সমগ্র শিক্ষিত মণ্ডলীর ভিন্ন ভিন্ন ভাবাপন্ন চিত্তের চিন্তা কিছুই নয় এবং তাহা একতা-প্রাপ্ত ও এক স্রোত-প্রবাহিত হওয়াতেই একেবারে অশুদ্ধ, অসার ও অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে! এরূপ মনে [illegible] ও আত্ম বুদ্ধি প্রশংসার [illegible] বটে, কিন্তু এক মাত্র আহম্মকীও বটে। তা, দেশশুদ্ধ বুদ্ধিমান বলিয়া বিবেচিত লোক মাত্রই যদি নির্ব্বোধ হইয়া গিয়া থাকেন, তাহা হইলে বুদ্ধি মহাশয়েরও বসবাসের স্থান কই?

কংগ্রেসের দ্বাদশাধিবেশনের বহু বক্তৃতাই বিশিষ্ট। সম্মাননীয় সভাপতি সয়ানী মহাশয়ের বক্তৃতা কার্য্যতঃই বৃহৎ, উহা রাজনৈতিক বহু তথ্য পূর্ণ এবং সেই তথ্য নিচয় হইতে কংগ্রেসের মূল সিদ্ধান্তাদি সমর্থনে সমর্থ। সভাপতি সবিশেষ দক্ষতার সহিত তৎসঙ্কলিত ঐতিহাসিক ও শাসননৈতিক তথ্য নিচয়ের সমালোচনা করিয়াছেন। দ্বাদশ সভাপতির বক্তৃতা, একাদশ সভাপতির বক্তৃতা অপেক্ষা আর যে যে অংশেই ন্যূন (যদি কোনও অংশে হয়) হউক, গুরুত্বে ও কংগ্রেসের পক্ষ সমর্থনে ন্যূন নহে, বরং শ্রেষ্ঠ বলিয়াই বোধ হইবে। বিশেষতঃ মুসলমানদিগকে কংগ্রেসের পক্ষ অবলম্বনার্থে আহ্বান—তাহার উপযোগিতা ও উপকারিতা প্রদর্শন এবং কংগ্রেস সম্বন্ধে মুসলমান সম্প্রদায়ের আপত্তি খণ্ডন,—এই মুসলমান সভাপতি যেরূপ দক্ষতা ও দূরদর্শিতার সহিত করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। তদ্দ্বারা কংগ্রেসের কিছু উপকার হইলেও পারে। কিন্তু, তাহা সংবাদ পত্রের কলমে ও কংগ্রেসের বাৎসরিক পঞ্জিকায় ইংরেজী অক্ষরে আবদ্ধ থাকিলে উপকার হইবে না। উহা অন্ততঃ উর্দ্দু ও বাঙ্গালাতে অনুবাদিত হইয়া মুসলমান-প্রধান স্থান মাত্রেই বিতরিত হওয়া আবশ্যক।

এ বৎসরের সমস্ত বক্তৃতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ, উপাদেয় ও সুন্দর বক্তৃতা স্যার রমেশচন্দ্র মিত্রের। এবম্বিধ বক্তৃতার সংখ্যা কংগ্রেস-সাহিত্যে বিরল। ইহা যেমন সুচিন্তিত,

তদ্রূপ সুলিখিত। ইহা উচ্চতায়, বক্তার স্বস্থানের মত সম্ভ্রান্তশীলতায় তদ্রূপ বিনীত, ইহা চিন্তাশীলতায় শীতল ও গভীর, অথচ আন্তরিক উত্তাপে চিত্তাকর্ষক। পরন্তু ইহা স্থানে স্থানে প্রচ্ছন্ন পরিহাস-রসিকতায় সরস এবং সর্ব্বত্র সুরুচি সম্পন্ন ও সবল। স্যার রমেশচন্দ্রের বক্তৃতা সাহিত্যাংশে এই। অপিচ, স্যার রমেশচন্দ্রের কঙ্গ্রেসাভিমতের এই অভিব্যক্তি কঙ্গ্রেসের উপকারে আসিবে ইহা বলা বাহুল্য। ইহা দ্বারা অন্ততঃ কতক লোক কঙ্গ্রেসে কিয়ৎ পরিমাণে বিশ্বাসবান হইবে এবং আকৃষ্ট হইলেও পারে। কিন্তু, বাঙ্গালায় অনুবাদিত হইয়া প্রচার হওয়া আবশুক। স্যার রমেশচন্দ্র মিত্রের এই বক্তৃতা ও কঙ্গ্রেসের আরও কোন কোনও বিষয় সময়ান্তরে আলোচনা করার ইচ্ছা রহিল। এখন উপসংহারে কেবল এইমাত্র বক্তব্য যে, এই প্রবন্ধে বহু কথা বিচারের আকাঙ্ক্ষায়, অনেক স্থলে হয় ত, অল্প বুদ্ধি প্রবন্ধ-লেখকের ভ্রম প্রমাদ ঘটিয়াছে, অনেক স্থলে হয় ত চিন্তাবেগে বশতঃ অশিষ্টাচার হইয়া থাকিবে। কিন্তু, বিষয়টী যেরূপ বৃহৎ ও বিশিষ্ট, উহার এই আলোচনাকারী তদ্রূপ ক্ষুদ্র ও অক্ষম এবং এই আলোচনা তদ্রূপ অকিঞ্চিৎকর। পরন্তু, এই প্রবন্ধে যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে, সম্পূর্ণ সরল বিশ্বাস ও কঙ্গ্রেসের সহিত সমবেদনা ও তৎপ্রতি ও তাহার ন্যায্য প্রাপ্য ন্যায্য সম্ভ্রম প্রণোদিত হইয়া লিখিত হইয়াছে। অপিচ বুদ্ধির ভুল, বিচারের ভুল, তথ্যানভিজ্ঞতার ভুল যাহা ঘটিয়াছে, সরল ও শান্তভাবে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক কেহ প্রদর্শন করিলে, তাহা স্বীকার করিতে ও তদ্দ্বারা সংশোধিত হইতে বিনীতান্তঃকরণে প্রস্তুত আছি। অতএব, এই সকল কারণে, আমাদের যে কিছু ভ্রম প্রমাদ ও ত্রুটি হইয়া থাকে, তাহা প্রবীণ ও সমীচান পাঠকবর্গের নিকট মার্জ্জনীয় হইবে, এমন আশা করা যায়। বৃহৎ ক্ষুদ্র সকলেরই কর্ত্তৃক কঙ্গ্রেস কথায় ভাল মন্দের আলোচনায় কঙ্গ্রেসের মত পদার্থের ইষ্ট ভিন্ন অনিষ্ট নাই, ইহা বিজ্ঞ কঙ্গ্রেসীবর্গ অবশ্য বুঝেন, নিম্নাধিকারীদের ও বুঝা আবশ্যক।

শ্রীঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।

বিদেশী বাঙ্গালী। (৫)

দুর্লভ গোস্বামী।

ভক্তাধিক ভক্ত, গায়ককুলাগ্রগণ্য, পরম সাধু দুর্লভ গোস্বামী মহাশয় ভারতের এক মহাধর্ম্মবীর। ইনি বর্ণে বৈদ্য, ধর্ম্মে হিন্দু, চর্ম্মে বাঙ্গালী, সম্প্রদায়ে বৈষ্ণব এবং সাংসারিক জীবনে স্বার্থত্যাগী মহাপুরুষ। দুঃখের বিষয় যে দেশে ইঁহার জন্ম, যে জাতির ইনি অলঙ্কার, সেদেশে ও সে জাতি মধ্যে ইঁহার নাম সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। দুর্লভের নাম বাঙ্গালা দেশে কেহই জানেন না, দাক্ষিণাবর্ত্তে দুলু গোঁসাই নামে একজন বঙ্গবাসী প্রায় ছয়শত বৎসর পূর্ব্বে সুন্দর স্বভাব, নির্ম্মল চরিত্র, ধর্ম্মপ্রচার, মানবজাতির দুঃখাপনোদন জন্য কিরূপ যশস্বী হইয়া উঠিয়াছিলেন, দাক্ষিণাবর্ত্তে কিরূপে তিনি চরিত্র বলে একজন অসাধারণ পুরুষ বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন, হিন্দু ও মুসলমান সমাজে কিরূপে [illegible]

বাঙ্গালী-অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, বাঙ্গালা দেশে এবং বাঙ্গালী জাতি মধ্যে এ কথার কেহই সংবাদ রাখেন না। আমিও যে সংবাদ রাখিতাম, এমত নহে; আমিও দুর্লভ গোস্বামীর কীর্ত্তিকলাপের কথা শ্রবণ করি নাই; ইংরাজী ১৮৮৮ অব্দের জানুয়ারী মাসে আমি মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সী ভ্রমণ করিতে করিতে এই বাঙ্গালী মহাত্মার নাম, গুণ ও মাহাত্ম্যের কথা সর্ব্ব প্রথমে শুনিতে পাইলাম। কয়েক স্থানে বহু অনুসন্ধান করিয়া এই প্রাচীন পুরুষের সম্বন্ধে যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহাই এস্থলে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত ত্রিপতি নাম্নী নগরী দক্ষিণাবর্ত্তের হিন্দুর এক মহাতীর্থ স্থান। ইহা বৈষ্ণবদিগের মহাপীঠ, ইহা অতি প্রাচীনা ভূমি। ত্রিপতি নগরী উত্তর আর্কট জেলার অন্তর্গত একটি মহকুমা, রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে নগর প্রায় অর্দ্ধ মাইল। ত্রিপতি নগরীতে একজন মহাধনশালী মোহান্ত বাস করেন এবং এথানে বহুসংখ্যক বৈষ্ণবাচার্য্যের "আখেড়া" আছে। সহর হইতে কয়েক মাইল দূরে গোকর্ণ গিরি দেখিতে পাওয়া যায়, ইহারই উপরে প্রকৃত ত্রিপতি নগরী স্থাপিতা। সিটি ত্রিপতি রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট বসাইয়াছেন, সুতরাং ইহা প্রাচীনা ত্রিপতি নহে।

খ্রীষ্টীয় ১৮৮৮ অব্দে আমি ত্রিপতি সিটিতে পৌঁছিয়া তত্রত্য মুন্সেফ মহাশয়ের আতিথ্য গ্রহণ করিলাম; ইনি জাতিতে তৈলঙ্গী ব্রাহ্মণ এবং সম্প্রদায়ে বল্লভাচার্য্য-বৈষ্ণব। একদিন বাঙ্গালী জাতি এবং চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রসঙ্গ হইতেছিল, এমন সময়ে মুন্সেফ মহাশয় বলিয়া উঠিলেন "বহুশতবর্ষ পূর্ব্বে একজন বাঙ্গালী বৈষ্ণব ত্রিপতিতে আসিয়া সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন পূর্ব্বক পর্ব্বতোপরে বাস করিয়াছিলেন, তিনি একজন অসাধারণ দৈববলসম্পন্ন মহাপুরুষ ছিলেন, তাঁহার সমস্ত জীবন ধর্ম্মালোচনায়, ঈশ্বরোপাসনায় এবং পরোপকারে ব্যয়িত হইয়াছিল, ঐ মহাত্মার সমাধি গোকর্ণ গিরির বৈষ্ণব-গোস্বামী আচার্য্যদিগের রমণীয় সমাধি শ্রেণী মধ্যে এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে; শত সহস্র নর নারী ফুল চন্দন দিয়া ঐ সমাধির এখনও পূজা করে।" বন্ধুবর মুন্সেফের এই কথা শুনিয়া আমার রোমাঞ্চ উপস্থিত হইল; অবশেষে এতই কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া উঠিলাম যে, পর দিবস পদব্রজে আমরা সেই বাঙ্গালী সাধুর সমাধি দেখিবার জন্য গোকর্ণ গিরিতে যাইয়া পৌঁছিলাম। এই গিরি অতি উচ্চ, ইহার সর্ব্বত্র নিবিড় অরণ্যে পরিপূর্ণ, স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলোৎস দেখিতে পাওয়া যায়, কোনও কোনও স্থানে পর্ব্বতের গাত্রে অতি প্রাচীন গুহা বিদ্যমান, এই গুহায় অনেক যোগী বাস করেন বলিয়া শুনা যায়; আমরা একটা গুহায় প্রবেশ করিয়াছিলাম, উহার অভ্যন্তরে দিব্য মন্দির, মনোহর কূপ, ক্ষুদ্র পুষ্পোদ্যান, ছোট, ছোট কুটীর ইত্যাদি দেখিতে পাইলাম। যাহা হউক, অনেক কষ্টে গোকর্ণ গিরির উপরে আরোহণ করিয়া, বিনা অনুসন্ধানে—অতি সহজেই—দুর্লভ গোস্বামীর সমাধিকে ভক্তিভরে দর্শন করিয়া কৃতকৃতার্থ হইলাম। ইহাতে এই বুঝিলাম যে, দুলু গোঁসাই বা দুর্লভ গোস্বামী নামে এক পূজ্যপাদ ব্যক্তি অতি পুরাতন কালে ত্রিপতিতে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু "তিনি বাঙ্গালী ছিলেন কি না?" এই তর্ক মনোমধ্যে উদয় হইল।

ঢুলু গোঁসাই যে বাঙ্গালী ছিলেন, তাহারও প্রমাণ পাইয়াছি, সে কথা এখন বলিতেছি।

বন্ধু বলিলেন, প্রবাদ, জনশ্রুতি এবং বহুকাল হইতে প্রচলিত বৈষ্ণব সমাজের ক্রিয়াকাণ্ড মতে ইহা প্রমাণীত হইয়াছে যে, ঢুলু গোঁসাই বাঙ্গালী ছিলেন। মুন্সেফের এই কথা গুলি বিচার করিয়া দেখিবার জন্য আমি অনুসন্ধান আরম্ভ করিলাম। অনুসন্ধানারম্ভের পূর্ব্বেই কয়েকটি অকাট্য প্রমাণ দ্বারা ঢুলুকে বাঙ্গালী বলিয়া চিনিতে পারিলাম। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলিলেন, এই সমাবিস্থ মহাপুরুষের প্রকৃত নাম (Full Name) দুর্ল্লভচন্দ্র সেন, ইনি গোসাইগিরিতে দীক্ষিত হইবার পরে বৈষ্ণবেরা ইহাঁর দুর্লভ গোস্বামী নামকরণ করেন। 'দুর্লভ' এই নাম বাঙ্গালী ভিন্ন আর কোনও দেশীয়ের মধ্যে প্রচলিত নাই, "দুর্লভচন্দ্র" এই নাম বাঙ্গালী ভিন্ন আর কাহারও যে হয় না, যাঁহারা ভারতবর্ষ পবিভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারা ইহা সহজেই বুঝিয়া লইতে পারেন। "দুর্লভচন্দ্র সেন"—এই নাম যে বাঙ্গালীর, তাহা দশম বৎসরের বালকও বলিয়া দিতে পারে। সেন উপাধি বাঙ্গালীর একচেটিয়া, বঙ্গদেশের বাহিরে এ উপাধি চলেনা, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সী মধ্যে দুর্লভচন্দ্র সেন কোনও দেশীয় ব্যক্তির নাম হয় না। তদ্ভিন্ন সমগ্র দেশ-ব্যাপী—সমগ্র বৈষ্ণব-সমাজ ব্যাপী—বহুকালের জনশ্রুতি দ্বারাও ঢুলু গোঁসাইয়ের বাঙ্গালীত্ব প্রমাণীত হইতেছে। ইহা ব্যতীত আরও কয়েকটি সুন্দর প্রমাণ আছে। পাঠক মহাশয়ের বোধ হয় জানা আছে যে, পৃথিবীর মধ্যে বাঙ্গালী জাতি ব্যতীত আর কোনও জাতিই মস্তককে অনাবৃত রাখেনা, এই জন্য বঙ্গদেশের বাহিরে বাঙ্গালীর "মাথা খোলা" উপাধি হইয়াছে। মান্দ্রাজ অঞ্চলে রেল বা তার খোলা হইবার পূর্ব্বে, মহাপ্রভু চৈতন্য এবং তাঁহার সহচরগণ ব্যতীত আর কোন বাঙ্গালী এ দেশে প্রাচীন সময়ে আসিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায় না। দুর্লভ গোস্বামী বাঙ্গালী ছিলেন, সুতরাং তাঁহার মাথা খোলা ছিল, তামিল ভাষায় এখনও একটা শ্লোক আছে যাহার অর্থ এই যে "ঢুলু বাঙ্গালী গোঁসাই ভিন্ন মাথাটা আর কাহারও খোলা দেখ্‌লাম না।" এই শ্লোকটার কিয়দংশ অনুবাদ করিলে এইরূপ হয়—

'তেলঙ্গী, তামিলী আর মালোয়ালের লোক,
পাগড়ীর ভারে, গেল মরে, ক'চ্ছে কত শোক।
চেয়ে দেখ, ঢুলু গোঁসই, বাঙ্গালার বড় বীর,
আর কোথাও কি দেখিয়াছ এমন খোলা কেশেরশির।"

এই ঢুলু গোঁসাই মহাত্মা কোথায় জন্ম গ্রহণ করেন এবং কোন্ কুলের মুখোজ্জ্বল করেন, তাহার কিছুই জানা যায় না। যে সময়ে মহা প্রভু চৈতন্য এবং তাঁহার সহচর গণ দক্ষিণাবর্ত্তে ধর্ম্ম প্রচার জন্য আগমন করেন, দুর্লভচন্দ্র সেন তখন তাঁহার সঙ্গে ছিলেন, সেন মহাশয় তখন অর্দ্ধ-সংসারী অর্দ্ধ বৈরাগী। ইনি চৈতন্যের অথবা তাঁহার সহচরগণের চিকিৎসক হইয়া অথবা সেবক রূপে দাক্ষিণাত্যে আসিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে।

প্রাচীন বৈষ্ণব-সাহিত্য অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম, কেবল এক জন দুর্লভ গোঁসাইয়ের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, ইনি ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং দাক্ষিণাত্যে ইনি আইসেন নাই। ইহার সহিত আমাদের প্রস্তাবের ঢুলু গোঁসাইয়ের কোনও সম্বন্ধ নাই। দাক্ষিণাত্য হইতে বঙ্গদেশে প্রত্যাগত হইয়া বৈষ্ণবাচার্য্যগণ যে সকল ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বা ক্রিয়াকলাপ প্রচার করেন, তন্মধ্যে বৈষ্ণবী

সাহিত্যে যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে,তাহাতে দুর্লভ গোঁসাইয়ের নাম নাই ; নাম না থাকি বারই কথা, কারণ এই যে—দুর্লভ গোঁসাই চৈতন্যদলকে পরিত্যাগ করিয়া যান এবং যে সময়ে পরিত্যাগ করেন, সে সময়ে তাঁহার নাম বা যশঃ বিস্তৃত হয় নাই, সুতরাং তাঁহার নাম উল্লিখিত হয় নাই। এস্থলে একটা কথা বলিয়া রাখা উচিত যে,বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে বঙ্গদেশের বৈদ্য সমাজ যেরূপ ঘনতর রূপে মিলিয়া মিশিয়াছিল, আর কোনও সমাজ সেরূপ মিশিয়া ছিল বলিয়া বোধ হয় না। বৈষ্ণব সাহিত্যের অর্দ্ধাংশ হইতেও অধিক গ্রন্থ বৈদ্য-লেখনী প্রসূত। দুর্লভ গোস্বামী এই বৈদ্যকুলের মুখোজ্জ্বল করেন। ত্রিপতি হইতে শ্রীচৈতন্য দক্ষিণে চলিয়া গেলে,দুর্লভ তাঁহার সঙ্গে আর যান নাই, কেন যান নাই, আমরা তাহা জানিনা। তিনি ত্রিপতিতে থাকিয়া কিছুকাল বৈদ্যের ব্যবসা (চিকিৎসা) করেন, তখন "তিনি সেন বাবু" বা "দুর্লভ সেন" বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন, তদনন্তর মস্তক মুণ্ডন করাইয়া বৈষ্ণবাচার্য্যদিগের সামাজিক প্রথামতে গোস্বামী মতে দীক্ষিত হয়েন এবং দুর্লভ গোস্বামী নামে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠেন। আমরা এইবার দুর্লভের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে কিছু বলিব।

মহাত্মা দুর্লভ গোস্বামী একজন প্রকৃত ধর্ম্মবীর ছিলেন। সংসার পরিত্যাগ করিয়া তীব্র বৈরাগ্য-ব্রত গ্রহণ করিবার পরে নিষ্কাম ধর্ম্ম ব্যতীত আর কিছু পালন করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার সমস্ত জীবন সংসারের উপকারে ব্যয়িত হইয়াছিল। নিজের সুখ স্বচ্ছন্দতার দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না, অপরের সুখে তিনি সদা সুখী থাকিতেন। দরিদ্রের দুঃখ মোচন, পীড়িতের সেবা, অনাথের পালন, দুশ্চরিত্রের সংশোধন, অজ্ঞানীর সংস্কার সত্য ধর্ম্মের আলোচনা, শাস্ত্রের ব্যাখ্যা, ব্রহ্মোপাসনা, যোগাভ্যাস প্রভৃতি কার্য্যেই তাঁহার আনন্দ ছিল। বৃদ্ধ, যুবা, বালিকা, হিন্দু, মুসলমান, শাক্ত, শৈব—সকলেরই তিনি নমস্য ও প্রিয় ছিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে কেহ একটী কথাও বলিত না, যেহেতু তাঁহার বিরুদ্ধে বলিবার কোনও হেতুই ছিল না। প্রভাতে উঠিয়া তিনি উপাসনার পরে আপনার আশ্রমের সম্মুখে গো, মেষ, মহিষ, ছাগ, পক্ষী প্রভৃতির জন্য চাউল প্রভৃতি শস্য ছড়াইয়া দিতেন,এবং ইষ্টক নির্ম্মিত এক বৃহৎ "হৌজে" নির্ম্মল জল স্বহস্তে ভরিয়া রাখিতেন, এই জলে বহুসংখ্যক তৃষিত জীবের পিপাসার শান্তি হইত। গ্রীষ্মকালে পর্ব্বতের যে রাস্তা দিয়া পথিকেরা গোকর্ণে উঠিত, তাহার স্থানে স্থানে তৃষিত যাত্রীর জন্য তিনি জলের কলস বসাইয়া রাখিতেন। পশু-পক্ষীদের আহার হইলে,তিনি দরিদ্র ও পীড়িতদিগের ঘরে ঘরে গিয়া দেখিয়া আসিতেন এবং বিনা মূল্যে ঔষধাদি প্রস্তুত করিয়া বিতরণ করিতেন। জাতিতে বৈদ্য ছিলেন বলিয়া অনেক ঔষধাদি তাঁহার জানা ছিল। তদনন্তর ভিক্ষা দ্বারা যাহা কিছু প্রাপ্ত হইতেন,তাহাই স্বহস্তে পাক করিয়া পরমানন্দে ভোজন করিতেন। অপরাহ্নে শাস্ত্র ব্যাখ্যা, সায়াহ্নে সঙ্কীর্ত্তন এবং রাত্রি ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত নগরের প্রধান প্রধান স্থানে বীণা বাজাইয়া ব্রহ্মগুণ গান করিতেন। মধ্যরাত্রে যোগ সমাপন করিয়া নিদ্রিত হইতেন এবং খুব প্রভাতে উঠিয়া কর্ম্মে নিযুক্ত হইতেন। মধ্যে মধ্যে দেশ দেশান্তরে গিয়া ধর্ম্ম প্রচার

করিতেন। প্রকৃত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের তিনি প্রচারক ছিলেন; স্বার্থত্যাগ, স্বদেশের ও স্বজাতির উপকার,এক ব্রহ্মোপাসনা, জাতি-ভেদের অলীকতা, পরোপকার পরম ধর্ম্ম, এ সকল কথা তিনি শাস্ত্র প্রমাণ দিয়া বুঝা-ইতেন। তাঁহার শরীর যেমন সুস্থ, সবল ও সুন্দর ছিল, মানসিক বলেও তিনি তেমনি বলীয়ান ছিলেন; লোকে তাঁহাকে জ্ঞানের বারিধি বলিত। তাঁহার সুন্দর চরিত্র এবং নির্ম্মল স্বভাব অতি সহজেই লোকের চিত্তাকর্ষণ করিত। আশ্রমে চৈতন্যের একটী প্রতিমূর্ত্তি ছিল, শুনিলাম, কম্বোকনম নগরের জনৈক ব্রাহ্মণের বাটীতে উহা এখনও বিদ্যমান আছে। দুর্লভ গোস্বামীর নিত্য পাঠ্য চৈতন্য-চরিতের কয়েক পৃষ্ঠা ত্রিপতি বৈষ্ণবাচার্য্য মন্দিরে এখনও সযত্নে রক্ষিত।

শ্রীগোপালচন্দ্র শাস্ত্রী।

শোক-সঙ্গীত। *

মোগল-সম্রাট-কেশরী আকবরের রাজত্বকালে রাজস্থানের প্রায় সমস্ত হিন্দু রাজন্যবর্গ দিল্লীশ্বরের বশ্যতা স্বীকার করেন। অধিকন্তু রাজা মানসিংহ প্রভৃতি কেহ কেহ মোগল সম্রাট পরিবারের সহিত উদ্বাহ সম্বন্ধ স্থাপন পূর্ব্বক দিল্লীশ্বরের অধীনে উচ্চরাজ কার্য্যে নিযুক্ত হন। কেবল চিতোরের হিন্দুসূর্য্য মহারাজা প্রতাপসিংহ সূর্য্যবংশের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখেন, এবং বহুকাল পর্য্যন্ত সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়া চিতোরের স্বাধীনতা রক্ষা করেন। অবশেষে দিল্লীশ্বর বহু সৈন্য সামন্ত সহিত নিজপুত্র সেলিমকে প্রতাপসিংহের প্রতিকূলে প্রেরণ করেন। হলদীঘাটের পবিত্র সমরক্ষেত্রে প্রতাপসিংহ অতুলনীয় শৌর্য্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন,কিন্তু তাঁহার কতিপয় সহস্র সৈন্য অবশেষে সম্রাটের অগণ্য সৈন্যের নিকট পরাভূত হয়। এই যুদ্ধে সহস্র সহস্র রাজপুত বীর রণক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জন করেন, এবং মুসলমান সৈন্যের হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য রজনীতে শত শত রাজপুত কুলাঙ্গনা জ্বলন্তচিতা আরোহণ করেন। এই চিতারোহণ উপলক্ষে এই সঙ্গীতটি রচিত হয়।

(১)

সান্ধ্য আকাশে লোহিত দিনমণি
তিমির সাগরে ডুবিছে রে॥
পর্ব্বত-কন্দরে উচ্চ বিলাপে
শৈল-সমীরণ স্বনিছে রে।
মন্থর গমনে ওই ক্ষুদ্রা তরঙ্গিণী
কাঁদিয়া কাঁদিয়া চলিছে রে॥
দিগন্তবেষ্টিত ভীম শ্মশানে
লোহিত করজাল পরকাশিছে রে।
আজি বিশাল প্রাঙ্গণে শোণিত রঞ্জিত
রাজপুতগণ চিরনিদ্রিত রে॥
জীবন বিসর্জ্জিয়া জননীচরণে
রাশি রাশি দেহ রাজি শোভিছে রে।
শিশিরের ছলে যত স্বর্গসীমন্তিনী
তাহে নয়ন আসার বরষে রে॥
হেনকালে দিল দেখা ভূধর উপরে
শত শত রাজপুত রমণী রে।
রকত বসনে সকলে বসানা
বনফুলে শোভিত বেণী রে॥
নৈশ আন্ধারে ডুবিল ধরা
স্বর্গের পটখানি শোভিল রে।
জ্বলিল চিতা ভীম গরজনে
শত রাজপুত রমণী গাইল রে॥

(২)

ঘোর আন্ধারে ডুবিল দেশ
নরনারী ক্রন্দন ছুটিল রে॥
ওগো ও জন্মদে! স্নেহময়ি জননি!
বিদায় মাগি হে তব চরণে রে।

* "যমুনা লহরীর" সুর।

নিরখি তোমারে আকুল হিয়া
হৃদয়-আগার আন্ধার রে॥
আর্য্য শোণিতে লভেছি জনম
আর্য্যের মত প্রাণ সঁপিব রে।
সাক্ষী থাকহে তুমি দেবী বিভাবরি!
তারকামালিনী যামিনি! রে॥
বীর-রমণী মোরা বীর প্রসূতি
যাই চলি পতিপুত্র যেথানে রে।
জয়দেব হুতাশন বিশ্ব-পবিত্র
প্রণমিছে রাজপুত রমণী রে॥
বলিতে বলিতে তবে অনল প্রবেশিল
শত শত নারীবেশী দেবী রে।
পর্ব্বত কন্দরে সিংহী গরজিল
স্বরগ ভূধর কাঁদিল রে॥
দেখিতে দেখিতে কুসুমাসারে
পর্ব্বত প্রাঙ্গণ ছাইল রে।
দেখিতে দেখিতে বিদ্যুৎ রূপে
চিতানল আকাশে মিশিল রে॥
কোথা সবে জননি গো কাঁদিছে পরাণ আজি
দুনয়নে জলধারা বহিছে রে॥
সোণার ভারত এবে ভীম শ্মশান
ঘনঘটা আকাশে খেলিছে রে।
বজ্র গরজনে ঝঞ্ঝা বহিছে
ভারত দুঃখিনী মূর্চ্ছিতা রে॥
জাগাও জাগাও সবে ভীম নিনাদে
জাগাও এ নির্জ্জীব ভারত রে।
জীমূত মন্দ্রে বিদ্যুৎরূপে
ভারতাকাশে পরকাশিয়া রে॥
জাগাও জাগাও সবে আর্য্য রমণী
দেখ সবে ম্রিয়মাণা রয়েছে রে।
স্বর্গীয় তেজে পূরাও সবারে
দুন্দুভি নাদে ধরা কাঁপাও রে॥
নৈশ ঝটিকাসনে এসগো ছুটিয়া
শত শত স্বর্গীয় দেবী রে।
সবে শিয়রে বসিয়া দেখাও স্বপন
নিদ্রিত যুবকে জাগাও রে॥
মিলিয়া সকলে নগরাজ শৃঙ্গে
সিংহীর গরবে দাঁড়াও রে।
কাঞ্চন-জঙ্ঘা স্বর্ণ কিরীটী
নবরাগ রঞ্জিত শোভিবে রে॥
স্বরগ মরত ভূধর সাগর
জয় জয় নাদে পূরিবে রে।
গঙ্গা যমুনা সিন্ধু কাবেরী
নাচিয়া নাচিয়া বহিবে রে॥
স্বর্গের দূত হেমপক্ষ প্রসারি
ভারত আকাশে উড়িবে রে।
হাসিবে কাঁদিবে নাচিবে গাইবে
ওই চিতাভস্ম মাখিবে রে॥

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সেন।

আহার-তত্ত্ব।

ভেতো বাঙ্গালী বলিয়া আমাদের একটা দুর্নাম আছে। ভাত কি হেয় পদার্থ? তবে এ দুর্নাম কেন?

আবার কেবল বাঙ্গালীরাই ভেতো নহে। বঙ্গ-উপসাগরের তিন পাশের লোকেরই ভাতগত প্রাণ। মান্দ্রাজ, উড়িষ্যা, বাঙ্গালা ও ব্রহ্মদেশ, এই কয়েক প্রদেশেই ধান্যের প্রচুর আবাদ এবং এই কয়েক প্রদেশে ভাতই প্রধান খাদ্য।

অবশ্য হিন্দুজাতি ভেতো নহে। কিম্বা ভারতবাসী ভেতো নহে। সমুদয় ভারত লইতে গেলে, ভাত অল্প লোকের প্রধান খাদ্য। গম,যব,জোয়ার,বাজরা,দাইল ইত্যাদি ভারত-বাসীর খাদ্য। তবে বঙ্গউপসাগর বেড়িয়া কয়ে

কটা প্রদেশে ছাতু ও আটা যেরূপ, ভারতের অপর প্রদেশে ভাত সেইরূপ। কেবল ধনী লোকের রসনার তৃপ্তি সাধন করে।

ভাতের দোষগুণ বিচারের পূর্ব্বে আহারের প্রয়োজনটা বুঝা কর্ত্তব্য। কিন্তু আহারের প্রয়োজন বুঝেন না কে? আহার ব্যতীত জীবনধারণ অসম্ভব, এ কথা কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না। কিন্তু আহার করাটা নিত্য ব্যাপার বলিয়াই একটু বিচার করা আবশ্যক। প্রত্যহ যাহা করিতে হয়, তাহার ভাল মন্দ সবিশেষ বিবেচনা করিয়া করা কর্ত্তব্য।

ছেলেবেলায় দুর্ভিক্ষের কথা শুনিলে মনে হইত,দেশে কত গাছপালা, কত মাটিজল আছে. সেই সব খাইয়া লোকে পেট ভরায় না কেন? মাটি জলের ত অভাব নাই। আর পেট খালি হয় বলিয়াই ত ক্ষুধা বোধ করি। তখন কেহ যদি বলিত, মাটি খাইতে মিঠে লাগিবে কেন? অমনই উত্তর হইত, নুন তেল মাখাইয়া ভাজিয়া বা রাঁধিয়া খাইলে চলে না? অনেক শাক কাঁচা খাইতে মাটি অপেক্ষা সুস্বাদু বোধ হয় না। আমাদের মধ্যে যে বুদ্ধিমান ছিল, সে বলিত "মাটি যে খাবার জিনিস নয়।" তা'ত নয়, কিন্তু কেন নয়? আর একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি।

এক ব্যক্তি একটি নূতন পুষ্করিণী কাটাইয়াছিলেন। পুষ্করিণী করিলেই তাহাতে মাছ করিতে হইবে। বড় পুষ্করিণী, অনেক জল। অনেক মাছ ছাড়া হইল। কিন্তু দুই বৎসর গেল,মাছ যেমন ছিল, তেমনই রহিল। বড় পুঁটি মাছ অপেক্ষা রুই কাতলা বড় হইল না। এমন সাধের পুকুরে মাছ হইল না, পুষ্করিণীর কর্ত্তার দুঃখের অবধি রহিল না। নির্ম্মল জল, লতা পাতা নাই, পুকুরের চারি পাড় পরিষ্কার; অথচ মাছ বাড়ে না। কেহ বলিয়াছিল, পুকুরের মাছ খাইতে পায় না। কর্ত্তা শুনিয়া অবাক হইয়াছিলেন। পুকুরে কি মাটি জল নাই?

এক দিন খাইতে না পাইলেই শরীর অবসন্ন হয়,নড়িতে চড়িতে,কাজকর্ম্ম করিতে ইচ্ছা হয় না। শাস্ত্রে শরীরটা নবদ্বারযুক্ত বলা হইয়াছে। কিন্তু দ্বার সংখ্যা নয় হউক বা দশ হউক, কয়েকটি দ্বার দিয়া আমরা অবিরত ব্যয় করিতেছি। এই ব্যয়টা বন্ধ করিতে পারিলে আহার চিন্তা থাকিত না।

কিন্তু ব্যয় হয় বলিয়াই শরীর যন্ত্রটা রক্ষিত হইতেছে। এ সম্বন্ধে একটা পুরাতন দৃষ্টান্ত আছে। আমাদের দেহটা একটা ষ্টীম এঞ্জিন বা বাষ্পীয় যন্ত্র। একখানি এঞ্জিন থাকিলেই তদ্দ্বারা কাজ পাওয়া যায় না। এঞ্জিন দ্বারা কাজ পাইতে হইলে খরচ করিতে হয়। সকলেই জানেন, এঞ্জিনের খরচ কাট বা কয়লা। তবেই কাট বা কয়লা পোড়াইলে যে শক্তি জন্মে, তাহাই এঞ্জিনের কাজ করিবার শক্তি। এঞ্জিন দ্বারা যত কাজ হয়, সমুদয় সেই কাঠ বা কয়লার শক্তি দ্বারা হয়।

কাঠ বা কয়লা পোড়াইলে যত শক্তি প্রকাশিত হয়, তাহা পরিমাণ করিতে পারা যায়; আবার কত শক্তি দ্বারা কত কাজ হইতে পারে, তাহাও পরিমিত হইয়াছে। এই ভাবে দেখিলে, এঞ্জিনে যত কাঠ বা কয়লা পোড়ান হয়, তাহা অত্যল্পই আমাদের কাজে আসে। কাঠ বা কয়লার সমুদয় শক্তির প্রায় দশ ভাগের এক ভাগ আমাদের কাজ করে। অবশিষ্ট ভাগের আকারে বায়ুর সহিত মিশিয়া বৃথা নষ্ট হয়।

তাহা ছাড়া এঞ্জিনের মধ্যে একখানা বড়

চাকা ঘুরে এবং সেই ভ্রাম্যমান চাকার শক্তি দ্বারা ময়দার কল বা রেলেরগাড়ী চলে। কিন্তু সেখানি ছাড়া আরও কত ছোট বড় চাকা ঘুরিতে থাকে। সে গুলা চালাইতেও শক্তি চাই। এই শক্তি-ব্যয়টা কি বৃথা ব্যয় নহে?

বৃথা ব্যয় নহে। কেন না, বড় চাকাটা চলিতে পারিবে বলিয়াই এই সকল ছোট চাকা চালাইতে হয়। এগুলা ঠিক না চলিলে বড় চাকা চলে না এবং ময়দা ভাঙ্গাও হয় না। তবেই দেখা গেল, এঞ্জিনে তাপের আকারে বৃথা ব্যয় ছাড়া আর এই রকমে শক্তি ব্যয়িত হয়। (১) ছোট চাকা গুলা চালাইতে যে শক্তি ব্যয় হয়, তাহাকে আভ্যন্তর ব্যয় বলা যাইবে এবং (২) বাহিরের বড় চাকা ঘুরাইতে যে শক্তি ব্যয় হয়, তাহাকে বাহ্য ব্যয় বলা যাইবে।

আমাদের শারীরযন্ত্রে এঞ্জিনের বৃথা ব্যয়টা নাই। কিন্তু অপর দুই প্রকার ব্যয় আছে। বুকের ভিতরে যে হৃদ্‌যন্ত্র দিবারাত্রি ধক্ ধক্ করিতেছে, তাহার জন্য অনেক খানি শক্তি আবশ্যক হয়। ফুস্‌ফুস্ আছে, আহার পরিপাক করিবার জন্য পাকযন্ত্র আছে, আরও কত কল শরীরের মধ্যে চলিতেছে। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যয়, শরীরকে সর্ব্বদা একই ভাবে উষ্ণ রাখিতে হইতেছে, গাত্রচর্ম্ম দিয়া জল বাষ্পীভূত করিতে হইতেছে। এ সমস্ত কাজের জন্য শক্তি চাই। ইহাদের উপর, বাহিরের কাজ কর্ম্ম করিতে শক্তি আবশ্যক।

স্থূল দৃষ্টিতে আমাদের দেহের আভ্যন্তর ব্যয়টা বৃথা বোধ হইতে পারে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। এঞ্জিন খানা গড়িতে কত শক্তি লাগিয়াছিল, উহার জীর্ণসংস্কার করিতে শক্তি আবশ্যক হয়। আমাদের দেহ নিজেই আপনাকে নির্ম্মাণ করিতেছে, নিজেই আপনার জীর্ণসংস্কার করিতেছে। শরীরকে সর্ব্বদা উষ্ণ রাখিতে হইতেছে। নতুবা প্রাণ রক্ষা হয় না।

তবেই দেহযন্ত্র কার্য্যক্ষম অবস্থায় রাখিতে এক ব্যয় এবং তদ্দ্বারা বাহিরের কাজ করিতে আর এক ব্যয়। প্রথম ব্যয়টা বন্ধ করিলে দেহযন্ত্রটাই যায়। দ্বিতীয় ব্যয়টা ইচ্ছানুসারে কমাইতে বাড়াইতে পারি। যদি কোন প্রকার কাজ না করিয়া কেবল দেহখানাই বাঁচাইয়া রাখিতে চাই, তাহা হইলে দ্বিতীয় ব্যয়টা করিতে হইবে না। অবশ্য এরূপ স্থলে জড়ভরত হইয়া দিন কাটাইতে হইবে।

সময় ও অবস্থা বিশেষে আমরা প্রথম ব্যয়টাও কিছু কমাইতে পারি। শীতকালে দেহ অনাবৃত রাখিলে দেহের অনেক শক্তি তাপরূপে বৃথা নষ্ট হয়। আগুন জ্বালিয়া কিম্বা শীতবস্ত্রে বা ভস্মাদিতে দেহ আবৃত করিয়া এই অপব্যয় কিয়ৎপরিমাণে নিবারিত হইতে পারে। সর্পাদি কতিপয় প্রাণী দেহের যন্ত্রগুলিকে এমন অবসন্ন অবস্থায় রাখিতে পারে যে, তাহারা কয়েক মাস আহার করিয়া অন্ন হইতে শক্তি সঞ্চয় না করিয়াও বাঁচিয়া থাকিতে পারে। অবশ্য এই সময়ে তাহাদের শরীর শীর্ণ হইতে থাকে।

দুই এক দিন কিছু না খাইলে যে শরীর শুকাইয়া যায়, তাহার কারণ এই যে, তখন আমরা শরীরের আভ্যন্তর শক্তি ব্যয়টা শরীর দ্বারাই সম্পাদন করি। বস্তুতঃ উপবাসী ব্যক্তি নিজের শরীর ভক্ষণ করে। এজন্য শরীর শীর্ণ হয় এবং শক্তির অভাবে অবসন্ন হয়। কিন্তু যদি কর্ম্মঠ হইতে চাই, তাহা হইলে প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যয়টা যথোচিত করিতে হইবে।

কিন্তু বিধাতা এমনই নিয়ম করিয়াছেন

যে, আয় না থাকিলে ব্যয় করা চলে না। সুতরাং জীবন ধারণ করিতে হইলে আহার আবশ্যক এবং যিনি যত কাজ করিতে চান, তাঁহাকে তদনুরূপ আহার করিতেই হইবে। আহার দ্বারা দেহ রক্ষিত হয় এবং দেহে শক্তি সঞ্চিত হয়। কিন্তু এজন্য অন্ন কেবল উদরস্থ করিলেই চলিবে না। অন্নকে দেহসাৎ করা চাই। অর্থাৎ অন্নকে আমাদের রক্ত মাংসাদিতে পরিণত করিতে না পারিলে আহারে কোন ফল হয় না। পুষ্করিণী জলপূর্ণ করিতে হইলে যেমন জল নির্গম পথ খুলিয়া রাখিলে তাহা কখন পূর্ণ হইতে পারে না, তেমনই দেহে শক্তি সঞ্চয় করিতে হইলে অন্নকে দেহস্থ করা চাই।

এই বিষয়ে দেহযন্ত্র বাষ্পীয় যন্ত্র হইতে পৃথক্। বাষ্পীয় যন্ত্রে কাঠ বা কয়লা যেমন দেওয়া যায়, তাহা তেমনই পুড়িয়া শক্তি উৎপাদন করে। কিন্তু দেহযন্ত্রে অন্ন যেমন প্রবেশিত করা যায়,তেমনই আকারে উহার অত্যল্পই পুড়ে। অধিকাংশই শরীরের রক্ত মাংসে পরিণত হইয়া পুড়ে। এই কথাটী স্মরণ রাখিলে আমাদের কি প্রকার অন্ন আবশ্যক, তাহা বুঝা যাইবে। অন্ন এমন হওয়া চাই যে, তাহা সহজে দেহস্থ করিতে পারা যায়। অতএব যদ্দ্বারা আমাদের রক্তমাংসাদি গঠিত হইতে পারে, তাহাই অন্ন।

কি প্রকার অন্ন আবশ্যক, তাহা শরীরের ব্যয় দেখিয়াও বুঝিতে পারা যায়। আমাদের দেহে তিনটি প্রধান ব্যয়স্থান আছে (১) ফুসফুস (২) মূত্রাশয় (৩) গাত্র। এই তিন দ্বার দিয়া যে সকল পদার্থ অবিরত দেহ হইতে চলিয়া যাইতেছে, তৎসমুদয় পূরণ করিতে পারিলে দেহ যেমন, তেমনই থাকে। শৈশবাবস্থায় শিশু যাহা দেহস্থ করে, তাহার কিয়দংশ আভ্যন্তর এবং বাহ্যব্যয়ে এবং অবশিষ্ট দেহবর্দ্ধনে নিযুক্ত হয়। যৌবনাবস্থার পরে দেহ বৃদ্ধি আবশ্যক হয় না, এজন্য তখন ব্যয়ানুসারে আহার রূপ আয় করিলেই চলে। অতএব শরীরের পরিমাণের তুলনায় বালকদিগকে প্রৌঢ় অপেক্ষা অধিক আহার করিতে হয়।

দেখা গেল, অন্নের শক্তিই আমাদের দেহের শক্তি এবং দেহের উপাদানই অন্নের উপাদান। দেহের মূল উপাদান অনেক। তন্মধ্যে কার্বণ বা কয়লা,হাইড্রজ, অক্সিজ, নাইট্রজ, গন্ধক, ফস্ফর, এবং কয়েকটী ধাতু প্রধান। এই মূল উপাদানগুলি উপযুক্ত পরিমাণে দেহস্থ করিতে পারিলেই আয় ব্যয় সমান থাকে।

আবশ্যক মূল উপাদানগুলি দুষ্প্রাপ্য নহে। কার্বণ বা কয়লা কাঠে, হাইড্রজ জলে, অক্সিজ জলে ও বায়ুতে, নাইট্রজ বায়ুতে এবং গন্ধক ফস্ফর ও ধাতুগুলি মৃত্তিকায় আছে। কিন্তু থাকিলে কি হয়, যেমন ময়দার কলে ইঁট ভাঙ্গা চলে না, তেমনই মূল উপাদান দেহের বড় একটা কাজে আসে না। কথাটা আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝা যাউক। ঐ সকল মূল উপাদান লইয়া দেহের রক্তমাংস গড়িতে অবশ্য শক্তি চাই। দেহ নিজেই অপর শক্তির অপেক্ষা করে, সুতরাং উহা মূল উপাদান যুড়িয়া রক্তমাংস গড়িবার শক্তি পাইবে কোথায়?

এ বিষয়ে উদ্ভিদ্ প্রাণী হইতে ভিন্ন। তাহারা মূল পদার্থ গ্রহণ করিয়া দেহ নির্ম্মাণ করিতে পারে না বটে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত সামান্য যৌগিক পাইলেই নিজ নিজ পত্রকাণ্ড গড়িতে পারে। তাহাদের দেহ আরও জটিল যৌগিক দ্রব্যে গঠিত। সুতরাং তাহা-

দিগকে অল্প জটিল হইতে অধিক জটিল পদার্থ গড়িতে হয়। অবশ্য এজন্যও শক্তির প্রয়োজন। এই শক্তি তাহারা সূর্য্য হইতে লইতেছে। কেননা, সূর্য্যের আলোক না পাইলে তাহারা স্ব স্ব দেহ নির্ম্মাণোপযোগী যৌগিক প্রস্তুত করিতে পারে না।

কিন্তু আমাদের ঠিক বিপরীত। আমরা অধিক জটিল পদার্থ ভাঙ্গিয়া অল্প জটিল করিতেছি। আমাদের দেহের উপাদান যত জটিল, দেহের ব্যয়িত পদার্থ তত জটিল নহে। জটিলকে ভাঙ্গিয়া বা পোড়াইয়া সহজ করিয়াই আমরা শক্তি পাই।

কিন্তু একেবারে কোন মূল পদার্থ আমরা আহার করি না, এমন নহে। বায়ুর অক্সিজ আমরা অবিরত দেহস্থ করিতেছি। আমরা বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকি, এ কথা শুনিলে অনেকে হয়ত বিস্মিত হইবেন। কিন্তু যাহা খাইয়া প্রাণ ধারণ করি, তাহাই অন্ন। তবে অক্সিজ মুখ দিয়া না খাইয়া নাক দিয়া খাই এবং উহা কঠিন কিম্বা দ্রব না হইয়া বায়ু। কিন্তু তা বলিয়া উহার অন্নত্ব বিলুপ্ত হইবে কেন? এই বায়ুরূপ অন্ন পরিমাণেও অল্প নহে। প্রত্যহ প্রায় ৸০ পোয়া অক্সিজ আমরা দেহসাৎ করিতেছি।

অনেক লোক চাউল, দাইল, জল কত বাছাই করিয়া আহার করে, এবং আবশ্যক হইলে বেশী দাম দিয়াও ঐ সকল অন্ন ক্রয় করিতে পরাঙ্মুখ হয় না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, বায়ুটা সহজ লভ্য বলিয়া উহার ভাল মন্দ কুড় একটা বিচার করে না। এই শীতকালে লোকে ঘরের দ্বার জানালা আট-আট বন্ধ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যায়, কিন্তু সরু চাউল পাওয়া যায় না বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করে। তাহাদের অনেকে আবার নাক মুখ লেপ চাপা দিয়া সুখে নিদ্রা যায়। মানব চরিত্র এমনই বিচিত্র বটে!

যাহা হউক, যেমন বায়ুর অক্সিজ ব্যতীত কাঠ পুড়ে না, তেমনই আমাদের দেহও পুড়ে না। কাঠ পুড়িলে যেমন তাপ জন্মে, দেহের মাংসাদি পুড়িলেও তেমনই তাপ জন্মে। প্রভেদের মধ্যে কাঠ পুড়িবার সময় জ্বলিয়া উঠে, দেহের মাংসাদি এমন মন্দ মন্দ পুড়ে যে, জ্বলিয়া উঠে না।

মূল পদার্থের মধ্যে কেবল অক্সিজ বায়ু আমরা শরীরে গ্রহণ করিয়া থাকি। তদ্ভিন্ন, জল ও কয়েকটী ধাতব পদার্থও আমাদের অন্ন। উহাদিগকে সামান্য যৌগিক বলা যায়। জলের ভাল মন্দ বিচার অনেকেই করিতেছেন; তৎসম্বন্ধে এখন কোন কথা বলা আবশ্যক নাই। আমাদের দেহের প্রায় ৷৶০ আনা জল, শিশুদের ৸/০ আনা। কিন্তু আমরা কেবল জলপান করিয়াই দেহে জল প্রবেশিত করি না। শিশুদের প্রাণ মানুষদুগ্ধে প্রায় ৸৶০ আনা জল, গাভীদুগ্ধে ৸/০ আনা। শাক সবজি ফল মূলে বিস্তর জল। লাউ কুমড়া শাকে প্রায় ৸৶০ আনা জল। তরমুজে ৸৵০ আনা, আলুতে ৸০, মৎস্য মাংসে গড়ে ৷৵০। চাউল দাইল ময়দার মোটামুটি ৶০ আনা জল।

ধাতব পদার্থের মধ্যে খাদ্য লবণ, ফস্ফর, গন্ধক, ক্ষার, চূণ ইত্যাদি প্রধান। নুন আমরা প্রত্যহ খাইয়া থাকি। অপরাপর পদার্থ এইরূপে পৃথক্ খাই না বটে, কিন্তু শাকাদির সঙ্গে উহাদিগকে উদরস্থ করিতেছি। কাঠ পোড়াইলে যে ভস্ম অবশেষ থাকে, তাহাই উদ্ভিদ দেহের ধাতব পদার্থ। এ গুলিকে রাসায়নিকেরা সামান্যতঃ লবণ বলিয়াই নির্দ্দেশ করেন। আমরা লবণকেই

উদ্ভিদভোজী। এজন্য এ সকল পদার্থের জন্য ভাবনা নাই। অবশ্য সকল উদ্ভিদে সমান পরিমাণে ধাতব পদার্থ নাই। ১০০ সের পরিষ্কার চাউল পোড়াইলে ॥০ সের মাত্র ভস্ম পাওয়া যায়। দাইলে অপেক্ষাকৃত অধিক ধাতব পদার্থ আছে। তন্মধ্যে ৩॥০ সের চাউলে যত ফস্ফর, ১ সের অড়র দাইলে তত আছে। স্থূলতঃ বলিতে গেলে, দাইল ইত্যাদির খোসায় অপেক্ষাকৃত অধিক ধাতব পদার্থ আছে।

বায়ু, জল, মৃত্তিকা, (ধাতব পদার্থ) এই তিন প্রকার অন্নের উল্লেখ করা গেল। কিন্তু এতদ্দ্বারা আমরা কাবণ এবং নাইট্রজ পাই না। মৃত্তিকায় সোরা আছে এবং সোরায় নাইট্রজ আছে। সেইরূপ বায়ুতে নাইট্রজের পরিমাণ প্রায় ৬/০। কিন্তু এই এই আকারে নাইট্রজ আমাদের কাজে লাগে না। সুতরাং কার্বণ ও নাইট্রজ,এই দুইটীর উপায় করিতে পারিলেই আহার সংস্থান হয়।

ইহাদের পরিমাণও অল্প নহে। আমরা প্রত্যহ প্রায় ২৩ তোলা কার্বণ এবং ১.৬ তোলা নাইট্রজ দেহ হইতে ব্যয় করিতেছি। উহাদের অনুপাত প্রায় ১৪ ভাগ কার্বণ ১ ভাগ নাইট্রজ।

এই কার্বণ ও নাইট্রজ ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হয় বলিয়াই অন্ন চিন্তা বিষম হইয়াছে। উহাদিগকে মূল আকারে কিম্বা সামান্য যৌগিক আকারে পাইলে হয় না। উহাদিগকে বিশেষ জটিল আকারে পাওয়া আবশ্যক। ইহার কারণ পূর্ব্বে বলা গিয়াছে। উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহে উহারা আবশ্যক জটিল আকারে বিদ্যমান। এজন্য উদ্ভিদ কিম্বা প্রাণীদেহ হইতে ঐ দুই পদার্থ গ্রহণ করা ব্যতীত আমাদের গত্যন্তর নাই। অর্থাৎ এই কারণে উদ্ভিদ কিম্বা প্রাণীদেহ কিম্বা উভয়ই আমাদের অন্নের মধ্যে হইয়াছে।

উদ্ভিদ ও প্রাণী লইয়া জীব। তাহাদের দেহ জৈব পদার্থ। তবে আমাদের অন্ন গুলি এই কয়েক প্রকার—(১) বায়ুর অক্সিজ (২) জল, (৩) ধাতব লবণ (৪) জৈব পদার্থ। জৈব পদার্থ আমরা তিন আকারে গ্রহণ করিয়া থাকি। (১) সাবু, আরারুট, চিনি প্রভৃতি যে সকল পদার্থে নাইট্রজ নাই, কিন্তু কার্বণ, হাইড্রজ, অক্সিজ আছে। এ গুলিকে রাসায়নিকেরা কার্বহাইড্রেট নামে অভিহিত করেন। (২) ঘৃত তৈল প্রভৃতি যে সকল দ্রব্যে ঐ তিনটী পদার্থ আছে, কেবল হাইড্রজের তুলনায় অক্সিজ কম আছে। (৩) মৎস্য মাংসাদি, যাহাতে ঐ তিন পদার্থ ছাড়া নাইট্রজ আছে। এই শেষোক্ত পদার্থে নাইট্রজ আছে বলিয়া উহাকে নাইট্রজেত পদার্থ বলা যায়।

কার্ব্বহাইড্রেট পদার্থে কার্ব্বণ ।৶০ আনা। চিনিতে একটু প্রভেদ আছে। উহাতে কার্ব্বণ ।৶১৫। ঘৃত তৈলে কার্ব্বণ ও হাইড্রজ বেশী এবং অক্সিজ কম। এজন্য উহাদিগকে পোড়াইলে কার্ব্বহাইড্রেট অপেক্ষা বেশী তাপ পাওয়া যায়। যাহা হউক, ঘৃত তৈলে কার্ব্বণ গড়ে ৸০ আনা। নাইট্রজেত পদার্থের একটা উৎকৃষ্ট উদাহরণ ডিম্বের শ্বেতাংশ। সেইরূপ দাইল ও ময়দার অংশ বিশেষ এবং মেদ ও অস্থি বিযুক্ত মৎস্য ও মাংস,দুধের ছানা প্রভৃতি নাইট্রজেত পদার্থ। এই সকল পদার্থে গড়ে নাইট্রজ ৵১০ আনা এবং কার্ব্বণ ॥৴॥০আনা। উভয়ের অনুপাত ১: ৩.৩

এই সমুদয় জৈব অন্ন ব্যতীত আমরা লেবু, তেঁতুল প্রভৃতি অম্ল, লঙ্কা হলুদ গোলমরিচ প্রভৃতি মসলা খাইয়া থাকি। ইহাদের

পরিমাণ অল্প বলিয়া এখানে ধরা গেল না। অবশ্য এগুলিরও প্রয়োজন আছে।

এই কয়েক রকম জিনিসই আমাদের আবশ্যক। অবশ্য কেবল চিনি কিম্বা আরারুট কিম্বা তৈল বা ঘৃত খাইলে চলিবে না। কেননা, তৎসমুদয়ে নাইট্রজ নাই। মাংসাদি নাইট্রজেড পদার্থে কার্ব্বণ ও নাইট্রজ, উভয়ই আছে। কেবল ঐ প্রকার অন্ন খাইলে ক্ষতি কি?

কিন্তু দেখা যায়, নাইট্রজেড পদার্থে নাইট্রজ ও কার্ব্বণের অনুপাত ১ : ৩·৩। কিন্তু আমাদের চাই ১ : ১৪। সুতরাং আবশ্যক নাইট্রজ পাইতে গেলে কার্ব্বণ কম পড়ে, আবার আবশ্যক কার্ব্বণ পাইতে গেলে নাইট্রজ বেশী হয়। কিন্তু ভাগে নাইট্রজ বেশী পড়িলে ক্ষতি কি? ক্ষতি এই যে, নাইট্রজেত পদার্থ হইতে আবশ্যক পরিমিত কার্ব্বণ পাইতে হইলে ঐ পদার্থ অনেক খানি উদরস্থ করিতে হয়। অতখানি পদার্থ জীর্ণ করিতে পাকযন্ত্রকে তদনুরূপ শক্তি দিতে হয়। পূর্ব্বে বলা গিয়াছে, আমাদের অন্নের শক্তিই মূলধন। সুতরাং যেমন টাকা আদায় করিবার সময় ব্যয়ের দিক্‌টা কম করাই উচিত, তেমনই অন্ন হইতে শক্তি সঞ্চয় করিবার সময়েও অধিক শক্তি ব্যয় বাঞ্ছনীয় নহে।

ইহার উপর আরও কথা আছে। পাকযন্ত্র একটী নহে, অনেকগুলি আছে। কোন যন্ত্র দ্বারা কেবল কার্ব্বহাইড্রেট, কোনটি দ্বারা কেবল ঘৃতাদি তৈল পদার্থ, কোনটি দ্বারা নাইট্রজেত পদার্থ এবং কোনটি দ্বারা সকলগুলিই অল্প পরিমাণে জীর্ণ হইতে পারে। এখন সভ্যসমাজে যেমন লোকের কার্য্যক্ষমতানুসারে ব্যবসায় ভাগ দ্বারা কাজের সুতরাং সমাজের সুবিধা ঘটে, তেমনই পাকযন্ত্র রূপ সমাজের লোকদিগের কার্য্যক্ষমতানুসারে সকলকেই স্ব স্ব কর্ম্মে নিযুক্ত রাখা উচিত। নতুবা কোন যন্ত্রটা নিষ্কর্ম্মা বসিয়া থাকিবে এবং কোনটা বা অতিরিক্ত গুরু পরিশ্রমে শীঘ্র অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবে। তবেই আমাদের দৈব অন্ন এমন হওয়া আবশ্যক যে, (১) পাকযন্ত্রের সমুদয় যন্ত্রগুলিই স্ব স্ব কর্ম্ম পাইবে এবং (২) কোন যন্ত্রকেই অতিরিক্ত কাজ করিতে হইবে না। অর্থাৎ ভোজ্য অন্নের কেবল উপাদান দেখিলেই চলিবে না। তাহা সুপাচ্য কি না, তাহা দেখা আবশ্যক। নতুবা দুর্ভিক্ষের সময় বনের লতা পাতা খাইলে চলিতে পারিত।

অনেক পরীক্ষা দ্বারা দেখা যায় যে, আমাদের ভোজ্য নাইট্রজেত, কার্ব্বহাইড্রেট এবং তৈল পদার্থত্রয়ের পরস্পর অনুপাত ১.৩ : ৩.৫ : ১ হইলে দেহযন্ত্র সুচারু চলিতে থাকে। আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে তৈল পদার্থের পরিমাণ কিছু কম করিয়া তৎপরিবর্ত্তে কার্ব্বহাইড্রেট গ্রহণ করিলে কোন ক্ষতি হয় না। এজন্য আমরা ১·৫ : ৪·৫ : ১ অনুপাতে ঐ তিন পদার্থ গ্রহণ করিতে পারি। রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা দেখা যায় যে, এমন কোন একটী খাদ্য নাই, যাহাতে ঐ তিন পদার্থের অনুপাত ঐ প্রকার। এজন্য আমাদিগকে ঐ তিন রকম পদার্থ মিশাইয়া খাইতে হয়।

দৈনিক অন্নের ব্যবস্থা করিবার সময় কোন্ পদার্থে কত কার্ব্বণ, কত নাইট্রজ আছে, তাহার হিসাব করিয়া খাওয়া চলে না। এজন্য আর একটা সহজ উপায় করা উচিত। ঘৃত তৈলের উপাদান এবং পোড়াইলে কত তাপ জন্মে, তাহা বিচার করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ১ ভাগ ঘৃত তৈলাদি পদার্থ ২.৩ ভাগ কার্ব্বহাইড্রেটের তুল্য

ফল দেয়। এতদনুসারে আমাদের জৈব অন্ন দুই ভাগ বিভক্ত করা চলে। যথা, (১) নাইট্রজেত এবং (২) কার্বহাইড্রেট। উপরের লিখিত আমাদের তিন প্রকার জৈব অন্নের অনুপাত ভাঙ্গিলে দেখা যায় যে, নাইট্রজেত এবং কার্বহাইড্রেটের অনুপাত ১: ৪॥ কিম্বা ১:৫ রাখা উচিত। এই অনুপাতে নাইট্রজেত এবং কার্বহাইড্রেটের কার্বণ ও নাইট্রজ হিসাব করিলেও আসে। ইহাদের অনুপাতকে পুষ্টিদ অনুপাত বলা যাইবে।

নিম্নে আমাদের প্রচলিত কয়েক প্রকার জৈব অন্নের স্থূল উপাদান দেখান গেল। প্রত্যেক পদার্থের শতভাগে কোন্ পদার্থ কত আছে এবং তৈল পদার্থকে কার্বহাইড্রেটে পরিণত করিয়া নাইট্রজেত ও মোট কার্বহাইড্রেটের পুষ্টিদ অনুপাত দেওয়া গেল।

	নাইট্রজেত	কার্বহাইড্রেট	তৈল	পুষ্টিদানুপাত
আরারুট	০·৮	৮৩·৩	—	১·১০৪
মাণ্ডুয়া চাউল	৭·৩	৭৩ ২	১·৫	১ ১৩
চাউল	৭·৩	৭৮·৩	০·৬	১:১০·৮
আলু (নূতন)	২	২১	●·২	১:১০·৭
জনার	৯·৫	৭০·৭	৩·৬	১:৮·৩
জোয়ার	৯.৩	৭২.৩	২.০	১:৮.৩
যবের ছাতু	১১.৫	৭০.০	১.৩	১:৬.৩
ওট (oats)	১০.১	৫৬.০	২.৩	১:৬
চীনের বাদাম	২৪.৫	১১.৭	৫০.০	১:৫.২
গম	১৩.৫	৬৮.৪	১.২	১:৫.২
গুড়গড়ে	১৮.৭	৫৮.৩	৫.২	১:৩.৮
কপিশাক	১.৮	৫.৮	০.৫	১:৩.৮
বুটের দাইল	২১.৭	৫৯.০	৪.২	১:৩.১
অড়র দাইল	২২.৩	৬০.৯	২.১	১:৩
মাষ কলাই *	২২.২	৫৪.১	২.৭	১:২·৭
কুলথ কলাই	২২.৫	৫৬.০	১.৯	১:২.৭
মসুর দাইল	২৫.১	৫৮.৪	১.৩	১:২.৫
মুগ কলাই	২৩.৮	৫৪.৮	২.০	১:২.৫
শিম	২০.০	৫৫.০	১.৯	১:২.৫
বরবটী কলাই	২৩.১	৫৫.৩	১.১	১:২.৫
খেড়ী কলাই	২৩.৮	৫৬.৬	০.৬	১:২.৫
মটর	২৮.২	৫৫.০	১.৫	১.২.৪
খেসারী	৩১.৯	৫৩.৯	০.৯	১:১.৭৫
ঝিনুক	১১.৭	—	২.৪	১:০.৮
মৎস্য	১৮.১	—	২.৯	১:০.৪
পক্ষীমাংস	২১.০	—	৩.৮	১ ০.৪
ডিম্ব	১৩.৫	—	১১.৬	১.২
ঐ শ্বেতাংশ	২০.৪	—	—	১:০
ঐ পীতাংশ	১৬.	—	৩০.৭	১:৪.৪
ছাগ ও মেষ মাংস				
মেদহীন	১৮.৩	—	৪.৯	১:০.৬
মেদযুক্ত	১২.৪	—	৩১.১	১.৫.৮
গো দুগ্ধ	৪.১	৫.২	৩.৯	১:৩ ৫
সর	২.৭	২.৮	২৬.৭	১:২৪
ছানা (ননীতোলা)	৪৪·৮	—	৬.৩	১:০.৩
ঐ (ননীযুক্ত)	৩৩·৫	—	২৪.৩	১:১.৭

* কলাইর খোসা বাদ দিলে নাইট্রজেত ও কার্বহাইড্রেটের পরিমাণ কিছু অধিক হয়। কিন্তু এরূপ প্রভেদ শতভাগে১।২ ভাগ মাত্র।

এই তালিকা দেখিলে সহজেই বুঝা যাইবে যে, এমন কোন একটি খাদ্য নাই, যাহা আমাদের আবশ্যক কার্বণ ও হাইড্রজ দিতে পারে। এ জন্য দুই তিনটি খাদ্য মিশাইয়া খাইলে হয়। গমে আর একটু তৈল পদার্থ থাকিলে উহা উৎকৃষ্ট অন্ন হইতে পারিত। ঐ অভাব পূরণ নিমিত্ত রুটী বা লুচীর আকারে ঘৃত সংযুক্ত করা হইয়া থাকে। ভাতে তৈল পদার্থ আরও কম। এজন্য উহাও ঘৃত সংযুক্ত করিয়া খাইবার রীতি আছে। কিন্তু এরূপে পুষ্টিদানুপাত আরও কম হয়। তাহা ছাড়া, আমরা ভাত রাঁধিবার সময় উহার ফেন ফেলিয়া দিই।

ফেনের সঙ্গে উহার ফস্ফর চলিয়া যায় এবং নাইট্রোজেন পদার্থও কিঞ্চিৎ নষ্ট হয়। একে চাউলে ধাতব পদার্থের অত্যন্ত অভাব, তাহাতে যাহা কিছু আছে, তাহাও ফেলিয়া দেওয়া উচিত নহে। * এজন্য যেমন "পোড়ের ভাত" কিম্বা খিচড়ি বা পোলাওতে পরিমিত জল দিয়া ভাতে ফেন হইতে দেওয়া হয় না, তেমন করিয়া ভাত রাঁধিবার রীতি হইলে ভাল হয়। যাহা হউক, দেখা গেল, কেবল ভাত খাইলে আমরা আবশ্যক উপাদান পাই না।

গম অপেক্ষা বিলাতী ওট উৎকৃষ্ট অন্ন। উহাতে আবশ্যক পদার্থ প্রায় আবশ্যক পরিমাণে বিদ্যমান। কিন্তু এদেশে ওটের চাষ অল্পই হইয়া থাকে। জনার, আশুয়া, জোয়ার প্রভৃতি অন্নগুলি চাউল, ময়দা, যবোনধাতুর মত সুপাচ্য নহে। দাইলের মধ্যেও তেমনই প্রভেদ আছে। একথা সকলেই জানেন। কিন্তু লোকে ভাতের সঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণ দাইল পায় কি? শাক ভাত খাইয়া আমাদের অনেকে জীবন ধারণ করে। কিন্তু শাকে অল্পই সার পদার্থ আছে। কপির উপাদান দেখিলেই কথাটা বুঝা যাইবে।

এখন কয়েক প্রকার প্রচলিত অন্নের উৎকর্ষাপকর্ষ বিচার করা যাউক। প্রথমে দাইল রুটী লওয়া যাউক। মনে করুন, এক সের আটা, ⁄০ ছটাক ঘৃত এবং ।০ পোয়া বুটের দাইল লইয়া কেহ অন্ন প্রস্তুত করিতে চান।

দেখা যায়,	নাইট্রোজেন	কার্বহাইড্রেট	তৈল।
৮০ তোলা আটায় †	১০·৮	৫৪·৭	১ তোলা
২০ „ বুটের দাইলে	৪·৩	১১·৮	·৮ ঐ
৭·৫ „ ঘৃতে	—	—	৭·৫ „
	১৫·১	৬৬·৪	৯·৩ „
অনুপাত	১·৬	৭	১
আবশ্যক অনুপাত	১·৫	৪·৫	১

সুতরাং ঘৃতাদির অনুপাত প্রায় ঠিক দেখা যাইতেছে। ১ ভাগ ঘৃত ২·৩ ভাগ কার্বহাইড্রেটের তুল্য ধরিয়া দেখা যায়, নাইট্রোজেন ও কার্বহাইড্রেটের অনুপাত ১:৫·৮ হয়। সুতরাং এদিকেও এই প্রকার অন্ন উৎকৃষ্ট বলিতে হইবে।

আটার রুটী অপেক্ষা কেবল লুচী ভাল নহে। ১ সের ময়দার লুচী করিতে ।০ পোয়া ঘৃত লাগিলে

	নাইট্রোজেন	কার্বহাইড্রেট	তৈল।
১ সের ময়দায়	১১	৫৫	১ তোলা
।০ পোয়া ঘৃতে	—	—	২০ „
	১১	৫৫	২১ „
অনুপাত	১	৫	২
পুষ্টিদানুপাত	১:৯।		

সুতরাং কেবল লুচী কোন দিকেই ভাল নহে। উহার সঙ্গে দাইল বা অপর কোন নাইট্রোজেন প্রধান খাদ্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

আর কয়েকটি প্রসিদ্ধ অন্ন বিচার করা যাউক। প্রথমে নিরামিষ ভোজীর খিচড়ী দেখা যাউক।

	নাইট্রোজেন	কার্বহাইড্রেট	তৈল।
চাউল ১ সেরে	৫·৮	৬২·৬	০·৫ তোলা
মসুর দাইল ১ সেরে	২০·১	৪৬·৭	১·০ „
ঘৃত ।০ পোয়া	—	—	২০·০ „
	২৫·৯	১০৯·৩	২১·৫
অনুপাত	১·২	৫	১
পুষ্টিদানুপাত	১:৬		

* সিদ্ধ চাউল সুখপাচ্য বটে কিন্তু আতপ চাউল অপেক্ষা তাহাতে ফস্ফর আরও কম পড়ে।

† গম এবং গমের আটা কিম্বা ময়দার মধ্যে উপাদানের একটু প্রভেদ পড়ে। গম অপেক্ষা আটায় এবং আটা অপেক্ষা ময়দায় নাইট্রোজেনের ভাগ একটু কম পড়ে।

নিরামিষভোজীর জন্য

চাউল ১ সের	৫৮	৬২.৬	০.৫	"
মুগের দাইল।০ পোয়া	৪৮	১১.০	০.০৪	"
ঘৃত /০ ছটাকে	—	—	৫.০	"
দুগ্ধ /৲ সেরে	৪.১	৫২	৩.৯	"
	১১৭	৭৮৮	৯৪৪	
অনুপাত	১৬	৮৩	১	
পুষ্টিদানুপাত	১৬১			

নিরামিষভোজীরা দুগ্ধ এবং দুগ্ধ হইতে জাত ঘৃত ছানা দধি বাদ দেন না। এ গুলা আমিষান্ন না হইয়া নিরামিষান্ন হইল কেন, বলিতে পারি না, যাহা হউক, মৎস্যের, মাংসের এবং নিরামিষ-ভোজীর জন্য ছানার পোলাও উৎকৃষ্ট খাদ্য।

১॥০ সের চাউলে	৮.৭	৯৩৯	০৭	তোলা
১॥০ সের মৎস বা				
১।০ সের মাংস বা				
॥০ সের ছানায়	২২.০	—	৩০	"
।০ পোয়া ঘৃতে	—	—	২০০	"
	৩০.৭	৯৩৯	২৩৭	"
অনুপাত	১.৩	৪	১	
পুষ্টিদানুপাত	১৪৮			

কিন্তু অনেকে খিচড়ী পোলাওকে গুরু-পাক অন্ন বলিয়া থাকেন। অবস্থা বিশেষে উহারা গুরুপাক বটে। যে ব্যক্তির প্রত্যহ আরারুট খাওয়া অভ্যাস, তাহার পক্ষে নাইট্রজেত কিম্বা ঘৃতের পরিমাণ একটু অধিক হইলে দুষ্পাচ্য হইবার কথা। তাহা ছাড়া আরও কথা আছে। অনেকে এরূপ উৎকৃষ্ট খাদ্য ভাতের মত আকণ্ঠ খাইয়া বসেন। মাংস খাইতে হইবে, তাহাকে নানাবিধ মসলা দিয়া পাক করিয়া এক বাটী পূর্ণ মাংস খাইয়া বসেন। বস্তুতঃ উৎকৃষ্ট অন্নের এই এক গুণ যে, শরীর রক্ষার্থ কিম্বা শারীরিক পরিশ্রম-জনিত ব্যয় নির্ব্বাহ নিমিত্ত উদর পরিপূর্ণ করিয়া খাইবার প্রয়োজন হয় না। অনেকে দশটার সময় ভাতে জলে এমন এক পেট খাইয়া থাকেন যে,আফিসে যাইতে তাহাদের প্রাণান্ত ঘটে, অবশ্য আহারের পরক্ষণেই শারীরিক কাজ করা উচিত নহে। কেন না, তখন আভ্যন্তর কাজ বেগে চলিতে থাকে। এ সময় বাহ্য কাজ করিতে সহজেই শক্তির অভাব ঘটে।

খাদ্য সম্বন্ধে আরও একটা কথা আছে। আজ কাল কেহ কেহ সন্দেশ মিঠাইর প্রতি খড়্গহস্ত হইয়াছেন। সবিশেষ বিবেচনা করিয়া ছানার সন্দেশ কিম্বা দাইলের মিঠাই পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। কেন না, সন্দেশ মিঠাই কেবল যে জিহ্বার প্রীতিকর, এমন নহে, উহা অ...র পুষ্টিকর খাদ্য। কেহ কেহ মিষ্টান্নে চিনি থাকে বলিয়া মনে করেন যে, বুঝিবা চিনি খাইলে মধুমেহ রোগ জন্মিবে। কেহ বা মনে করেন যে,সাহেবেরা যখন মিষ্টান্ন খান না,তখন উহা ভাল জিনিস হইতে পারে না।

দেশের এটা দুর্গতি বলিতে হইবে। কেন না, পূর্ব্বাপেক্ষা বিলাতে চিনির ব্যবহার ক্রমশঃ বাড়িতেছে। * পূর্ব্বে সেখানে কম ছিল, কারণ চিনি তত সুলভ ছিল না। বস্তুতঃ চিনি যত সহজে দেহসাৎ হয়, অপর কোন খাদ্য তত সহজে হয় না। বালকগণের পক্ষে চিনি এই কারণে একটী উপাদেয় খাদ্য হইয়াছে। যে খাদ্যটি খাইতে ভাল লাগে, তাহা অহিতকর হইবে কেন?

* সাহেবদের মিষ্টান্ন আমাদের মিষ্টান্ন অপেক্ষা কম মিষ্ট নহে।

তাহাই যদি হইত, তাহা হইলে বলিতে হয়, প্রকৃতির নিয়মের উপরে মানুষ উঠিয়াছে। বাস্তবিক দুগ্ধপায়ী শিশুদিগের দুগ্ধে একটু চিনি মিশাইয়া দিলে দুগ্ধের নাইট্রজেত ও কার্বহাইড্রেটের পরিমাণ আবশ্যকমত হয়, এবং তৎসঙ্গে দুগ্ধ পান করিতেও শিশুরা আনন্দ অনুভব করে। অন্যদিকে, শিশুরা ঘৃত পদার্থ খাইতে ভাল বাসে না। সুতরাং তাহাদিগকে জোর করিয়া ঘৃত খাওয়ান উচিত নহে; দেখিতে গেলে, প্রৌঢ় ব্যক্তিগণের ঘৃত ভোজন দ্বারা উপকার হয়।

দুগ্ধের উপাদান দেখিলে জানা যায় যে, শুধু দুগ্ধ গলাধঃ করা অপেক্ষা, তাহাতে ভাত কিম্বা সের প্রতি প্রায় ৵০ পোয়া চিনি মিশাইয়া খাইলে পরিপাক করিবার পক্ষে সুবিধাজনক হয়। এজন্য কেহ কেহ গো বৎসের স্তন্যপান দেখিয়া তাহার মত অল্প অল্প করিয়া দুগ্ধপান করিতে বলেন। যাঁহাদের দুগ্ধ পরিপাক হয় না, তাঁহারা এই প্রকারে দুগ্ধপান করিলে দুগ্ধ পরিপাক করিবার অভ্যাস করিতে পারেন। ইহা সাধারণ নিয়ম বলা যাইতে পারে যে, কেবল নাইট্রজেত বা কোন কার্ব্বহাইড্রেট বা কেবল তৈল পদার্থ না খাইয়া সকলগুলি যথোচিত পরিমাণে মিশাইয়া খাইলে জীর্ণ করিবার সুবিধা হয়। এতদনুসারে ভাতে দাইল মাখিয়া খাইবার রীতি চলিত আছে। এক বেলা ভাত অন্য বেলা মৎস্য বা মাংস না খাইয়া, ভাতের সঙ্গে মাংসাদি খাইলে ভাল। আমরা তাহাই করিয়া থাকি।

অন্নের উপাদানের অনুপাত দেখিয়া উহার ব্যবস্থা করা অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু প্রত্যেকের কি পরিমাণ আহার করা কর্ত্তব্য, তাহা নির্দ্দেশ করা তত সহজ নহে। সহজ না হইবার কারণ এই যে, আমাদের ব্যয়িত শক্তির পরিমাণ ঠিক জানিতে পারা যায় না। বাহিরে কত শক্তি কাজে লাগাই, তাহা পরিমাণ করিতে পারিলেও, শরীরের তাপ রক্ষার্থ এবং অভ্যন্তরের যন্ত্র সমূহের কার্য্যের নিমিত্ত কতখানি শক্তির প্রয়োজন, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। যাহা হউক, দেখা যায় যে, (১) শীতকালে যত শক্তি আবশ্যক, গ্রীষ্ম কালে তত আবশ্যক হয় না; (২) গুরু পরিশ্রম করিতে যত আবশ্যক, লঘু পরিশ্রম করিতে বা আলস্যে দিন কাটাইতে তত আবশ্যক হয় না; (৩) ভারী দেহীর শক্তির পরিমাণ যত আবশ্যক, লঘু দেহীর তত নহে।

আবার, মনুষের দেহের দৈর্ঘ্যানুসারে দেহের ভার না থাকিলে ক্ষীণ দেখায়। গড়ে ফুট প্রতি শরীরের ভার ১৩॥০ সের হইলে দেহ সুন্দর দেখায়। এইরূপে, যে ব্যক্তির দেহ ৫॥০ ফুট লম্বা, তিনি ১৸৪ মণ হইলে তাঁহাকে নাতিস্থূল নাতিক্ষীণ দেখায়।

কিন্তু বাঙ্গালীর মধ্যে এরূপ অনুপাত অল্প লোকেরই দেখা যায়। জেলখানায় এই হিসাবে ধরা হইয়া থাকে। পাঁচ ফুট ১৵৯ মণ হইয়া পাঁচ ফুটের পর দৈর্ঘ্য যত ইঞ্চি হয়, তত ১॥০ সের যোগ করা হইয়া থাকে। এইরূপে দেখা যায়, ৫॥০ ফুট দীর্ঘ লোক ১৷৮ মণ পড়ে। সাহেবদের ওজন গড়ে ১৸৩ মণ ধরা হইয়া থাকে। আমাদের দেশের লোকদের দেহের ওজন গড়ে ১৷৬ মণ মাত্র। সুতরাং সাহেবদের তুলনায় আমাদের কাজের এবং আহারের পরিমাণ কম হইবে।

কাজ পরিমাণ করিতে হইলে, কাজের একটা একক নির্দ্দেশ করা আবশ্যক। ১ মণ ভারী জিনিস ১ হাত উচ্চে তুলিলে যে কাজ

হয়, তাহাকে কাজের একক ধরা গেল। ইহাকে এক মণ-হাত কাজ * বলা যাইবে। এখন দেখা যায়, ১॥৪ মণ ভারী কোন লোক ২০ মাইল হাঁটিয়া গেলে তাহার ৫৪০০ মণ-হাত কাজ করা হয়। কিন্তু প্রত্যহ ২০ মাইল পথ চলা আমাদের দেশের কয় জন লোক পারে? গড়ে প্রত্যহ ১৫ মাইল ধরিলে আমাদের পক্ষে মন্দ কাজ হয় না। এতদ্দ্বারা প্রত্যহ ৪,৪০০ মণ-হাত কাজ হয়। অর্থাৎ দেহের ভারের সের প্রতি ৭০ মণ-হাত মাত্র কাজ হয়। এরূপ কাজ জেলখানার কয়েদী-দিগকে প্রত্যহ করিতে হয়; দেখা যায় যে, সকল কয়েদীকে পরিশ্রম করিতে হয়, তাহা-দের দৈনিক অন্নের পরিমাণ এই—চাউল ৸৴০ ছটাক, দাইল ৵০ ছটাক, তৈল ১।০ তোলা, লবণ ১॥০ তোলা, তরকারী ৵০ ছটাক।

নুন, তেল, তরকারী বাদ দিয়া চাউল ও দাইলের † পরিমাণ দেখিলে জানা যায় যে, প্রত্যেক কয়েদী প্রায় পৌনে ২ছটাক নাইট্রজেত এবং বার ছটাক কার্ব্বহাইড্রেট খাইয়া থাকে। উভয়ের অনুপাত ১ : ৭ এবং মোট ওজন পৌনে চৌদ্দ ছটাক।

বেহারী কয়েদীর জন্য ৸৴ ছটাক চাউল না হইয়া ।৵ ছটাক চাউল এবং ।৴ ছটাক গমের আটা কিম্বা ।৵ ছটাক জনারের ছাতু নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহার সঙ্গে দাইল ৵০ ছটাক লইয়া উপাদান হিসাব করিলে, নাইট্রজেত প্রায় পৌনে দুই ছটাক এবং কার্ব্বহাইড্রেট দশ ছটাক পড়ে। তৈলের অনুপাত ১ : ৫॥০ এবং মোট ওজন প্রায় বার ছটাক।

যিনি যাহাই বলুন, জেলখানায় কয়েদী-দিগের যে প্রকার আহারের ব্যবস্থা আছে, তাহাতে তাহাদের শরীর শীর্ণ হইবার কথা নহে। বরং কোন কোন স্থানে কয়েদীদিগের শরীর বলিষ্ঠও হইতে দেখা যায়। আমাদের দেশের সাধারণ লোকে যেরূপ খাইয়া থাকে, জেলখানার কয়েদীদিগকে তদপেক্ষা কম বা নিকৃষ্ট অন্ন দেওয়া হয় না। আমাদের দেশে কয়জন লোকে প্রত্যহ ৵০ ছটাক † দাইল বা তদনুরূপ মৎস্য বা মাংস খাইয়া থাকে? নুন লঙ্কা, বা শাক বা দিয়া ১ সের চাউলের ভাত খাইলে নাইট্রজেত ও কার্ব্বহাই-ড্রেটের অনুপাত ১ ৭ হয় না।

যে ব্যক্তির ওজন ১৬ মণ, তাহার পরি-শ্রম অনুসারে কেহ কেহ এই প্রকার খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। (ক) আদৌ পরিশ্রম না করিলে, (খ) অল্প পরিশ্রম করিলে, এবং (গ) গুরু পরিশ্রম করিলে, *

	নাইট্রজেত	কার্ব্বহাইড্রেট	তৈল। *
(ক)	৫.৭	২০.১	২ তোলা
(খ)	৭.৯	৩৩.৫	৩.৮ ,,
(গ)	৯.৭	২৯.৯	.৭ ,,

তৈলকে কার্ব্বহাইড্রেটে ভাঙ্গিয়া নাইট্রজেত ও মোট কার্ব্বহাইড্রেটের পরিমাণ এইরূপ দেখা যায়।

	নাইট্রজেত	কার্ব্বহাইড্রেট।	
(ক)	৫.৭	২৪.৭ তোলা।	মোট ৩০.৪ তোলা বা ।৵৫ ছটাক অনুপাত ১:৪.৩
(খ)	৭.৯	২০.৬ তোলা।	মোট ৫০ তোলা বা ॥৵০ ছটাক অনুপাত ১:৫.৩

* ১৮ মণ-হাতে 1 foot-ton ধরা গেল। ১হাত ১ হাত — ½ metre ধরিলে ভুল হয় না।

* মটর দাইল লইয়া হিসাব করা গেল। মধ্যে মধ্যে কয়েদীদিগকে মৎস্য, মাংস এবং দই দিবার ব্যবস্থা আছে। এরূপ স্থলে ইহাদের ৵০ ছটাক দিলে ৴০ দাইল কম করা হইয়া থাকে।

(গ) ৯.৭ ৪৫.৩ তোলা। মোট ৫৫ তোলা বা ॥৶০ ছটাক

অনুপাত ১:৪.৭

তবেই জলশূন্য নাইট্রোজেত ও কার্ব-হাইড্রেট ১০।১২ ছটাক খাইলেই স্বচ্ছন্দে চলে। এইরূপ ।৶০ ছটাক অন্ন খাইয়া থাকিতে হইলে কেবল প্রাণ রক্ষা করা হয় মাত্র। এই সকল পরিমাণের সহিত নিম্ন-লিখিত দৈনিক আহারের পরিমাণ তুলনা করুন। কোন ভদ্রলোক প্রত্যহ এই প্রকার আহার করিয়া থাকেন।

		নাইট্রোজেত	কার্বহাইড্রেট
চাউল	।৶০ ছটাক	২.২	২৩.৭ তোলা
মুগদাইল	/০ ,,	১.২	৩.০ ,,
মৎস্য	৶০ ,,	১.৮	০.৩ ,,
দুগ্ধ	/১ সের	৩.৩	১১.২ ,,
ছানার সন্দেশ	৶০ ছটাক	০.৫	৩.৩ ,,
ঘৃত তৈল	/০ ,,	—	১১.৫ ,,
তরকারী—			
		১১.০	৫৩.০ তোলা

উভয়ের অনুপাত ১: ৪.৭। মোট ওজন ৸৴০ ছটাক, ইহার শরীরের ওজন ২/ মণের অধিক। কিন্তু শারীরিক পরিশ্রম করেন না বলিয়া আহারের পরিমাণ অধিক বলিতে হইবে। তবে, ভদ্রলোকে আহারের সময় পাত পুঁছিয়া খায় না।

পরিমাণ যাহাই হউক, কার্বহাইড্রেট ও নাইট্রোজেতের অনুপাতের দিকে একটু লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। ভেতো বাঙ্গালীর পক্ষে কার্বহাইড্রেটের পরিমাণ সহজেই অধিক হয়। উহার সহিত নাইট্রোজেত পদার্থের মিশ্রণ আবশ্যক। কিন্তু নাইট্রোজেত পদার্থের এত প্রয়োজনের কারণ কি? কারণ এই, একমাত্র কার্বহাইড্রেট বা তৈল দ্বারা শরীর-ক্ষয় পূরণ হয় না। অবশ্য নাইট্রোজেত পদার্থেও শক্তি আছে। বস্তুতঃ ১ভাগ তৈল পদার্থ ২.২ নাইট্রোজেত এবং ২.৩ কার্বহাইড্রেটের তুল্য শক্তি প্রদান করিতে পারে। অর্থাৎ ঐ তিন পদার্থ হইতেই শরীরে তাপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শরীরের দৈনিক তাপ ব্যয় অল্প নহে। কাজের হিসাবে, ঐ তাপের পরিমাণ প্রায় ৫৪,০০০ মণ হাত এবং প্রাত্যহিক ভুক্ত অন্নের শক্তি হইতে প্রায় ৬১,২০০ মণ হাত কাজ পাওয়া যাইতে পারে। অতএব ৭২০০ মণ-হাত কাজের শক্তিদ্বারা দেহের আভ্যন্তর ও বাহ্য ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।

দেহের শক্তিরূপ আয় ব্যয় দেখা গেল। রসায়ন শাস্ত্রের সাহায্যে আহার তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করা গেল। কিন্তু মানবদেহ রাসায়নিকের সূক্ষ্ম তুলা-যন্ত্র অপেক্ষাও সূক্ষ্ম। রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা যে পদার্থ ধরা যায় না, শরীরগত হইতে তাহাকে দেহযন্ত্র জানিতে পারে। এই সকল কারণে কেহ বা আতপ চাউলের ভাত, কেহ বা নূতন চাউলের ভাত জীর্ণ করিতে কষ্ট বোধ করেন। কিন্তু রাসায়নিক বিচার তাদৃশ সূক্ষ্ম না হইলেও এতদ্দ্বারা ভোজ্য বস্তুর স্থূল নিরূপণ হইতে পারে। তাহার সাহায্যে দেখা গেল, সাধারণ বাঙ্গালীর খাদ্য আজ কালকার কঠিন জীবন সংগ্রামের পক্ষে উপযুক্ত নহে। এখানে নিরামিষ ভোজন ভাল, না আমিষ ভক্ষণ ভাল, তাহার কথা হইতেছে না। কেবল কার্বহাইড্রেটের তুলনায় নাইট্রোজেত পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে বলা যাইতেছে। শাক ভাত খাইয়া একজন স্বচ্ছন্দে বাঁচিয়া আছে, এ কথা ইহার বিরুদ্ধ প্রমাণ হইল না। কার্বহাইড্রেট

দ্বারাও শরীর গঠিত হয়। তবে, পরিশ্রমী লোকের দেহে নাইট্রজেন পদার্থ যত সহজে দেহসাৎ হয়, কার্ব্বহাইড্রেট তত সহজে হয় না, এবং প্রাণিজ নাইট্রজেন যত সহজে হয়, উদ্ভিজ নাইট্রজেন তত সহজে হয় না।

আর একটি কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হওয়া যাক্। সে দিন এক ব্যক্তি দেশের লোকের মূর্খতা দেখিয়া দেখিয়া দুঃখ করিতেছিলেন। এই মহার্ঘ আটা চাউলের দিনে লোকে সস্তা আলু খায় না দেখিয়া তাঁহার দুঃখ। চাউলের সের ৵০ আনা, আলুর সের ⁄০ আনা। স্থূল দৃষ্টিতে আলু সস্তা বোধ হয়। কিন্তু মনে রাখা উচিত যে, নূতন আলুতে ৸০ আনা জল এবং শুষ্ক চাউলে ৵০ আনা মাত্র। তবেই এই হিসাবে ১ সের চাউলের দাম ৵৫ পয়সা, কিন্তু আলুর সের ।০ আনা পড়ে। অন্য দিকে দেখুন, ১ সের চাউলের ভাত রাঁধিলে জলযোগে তাহা ২৷০ সের হয়। কিন্তু ভাতে যে পরিমাণ সার থাকে, কাঁচা নূতন আলুতে প্রায় সেইরূপ। সুতরাং ভাত এবং নূতন আলুর পুষ্টিকারিতা একরূপ। এখানে আমারা হিসাব করিয়া যাহা দেখিলাম, সাধারণ লোকের তাহা অজ্ঞাত নহে।

এইরূপ, দাইল অপেক্ষা মৎস্য মাংস উৎকৃষ্ট হইলেও, উহাদের মূল্য কখনও দাইলের সমান হইবে না। দাইল ৵০ আনা সের এবং মৎস্য ⁄০ আনা সের হইলেও মৎস্য মহার্ঘ হইল। কেননা, জল বাদে ৵০ আনায় ৸৵০ ছটাক দাইল পাওয়া গেল, কিন্তু ৷০ সেরের অধিক মৎস্য পাওয়া গেল না।

ভেতোবাঙ্গালী দুর্নামটা তবে মিথ্যা নহে। বেহারী কয়েদী যাহা খায়, মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী কয়জন খায়? কেহ যেন বলিয়াছিল যে, আমাদের দেশের লোকেরা অর্দ্ধাশনে থাকে। কেন না, দুইবেলা পেট ভরিয়া ভাত পায় না। কিন্তু এক পেট ভাত খাইলেই পূর্ণাশন হইল, বলিতে পারা যায় না। সাহেবদের দেহের ওজন, কাজ করিবার শক্তি আমাদিগের অপেক্ষা অধিক হয় কেন?

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

খোকার বিলাতের পত্র। (২)

শ্রীশ্রীচরণ কমলেষু—

এ বিড়ম্বনা কেন, বুঝি না। কোন কালে দুই ছত্র সাজাইয়া লেখা অভ্যাস নাই, আমার উপরেই সেই ভার! বিলাতের পথে যে আসে, সেই একটু না একটু কিছু লিখিয়া থাকে। আমার পাগলামি, আমিও আরম্ভ করিয়াছি! এক ত তোমরা বারে বারে আমার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত শুনিতে চাহিয়াছ, তাতে আবার আমার মনের ইচ্ছা যোগ দিয়াছে। এত সুন্দর সমস্ত জিনিস দেখিয়াছি, এত প্রকার লোকের সহিত মিশিয়াছি, এত উপভোগ করিয়াছি, বোধ হয় জীবনে আর করিব কিনা, জানি না। এই সমস্তের আস্বাদন তোমরা পাও নাই, ইহাতে বড়ই আমাকে দুঃখ দিয়াছে। যখনই কোন আশ্চর্য্য জিনিস দেখিয়াছি, অমনই মনে হইয়াছে, আহা, বাড়ীর সকলে যদি থাকিত, দেখিতে পাইত। তাহা যখন হয় নাই, আমি আমার পোড়া লেখনী দ্বারা তোমাদিগকে সেই স্থানে দণ্ডায়মান করিতে প্রয়াস পাই-

তেছি। তোমরা ইহা পাঠ করিয়া,সেই সমস্ত স্থানে ও সেই সমস্ত অবস্থায় থাকিয়া যে উপকার ও যে অভিজ্ঞতা পাইতে, সেখানে না থাকিয়া যাহাতে তাহা পাইতে পার, এই আমার অভিলাষ। কি উচ্চ আশা। সাধারণে জানিলে না জানি কত হাঁসিবে! এই পাশ্চাত্য জগতে ঐ ব্যবহার নাই। পাঠ যোগ্য হইলে শিশু বা কি, যুবাই বা কি? অপাঠ্য প্রবীণের বচনও হাস্যস্পদ।

২২শে অক্টোবর, বৃহস্পতিবার, প্রায় দশটা কি এগারটার সময় সুয়েজে পৌঁছিলাম। এখানে জাহাজ বেশীক্ষণ থামিবে না। আমাদের জাহাজের খালে ঢুকিবার পালা আসিলেই ছাড়িবে। যদিও আমাদের জাহাজে ফরাসী মেল ছিল, এবং আমাদের জাহাজ ফরাসীদের, তবু আমাদের প্রায় ঘণ্টা দুই তিন অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। ফরাসী জাহাজ বলার অর্থ এই যে, সুয়েজ খাল কোম্পানী ফরাসীদের, কোন ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার ইহা নির্ম্মাণ করেন। শুনিয়াছি, পূর্ব্বে নাকি সুয়েজে আর একটী খাল ছিল। এখনও তাহার অনেক প্রমাণ রহিয়াছে। এই খাল নীল নদের সহিত লোহিত সমুদ্রকে সংযুক্ত করিত। মিশর যখন স্বাধীন ছিল, তখন এই খাল আরম্ভ করা হয়। নেকো (Necho) নামক কোন শিল্পী এই কার্য্য ভার প্রাপ্ত হন। ইহা আজ প্রায় ২৫০০ হাজার বৎসরের কথা। দরিয়স (Darius) নামক জনৈক কৃতবিদ্য ব্যক্তি ইহা সম্পূর্ণ সমাধা করেন। (Herod ii, 157) এই স্থান কেবলই বালুকাময়, প্রস্তরময় (Sandstone), মধ্যস্থলে কয়েকটী হ্রদ আছে। এই গুলির জল এমনই লবণাক্ত যে,ইহাদের নাম কটু হ্রদ (Bitter lakes) হইয়াছে। এই হ্রদ গুলির উত্তরে আরও হ্রদ আছে। আমাদের জাহাজ মধ্যস্থলে দাঁড়াইল। সুয়েজ খালে যেখানে প্রবেশ করা যায়, তাহাকে তেওফিক বন্দর কহে। এখন আমরা বন্দরের এক মাইল দূরে। সুয়েজ-সহর আরও দূরে, প্রায় দেড় ক্রোশ দূর। দূরে আমরা ঐ সমস্ত সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা দেখিতেছি, ঐ ধূধূ করিতেছে, ঐ সহর।

এখানে দেখিবার বড় একটা কিছু নাই। এসিয়ার দিকে মুশার কুয়া Moses' wells আছে,সে অনেক দূর। জাহাজ কখন ছাড়ে, ঠিক নাই, আমরা তাই নামিলাম না। জাহাজের উপর হইতে যত দূর সম্ভব, উপভোগ করিতে লাগিলাম। এখান হইতে রীতিমত ইসমাইলিয়া, কাইরো এবং আলেকজাণ্ডারিয়ার জন্য ট্রেণ ছাড়ে। আমরা অপরাহ্ণে, প্রায় দুইটার সময়, খালে প্রবেশ করিলাম। খালটী বড়ই সরু। একখানি জাহাজের বেশী আসা যাওয়া করা অসম্ভব জাহাজ থেকে, মনে হয়, যেন পারে লাফ দিয়া পড়া যায়। আফ্রিকা উপকূলেই প্রায় সমস্ত ষ্টেসন। ষ্টেসন অত্যন্ত নিকটেং। এক হইতে অপর প্রায়ই দেখা যায়। ষ্টেসনগুলি দেখিতে অতি সুন্দর। বহু যত্নে সুন্দর বৃক্ষ সমূহ পালিত হইয়াছে। যে স্থান দিয়া জাহাজ যাইবার কথা, অর্থাৎ যে স্থল সর্ব্বাপেক্ষ গভীর, সেই স্থল লৌহ-স্তম্ভ দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে।

খাল সাধারণতঃ তিন প্রকার। কতকগুলি খাল উচ্চ ভূমির মধ্য দিয়া গমন করে। এই অবস্থায় নানা প্রকার কল কব্জা দ্বারা জল রক্ষিত হয়। যেমন আমাদের মেদিনীপুরের খাল, সেখানে কত লকের প্রয়োজন হইয়াছে। এই সমস্ত খাল সঙ্কী

বিত রাখিবার জন্য কোন স্বাভাবিক হ্রদ বা অন্য কোন জলের আকরের প্রয়োজন। অপর কোন প্রকার স্বাভাবিক উপায়ে কার্য্যসিদ্ধি না করিতে পারিলে, অগত্যা অস্বাভাবিক উপায়ে চৌবাচ্চা (Reservoir) সমস্ত প্রস্তুত করিতে হয়। জল আকর্ষণ-যন্ত্রের প্রয়োজন হয়। ফ্রান্সের Lanquedoc Canal, অথবা স্কটলণ্ডের Caledonion Canal এই এই প্রকার খালের সুন্দর উদাহরণ।

দ্বিতীয় প্রকার বলিতেছিলাম, যে খাল নিম্নভূমি দিয়া যাইয়া থাকে। এই সমস্ত খালে ডবল কার্য্যকারী লক দরকার। জোয়ারের সময় জল যাহাতে আসিয়া একেবারে ভাসাইয়া দিতে না পারে, আবার ভাঁটার সমস্ত জল যাহাতে না বাহির হইয়া যাইতে পারে; মোট কথায় খাল সর্ব্বদাই একভাবে থাকে, এইজন্য ডবল কার্য্যকারী দরজার প্রয়োজন। এইরূপ খাল হলণ্ডে এবং অন্যান্য নিম্ন দেশে দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে বড় এই প্রকার খালের ব্যবহারের কথা শুনি নাই।

তৃতীয় প্রকার। আমাদের দেশের যে খানে সেখানে এই খালের উদাহরণ। খাল বলিলে আমরা যাহা বুঝি, তাহাকেই আমি এই বিভাগভুক্ত করিয়াছি। দুই জলরাশির সহিত যে মানবকৃত ক্ষুদ্র জলরাশি সম্মিলিত হয় এবং অন্য কোন প্রকার দরজা (lock) ইত্যাদি কিছুরই আয়োজন হয় না, অর্থাৎ ঐ জলরাশি এই খালকে সর্ব্বদা পূর্ণ রাখিতে পারে, ইহাই আমার তৃতীয় শ্রেণীর খাল। আমাদের দেশে এরূপ অনেক আছে বটে, কিন্তু সমুদ্রের সহিত সমুদ্রের সংযোগ করিয়াছে, এই শ্রেণীভুক্ত আজ পর্য্যন্ত একটী মাত্র খাল হইয়াছে, তাহার নাম সুয়েজ খাল।

আমাদের বাঙ্গালা কথা 'খাল' বলিলে (lock) ইত্যাদি কিছুরই কথা মনে হয় না। ওমুক নদীর সহিত ওমুক নদী পর্য্যন্ত খাল আছে, কেহ কি বুঝিলেন, কতগুলি দ্বার, কতগুলি চৌবাচ্চা ইত্যাদি আছে? বস্তুত উড়িষ্যা মেদিনীপুরের খালই আমাদের আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয়। এ আবার কি? কিন্তু ইংরাজী Canal কথা ব্যবহার করিলেই ঐসব lock, reservoir, gate, pumping engine, এই সমস্তের কথা হৃদয় পটে অঙ্কিত হয়। হয় না কি? কোন বিখ্যাত ইংরাজী গ্রন্থকার এই সুয়েজ খাল সম্বন্ধে লিখিতে লিখিতে বলিতেছেন—

" * * Though it is called a canal, it bears little resemblance to the works we have described under that name, for it has neither locks gates, reservoirs, pumping engines, nor has it, indeed, anything in common with canal except that it affords a short route for sea bourne ship It is in fact, correctly speaking, an artificial strait or arm of the sea connecting the Mediterranean and the Red Sea from both of which it derives its watter-supply"

Encyclopedia Britannica.

এই দুই সমুদ্র এক সমতলে হওয়াতেই এই খালের সৃষ্টি, এই সহজ উপায়ে হইয়াছে। নতুবা ঐ সমস্ত পদার্থের প্রয়োজন হইত। এই সহজ উপায়ে সমাধা করার পক্ষে আর একটা সুবিধা ছিল, এই দুই সমুদ্রই জোয়ার ভাঁটায় বড় বাড়ে কমে না।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই স্থানে সুয়েজযোজকে পূর্ব্বে এক খাল ছিল। আধুনিক সময়ে এই স্থানে খাল করিবার কথা ফ্রান্সের বিখ্যাত সম্রাট প্রথম নেপোলিয়নই, বোধ হয়, প্রথম উত্থাপন করেন। তিনি ইংরাজী সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে M. Lepere নামক জনৈক ইঞ্জিনিয়ারের নিকট হইতে এই স্থানের এক বিবরণ প্রাপ্ত হন। কিন্তু সে সমস্ত বিবরণ,

সে সমস্ত চেষ্টা বিফল হয়। আমরা অতীতের দিকে চাহিয়া বেশ বিচার করিতে পারি, তখন এই খাল হয় নাই বেশ হইয়াছিল। এই খালের তখন বড় প্রয়োজনও ছিল না। এই খাল যদি প্রস্তুতও হইত, অতি অল্প নাবিকই এই চড়া ও লুক্কায়িত পর্ব্বতময় ভূমধ্য ও লোহিত সাগরের ন্যায় ক্ষুদ্র জলাশয়ে কেবল তাহাদের পালের উপর নির্ভর করিয়া আসিত, উন্মুক্ত সমুদ্রে তাহারা "সেই ঘুরিয়ে নাক দেখান" পথে যাইতেই ভালবাসিত। কে চড়ায় ঠেকিয়া মরিতে যায়। বস্তুত পরে যখন বাষ্পীয়-পোত নব স্ক্রু-ষ্টিমার আবিষ্কার করা হইল, তখন এই প্রকার খালের সময় আসিয়াছে। এখন আর বাতাসের উপর নির্ভর করিতে হয় না, খুব বাতাস বহিলেও বড় ক্ষতি নাই, না বহিলেও ভালই। এখন লোকে উহার প্রয়োজনীয়তা বোঝে, কিন্তু তখন ততদূর বুঝিত না। তাই বুঝি বিধাতা তখন এই খালের সৃষ্টি করিয়াও করিলেন না। জগৎ জানিল, ঐ স্থানে কোন খাল হইতে পারে, সে তাহার পোতের উন্নতির দিকে মন দিল। যখন আশানুরূপ পোত নির্ম্মাণ কার্য্য সুসম্পন্ন হইল, তখন জগন্মাতা ভগবতী ফার্দ্দিনন্দ লেসেপসের (M. Fardinand Lesseps) হাতে এই কার্য্যভার অর্পণ করিলেন। তিনি এই কার্য্য তাঁহার কৃপায় সুসম্পন্ন করিলেন।

আমরা যখন সুয়েজে আসিলাম, তখন সুয়েজ খাল নির্ম্মাণ সম্বন্ধীয় বৃত্তান্ত জানিতে আমার বড় ইচ্ছা হইল। এই সামান্য খাল জগতের কত উপকার করিতেছে, বলা যায় না। পূর্ব্বে পশ্চিম ইউরোপ হইতে ভারতের পথ প্রায় ১১৩৭৯ মাইল ছিল। এখন এই [illegible] ৭৬২৮ মাইল মাত্র হইয়া [illegible] নির্জ্জীব জগতের প্রতি জাতিরই এত উপকার করিতেছে, সেই মহান পদার্থের বিষয় একটু জানিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? তোমরা সকলেই ইহার বিষয় বেশ জানিতে পার, কিন্তু তবুও একটু যদি বলি, তবে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। বিশেষতঃ এই অতি আশ্চর্য্য,সুকৌশলপূর্ণ,সুশোভন বিষয়কে একেবারে অনালোচিত রাখিয়া ফেলিয়া যাইতে ইচ্ছা হয় না।

মুসেঁ ফার্দ্দিনন্দ লেসেপ্সের ইচ্ছা ছিল, সুয়েজ যোজকের মধ্যে একটী প্রকাণ্ড খাল কাটেন। খাল সর্ব্বাপেক্ষা ছোট হওয়া চাই, এবং খুব সহজেই হওয়া চাই। এই স্থানে কয়েকটী উপত্যকার ন্যায় স্থান অর্থাৎ নিম্নভূমি আছে, সে গুলির সুযোগও তিনি লইবেন, মনস্থ করিলেন। মেনজালা হ্রদ, বালা হ্রদ, তিমসা হ্রদ এবং পূর্ব্বোক্ত তিক্ত বা কটু হ্রদ, এই গুলি তাঁহার অনেক শ্রমের লাঘব করিয়াছিল।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে জেনারেল চেস্‌নি ভূমধ্য ও লোহিত সাগরের মধ্যস্থ স্থান পর্য্যবেক্ষণ করেন এবং একটী প্রবন্ধ লেখেন। সেই সময়ে এই দুই সমুদ্রে ত্রিশ ফিটের তফাৎ জানা ছিল। সকলেই জানিত ভূমধ্য লোহিত সাগর হইতে ত্রিশ ফিট উপরে!! সেইজন্য চেস্‌নি সাহেবের খালের নকসাও সেই মতের উপরে স্থাপিত।

১৮৪৯ হইতে ১৮৫৪ খ্রীঃ পর্য্যন্ত মহাত্মা লেসেপ্স এই বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান বুদ্ধিকে প্রখরতর করিতে লাগিলেন। কি উপায়ে খাল কর্ত্তন করা যায়, কোথা হইতে কোন স্থান দিয়া কি প্রকারে যাইলে সর্ব্বাপেক্ষা সহজ উপায় হইবে, এই সমস্ত চিন্তা তাঁহার মানস পটকে একেবারে এই ছয় বৎসর ধরিয়া পূর্ণ করিয়া রহিল। তিনি বলেন,এমন সময়

নাই যখন তিনি এবিষয় চিন্তা করেন নাই। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ সৈয়দ পাশা মিশরের রাজপ্রতিনিধি হন। তিনি তৎক্ষণাৎই লেসেপ্সের জন্য লোক পাঠাইলেন। খাল কর্ত্তন বিষয়ে কোন বিশেষ কথার জন্য তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতে বলিলেন। এই সাক্ষাতেই এই মহৎ কার্য্যের আরম্ভ হইল। সেই বৎসরে, ৩০শে নবেম্বর, লেসেপ্সের উপর স্তার দিয়া কেংবো হইতে সহি করা এক কমিশন পত্র আসিল যে, তিনি "সাধারণ সুয়েজ খাল কোঃ" নামে এক কোম্পানি খুলিতে পারেন। * পর বৎসরে অর্থাৎ ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে মহাত্মা লেসেপ্স, রাজপ্রতিনিধির হইয়া, কতকগুলি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সাধারণ কার্য্যের অধ্যক্ষ বলিয়া অথবা সুশিক্ষিত ইঞ্জিনিয়ার বলিয়া, বিখ্যাত, গণ্য, মান্য, সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোককে একটা আন্তর্জাতিক সভা করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিলেন। সেখানে খাল সম্বন্ধীয় বিষয় আলোচিত হইবে, এই তাঁহার উদ্দেশ্য।

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দেরই ডিসেম্বর মাসে এবং পর বৎসরের জানুয়ারিতে মিশরে দুই কমিশন বসিল। কমিশন উভয় সমুদ্রের বন্দর সমূহকে এবং তন্মধ্যস্থ মরুকে বিশেষরূপে পরীক্ষা করিল। অনেক পরীক্ষা, অনুসন্ধান এবং চিন্তার পর স্থির হইল, ভূমধ্যের পেলুসিয়ম উপসাগর হইতে সুয়েজের নিকট দিয়া লোহিত সাগরের সহিত এক খাল কাটা যাইতে পারে, কিন্তু কি প্রকারে খাল কাটা যাইতে পারে, কোনটী সর্ব্বাপেক্ষা সহজ উপায়, এই বিষয়ে সকলের মত নানা প্রকার দাঁড়াইল। তিন জন ইংরাজ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, তাঁহাদের মত বড়ই মজার। তাঁহারা বলেন, খাল সমুদ্র হইতে ২৫ ফিট উচ্চে করা হউক। খালের এক দিকে পেলুসিয়ম উপসাগরে, অপর দিক লোহিত সাগরে মিশিবে। মধ্যে অনেক দরজা, কজা, চৌবাচ্চা করা হইবে। এবং আবশ্যক মত নীল নদ হইতে জল শোষণ করিয়া আনা হইবে! তাঁহাদের মতে এই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম উপায়। সহজ দিকে আর বুদ্ধি যায় না। অন্যান্য বিদেশী সভ্যগণ সমুদ্র হইতে ২৭ ফিট নিম্নে খাল কাটার কথা বলিলেন। তাঁহাদের মতে লক ইত্যাদির কিছুই দরকার নাই। সমুদ্র হইতে সমুদ্র যুক্ত হইবে, সমুদ্রই ইহাকে পরিপোষণ করিবে। খালের দুই দিকে দুই বন্দর করা হইবে।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে মহাসমারোহে পারিস মহানগরীতে এই কমিশনের এক অধিবেশন হয়। সেখানে ইংরাজ শিল্পীগণের মত একেবারে অগ্রাহ্য করা হয়। অপর উপায়েই খাল কর্ত্তন করা হইবে, স্থির হইল! কার্য্যবিবরণ প্রকাশিত হইল। কার্য্যবিবরণ প্রকাশিত হইবার পরে মহাত্মা লেসেপ্সকে আরও দুই বৎসর অর্থের জন্য অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। চারিদিকে অর্থ সাহায্যের জন্য সভা হইতে লাগিল। তিনি তাঁহার সমস্ত কার্য্যাদি শেষ করিয়া এই কার্য্যে লাগিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। অর্দ্ধেক অর্থ য়ুরোপ হইতে সংগৃহীত হয়। তন্মধ্যে ফরাসীগণই অধিক দান করে। অপরার্দ্ধ রাজপ্রতিনিধি পাশাই দেন। মহম্মদ সৈয়দ প্রতিজ্ঞা করেন, তিনি প্রয়োজন হইলে জোর করিয়া কুলি দিবেন। আরও কিছু সময় কাটিয়া গেল। অবশেষে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের পশ্চাদ্ভাগে এই মহাকার্য্য আরম্ভ হইল।

* "The Universal Suez Canal Co.

২৫,০০০ হাজার হইতে ৩০,০০০ হাজার পর্য্যন্ত লোক নিযুক্ত হইয়াছিল! প্রায় লোকই জোর করিয়া আনা হয়।

১৮৬২ খ্রীঃ পর্য্যন্ত কার্য্য যথানিয়মেই পরিচালিত হইল। কিন্তু তখন রাজপ্রতিনিধি মহম্মদ সৈয়দপাশা আন্তর্জাতিক মহামেলা দেখিতে আসেন। সেখানে সার জন হক্‌সাবের (Sir John Hawkshaw) তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাঁহাকে খালকার্য্য পরিদর্শন করিতে অনুরোধ করেন। পাশা এত টাকা খরচ করিতেছেন, নিজে নিন্দার ভাগী হইয়া এত হাজার লোককে জোর করিয়া কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, কার্য্য সফল না হইলে তাহার কত কষ্ট! তাঁহার এই বিষয় জানিতে একান্ত ইচ্ছা হইল। যাহাতে অন্য কোন কর্ম্মচারী হক্‌সাকে ঠকাইতে, ভুলাইতে না পারে, তাহার জন্য পাশা আদেশ করিলেন যে, হক্‌সার সহিত কোন কর্ম্মচারী যাইবে না। হক্‌সা আর কিছু করুন বা নাই করুন, তিনি খাল কাটার বিরুদ্ধে কয়েকটী কথা লিখিয়া পাঠাইলেন। কি কি বিষয় তিনি বলিলেন, তাহা এখানে উল্লেখ অনাবশ্যক, এই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, যে আপত্তিগুলি তিনি করিয়াছিলেন, সেগুলির কোনটীই আজ কাল ঘটিতেছে না, ঘটেও নাই।

সৈয়দপাশা তাঁহার রিপোর্ট পাইবার পূর্ব্বেই মৃত্যু মুখে পতিত হন। তাঁহার ভ্রাতা ইস্‌মাইল তাঁহার পরে রাজপ্রতিনিধি হন। ইস্‌মাইল হক্‌সার বিবরণ পাইয়া বড়ই দুঃখিত হইলেন। যখন খাল কর্ত্তন বিষয়ে সম্পূর্ণ আশা নাই, ইস্‌মাইল জানিতে পারিলেন, তিনি তাঁহার প্রজাবর্গকে বৃথা জোর করিয়া কার্য্যে নিযুক্ত করিতে অস্বীকৃত হইলেন। ইহা ত অস্বাভাবিক নয়। কাজ বন্ধ হইয়া গেল। সমস্ত লোকই প্রায় চলিয়া গেল। এই সময়ে কি করা উচিত, লেসেপ্স ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি এই ব্যাপার ফরাসী সম্রাটের নিকট জ্ঞাপন করিলেন। সম্রাট দেখিলেন, কাজটা হয় না, তাই, জোর করিয়া কাজ করান তুলিয়া লওয়ায় অথবা দেশী কুলি না পাওয়ায় খাল-কোম্পানীর যে ক্ষতি হইবে, তাহার পূরণ স্বরূপ সম্রাট দয়া করিয়া ৩৮০,০০০০ হাজারপাউণ্ড তাহাদিগকে দিতে রাজপ্রতিনিধিকে আদেশ করিলেন। এই টাকা দ্বারা বহুকষ্টে নানা প্রকার কল কব্জা নানা স্থান হইতে ক্রয় করিয়া কাজ চালান হইতে লাগিল। বহু শ্বেতকায় কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইল। অধিক অর্থ ব্যয় হইল, তাহাদের থাকিবার জন্য অনেক নূতন গৃহ সমস্ত প্রস্তুত করিতে হইল। সামান্য এক হক্‌সার কথার জোরে মহাত্মা লেসেপ্সের অনেক কষ্ট ভুগিতে হইল, কিন্তু তিনি অসীম সাহসের উপর নির্ভর করিয়া অমানুষিক অধ্যবসায় অবলম্বনে এই কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিছুই তাঁহাকে বিচলিত করিবার নয়। ভূমধ্যসাগর হইতে ১৮৬৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে জল বহিতে আরম্ভ করে। সেই বৎসরের জুলাই মাস হইতে লোহিত সমুদ্রের জল বহিতে আরম্ভ করিল। অক্টোবর মাসে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জাহাজ লোহিত হইতে ভূমধ্য এবং ভূমধ্য হইতে লোহিত সাগরে যাতায়াত করিতে থাকে। পূর্ব্বে যে হ্রদগুলির কথা বলিয়াছি, সেগুলি এখন হ্রদ হইয়াছে, পূর্ব্বে নিম্নভূমি, শুষ্ক মরুভূমি মাত্র ছিল। তিমসা হ্রদ ৫ মাইল লম্বা, কটু হ্রদদ্বয় প্রায় ২৩ মাইল। সমস্ত খালটী ৮৮ মাইল লম্বা, তাহার

মধ্যে ৬৬ মাইলই খাল কাটিতে হইয়াছে। ১৪ মাইল জলের নীচে কাটিতে হইয়াছে (dredging) এবং অপর আট মাইলে মাত্র কোন কাজেরই প্রয়োজন হয় নাই। যেখানে সেখানে ১৯৬ ফিট চওড়া ২৬ ফিট্ গভীর। তলায় বরাবরই ৭২ ফিট্ চওড়া।
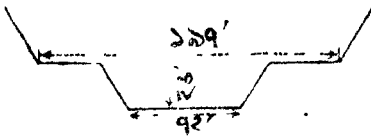
আর যেখানে হ্রদ, সেখানের পাড় আরও ঢালাও করা হইয়াছে ; কেন না, সেখানের বালি আসিয়া খালকে বুজাইতে পারে।
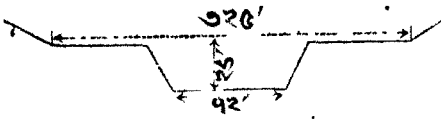
হ্রদের মধ্যে গভীরতম স্থান লৌহস্তম্ভ দ্বারা (Iron-beacons) দর্শিত হইয়াছে। এই চিহ্ন গুলি প্রায় ২৫০ ফিট তফাতে। শুনা যায়, নাকি ৮,০০,০০০০০কোটী ঘন বর্গ গজ মাটি খাল হইতে কাটিয়া বাহির করা হয়!!! পূর্ব্বে বলিয়াছি, কত লোক নিযুক্ত হইয়াছিল। তাহাদের পানার্থে পাম্প করিয়া নীল নদী হইতে জল আনা হইত ; আশে পাশে মিটা জলের নামও ছিল না! ৩০টী মাটী কাটা জাহাজ লাগিয়াছিল। মোটে নাকি২০,০০০০০০ কোটী পাউণ্ড খরচ হইয়াছিল। সকলেই, বোধ হয়, অবগত আছেন, এখন ১৬ টাকার কমে পাউণ্ড হয় না। সৈয়দ বন্দরে (Port-Said) এদুইটী (Break water) আছে। পশ্চিমেরটী ৬৯৪০ ফিট এবং পূর্ব্বেরটী ৬০২০ ফিট লম্বা। ১৮৮৩ খ্রীঃ ১০ ফ্রাঙ্ক, ৫০ সেণ্টিম (ইংরাজিতে ৮ সিলিং, ৪ পেন্স, ৩ ফার্দিং, আমাদের বাঙ্গালা মুদ্রায় প্রায় ছয় টাকা) প্রতি টনে দিতে হইত। তখন মাঝির (Pilot) জন্য ও মোটের উপর টন প্রতি ৭০ সেণ্টিম দিতে হইত। ৭০ সেণ্টিম আমাদের প্রায় ছয় আনা। ১৮৮৪ সালের ১লা জুন তারিখে মাঝির ভাড়া উঠিয়া গিয়াছে। এখন ১৮৮৫ খ্রীঃ হইতে টন প্রতি কেবল ৯ ফ্রাঙ্ক ৫ সেণ্টিম দিতে হয়। এতেও কি কম টাকা! প্রতি টনে ৫ টাকা করিয়া ধরিলে, ৫০০০ টাকার কম কখন পড়ে না।

এই ৮৮ মাইল যাইতে আমাদের ২২শে অক্টোবর বেলা একটা কি দুইটা হইতে ২৩শে শুক্রবার প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত লাগিল। তবেই বুঝিতে পার, জাহাজ কত আস্তে২ অগ্রসর হইতেছে! ঘণ্টায় পাঁচ মাইলের কিছু বেশী চলিতেছে। দুই পারে কেবল মরুভূমি দেখিতে লাগিলাম। রাত্রি হইলে আমাদের জাহাজের সম্মুখে এক প্রকাণ্ড বৈদ্যুতিক আলো জ্বালান হইল। সেই আলোকে খাল বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল। রাত্রিকে দিন করিতে পাশ্চাত্য জগত খুব মজবুত! আমরা আলোটী দেখিতে গেলাম। দেখিবার অনেক ছিল। আমি ও আমার বন্ধু নাটার অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দেখিলাম ; কিন্তু প্রায় একটা রাত্ হইয়াছে, দেখিবার সাধ না মিটিলেও, আমরা নিদ্রার তাড়নায় আর পারিলাম না। আমাদের ঘরে গেলাম। ঘরে গিয়া সেই ম্যাকফার্সনের সহিত মহা ঝগড়া হইল। নাটার বলে, আমাদের যখন ইচ্ছা আমরা ঘরে আসিব, তাতে আপনার বলিবার অধিকার কি আছে? যদি আপনি রুগ্ন হইতেন, ভিন্ন কথা। আমি চুপ করিয়া রহিলাম। পরদিন হইতে ম্যাকফার্সনের সহিত আলাপ

হুরহ হইয়া উঠিল। সাহেব রো আমাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হইয়াছে?' আমি কিছুই বলিতে চাহিলাম না। যাহা হউক, তিনি বলিলেন,"আমি যখন তোমার ভার লইয়াছি, তখন কোন মতেই ঐ প্রকার লোকের সহিত থাকিতে দিতে পারি না। আমি কমিসায়রের কাছে গিয়াছিলাম, তিনি সৈয়দ বন্দরের পরে তোমাদের এক ভিন্ন ঘর দিবেন।" পরে আমরা এক ভিন্ন ঘর পাই।

পরদিন প্রাতঃকালে আমরা সৈয়দবন্দরে পৌঁছিলাম। এখানে আমাদের জাহাজ আবার কয়লা লইবে। প্রাতঃকাল হইতেই কয়লা বোঝাই হইতে আরম্ভ হইল। আঃ এমন ময়লা যে বলা যায় না। সমস্ত কালীময় হইয়া গেল। প্রাতঃভোজ খাইয়া আমরা বন্দর দেখিতে যাইব মনস্থ করিলাম। প্রায় ১১ টার সময় আমাদের কালীময় জাহাজ ছাড়িয়া বন্দর দেখিতে গেলাম। আমরা পাঁচ জন। বন্ধু নাটার, মিসেস রো, মিষ্টার রো, ডাক্তার আলকক্ এবং আমি। আমরা প্রথমে কিং (Henry S. King) কোম্পানীর আপিষে গিয়া কাগজ পত্র পড়িলাম। তারপর সহর দেখিতে গেলাম। এখানে দেখিবার বড় কিছুই নাই। তবে দোকান ইত্যাদি খুব ভাল। এসিয়া বিভাগের প্রায় সমস্ত জিনিস এইখানে পাওয়া যায়। এই সমস্ত দোকান দেখিয়া আমরা আমাদের এজেন্ট কুকের বাড়ীতে গেলাম। সেখানে কিছুক্ষণ কাটাইয়া, আমরা জাহাজে ফিরিব মনে করিলাম। পথিমধ্যে একটা নাপিতের দোকান দেখিয়া মিঃ রো আমার সুন্দর দাড়ী গোঁফ কামাইয়া ফেলিতে বলিলেন। তোমরা যদি আমার এখনকার ছবি দেখ, বোধ হয়, চিনিতে পারিবে না। যাহা হউক, তিনি নিজের পয়সায় আমার সাধের জিনিসকে বিদায় দিতে বাধ্য করিলেন। লণ্ডনে আসিয়া করিতেই হইত, তাঁহার কৃপায় আমার পূর্ব্বেই সে কাজ করা হইয়া গেল। এখানকার একটা কথা বলি। এইস্থান বড় প্রলোভনময়। মিঃ রো যদি আমার সহিত না থাকিতেন, নিশ্চয় আমাকে বিপদে পড়িতে হইত। প্রতি দোকানে এমন অশ্লীল সমস্ত ছায়ালিপি (Photograph) চিত্র আছে যে, অত্যন্ত সাধু ব্যক্তিও অবিচলিত থাকিতে পারিবেন না। আমি আগেই মিঃ রো দ্বারা সতর্কিত হইয়াছিলাম এবং অনেক দোকানদার আমাকে সেই সমস্ত ছবি দেখিতে ডাকিলেও আমি যাই নাই। তাহাদের এক গোপনীয় ঘর আছে, যেখানে দর্শকগণ ঐ সমস্ত অশ্লীল, কদর্য্য এবং অবশ্যই দৃষ্টির অযোগ্য ছবিগুলি দেখিতে যায়।

আমাদের জাহাজ সেই দিনই সন্ধ্যার সময় সৈয়দবন্দর পরিত্যাগ করে। আমরা এখন পাশ্চাত্য জগতে। এখন আমরা আর লোহিত সাগরে নাই, ভূমধ্যে। পোর্ট সৈয়দ ছাড়ি আমরা ২৩শে অক্টোবর, শুক্রবার। আমরা মারসেলে (Marseilles) পৌঁছি ২৮শে অক্টোবর, দ্বিপ্রহরের পরে। এই পাঁচদিন আমাদের ভূমধ্যের মধ্যে বাস করিতে হইয়াছিল। আমরা ভূমধ্যের সুন্দর সুশোভন মনোহর দৃশ্য দেখিতে ২ চলিলাম। আমরা কেণ্ডিয়া দ্বীপের পার্শ্ব দিয়া সিসিলি এবং ইতালীর মধ্যস্থ মেসিনা যোজকের ভিতর দিয়া, বীর নেপোলিয়নের কীর্ত্তি ধরা কর্সিকার উত্তর দিয়া মারসেলে পৌঁছিলাম।

আমরা আগ্নেয় গিরি এট্না, এবং মনোরম মেসিনা যোজক দেখিয়াছি। ইহা ভিন্ন বড় বেশী একটা কিছু এই কয় দিনে দেখি নাই,—তবে মধ্যে ২ আমরা অনেক জলের মধ্যে আলোক মঞ্চের ন্যায় বিশাল প্রস্তর খণ্ড দেখিয়াছি। সে দৃশ্য বড় সুন্দর। আর এক কথা। আমি, আমি কেন, আমরা সকলেই, এতদিন আফ্রিকার মরুভূমির উত্তপ্ত বায়ুতে দগ্ধ হইতেছিলাম। কিন্তু এখন আর সে সমস্ত কিছুই নাই। দগ্ধ হওয়া দূরে থাক, যতই আমাদের যাত্রা শেষ হইয়া আসিতেছে, ততই যেন অধিকতর শীতলতা বোধ করিতে লাগিলাম। অবশেষে মারসেলের কাছে আসিতে আসিতে প্রায় জমিয়া যাইবার গোছ হইয়া উঠিল।

আমরা মারসেলে পৌঁছিলে, আমাদের বিভিন্ন এজেণ্টের ইণ্টারপ্রেটার আসিয়া আমাদের জিনিস পত্রের ভার লইল। আমরা সকলেই আমাদের জাহাজের বিল শোধ করিয়া জাহাজ ত্যাগ করিবার জন্য উৎসুক হইলাম? জাহাজের বিল আবার কি? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জাহাজ কোম্পানী কোন লিমনেড কিম্বা সোডা ওয়াটার দেয় না। আরও খাবার সময় ভিন্ন কোন মদ খাইলেই তাহার পূর্ণ দাম দিয়া পান করিতে হয়। সমুদ্রে একটু অসুখ হইলেই লেমনেড সকলের সহায়। এই উপায়ে জাহাজ কোম্পানী বেশ পয়সা উপার্জ্জন করে। তোমরা ভাবিতে পার, খাইবার সময় ভিন্ন কেহ মদ খায় না। কিন্তু আমি দেখিলাম, পাশ্চাত্য জগত মদের দাস, সকলে না হইলেও অনেকেই! আমাদের জাহাজে একজন ইংরাজ ছিল, জানিলাম, সে ব্যবসায়ে দর্জ্জি। আফ্রাকে ব্যবসায়ের জন্য গিয়াছিল। কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া ক্ষুণ্ণমনে গৃহে ফিরিতেছে। সেই ভদ্রলোক রোজ বাবুগিরি করিয়া এক বোতল দু বোতল সুরা দেবীর সেবা করেন। নেশার চোটে কি যে না করেন, বলিতে পারি না। রোজই তবু পান করা চাই। জ্ঞান হইলে একটু লজ্জা হয় বটে, কিন্তু আবার পানের সময় হইলেই, আরম্ভ করেন। আহারের সহিত যাহা দেওয়া হয়, তাহাতে তাঁহার কুলায় না, তিনি আবার অন্য সময়ে পান করেন। বেশ বাপু, টাকা থাকে, কর, তবুও সয়। এ ব্যক্তির টাকা নাই, তবু পান করা ছাড়িবেন না। মারসেলে আসিলে তাঁহার মদের বিল প্রায় পাঁচ পাউণ্ড হইয়াছে! নিজের হাতে এক পয়সাও নাই!!! একি ব্যাপার। এখন তাঁহার ব্যাগ, জিনিস পত্র সমস্তই বিক্রয় করিতে লইয়া যাইতে চায়, পূর্ব্বে মনে ছিল না। আমার বন্ধু সহৃদয় নাটার তাহার সমস্ত বিল পরিশোধ করিলেন। এই এক ঘটনায় দুই দিক দেখা যায়, জগতে মদ কি সর্ব্বনাশ করিতেছে, এবং পাশ্চাত্য জগত পরসেবায়, দানপরায়ণতায় কতদূর অগ্রসর। নিশ্চয় জানি, বন্ধু নাটার তাহার নিকট হইতে সে টাকা ফিরিয়া পাইবার আশায় দেন নাই। সেই লোকের সহিত নাটারের জাহাজের আলাপ মাত্র, তাহার সম্বন্ধে কোন বিষয় জানা নাই। এই অবস্থায় আমাদের দেশের কোন ব্যক্তি কি, ৫ পাউণ্ড (প্রায় ৮০৲ টাকা) ত দূরের কথা, একটী টাকা দান করিতে অগ্রসর হইতেন? যখন ইহারা বোঝে যে, এই লোক যথার্থই প্রয়োজনে পড়িয়াছে, তাহাকে সর্ব্বদাই প্রাণ পণে সাহায্য করিতে প্রস্তুত।

আমাদের এজেণ্ট জিনিস পত্র ক[illegible]

কাষ্টম হাউসে লইয়া গেল বটে, কিন্তু আমাদের জিনিস পরীক্ষা করিতে কেহই আসে না। খোসামোদ করিতে পারিলে হয়। তবে এখানে খোসামোদ সর্ব্বদা খাটে না। আসল জিনিস না দিতে পারিলে সহজে কার্য্যসিদ্ধি হইবার নয়। তবে কি না, কখনও ঘুস দেওয়া অভ্যাস নাই, উহাকে পাপ বলিয়াও মনে করি, আর ঘুস দিবারও তেমন ক্ষমতা নাই, কমে ত হইবে না, কাজেই অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল। অবশেষে এক মহাত্মা আসিয়া আমার জিনিস পত্র হাঁটকাইয়া এক খড়ির দাগ মারিয়া চলিয়া গেলেন। আমাকে এখন আর ঘণ্টা খানেক ধরিয়া গুছাইতে হইল। আমার জিনিস কুকের এজেণ্টের হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। সহর দেখিতে গেলাম। শীতে প্রাণ যায়, সহর দেখিব কি ছাই। প্রথমেই কুকের আপিসে গেলাম। সেখানে গিয়া কাগজপত্র পড়িব আশা ছিল, কিন্তু সমস্তই ফরাসী ভাষায়। মেসিলা নামক কোন ব্যক্তি এই স্থানকে স্থাপন করেন বলিয়া নাকি নাম মারসেলে হইয়াছিল। ইহা অত্যন্ত পুরাতন সহর। খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব প্রায় ৬০০ বৎসরে এই স্থান স্থাপিত হয়। এখন ইহাই ফ্রান্সের সর্ব্বোত্তম বন্দর। প্রকাণ্ড ডক, প্রচুর গুদাম ঘর, এবং বন্দর সুন্দর দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত। এখানে দেখিবার আর বেশী কিছু থাক আর নাই থাক, আমার স্থানটী বেশ লাগিল। সমস্ত সহরটাই পাহাড় কাটিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে। এখানে অনেক বাড়ী দেখিলাম, যাহার একদিকের দেয়াল পাহাড়। Chateau d'if বলিয়া সমুদ্রের মাঝখানে একটা দেখিবার যোগ্য পাহাড় আছে। আমরা পূর্ব্বে এই প্রকার পাহাড় অনেক দেখিয়াছি বটে, কিন্তু এটী লোকালয়ের, মারসেলের এত নিকটে বলিয়াই এত বিখ্যাত হইয়াছে। এখানে মিরাবো প্রভৃতি অনেক রাজবন্দী কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু আমি এই স্থানকে বেশী জানি, আলেকজাণ্ডার ডুমোর বিখ্যাত মন্‌টিক্রষ্টোর (Monte Cristo) সেই আশ্চর্য্য ভয়াবহ ঘটনাবলীর দৃশ্য স্থান বলিয়া। ইহা ভিন্ন এখানে দেখিবার যাদুঘর ইত্যাদি অন্য কিছুই বড় নাই। আমরা এই স্থানটীর গির্জাটী দেখিতে গেলাম। এটা একটা দেখিবার জিনিস। একটি পাহাড়ের উপর নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। সেইখানে বৈদ্যুতিক ট্রাম গাড়ীতে উঠিতে হয়। ট্রাম গাড়ী বলিলে তোমরা বুঝিবে, মাটির উপর দিয়া রেল গিয়াছে, এ তাহা নহে। সেই অত্যুচ্চ স্থান হইতে নীচ পর্য্যন্ত দুই মোটা মোটা তার আসিয়াছে, সেই তারের গাত্র ধরিয়া এই গাড়ী গমনাগমন করে। গাড়ী শূন্যের মধ্য দিয়া যায়!!

আমরা এই সমস্ত দেখিয়া অবশেষে কোন হোটেলে গিয়া আহার করিলাম। ইতিমধ্যে আমরা ছাড়াছাড়ি হইয়া গিয়াছি। মিঃ এবং মিসেস রো কখন কোথায় গিয়াছেন, আমরা দেখি নাই। ডাঃ আলককের সহিত সেই যে ছাড়াছাড়ি, আজও দেখা হয় নাই। তবু আমরা প্রায় আটজন। সেই দর্জি ভদ্রলোকও আমাদের সঙ্গে আছেন। তাঁহার খাইবার খরচ আমাদের দিতে হইল। আমরা রাত্রে কোথায় আর যাইব, পাছে পথ হারাইয়া ফেলি, তাই পূর্ব্ব হইতেই ষ্টেসনে গিয়া বসিয়া রহিলাম। ট্রেন ছাড়িবে ১০টার সময়, কিন্তু আমরা ৭টা হইতে ষ্টেসনে বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতে লাগিলাম। অনেক দিন এ সুখ পাওয়া হয় নাই। প্রায়

ময়টার সময় আমাদের এজেন্ট জিনিস পত্র লইয়া উপস্থিত হইলেন। আমরা টিকিট করিতে গেলাম। আমাদের দেশে মুটে আনা দুই পাইলে একেবারে রাজা হয়। এখানে মুটে রাঙ্গা মুখ। বোধ হয়; আমাদের অপেক্ষা বেশী উপায় করে। তাহাদের সামান্যে হইবার নয়। ফ্রান্সের ট্রেণ সমূহের ভাড়া অত্যন্ত বেশী। মোটের জন্য প্রতি ২২ পাউণ্ডে (১১ সেরের কম) ৭ফ্রাঙ্ক, ৯৫ সেণ্টিম, আমাদের টাকার প্রায় ৪৸০। আমাকে আমার এই এক বাক্সের জন্য প্রায় ১৫ সিলিং দিতে হইয়াছিল। আমরা ট্রেনে উঠিয়া চলিলাম আটজন। সকলে মিলিয়া আমোদে চলিলাম। প্রাতঃকালে প্রায় ৬॥ টার সময় আমরা লিয়নে পৌঁছিলাম। এখানে গাড়ী পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। এই ভোরে শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে আমরা জিনিস পত্র লইয়া গাড়ী পরিবর্ত্তন করিলাম। কেমনে সে দারুণ শীত বুঝাইব, বলিতে পারি না। আমি পূর্ব্বে কখনও এত শীত ভোগ করি নাই। বরফ হাতে করিয়া থাকিলে যে প্রকার বোধ হয়, আমার সেই প্রকার লাগিতে লাগিল। এত কাপড় থাকা সত্বেও আমার গা ফাটিয়া রক্ত বাহির হইতে লাগিল। আমার সে কষ্ট বলিবার নয়। ৭টা ১০ মিনিটে গাড়ী ছাড়িল। গত রাত্রে আমরা কিরূপ স্থান দিয়া আসিয়াছি, কিছুই জানি না। অন্ধকারে সমস্তই ঢাকা ছিল। প্রাতঃকালে ফ্রান্সের অনির্ব্বচনীয় শোভা দেখিতে দেখিতে আমরা চলিলাম, ট্রেন এত বেগে চলে যে, দেখা বড়ই দুষ্কর। আমাদের ক্ষুধানল জ্বলিয়াছে, তাই এই সমস্ত তত বেশী উপভোগ করিতে পারিতেছি না। তবুও ফ্রান্সের সেই দ্রাক্ষালতার ক্ষেত, সেই ঘন শ্যাম বর্ণের দুর্ব্বাদল সুশোভিত পর্ব্বতমালা, সেই সমস্ত মধুর বীণাধ্বনির ন্যায় শব্দায়মান ঝরণা, আহা! সেই মধু মধু চাতকের সুমধুর সঙ্গীত, দূরে ঘনকুয়াশা রাশির মধ্যে বীর পরাক্রান্ত সূর্য্যের আরক্তিম লুক্কায়িত বদন মণ্ডল, মনোমুগ্ধকর সেই সমস্ত দৃশ্য, জীবনে আর দেখি বা না-ই দেখি, হৃদয়ে একেবারে ছায়াচিত্রের ন্যায় অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে, কখনও মুছিবে না। আমার সাধ্য কি সে প্রকৃতির খেলাকে তোমাদের নিকট জ্ঞাপন করি। আবার এক এক স্থানে স্বভাবের সহিত মানব-কারুকার্য্যের যোগ, সৌন্দর্য্যকে কত শত গুণ বাড়াইয়া দিয়াছে। মানুষ এক জিনিস করিয়াছে, প্রকৃতি আসিয়া তাহার সুষমা হরিৎবর্ণের বৃক্ষলতাদি দ্বারা সেই পদার্থকে সুশোভিত ও মনোরম করিয়াছে, করিতেছে। ফ্রান্স প্রায়ই পর্ব্বতময়। আমাদের ট্রেণ কখনও নিম্নে, কত শত হস্ত দূরে সমস্ত লোকালয় ফেলিয়া তাহাদের উপর দিয়া দারুণ গর্জ্জনে ছুটিয়া চলিল। আবার কখন কখন পর্ব্বত ভেদ করিয়া সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, দিবা দ্বিপ্রহরকে ঘণ্টা দুই একের জন্য অন্ধকার রাত্রি দ্বিপ্রহর করিয়া মানবজাতির কৌশল, তাহাদের লীলা এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে মানবপিতা ভগবানের কৃপা প্রকাশ করিতে লাগিল। এইরূপে নানা স্থানে নানা ভাব, নানা স্থানে নানা প্রকার প্রকৃতির লীলাময় খেলা দেখিতে দেখিতে আমরা হৃদয় মনে সুস্থ হইতে লাগিলাম। কিন্তু এ গুলি মস্তিষ্কের ক্ষুধা, এগুলি প্রাণের ক্ষুধা নিবারণে পটু, জঠরানল নিবারণ করা দূরে যাক্, আরো উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিল। আমরা ডিজন নামক (Dijon) স্থানে

আমরা ব্রেকফাষ্ট করিলাম। আমার এখনও কাঁটা চামচায় খাওয়া তত অভ্যাস হয় নাই। অন্ততঃ খাইতে পারিলেও হাতে খাওয়ার মত শীঘ্র হয় না। এখানে ট্রেণ আহারের জন্য ১০ মিনিট থামিবে। অর্দ্ধেক খাওয়া না হইতে হইতেই ঘণ্টা বাজিয়া গেল। দৌড়িয়া গাড়ী ধরিলাম। আর কিছু না পারিয়া হোটেলে যে রুটি খানা দিয়াছিল সেখানিকে পকেটে করিয়া লইয়া আসিলাম। তাহা খাইয়াই ক্ষুধানল নিবাইলাম। কি দুর্দ্দশা।

এখন আমরা যতই উত্তরে যাইতেছি, যতই দিবা শেষ হইয়া আসিতেছে, ততই শীতের তীব্রতা বৃদ্ধি হইতেছে। কম্বল ইত্যাদি দ্বারা কোন রকমে জড়াইয়া প্রাণ বাঁচাইলাম। আমাদের ট্রেণ প্যারিসে ৫টা ৪৩ মিনিটে পৌছিল। পাশ্চাত্য জগতের স্বাভাবিক নীত্যনুসারেই সূর্য্যদেব (সূর্য্যদেব বলিকেন, তাঁহাকে ত এ মুল্লুকে দেখাই যায় না) দিবা-বিদায় লইয়াছেন। এখনই রাত্রি হইয়াছে। আমরা এখানে আমাদের ডিনার খাইয়া আবার ট্রেণ পরিবর্ত্তন করিলাম। প্যারিসে দুইটী ষ্টেসন, একটি দক্ষিণে, অপরটি উত্তরে। দক্ষিণ ষ্টেসন হইতে উত্তর ষ্টেসনে যাইতে আমাদের প্রায় এক ঘণ্টা লাগিল। তবেই বুঝিতেছ, কত বড় সহর। সেখানে আবার ট্রেণ পরিবর্ত্তন করিবার কথা ছিল। কিন্তু ট্রেণ পরিবর্ত্তন করিয়া করিয়া আমাদের একেবারে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে! আমরা কোন কর্ম্মচারীর নিকটে গেলাম, তাঁহার নিকটে আমাদের কথা বলিলাম। তিনি একটু ইংরাজি জানেন, সেইজন্য আমাদের গাড়ী খানা ক্যালের ট্রেণের সহিত যোগ করিয়া দিলেন। আমরা জিনিস পত্র লইয়া ছুটাছুটি হইতে একেবারে বাঁচিয়া গেলাম।

ক্যালে হইতে রাত্রি ১॥ টার সময় জাহাজ ছাড়িবে, তাই আমরা আর ঘুমাইলাম না। শীতে আমরা সকলেই কষ্ট পাইতেছি, বিশেষতঃ আমি। সমস্ত রাত্রি এই ভাবে উঠা নামা করিতে হইবে, এই ভাবিয়া আমার প্রাণ উড়িয়া গেল! যাহা হউক, রাত্র মধ্য রাত্রে আমরা ক্যালে পৌছিলাম। শীতে এক পা বাড়াইতে পারিতেছি না। তাহা হইলে কি হয়, যাইতেই হইবে, আমাদের জন্যে জাহাজ আর দাঁড়াইবে না। জাহাজের মধ্যে ক্যাবিনে গেলাম। সেখানে একটু গরম। বড় ক্লান্ত হইয়াছিলাম, সেইখানে একটু ঘুমাইলাম। বেশীক্ষণ আর ঘুম হইল না। অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে আমরা ডোভারে (Dover) এ আসিলাম, তখন দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। আবার জিনিস পত্র লইয়া গাড়ীতে উঠিতে যাইতেছি, পুলিস বাধা দিল, কাষ্টম হাউসে যাইয়া পূর্ব্বে পাশ আনিতে হইবে। এই রাত্রে জিনিস পত্র লইয়া কাষ্টম হাউসে গিয়া মহাত্মাদের জন্য দাঁড়াইয়া থাকা কেমন কষ্ট, সকলেই বুঝিতে পারেন। আমার মুটের পয়সা সব সময়ে দিবার সুবিধা নাই এবং দিতেও পারি নাই। আমার বাক্স বহিয়া বহিয়া হাত ব্যথা হইয়াছে। তাতে আবার কাষ্টম অফিসার আসিয়া সমস্ত জিনিস ঘাটাঘাটি করিয়া লণ্ডভণ্ড করিয়া দিল। আমি আর কি বলিব। বিলাত আসার সাধ বেশ মিটিয়াছে, আমার চক্ষে জল আসিল, হায়! এই দারুণ অবস্থায় ভগবান আমাকে কেন ফেলিলেন। বন্ধু নাটার আমাকে সর্ব্বদাই সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়াছিলেন। উভয়েই পরস্পরের জিনিস পত্র লইয়াছি। যাহা হউক, যাত্রা প্রায় শেষ

হইয়া আসিয়াছে। মনে এই আশা জাগাইয়া আমাদের জিনিস গুছাইয়া আমরা আমার ট্রেণে উঠিলাম। এই ট্রেণে প্রাতঃকালে ভোরে ছয়টার সময় লণ্ডনে পৌছিলাম। এখানে পুনরায় কাষ্টম হাউসে গিয়া আমরা আমাদের জিনিস পাশ করিয়া আনিলাম। এখনও একখানি গাড়ী আসে নাই। আমার জন্য কোন লোকজন আসেন নাই। আমিও টেলিগ্রাফ করিবার সময় পাই নাই। রাত্রে, কোথায় টেলিগ্রাফ আপিস, কে জানে! বন্ধু নাটারের নিকট হইতে বিদায় লইয়া, তাঁহার অযাচিত সাহায্য করার জন্য ধন্যবাদ দিয়া এক মুটে করিলাম। সে আমার জিনিসগুলি এক ক্যাবের (গাড়ী) উপর চাপাইয়া দিল। আমি গাড়োয়ানকে আমার বাসার ঠিকানায় হাঁকাইতে বলিলাম। সহজেই আমার বাসায় পৌছিলাম। আমার বন্ধুগণ আমাকে হঠাৎ দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্য ও আনন্দিত হইলেন।

৪ঠা, পৌষ ১৩০৩ }
শুক্রবার। }

স্নেহের সেবক—
প্রভাত।

দার্শনিক মতভেদ। (২)

হিন্দুদর্শনে যে সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, আমরা দেখাইয়াছি, তাহা বিভিন্ন জ্ঞানাধিকারীর নিমিত্ত। এই জ্ঞানাধিকারিগণকে হিন্দুদর্শন তিন প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন—(১) দ্বৈতজ্ঞানী, (২) দ্বৈতাদ্বৈতজ্ঞানী এবং (৩) অদ্বৈতজ্ঞানী। যতদিন ঐন্দ্রিয়িক বিষয়জ্ঞান প্রবল, ততদিন আমরা অদ্বৈতজ্ঞানে উপনীত হইতে পারি না। যতদিন ভেদজ্ঞান (Relative knowledge) বর্ত্তমান, ততদিন অভেদ অপরিচ্ছিন্ন নির্ম্মল (Absolute) জ্ঞান অসম্ভব। সাংখ্যবাদিগণ এই কথাই প্রতিপাদন করিয়াছেন। কাপিল সাংখ্যে আমরা যে অদ্বৈতবাদের নিরাস দেখিতে পাই, তাহার কারণ আর কিছুই নহে, কপিল দেখাইয়াছেন যে, দ্বৈতজ্ঞানীর অনুমান-তর্কে অদ্বৈতবাদ সিদ্ধ নহে। যুক্তি ও অনুমানে যেমন সগুণ ব্রহ্মবাদ অসিদ্ধ, অদ্বৈতবাদ তেমনি অসিদ্ধ। অনুমানে যাহা অর্জ্জিত নহে, তাহা অনুমানে পরিমেয় নহে। যাঁহারা অনুমান দ্বারা অদ্বৈতবাদ স্থাপন করিতে যাইবেন, তাঁহারা নিশ্চয় বিফল হইবেন। শঙ্কর তাই কেবল শ্রুতির শাসন দ্বারা অদ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়াছেন। অনুমানে যদি অদ্বৈতবাদ সিদ্ধ হইত, তবে সবাই বিনা প্রয়াসে অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানে উপনীত হইতে পারিতেন; তবে কষ্টসাধ্য যোগপথের আবশ্যকতা ছিল না। সামান্য অনুমান ও তর্কে অখণ্ড অদ্বৈতজ্ঞান অসিদ্ধ বলিয়া তজ্জন্য স্বতন্ত্র পথ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সেই স্বতন্ত্র পথ পুরুষার্থ সাধন। এই পুরুষার্থ সাধন দ্বারা বিবেকোদয় হইলে আত্মসাক্ষাৎকার ঘটে। তৎপূর্ব্বে অদ্বৈতজ্ঞান অসম্ভব। আত্মসাক্ষাৎকার ঘটিলে তবে সমস্তই ব্রহ্মময় হইয়া যায়। তখন সমস্তই "একমেবাদ্বিতীয়ং," সুতরাং আত্মজ্ঞান ভিন্ন যখন অদ্বৈতজ্ঞান অসম্ভব, তখন অনুমান দ্বারা সেই অদ্বৈতবাদ স্থাপন করা বৃথা। সাংখ্যশাস্ত্রে যখন আত্মজ্ঞানই প্রতিপাদ্য, তখন অনুমান দ্বারা অদ্বৈতবাদের নিরসন করিয়া সেই অদ্বৈতজ্ঞানের প্রকৃত পন্থা নির্দ্দেশ করাই যে সেই

উদ্দেশ্য-সাধক বলিতে হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তাই বিজ্ঞানভিক্ষু বলিতেছেন—

"যে শাস্ত্রের যে বিষয় মুখ্য উদ্দেশ্য, সেই শাস্ত্রে সেই বিষয় বর্ণিত হইলেই, সে শাস্ত্রে সপ্রমাণ ও অবিরুদ্ধ বলিতে হইবে। অংশত কোন নিন্দিত বিষয় থাকিলে শাস্ত্রকে নিন্দিত বলা যায় না। যদি বল সাংখ্য শাস্ত্রে বহুপুরুষ স্বীকৃত আছে, সেই অংশ অবশ্য নিন্দনীয়। সে অংশ নিন্দনীয় নহে। * * * যেহেতু জীবের ইতর-বিজ্ঞানই সাংখ্যের প্রধান প্রয়োজন। সেই প্রয়োজনসিদ্ধি বা অর্থের বাধ হইলে তাহাকে অপ্রামাণ্য বলা যাইতে পারে। নানাবিধ শ্রুতি স্মৃতিতে আত্মার নানাত্ব এবং একত্ব বর্ণিত হইয়াছে। আত্মার নানাত্ব ব্যবহারিক এবং একত্ব পারমার্থিক। সুতরাং ব্যবহারিক এবং পারমার্থিক জ্ঞানে সেই নানাত্ব এবং একত্ব উভয়ই সিদ্ধ ও অবিরুদ্ধ। ব্যবহারিক জ্ঞানে নানাত্ব প্রতিপাদিত হইলেও প্রকৃত পক্ষে আত্মার একত্বই সুসিদ্ধান্ত। এ সকল বিষয় আমরা ব্রহ্মমীমাংসাতে সবিশেষ বর্ণন করিয়াছি।"

বিজ্ঞানাচার্য্য যেমন সাংখ্যের ভাষ্যকার, তেমনি ব্রহ্মসূত্রের মাধবভাষ্য ব্রহ্মমীমাংসারও বৃত্তিকার। ব্রহ্মমীমাংসায় পূর্ণপ্রজ্ঞ মাধ্বাচার্য্য দ্বৈতবাদই প্রতিপাদন করিয়াছেন; কিন্তু দ্বৈতবাদ প্রতিপাদন করিয়াছেন বলিয়া নির্গুণ ব্রহ্মবাদকে একেবারে বিরুদ্ধ বলেন নাই। সেই নির্গুণ ব্রহ্মবাদ তাঁহার বিষয়ান্তর্গত নহে। যতদিন না জীবের ভেদজ্ঞান বিনষ্ট হয়, ততদিন সে দ্বৈতজ্ঞানী। এই ভেদজ্ঞান যে একেবারে তিরোহিত হয়, তাহাও সম্ভাবিত নহে। জীব যত ধ্যানপরায়ণ হয়, ততই তাহার সূক্ষ্মবিষয়ে মনঃসংযোগ হয়। স্থূল ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানের যতই সূক্ষ্মতা সম্পাদিত হয়, ততই অদ্বৈতজ্ঞানের আভাস অন্তরে উদিত হয়। সাদিজ্ঞান হইতে অনাদির আভাস, সসীম হইতে অসীমের আভাস, অনিত্য হইতে নিত্যের আভাস, বহু হইতে একের আভাস, পরিবর্ত্তনশীল জগৎ ও জ্ঞেয় হইতে একমাত্র নিত্য, অপরিবর্ত্তনীয়, অজ্ঞেয়ের আভাস, অনিত্য নামরূপ হইতে অনাম ও অরূপের আভাস প্রভৃতি যত অদ্বৈতের আভাস অন্তরে সঞ্চারিত হইতে থাকে, এবং যতই সেই আভাস অন্তরে প্রগাঢ়তা লাভ করে, ততই ভেদজ্ঞান ক্রমে সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হইয়া পরম সূক্ষ্ম আত্মপদার্থে চিত্ত সন্নিবেশিত হইতে থাকে। স্থূল হইতে এইরূপ সূক্ষ্মজ্ঞানের আবির্ভাব এবং প্রগাঢ় সংস্কার জন্মিলে যে অভেদের আভাস অধ্যাসিত হয়, তাহাই ক্রমশঃ ভেদ প্রতিষেধক হইয়া উঠে। ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানের সীমা এই পর্য্যন্ত। ইউরোপীয় সূক্ষ্মদর্শনেরও এই সীমা। এই দ্বৈতাদ্বৈত বাদই ভেদাভেদজ্ঞান।

আমাদের হিন্দুতত্ত্বদর্শী এই ভেদাভেদ জ্ঞান পর্য্যন্ত গিয়া জ্ঞানের পথে একেবারে থামিয়া যান নাই; তিনি আরও অগ্রসর হইয়াছিলেন। যে পথ দিয়া এই সীমা অতিক্রম করিয়াছিলেন, তাহাই সমাধিপথ। ইউরোপীয় তত্ত্বদর্শিগণ এপথে মূলেই আসিতে চাহেন না; আসিতে চাহেন না কি, এ পথের এখনও পর্য্যন্ত অনুসন্ধান পান নাই। যাহা কিছু শুনিয়াছেন, তাহাই শুনিয়া হতবুদ্ধি হইয়া তাহাকে Mysticism বলিয়াছেন। শ্রুতিতে এই ত্রিবিধ জ্ঞানই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই ত্রিবিধ মতানুযায়ী রামানুজ শারীরিক সূত্রের ভাষ্য লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে তিনি উক্ত ত্রিবিধ মতই প্রদর্শন করিয়াছেন। অধিকারভেদে ঐ ত্রিবিধ পথই প্রামাণ্য। যাহারা নিতান্ত স্থূলদর্শী, তাহাদের নিমিত্ত দ্বৈতজ্ঞান, যাহারা ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানের সূক্ষ্মতা সাধনে তৎপর, তাহাদের নিমিত্ত দ্বৈতাদ্বৈত বা ভেদাভেদজ্ঞান এবং যাঁহারা নির্গুণ পর-

মাত্মদর্শনের আকাঙ্ক্ষী, তাঁহাদের জন্য অভেদ অদ্বৈতজ্ঞান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মহোপনিষদের মতানুসারে রামানুজ ভগবান বোধায়নাচার্য্যের ব্রহ্মসূত্রবৃত্তি আলোড়ন করিয়া শারীরিক মীমাংসার ভাষ্য প্রণয়ন পূর্ব্বক বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ বিবৃত করিয়াছেন।

ভেদ, ভেদাভেদ এবং অভেদ জ্ঞানানুসারে যেমন বেদান্তের বিবিধ প্রস্থানের উৎপত্তি, পাশুপত দার্শনিকগণও তেমনি দ্বৈত এবং অদ্বৈত প্রস্থানে বিভক্ত হইয়াছে। মাধবাচার্য্য যাহা শৈবদর্শন নামে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, সেই মত দ্বৈতপ্রস্থান, প্রত্যভিজ্ঞা এবং রসেশ্বর দর্শন অদ্বৈতপ্রস্থান।

দ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত এবং অদ্বৈতজ্ঞান অধম, মধ্যম এবং উত্তম অধিকারীর নিমিত্ত। দ্বৈত জ্ঞানীর জ্ঞানালোচনা যত সূক্ষ্মতায় আইসে, ততই তিনি দ্বৈতাদ্বৈতভাবে পরিপূর্ণ হইতে থাকেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই সূক্ষ্মজ্ঞানে আমরা অদ্বৈতের অনেক দূর আভাস প্রাপ্ত হই। সসীম হইতে ক্রমশঃ অসীমে, সান্ত হইতে ক্রমশঃ অনন্তে উঠিতে থাকি। বাস্তবিক ভাবিতে গেলে, অনন্তের কখনই অংশত্ব বা সান্তভাব সম্ভাবিত নহে; তবে যে আমাদের নিকট সকল বস্তুই সান্ত ও সসীমরূপে প্রতীত হয়, সে কেবল আমাদের মায়িক জ্ঞানের দোষে। মায়িকজ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়া আমরা অনন্তকে সম্যক্ উপলব্ধ করিতে পারি না। উপলব্ধ করিতে না পারি, তাহাকে ভাবিবার জন্য এই মায়িকজ্ঞানের সহায়তা একান্ত আবশ্যক হয়। মায়িকজ্ঞানে আমরা সসীম ও সান্তকে উপলব্ধ করিয়া, তবে সেই সান্ত ও সসীমের মধ্যে অনন্তকে ভাবিতে সমর্থ হই। তাই বুঝাইবার জন্য ব্রহ্মসূত্রে আছে :—

বুদ্ধ্যর্থঃ পাদবৎ।
বেদান্তদর্শন। ৩অ, ২পা, ৩৩সূ।

শঙ্কর বলেন বুদ্ধ্যর্থ, উপাসনার্থ। সামান্য জ্ঞানে অনন্তকে আনিবার জন্য শ্রুতিতে সেই অনন্তের পাদকল্পনা করা হইয়াছে। অপরিমেয়কে পরিমেয়রূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। বাস্তবিক, অনন্ত নির্গুণ সত্তার মায়িক ত্রিগুণাত্মক কোন অংশ বা খণ্ড সম্ভাবিত নহে, কিন্তু আমাদের মায়িকজ্ঞানও অখণ্ড নহে। খণ্ডজ্ঞানে অখণ্ডের ভাবনাই উপাসনার অঙ্গ। সুতরাং বুদ্ধ্যর্থঃ অর্থে জ্ঞানার্থঃ এবং উপাসনার্থঃ বুঝাইতেছে।

ঋগ্বেদীয় পুরুষসূক্তে অখণ্ড ও নির্গুণ ব্রহ্মের এইরূপ পাদ কল্পিত হইয়াছে :—

"পাদোঽস্য বিশ্বভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।"

"ত্রৈকালিক ভূতসমুদায়রূপা এই জগৎ সেই বিরাটের একপাদ মাত্র। অবশিষ্ট আরও তিনটি পাদ আছে, উহা অমৃতস্বরূপ। সেই অমৃতাত্মা পাদত্রয়, ইঁহার স্বপ্রকাশ স্বরূপে অবস্থিত রহিয়াছে।"

ব্রহ্মব্রতসামাধ্যায়িকৃত অনুবাদ।

শঙ্কর বলেন, এই শ্রুতিতে যে ব্রহ্মের পাদ কল্পনা দৃষ্ট হইতেছে, তাহা কেবল সামান্য জ্ঞানে সেই বিরাটকে আনিবার জন্য। শঙ্করের এই অর্থ বিস্তারিত করিয়া ব্রহ্মব্রত মহাশয় বলিতেছেন :—

"ব্রহ্ম নিরবয়ব হইলেও তাঁহার মায়া ত সাবয়বা। এই মায়ার অবয়বত্ব তাঁহাতে আরোপ করিয়া তাঁহাকে চতুষ্পাদরূপে বর্ণন করা হইয়াছে। উপাসনার জন্য এইরূপ নিরংশে অংশের আরোপ, ভোগবৎ। দেখ অন্নপানাদি বা স্ত্রীপুত্রাদি বা গৃহশয্যা প্রভৃতি অনিত্য ভোগ হয়। কেবল ভোগ অপ্রসিদ্ধ। সুতরাং ভোগ করিতে হইলে যেমন অন্ন পানাদির সংসর্গ অত্যাবশ্যক, তদ্রূপ উপাসনা করিতে হইলেও মায়ার অংশ গ্রহণ অবশ্য কর্ত্তব্য। অধিক কি, ব্রহ্ম বৃহৎ বা নিরবয়ব, এই মাত্র জ্ঞানেও দেখ, মায়ার অংশ বৃত্তি

হইয়াছে, যেহেতু, বৃহৎ জ্ঞান, ক্ষুদ্রজ্ঞান সাপেক্ষ এবং নিরবয়বজ্ঞান অবয়বজ্ঞান সাপেক্ষ। অতএব মায়ার অংশ গ্রহণ না করিলে ব্রহ্মভাবনাই অসম্ভাবিত। ব্রহ্মকে 'অতিবৃহৎ' এইমাত্র ভাবনা করিতে হইলেও ষোলকলা এবং চারিপাদ এইরূপ মায়ার অংশ অগ্রে কল্পনা করিতে হইবে, পরে উপাসনা করিতে পারিবে, নতুবা এ পর্য্যন্ত এমন কোন উপায় বা যুক্তি উৎপন্ন হয় নাই, যদ্দ্বারা বিনা মায়ার সাহায্য ব্রহ্মের নির্বিশেষ স্বরূপও ধ্যানের বিষয় হইতে পারে।

ব্রহ্মমীমাংসায়ও ঐ বেদান্তসূত্রের এইরূপ ব্যাখ্যা দৃষ্ট হইয়া থাকে :—

"জীব ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ বিজ্ঞাপনার্থ যেমন অংশ বর পদে অপ্রসিদ্ধ হইলেও 'পাদোঽস্য বিশ্বভূতানি' ইত্যাদি শ্রুতিতে ঈশ্বরের পাদশব্দ প্রয়োগ হয় সেইরূপ জীব ও ঈশ্বরের অংশাংশিত্ব ভাববিজ্ঞাপনার্থ অলৌকিক ঐশ্বরানন্দের আনন্দ শব্দ প্রয়োগ হইতে পারে। পদ্মপুরাণে লিখিত হইয়াছে যে, যেমন লোক জ্ঞানার্থ রাজাতে দেবরাজ শব্দ প্রয়োগ হয়, সেইরূপ অলৌকিক ঐশ্বরিক জ্ঞান বিজ্ঞাপনার্থ জ্ঞানাদি শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে।'

কি ব্রহ্মমীমাংসা, কি অদ্বৈত শাঙ্করভাষ্য, সকল মতেই শ্রুতির প্রতিপাদ্য নির্গুণ ও অখণ্ড ব্রহ্মই গৃহীত হইয়াছে; কেবল উপাসনার্থ তাঁহার রূপ ও নাম কল্পিত হইয়া সামান্য জ্ঞানে তাঁহার ধ্যান করা হইয়াছে মাত্র। এই সামান্য জ্ঞানের ধ্যান অবলম্বন করিয়া উপাসনা পথে ভক্ত অগ্রসর হইয়া তাঁহার সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর এবং সূক্ষ্মতর হইতে সূক্ষ্মতম জ্ঞানে উপনীত হয়েন। দ্বৈতাদ্বৈত জ্ঞানের চরমসীমায় আসিয়া ভক্ত সগুণ ব্রহ্মের উপাসনায় সিদ্ধ হন। এই সগুণ ব্রহ্মের ধ্যান ও উপাসনা ক্রমে ক্রমে কেমন উত্থিত হয়, রামানুজ তাহা বলিতেছেন:—

"মূর্ত্তি বা প্রতিমাদির উপাসনা করিলে দুরিত রাশি বিদূরিত ও অন্তঃকরণে বিভব বা ঐশ্বর্য্যোপাসনায় অধিকার জন্মে। পশ্চাৎ বূহের (অনিরুদ্ধ প্রদ্যুম্ন, সঙ্কর্ষণ ও বাসুদেব এই চতুর্ব্যূহযুক্ত ব্রহ্মোপাসনা) উপাসনায় অধিকারী হওয়া যায়। তদনন্তর সূক্ষ্মের উপাসনায় সামর্থ্য জন্মে। পরে অন্তর্যামী সাক্ষাৎকরণের শক্তি সমুদ্ভূত হইয়া থাকে।" *

এই ধ্যান কিরূপে সঞ্জাত হয়, রামানুজ তাহা বলিতেছেন:—

"ধ্যানঞ্চ তৈলধারাবদবিচ্ছিন্নস্মৃতিসন্তানরূপা।"

তৈলধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন স্মৃতিপরম্পরা স্মৃতির আবির্ভাবের নাম ধ্যান।

স্থূল জগতে ভগবানের যে স্থূল প্রতিমা প্রতিবিম্বিত আছে, সেই স্থূল প্রতিমার ভাবনা ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্ম ঈশ্বরে সমুত্থিত হইতে থাকে। এই সূক্ষ্ম সগুণ ঈশ্বরের ভাবনায় ক্রমে ব্রহ্মের বিভব বা ঐশ্বর্য্যভাবনা ও জ্ঞানস্রোত হৃদয়ে উদিত হইতে থাকে। তৎপরে সেই ভাবনাস্রোত তৈলধারাবৎ ভগবানের সূক্ষ্মতর চতুর্ব্যূহভেদ করিতে থাকে। সূক্ষ্ম ও সম্পূর্ণ ষড়গুণবিশিষ্ট বাসুদেব হৃদয়ে ধ্যানস্থ হইলে অন্তর্যামী পরমাত্মধ্যানে চিত্ত সংযোজিত হয়। ব্রহ্মধ্যানের এই পর্য্যায়ানুসারে যে স্মৃতি বা ভাবনাপরম্পরা তৈলধারাবৎ অবচ্ছিন্নরূপে অনুভূত হয়, তাহাই ধ্যানরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। রামানুজ সগুণ সূক্ষ্মের এই ধ্যান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। এইখানে দ্বৈতাদ্বৈতজ্ঞান পরিসমাপ্ত হইয়াছে, কারণ, রামানুজ বলেন, এইখানে ভক্ত "শেষরূপী ব্রহ্মে লীন হইয়া সমুদায় অভীপ্সিত সিদ্ধি সম্ভোগ করেন।"

রামানুজের এই ধ্যান গীতায় অভ্যাস যোগরূপে বিবৃত হইয়াছে :—

"অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্॥" ৮অ-৮

"হে পার্থ! অভ্যাসযোগযুক্ত অর্থাৎ পুনঃ

---

* সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে রামানুজদর্শন।

পুনঃ স্মরণরূপ যোগযুক্তযোগী একাগ্রচিত্তে দিব্য পরমপুরুষকে স্মরণ করিতে করিতে সেই পরম পুরুষকে লাভ করে।”

একাগ্রচিত্তে এইরূপ ভগবানকে স্মরণ করিত করিতে শেষে কিরূপে শেষরূপী ব্রহ্মে লীনতা জন্মে, তাহাও গীতায় উক্ত হইয়াছে :—

“সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥ ৬অ ২৯।

“যোগাভ্যাস দ্বারা যাঁহার চিত্ত সমাহিত হইয়াছে এবং যিনি সর্ব্বত্র ব্রহ্মই দর্শন করেন, সেই সমাহিতচিত্ত সমদর্শী যোগী ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতে আপনাকে এবং আপনাতে সেই সমস্ত ভূত দর্শন করেন।”

জীব যখন এই দ্বৈতাদ্বৈতজ্ঞানে ব্রহ্ম ভাবনায় ধ্যানস্থ ব্রহ্মে লীন হয়েন —অবিচ্ছিন্নরূপে লীন হয়েন, তখন তাঁহার সমাধির অবস্থা। এই সমাধি-সম্পন্ন জীব ক্রমে নির্গুণ ধ্যানে অধিকারী হয়েন।

দ্বৈতজ্ঞানির চিত্তে সগুণ ব্রহ্মই প্রতিপাদিত; নির্গুণের জ্ঞানে তিনি অন্ধ। এই সগুণের ধ্যান যত কেন সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতমে অগ্রসর হউক না, সে সমস্ত জ্ঞানই সাকার ও মূর্ত্তজ্ঞান। এজন্য আর্য্যশাস্ত্রে উপাসনা দ্বিবিধ হইয়াছে, সাকার ও নিরাকার। সমস্ত ধ্যানই সাকার, কেবল একমাত্র নির্গুণের ধ্যান নিরাকার। গীতায় দ্বাদশ অধ্যায়ে এই দ্বিবিধ উপাসনা কথিত হইয়াছে। রামানুজ যে নিদিধ্যাসনের কথা কহিয়াছেন, সেই সগুণ ঈশ্বর ধ্যান সমস্তই মূর্ত্তধ্যান। রামানুজের সাকার উপাসনা পর্য্যায়ক্রমে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে :—উপাসনা—(১) স্থূলসাকার, (২) মানসিক সাকার, এবং (৩) সূক্ষ্মসাকার।

(১) স্থূল সাকার
- অর্চ্চা, বা, প্রতিমাদি
- বিভব, বা রামাদি অবতার।

(২) মানসিক সাকার, বা, চতুর্ব্যূহ।*
- অনিরুদ্ধ
- প্রদ্যুম্ন
- সঙ্কর্ষণ
- বাসুদেব

(৩) সূক্ষ্ম সাকার
- সূক্ষ্মবাসুদেব
- অন্তর্যামী।

এই ধ্যানপর্য্যায় Herbert Spencer এইরূপ বিবৃত করিয়াছেন :—

“The coalescence of Polytheistic conceptions into the Monotheistic conception and the reduction of the monotheistic conception to a more and more general form in which personal superintendence becomes merged in universal immanence.”
First Principles.

সমগ্র দেবতাদিগের ধ্যানজরূপ এক ব্রহ্মের ধ্যানজরূপে এবং সেই ব্রহ্মরূপ বিধাতা—বিশ্বব্যাপী, অন্তর্যামী, পরমাত্মায় বিলীন হয়।

গীতায়ও উক্ত হইয়াছে :—

“যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মনবর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥” ৪অ-১১।

এই সাকার উপাসনাই ধ্যানপথের শেষ সীমা নহে। সাকার উপাসনায় দ্বৈতজ্ঞানী

* শ্রীমদ্ভাগবতের ৩য় স্কন্ধে ২৬ অধ্যায়ে এই চতুর্ব্যূহতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শ্রীধরস্বামীর টীকা এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠকমাত্রেই এই চতুর্ব্যূহতত্ত্ব জানা আছে।

ক্রমে দ্বৈতাদ্বৈতভাবে উপনীত হইলে অদ্বৈত-জ্ঞানের অধিকারী হইলেন। তখন তাঁহার অবিচ্ছিন্ন ঈশ্বরভাবনা বা স্মৃতিপরম্পরা শেষ-রূপী ব্রহ্মে লীন হইলে, তিনি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম ধ্যানাধিকারে উপনীত হইলেন। এই ব্রহ্ম-ধ্যানে তাঁহাকে "নির্ব্বিষয়" হইতে হইবে। রামানুজ যেখানে সাকার উপাসনা শেষ করিলেন, সেইখান হইতে সাংখ্যের অধিকার আরম্ভ হইল। রামানুজও অধম ও মধ্যম অধিকারীর জন্য যে নিদিধ্যাসন ও ধ্যানযোগ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, সাংখ্য তাহার পরিশেষ করিয়া সমস্ত সমাধি-পথ সম্পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। এই ধ্যানপথের দ্বৈতাদ্বৈত সীমার পরই অদ্বৈতসীমার প্রারম্ভ। সাংখ্যের অধিকার এই নির্গুণের ধ্যান। তাই রামানুজ যে ধ্যানের লক্ষণ দিয়াছেন, তাহা অদ্বৈত-জ্ঞানমূলক নির্ব্বিষয়ক ধ্যান-লক্ষণ হইতে ভিন্ন হইয়াছে। সাংখ্যের ধ্যান নির্ব্বিষয়ক; মনকে বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করাই উদ্দেশ্য। চিত্তে সংসারবীজ মূলেই না থাকে, এরূপ উদ্দেশ্যে নির্গুণের সমাধি। সেই নির্ব্বিষয়ক, নির্ব্বিকল্প এবং নির্বীজ সমাধি লক্ষণ কপিল দেব এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন:—

ধ্যানং নির্ব্বিষয়ং মনঃ। ৬অ ২৫।

রামানুজ এবং কপিলদেবের ধ্যানলক্ষণে আপাততঃ বৈষম্য দৃষ্ট হয়। কিন্তু যখন আমরা এইরূপ অধিকারভেদ দেখি, তখনই কেবল বুঝিতে পারি, তাঁহাদের মতভেদের কারণ কি? এরূপ বৈষম্যকে মতভেদ বলা অন্যায়। তাঁহারা একই পথের বিভিন্ন দেশের ধর্ম্ম নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন মাত্র। ধ্যান-পথের বিভিন্ন অবস্থার ধর্ম্ম কখনই এক হইবার সম্ভাবনা নাই; সুতরাং তাঁহাদের ধ্যান লক্ষণ অবশ্যই বিভিন্ন হইয়াছে। একজন তরুণবয়স্ক এবং একজন বৃদ্ধের চিত্র কখনই সমান হইতে পারে না।

রামানুজের ধ্যান ভগবানের শেষ (অনন্ত) রূপে নিমজ্জিত হইয়া বিলীন হইয়াছে। এই ধ্যান তীব্র হইলে সালোক্য লাভ হয়, আরও তীব্র হইলে সামীপ্য এবং তদপেক্ষাও তীব্র হইলে সারূপ্য সিদ্ধ হয়। কিন্তু যখন জীব সারূপ্য প্রাপ্ত হইয়া একেবারে ভগবৎসত্ত্বার শেষরূপে নিমগ্ন হইয়া বিলীন হন, তখন তাহার সাযুজ্য মুক্তি লব্ধ হয়। সগুণ ব্রহ্ম ধ্যানপথে এই শেষরূপী ভগবানে বিলীন হওয়াই শেষ সীমা। তখন তীব্রধ্যানে ব্রহ্ম দর্শন ঘটে। তৎপরে সাংখ্যের নির্ব্বাণ মুক্তি। যখন জীব অনন্তে বিলীন হন, সেখানেও সাংখ্য বলিতেছেন, এখনও জীব প্রকৃতির ত্রিগুণ হইতে নির্ম্মুক্ত হইতে পারেন নাই; কারণ, অনন্তেও ত্রিগুণ রহিয়াছে। অনন্ত মূল প্রকৃতির প্রধানা মূর্ত্তি। সাংখ্যে তাহা মহত্তত্ত্ব বা মহান্ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই সূক্ষ্ম জ্ঞানময় মহত্তত্ত্ব হইতে চিন্ময় নির্গুণ পুরুষে উপনীত হইতে হইলে নিস্ত্রৈগুণ্য * সাধন করিতে হয়। এই নিস্ত্রৈগুণ্য সিদ্ধ হইলে তবে ত্রিগুণাতীত পুরুষের সাক্ষাৎকার ঘটে, এই সাক্ষাৎকারে নাম আত্মসাক্ষাৎকার বা পরম পুরুষ বা পরমাত্মদর্শন।

এই আত্মসাক্ষাৎকারে উপনীত হইবার দুই পন্থা আছে, এক সগুণ ঈশ্বরের ধ্যান

* গীতায়ও এই নিস্ত্রৈগুণ্যের উপদেশ। প্রথম অধিকারীর পক্ষে সাকার উপাসনাই শ্রেষ্ঠ। এই সাকার উপাসনায় কর্ম্মযোগ অবলম্বন পূর্ব্বক চিত্তকে একান্ত ঈশ্বরপরায়ণ করিয়া নিবৃত্তি ও নিষ্কাম পথে অগ্রসর হইলে, তখন স্বতঃই বিষয়-বৈরাগ্য উপস্থিত হয় এবং জ্ঞানযোগের অধিকার জন্মে।

পথ ; অন্য, সাংখ্যের তত্ত্বজ্ঞান পথ। রামানুজ, পতঞ্জলি, গৌতম, কণাদ প্রভৃতি সগুণ ব্রহ্মবাদিগণ সগুণ ঈশ্বরের ধ্যানপথে গৌণভাবে অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধিতে উপনীত হয়েন, কাপিল সাংখ্য সগুণ ঐশ্বরিক ধ্যান-নিরপেক্ষ কেবল প্রকৃতিবিবেকসিদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা সেই যোগসিদ্ধিলাভ করিতে চাহেন। এই খানে সাংখ্যযোগ হইতে অন্য যোগের প্রভিন্নতা। সগুণ ঈশ্বর-ধ্যান কোথায় আসিয়া সাংখ্যযোগের সহিত মিলিত হইয়াছে, তাহা আমরা দেখিয়াছি। সাংখ্যযোগীগণের সহিত অপরাপর যোগীর প্রভেদ এই সাংখ্যযোগী প্রকৃতিতত্ত্বদর্শন মধ্যে সগুণ ঈশ্বরের মূর্ত্তি দেখেন না, অপরাপর যোগীগণ সেই প্রকৃতি তত্ত্বে ঈশ্বরের মূর্ত্তি দেখিতে পান। সাংখ্যযোগী যে প্রকৃতিতত্ত্বজ্ঞানে, মূলবস্তুর উপলব্ধি করিতেছেন, যাহা প্রকৃতির কর্তৃত্বশক্তি ও চিদাভাস, তাহা অপরাপর যোগীগণের নিকট ঐশবিক তত্ত্ব। কিন্তু সাংখ্যের নিকট তাহার নাম প্রকৃতির ত্রিগুণাত্মক মূলতত্ত্ব। সাংখ্যযোগীগণ কেবল ঐশ্বর্য্যের প্রতিষেধার্থ বস্তুতত্ত্বজ্ঞানে নিমগ্ন হইয়া ধ্যানে ঈশ্বরমূর্ত্তির অবলম্বন ছাড়িয়া দেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঐশ্বর্য্য-বৈরাগ্য সাধনই তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য। তাঁহারা সেই মূলতত্ত্বকে প্রকৃতি বলিলেন এই জন্য যে, তাহা হইতে নাম-রূপ ও আকার সম্ভূত হয়; প্রকৃতি নাম-রূপ ও আকার সৃষ্টিকারিণী; যাঁহার প্রথম পরিণাম অনন্ত বা শেষরূপী মহত্তত্ত্ব। এই সগুণ মূলতত্ত্বই ঈশ্বর। যাহা প্রকৃতির অশেষ পরিণাম মধ্যে নিত্য, যাঁহার রূপই প্রকৃতি, তাহাই ঈশ্বর—ঈশ্বরই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কর্ত্তা। তিনি সর্ব্বশক্তিমান নিত্যবস্তু, সর্ব্বশক্তির শক্তি কার্য্য-কারণ-অতীত অপরিবর্ত্তনীয় কর্তৃত্বাধার। তাহা ত্রিগুণধারিণী ঐশ্বর্য্যশালিনী প্রকৃতির মধ্যে চিদাভাস; তাহা সগুণ চিৎশক্তি। সাংখ্যের সগুণ মূলতত্ত্বের সহিত যোগীগণের সগুণ ঈশ্বরের বিভিন্নতা এই মাত্র। মহানরূপে যে প্রকৃতি বিভিন্ন ধর্ম্ম, করণ ও আকারের সৃষ্টি করিতেছেন, তাহাই পুরাণে ব্রহ্মারূপে উক্ত হইয়াছেন। মূলতত্ত্ব এক হইলেও বিভিন্ন অধিকারীর নিমিত্ত দার্শনিকগণ দর্শনকে নানা পন্থায় বিভক্ত করিয়াছেন। কেহ দ্বৈতপথে, কেহবা দ্বৈতাদ্বৈত পথে ঐশ্বরিক সাধনতত্ত্ব দেখাইয়াছেন, কেহ বা অদ্বৈতপথে তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। সেই জন্য, তাহাদের বিভিন্ন নামকরণ এবং বিভিন্ন সাধনাবস্থার বিভিন্ন ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সকলেরই উদ্দেশ্য সেই একই, নিত্য পরমতত্ত্বে উপনীত হয়েন; বিভিন্ন দার্শনিকেরা একই পন্থার বিভিন্ন অবস্থা বা একই স্থানে উপনীত হইবার বিভিন্ন পন্থার নিরাকরণ করিয়াছেন মাত্র।

আমরা এমত কথা বলি না যে, নির্গুণবাদী সাংখ্য একেবারে দ্বৈতজ্ঞান বিরহিত। দ্বৈতজ্ঞান-প্রধান ন্যায়, বৈশেষিক, এবং ব্রহ্ম-মীমাংসায় আত্মার ভেদজ্ঞান, অংশত্বজ্ঞান, এবং বহুত্ব থাকিলেও সেই আত্মার একত্ব একেবারে অস্বীকৃত হয় নাই; তবে সেই একত্ব তাহার মুখ্য প্রতিপাদ্য নহে। তজ্জন্য সেই দ্বৈতবাদী দর্শনসমূহে আত্মার বহুত্ব এবং ব্রহ্মের সগুণত্ব পারমার্থিক হইয়াছে। বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন, সাংখ্যদর্শনে আত্মার বহুত্ব পারমার্থিক নহে, তাহা ব্যবহারিক জ্ঞান মাত্র। যত দিন না প্রকৃতি পুরুষের যথার্থ জ্ঞানোদয় হয়, যত দিন না সেই জ্ঞানোদয় হেতু বিবেকের সঞ্চার হয়, তত

দিন দ্বৈতজ্ঞাননিবন্ধন আত্মার অংশত্ব ও বহুত্ব জ্ঞান অবশ্যম্ভাবী। প্রকৃতির তত্ত্বজ্ঞান যত দিন বিচার্য্য থাকে, তত দিন সাংখ্যযোগীকে দ্বৈতজ্ঞানী হইয়া প্রকৃতির পরিণাম এবং আত্মার বহুত্বও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। তাই সাংখ্য-তত্ত্বজ্ঞানে আত্মার বহুত্ব ব্যবহারিক রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই ব্যবহারিক জ্ঞানাবলম্বনে সাংখ্যযোগী ক্রমে ক্রমে আত্মার একত্বে উপনীত হয়েন বলিয়া সেই অদ্বৈত জ্ঞানই তাহার পারমার্থিক। প্রকৃতি পুরুষের তত্ত্বনির্ণয় কালীন সাংখ্যযোগী অবশ্য এমত এক অবস্থায় উপনীত হয়েন, যখন তিনি ভেদজ্ঞানী এবং অভেদজ্ঞানী, উভয়ই। যখন তাঁহার এই অবস্থা, তখন তাহার দ্বৈত ও অদ্বৈত, উভয় জ্ঞানই আংশিকরূপে বর্ত্তমান। কিন্তু রামানুজ যেখানে দ্বৈতাদ্বৈতের সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, নির্গুণবাদী সাংখ্য সেখানে কোন সীমাই নির্দ্দেশ করিতে চাহেন না। সাংখ্য সেখানে বিলক্ষণ সগুণভাব বিদ্যমান দেখেন; সুতরাং এক দ্বৈতজ্ঞানের সামান্য আখ্যায় দ্বৈতাদ্বৈতবাদিকেও নিক্ষেপ করেন; সেই দ্বৈতাদ্বৈতবাদের আর স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেন না। এইজন্য অদ্বৈতবাদীগণ, কি দ্বৈতাদ্বৈত, কি দ্বৈতবাদ, উভয়কেই এক সামান্য দ্বৈতবাদ নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

ঈশ্বরোপাসনা সকল দ্বৈতবাদীর স্থির লক্ষ্য। যদি লক্ষ্যই স্থির না থাকে, তবে উপাসনা কাহার জন্য। এজন্য দ্বৈতবাদী দার্শনিকগণ উপাসনার সৌকর্য্যার্থ নিত্য ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন। সাংখ্য ঈশ্বরোপাসকগণের এই স্থির লক্ষ্য স্বরূপ নিত্য ঈশ্বর স্বীকার করিতে চাহেন না। কারণ, সগুণ বস্তু মাত্রেরই ঐশ্বর্য্য ও ধর্ম্ম অনিত্য এবং পরিবর্ত্তনশীল। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির সাধর্ম্মাই এই। পাছে সাংখ্যযোগীগণ এই কীলকে আসিয়া বাঁধিয়া পড়েন, তাই তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিবার জন্য সাংখ্যকার দেখাইয়া দিয়া গেলেন যে, এই সগুণ ঐশ্বর্য্যে পরাৎপর ভাব বিদ্যমান থাকাতে তাহা অনিত্য জানিও; তোমাদের লক্ষ্য এ অনিত্যধামে নহে। যে নির্গুণ চৈতন্য নিত্য, স্থির ও অচঞ্চল, সেই নিত্য ধামে তোমাদের লক্ষ্য।

নির্গুণবাদী জৈমিনিরও এই মুক্তি লক্ষ্যস্থানীয়। সেইজন্য তিনিও সেই সগুণ ঈশ্বরের লক্ষ্য ভেদ করিয়া নির্গুণ পরমাত্মায় বিরামলাভ করিয়াছেন। জৈমিনি ও কপিল নিজে নিজে যে স্থলে আসিয়া বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন, অপরকেও সেই গন্তব্য স্থলে লইয়া যাইতে চাহেন বলিয়া তাঁহারা নিজ নিজ দার্শনিক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। বিজ্ঞানভিক্ষু বুঝাইয়া দিলেন, কপিল কেবল নিজ নির্দ্দিষ্টপন্থার ব্যাঘাত নিবারণ জন্য সগুণ ঈশ্বরের অবলম্ব পরিহার করিয়াছেন মাত্র; তাই তিনি বলিয়াছেন, ঈশ্বর অসিদ্ধ; নহিলে তিনি এমত কথা বলেন নাই যে, ঈশ্বর একেবারে নাই। তাঁহার অর্থ, সাংখ্যযোগপথে ঈশ্বর অসিদ্ধ হইলেও, যাঁহারা সে অবলম্ব ধরিয়া সমাধিপথে অগ্রসর হইতে পারেন, তাঁহাদের পক্ষে ঈশ্বরভক্তি অসিদ্ধ নহে। পাতঞ্জল সাংখ্যে সে কথা আরও পরিস্ফুট হইয়াছে। ভগবান্ পতঞ্জলি সেই ভক্তিপথ ধরিয়া জ্ঞানপথে উঠিয়াছিলেন এবং অপরকেও তাহা উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। তাই, ভগবান্ যাস্ক বলিয়াছেন, যে ঋষি যে পথ ধরিয়া সিদ্ধি-

লাভ করিয়াছেন, তিনি সেই সাধনপথে সম্পূর্ণ পারদর্শী হইয়া অপরকে তাহা নিঃসংশয়ে প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। পাতঞ্জল যোগসূত্রে যোগপথের পদে পদে অঙ্গপাত হইয়াছে। কোন খানে কোন বিঘ্ন ঘটিলে তাহার নিবারণ জন্য ঋষি উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন। গৌতম প্রভৃতি সগুণ ঈশ্বরবাদিগণ নানা যুক্তি দিয়া দ্বৈতপ্রস্থানকে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সুতরাং হিন্দুদর্শনে বৈদিক মুক্তিপথের সকল দেশে সমান আলোকপাত হইয়া অতিপবিস্তৃত হইয়াছে। সকলেই একই নির্ব্বাণমুক্তির পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। যিনি যে অধিকারীর নিমিত্ত নিজ নিজ দর্শনের সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি সেই অধিকারীর পক্ষে বেতাবা। অপর অধিকারীর পক্ষে সে পথ তত প্রশস্ত না হইতে পারে, কারণ, অপর অধিকারীর নিমিত্ত তাহা প্রস্তুত হয় নাই; কিন্তু যে অধিকারীর জন্য তাহা প্রস্তুত হইয়াছে, সে অধিকারী তাহাতে সম্পূর্ণ উপদেশ লাভ করিয়া নিজ পথে অগ্রসর হইতে পারেন। প্রাচীন কালে যখন কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানপথের অনেক পথিক পাওয়া যাইত, তখন সেই সেই পথের পারদর্শিতা প্রতিপন্ন হইত। একালে যখন সেই পথই পরিত্যক্ত হইয়াছে, তখন সে পথের নানা দোষোদ্ঘাটন করা কেবল মিথ্যা বাক্য ব্যয় মাত্র। এক্ষণে যাহা মতভেদ বলিয়া প্রতীত হইতেছে, তাহা আমাদের মিথ্যাদৃষ্টি মাত্র। প্রাচীনকালে সেই সেই গন্তব্যপথের পথিকগণের নিকট তাহা প্রতি পথকে সুদৃঢ়, নিষ্কণ্টক, পবিস্তৃত ও সমলঙ্কৃত করিয়াছিল।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু।

সমাজ-সমস্যা।

ভারত সমাজে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কিন্তু কেন ঘটিল?

(১) ইংরাজের পরিচ্ছদ আঁটা সাঁটা, আমাদের শিথিল, ইংরাজ বয়ঃপ্রাপ্ত না হইলে বিবাহিত হয়েন না, আমরা বাল্যে বিবাহিত হই, ইংরাজ সমাজে বিধবা নবভর্ত্তা গ্রহণ করিতে পারেন, আমাদের সমাজে শ্রেষ্ঠ জাতীয় বিধবাগণ তাহা পারেন না, বঙ্গ সমাজে কোন জাতীয় বিধবাগণই তাহা পারেন না বা করেন না। ইংরাজ বলিয়া যে একটা জাতি, তাহাদের মধ্যে পরস্পরের সহিত আহারাদি এবং আদান প্রদান চলে, তবে বংশগৌরবাদি উপেক্ষিত হয়, তাহা নয়। কিন্তু আমাদিগের দেশে অনেক "জাতি;" তাঁহাদের মধ্যে পরস্পরে আহার বিবাহাদি চলে না। ইংরাজের ভোজন প্রণালী আমাদের মতন নহে, উপবেশন পদ্ধতিও সতন্ত্র। কথা এই, ইংরাজে এবং এদেশীয়ে প্রভেদ এত বেশী যে, তাহার সংখ্যা করা সহজসাধ্য নহে। কিন্তু ইংরাজ বিজেতা, আমরা বিজিত, ইংরাজ প্রভু, আমরা দাস। উপযোগী বা অনুপযোগী হউক, উপকারী বা অপকারী হউক, যাহা প্রভু-সমাজে প্রচলিত, তাহার প্রতি দাসবর্গের একটু টান থাকা স্বাভাবিক। এই কারণে অনেক লোক আত্ম-সমাজ-বিদ্বেষী এবং পর-সমাজ-প্রিয়। বিদ্বেষ বা অনুরাগ কেবল মনে মনে থাকে না, কার্য্যেও পরিণত হয়; এবং তাহা হইয়াছেও।

(২) দোকানের সম্মুখে একটা ষাঁড় শুইয়াছিল, ইহাই দেখিয়া একজন ময়রার দোকান চিনিয়া রাখিয়াছিলেন। সে গল্প সকলেই জানেন। ইংরাজ ক্ষমতাশালী, ইংরাজের জাতীয়ত্ব আছে। ইংরাজ আমাদের প্রভু। কিন্তু আমরা দাস, এবং আমাদের আছেই বা কি গুণ! যদি কোন গুণ থাকিত, তবে দাস হইব কেন? যাহারা ক্ষমতাশালী এবং প্রভু, তাহাদের মধ্যে যে সকল প্রথা পদ্ধতি দেখা যায়, বোধ হয়, সে গুলি ক্ষমতা এবং প্রভুতা বৃদ্ধির উপযোগী। এই প্রকার বিচারে অনেকে দেশীয় প্রথার প্রতি বিরক্ত এবং বিদেশীয় প্রথাদির প্রতি অনুরক্ত। এপ্রকার ন্যায়, ষাঁড় দেখিয়া দোকান স্থির করিবার মত। কিন্তু এ প্রকার যুক্তি ও সিদ্ধান্ত অনেক লোকের পক্ষে স্বাভাবিক।

(৩) ইংরাজ আমাদের রাজা। রাজার সহিত ব্যবহারে ইংরাজী ভাষাই চলে। কাজেই ইংরাজী শিক্ষা আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয়। সম্পদ, সম্মান ও গৌরব লাভ করিতে হইলে ইংরাজীতে সুশিক্ষিত না হইলে চলে না। কাজেই ইংরাজী সাহিত্যের চর্চ্চাই অধিক। ইংরাজ উন্নতিশীল জীবন্ত জাতি; তাঁহাদের সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞানাদিও প্রভূত। সে সকল বিদ্যায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যে, ইংরাজের প্রতি অনুরক্ত হইবেন, তাহা অত্যন্ত স্বাভাবিক।

(৪) যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ ইংরাজীতে লিখিতে ও কথা কহিতে পারে, সে সুশিক্ষিত বলিয়া আদৃত হয়। যে ইংরাজের চালে চলে, লোকে তাহাকে ইংরাজীতে সুশিক্ষিত বলিয়া মনে করে, কারণ বহু শিক্ষার ফলে উক্ত প্রকার চাল চলনে অনুরাগ হয় বলিয়াই লোকের অনুমান। আদর পাইবার জন্য অথবা মনে মনে আত্মাভিমানের তৃপ্তির জন্য অনেক ইংরাজী প্রথার অনুকরণ করিয়া থাকেন।

(৫) ইংরাজের সহিত মিশিবার আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। দেশের লোকের সহিত আমাদের মিশ না থাইলেও ক্ষতি নাই; কারণ চাকুরী ত দেশীয়েরা দিবে না? ইংরাজের সহিত মিশিতে হইলে অথবা সৌভাগ্যের পথ পরিষ্কার করিতে হইলে, ইংরাজ যে প্রকার ব্যবহারে সন্তুষ্ট হয়েন, তাহা অবলম্বন করিবার জন্য লোকের প্রবৃত্তি জন্মে। "সাহেবেরা এরূপ কার্য্য না করিলে কি ভাবিবে," এই চিন্তায় অনেক দেশীয় আচার ব্যবহারাদির বিরোধী হইয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন আবার সাহেবদিগের সামাজিক শিষ্টাচারের বাঁধা নিয়ম জানা, এবং তাহার অবলম্বন, সাহেবদিগের সহিত মিশিবার জন্য প্রয়োজনীয়। এজন্যেও অনেকে ইংরাজী প্রথার অনুবর্ত্তী হয়েন।

(৬) ৫ম কারণটির আরও একটু বিশদ বিবৃতির প্রয়োজন। যাঁহারা উচ্চ পদস্থ, তাঁহাদের পক্ষে সাহেবদিগের সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপন প্রয়োজনীয় হয়। যাহাদের পারিবারিক ব্যবহার ইংরাজ জাতির অনুরূপ নহে, সাহেবেরা তাহাদের বাড়ীতে দেখা শুনা করিতে যান না। উচ্চ পদস্থ লোকদিগের পক্ষে এরূপ মেশামেশিতে উন্নতির পথ পরিষ্কৃত হয়; সেই জন্য তাঁহাদের পক্ষে ইংরাজ জাতির ব্যবহারাদি প্রবর্ত্তনের প্রয়োজন হয়।

(৭) অনেকে বলিয়া থাকেন যে, এমন অনেক সাহেব আছেন, যাঁহারা দেশীয় লোকদিগকে বিদেশীয় প্রথানুবর্ত্তী হইতে দেখিলে চটিয়া যান। "ইহারা আমাদের সমকক্ষ

হইতে চায়” ভাবিয়া রুষ্ট হয়েন। কিন্তু এ প্রকার মনের ভাব অপেক্ষা বিপরীত রকমের মনের ভাব অধিক। সে কথা দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতেছি। এক জন ভট্টাচার্য্য অধ্যাপক ব্রাহ্মণ নগ্নপদে সামান্য পরিচ্ছদে একজন সুবেশ ভূষিত হাকিমের সম্মুখে উপস্থিত। সে ব্যক্তি হাকিমের করুণা ভিক্ষা করে, তাঁহাকে হুজুর বলে, অথচ তাঁহার স্পর্শ অপবিত্র বলিয়া জ্ঞান করে। ইহাতে হাকিমের মনে বিরক্তি এবং অভিমান জন্মে। তিনি ভাবেন যে, যে ব্যক্তি বিজিত, আমি যাহার রাজা বা প্রভু, এবং যাহা অপেক্ষা আমি কত গুণে উন্নত, সে ব্যক্তি কেন আমাকে ঘৃণা করিবে? কেন সে আপনাকে আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভাবিবে? কিন্তু যে ব্যক্তি ইংরাজের করস্পর্শ পাইলে সৌভাগ্যবান ভাবে, ইংরাজের প্রথা পদ্ধতি ভাষা বা... অবলম্বন করে, এবং স্বদেশীয় অবস্থা ঘৃণিত বলিয়া চিন্তা করে, তাহাকে দেখিলে হাকিমের মনে হইবে যে এক স্থানে দেশ জয় সম্পূর্ণ হইয়াছে, ইহারাই প্রকৃত দাস। কাজেই ইংরাজী প্রথা অবলম্বিত দেখিলে যে ইংরাজ দেশীয়দিগের উপর বিরক্ত হইয়া থাকেন, এ কথা সকল সময়ে ঠিক নহে। ইংরাজী প্রথা অবলম্বনে সাহেবদের নিকট সুশিক্ষিত এবং সংস্কৃত-রুচি সম্পন্ন এবং সৎসাহসী বলিয়াই আদৃত হইবার সম্ভাবনা অধিক। এ কারণেও অনেকে ইংরাজের সামাজিক প্রথার অনুকূলে।

(৮) এমনও অনেক লোক আছেন, যাঁহারা বিচার দ্বারা নিষ্পন্ন করিতেছেন যে, ইংরাজ জাতির কোন কোন আচার অনুষ্ঠান সমাজের পক্ষে কল্যাণকর। ভিন্ন রকমের আচার ব্যবহার প্রথা পদ্ধতিগুলি রাত্রি দিন দেখিতে হয়; তাহাকে তাহার গুণের সমালোচনা ও উপযোগিতার বিচার চিন্তাশীলের নিকটে অপরিহার্য্য। শুধু চিন্তা করিয়াই চুপ করিয়া থাকেন, এমন লোকও আছেন, কিন্তু এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা যাহা উপযোগী এবং কল্যাণকর বলিয়া মনে করেন, তাহার অনুষ্ঠান করেন এবং সমাজে প্রবর্ত্তিত করাইবার জন্য চেষ্টা করেন।

(৯) পরিবর্ত্তন নিয়ম। সহজেই সকল সমাজেই পরিবর্ত্তন ঘটে। চীন সমাজেও পরিবর্ত্তন হইতেছে। তাহার পর বিদেশীয়ের সংঘর্ষ, ভিন্ন প্রকারের আচার ব্যবহারের সংঘর্ষ। পরিবর্ত্তন নিরুদ্ধ হইবার নহে, তবে নিয়মিত হইতে পারে।

ভারত সমাজে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, এবং প্রতিনিয়তই অধিকতর পরিবর্ত্তনের দিকে সমাজের গতি দৃষ্ট হইতেছে। এই পরিবর্ত্তনের ফলে অনেক প্রাচীন আচার ব্যবহার, প্রথা, পদ্ধতি, বিলুপ্ত হইয়াছে, বা বিলুপ্ত-প্রায় হইতেছে, এবং বহুতর নূতন প্রথা পদ্ধতি প্রাচীনের স্থান অধিকার করিতেছে। যাহা কিছু প্রাচীন, তাহাই মন্দ, এবং যাহা নবীন, তাহাই ভাল, এ কথা কেহ সাহস করিয়া বলিতে পারেন না; এবং ইহার বিপরীত কথাও সাহস করিয়া বলা যে অবিবেচকতা, তাহার সন্দেহ নাই। পরিবর্ত্তনের ফলে যে কোন ২ উপযোগী এবং মঙ্গলদায়ক সংস্কার ও অনুষ্ঠান তিরোহিত হইয়াছে, তাহা পরে প্রদর্শন করিব। যাহা উপযোগী এবং মঙ্গলপ্রদ, তাহার তিরোধানে যে সমাজে অসুখ অসুবিধা এবং অনিষ্ট সংঘটিত হয়, তাহা আর বলিতে হইবে কেন? কোন ২ স্থলে আবার প্রাচীনতা অটুট রহিয়াছে বলিয়া অথবা

এই পরিবর্ত্তনের সময়ে কালোচিত মঙ্গল-প্রদ নবভাব সমাজ শরীরে প্রবিষ্ট হইতে পারিতেছে না বলিয়া, ক্লেশ, এবং অশান্তি উৎপাদিত হইয়াছে। ক্লেশ অসুবিধা এবং অশান্তি সকলেই অনুভব করে, কিন্তু এ সকল কি কারণে ঘটিল, তাহা সাধারণ লোকে বুঝিয়া উঠিতে পারে না। পরিবর্ত্তন ইহার কারণ, সন্দেহ নাই; কিন্তু এই পরিবর্ত্তনের কোন্ অবস্থা ইহার কারণ, তাহা স্থির করা দুরূহ। এই জন্য সাধারণ লোকে যে কোন পরিবর্ত্তনকেই অনিষ্টকর বলিয়া মনে করিতেছে এবং তাহার বিরোধী হইতেছে। যাঁহারা শিক্ষিত এবং বিবেচক, তাঁহাদের মধ্যেও কারণ নির্দ্দেশ বিষয়ে বিস্তর মতভেদ দৃষ্ট হইতেছে।

সামাজিক পরিবর্ত্তনের উপর যখন আমাদিগের জাতীয় জীবন নির্ভর করিতেছে, তখন এ বিষয়ের সমালোচনায় যদি সমগ্র বঙ্গ সাহিত্য নিয়োজিত হইত, তাহা হইলেও ক্ষতি ছিল না। কতকগুলি কুশিক্ষিত এবং চিন্তাবিহীন লোকের হিন্দুধর্ম্ম এবং হিন্দু আচার অনুষ্ঠানের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যারূপ উন্মত্ত চীৎকারে, দেশে কাণ পাতিবার যো নাই। সাধারণ লোক সর্ব্বত্রই লঘু-প্রকৃতিক; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদিগের দেশে এই লঘুতা এত বাড়িয়া গিয়াছে যে, অনেক সময়ে দেশের উন্নতির আশায় হতাশ হইয়া পড়িতে হয়। এই কোলাহল এবং উন্মত্ততার মধ্যেও কয়েক জন বুদ্ধিমান এবং চিন্তাশীল ব্যক্তি সামাজিক পরিবর্ত্তন এবং তাহার ফলাফল বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। জানি না, এ সকল গ্রন্থ দেশে বহুল পঠিত হইয়াছে কি না। এই প্রবন্ধে যদি সেই সকল গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে সমাজ-সমস্যার কথা আলোচিত হয়, তাহা হইলে অন্ততঃ সেই গ্রন্থগুলির প্রতি অনেক লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে পারিবে, আশা করা যায়। আমি মুখ্যভাবে তিন জন গ্রন্থকারের পুস্তক অবলম্বন করিয়া সমালোচনা আরম্ভ করিতেছি; কিন্তু পরোক্ষভাবে অন্যান্য ব্যক্তির মতামতও সমালোচিত হইবে। প্রথমতঃ ৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত সামাজিক-প্রবন্ধ, পারিবারিক-প্রবন্ধ, আচার-প্রবন্ধ, এবং স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস, দ্বিতীয়তঃ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় প্রণীত যুগান্তর এক বক্তৃতামালা; তৃতীয়-শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় প্রণীত হিন্দুত্ব, এই সমালোচনার আলোচ্য মুখ্য গ্রন্থাবলী।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

ব্রহ্ম ও জগৎ। (৬)

অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়
স্তে উভে নানার্থে পুরুষংসিনীতঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি
হীয়তেঽর্থাদ্ য উ প্রেয়ো বৃণীতে।

(কঠোপনিষৎ, ২।১)

"শ্রেয় (পরমার্থ) ও প্রেয় (সংসার সুখ) পরস্পর বিভিন্ন। এই উভয় বিভিন্নরূপে পুরুষকে আবদ্ধ করে। যে এই দুইয়ের মধ্যে শ্রেয়কে গ্রহণ করে, তাহার মঙ্গল হয়, আর যে প্রেয়কে গ্রহণ করে, সে পরমার্থ হইতে বিচ্যুত হয়।"

(সীতানাথ দত্ত কৃত অনুবাদ)।

বিদ্যা এবং অবিদ্যা, প্রেয় এবং শ্রেয়

চিরদিন মনুষ্যের উপর আধিপত্য করিয়া আসিতেছে। আপাত-মধুর অবিদ্যার বিবিধ লাস্যলীলাময়ী মোহিনীমূর্ত্তি দুর্ব্বল মনুষ্য হৃদয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহাকে মোহ-মুগ্ধের ন্যায় করিয়া তোলে। মানব তাহার সেই সৌন্দর্য্যে—বাহ্যবেশভূষায় আত্মহারা ও দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া তাহার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া, সেই মোহিনী-দত্ত মদিরাপানে উন্মত্ত হইয়া, সমস্ত ভুলিয়া যায়। কিন্তু দুইটী দিন মাত্র চলিয়া যাউক, দেখিবে, সেই মোহিনীর যে কটাক্ষবিভ্রম তোমার চিত্তের একটা যুগান্তর উৎপাদিত করিয়া তোমায় সর্ব্বতো-ভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল, তাহাই দুইটী দিন পরেই কাল ভুজঙ্গের মত তোমার অন্তঃকরণে হলাহল ঢালিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে। আর তুমি সেই তীব্র বিষের জ্বালায় ছট্‌ফট্ করি-তেছ ;—সেই বিষের প্রতাপে তোমার সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তি, মন, দেহ একেবারে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। যাহাকে পরমামৃতবোধে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া—প্রাণ ভরিয়া পান করিয়াছিলে, হায়! তাহাই আজ—এই দুই দিনের পরেই—ঘোরতর জ্বালাময় বিষাকারে পরিণত হইয়া তোমার অন্তর্দ্দাহ উপস্থিত করিয়াছে। অবিদ্যা রাক্ষসীর প্রতা-পই এইরূপ ; সংসারাসক্তির পরিণামই এইরূপ। এইরূপেই ঐ দুষ্টা মানবকে মজাইয়া তাহার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকে। কিন্তু বিদ্যা এরূপ নহে। বিদ্যার সংসর্গে মনুষ্যহৃদয় এক অপূর্ব্ব পীযূষধারায় অভিষিক্ত হইয়া থাকে। যদিও, বিদ্যা যখন প্রথম মুহূর্ত্তে মানবের নয়নপথবর্ত্তী হয়, তখন যদিও আপাততঃ তাহাকে বড় কদা-কার বলিয়া বোধ হয় ; বড় ভয়ানক বলিয়া মনে হয়, তথাপি ইহার সংসর্গ পরি-ণামে অমৃতরস অভিসিঞ্চন করিয়া দেয়। বিদ্যা যখন প্রথম উপস্থিত হয়, তখন মনে হয় যেন এ কি এ? কে এই ঘনকৃষ্ণ বসন পরিধান করিয়া, ঘোরকৃষ্ণবসনে স্বীয় শরী-রের সর্ব্বাংশ সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদন করিয়া আমার সম্মুখে উপনীত হইল? কে এ, যাহার শরীর হইতে—যাহার আচ্ছাদিত বপুঃ হইতে দারুণ জ্যোতিরাশি বহির্গত হইয়া একটা দারুণ উষ্ণতার উচ্ছ্বাস আন্দোলিত করিয়া তুলিল? কিন্তু একবার ঐ অবগুণ্ঠন মোচন কর, ঐ তেজ একবার মাত্র কোন রূপে সহ্য করিয়া উহাকে হৃদয়ে তুলিয়া লও, দেখিবে, কোথায় সে কৃষ্ণচ্ছায়া চলিয়া গিয়াছে, কোথায় সেই দাহকারী তেজ অন্তর্হিত হইয়াছে। তাহার পরিবর্ত্তে কমনীয় পরমাশান্তি বিধায়িনী ও সহস্রক্লেশের পরমৌষধিময়ী স্নেহমাখা একটী দেবীমূর্ত্তি প্রাদুর্ভূত হইয়া শুভ্র-হাস্যের কিরণমালায় তোমার হৃদয়ে এক অতি সুন্দর সুষমার আবির্ভাব করিয়া দিয়াছে!! বিদ্যার প্রতাপই এইরূপ; আপাতকঠিন হইলেও পরমার্থের পরিণামই এইরূপ।

এই অবিদ্যার নাম জগৎ এবং এই বিদ্যার নাম ব্রহ্ম। জগৎ ও ব্রহ্ম, অবিদ্যা ও বিদ্যা দ্বারা মানব দৃঢ়নিয়মিত এবং নিয়ত-নিবদ্ধ। শ্রুতি বলেন—

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত স্তৌসংপরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ। শ্রেয়ো হি ধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে।" (কঠোপনিষৎ)।

"জ্ঞানী ব্যক্তিই ব্রহ্মকে গ্রহণ করেন, আর অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিই যোগ ক্ষেম-অভি-লাষে সংসারে আসক্ত হইয়া পড়ে।" হায় মনুষ্য! এই মহা দাবদাহদারুণ সংসারে শতবার সুদগ্ধ হইয়াও বুঝিলে না! ব্যাধ

নিগূঢ়রূপে দূর হইতে জাল পাতিয়া রাখিয়াছে ;—তুমি তাহাতে শতবার পড়িয়াও, আবার বহ্নি-মুখ-বিবিক্ষু পতঙ্গবৎ, তাহাতেই পড়িবার জন্য পুনরপি ধাবিত হইতেছ। হায়! এমন করিয়া কি লোকে মজিতে পারে? এমনি করিয়া কি বুদ্ধি-জ্ঞান-বিশিষ্ট মানব নিজপদে কুঠারাঘাত করিতে পারে? হা অন্ধ! ঘোরান্ধকারে ক্ষণ-প্রভাবৎ—যে একটু ক্ষণিক সুখের আশায় এইরূপে নিয়ত প্রধাবিত হইতেছ,—জানিতেছ না যে, উহা পরক্ষণেই আবার তোমারই চক্ষে শত-সূচী-ভেদ্য অন্ধকারের দারুণ জ্বালার আবির্ভাব করাইয়া তোমায় পথভ্রান্ত, ক্ষুব্ধ ও পাতিত করিয়া দিবে? তাই বলি, এমন অন্ধতা কেন? দেখিতেছ, বুঝিতেছ যে, যাহার আশায় জালে পড়িতেছ, সে যে দুই দিনের জন্য। যাহা দুই দিনের জন্য—যাহার পরিগ্রহ পরক্ষণেই বিষাদ আনিয়া দেয়,—যাহার প্রাপ্তি পরমুহূর্ত্তেই আরও আশা বাড়াইয়া দিয়া নিয়ত চিত্তচাঞ্চল্য-জনিত ঘোর তৃষ্ণার উৎপাদন করায়,—বলি, বুঝিয়া জানিয়া দেখিয়া—এই স্বাধীনতা-পূর্ণ মানব তাহার জন্য এত লালায়িত হয় কেন?-

> "অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ,
> স্বয়ন্ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
> দন্দ্রম্যমানাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়াঃ,
> অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ।"

এইরূপ মূঢ়ের ন্যায় ইতস্ততঃ বিক্ষেপ-কারি-অবস্থা সাধ করিয়া লোকে ডাকিয়া আনে কেন? মানবমনে বিধাতা শক্তি (Preferential Power) এবং স্বাধীনতা (Free-will) নিহিত করিয়া দিয়াছেন। একটু পরিচালনা করিলেই, মনুষ্য আপন-পথের কণ্টক বাছিয়া লইয়া, সুগম করিয়া লইতে পারে। তবে কেন এই অজ্ঞানতা? তবে কেন নিজ হাতে তুলিয়া বিষ-পাত্রে চুম্বন? কে বলিবে, ইহার কারণ কি?

মানুষ নিজেই নিজের পথে, অতি যত্নে—ইচ্ছাপূর্ব্বক স্বহস্তে—কণ্টক রোপণ করিয়া ফেলিয়াছে। সাধে এ সংসার দুঃখময়? সাধে কি এই দারুণ যন্ত্রণা ও হাহাকার অহরহ মনুষ্যকে ব্যতিব্যস্ত ও দিশেহারা করিয়া তুলিয়াছে? এই যে চীৎকার, এই যে চারিদিকে ভয়াবহ দাবানল জ্বলিয়া উঠিয়া—ঘোরগর্জ্জনে অশান্তির উষ্ণবায়ু চালিত হইয়া, প্রতিমুহূর্ত্তে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে,—ইহা মনুষ্যের স্বহস্তে-বিরচিত কার্য্যের পরিণাম মাত্র! এ দুঃখের জন্য দায়ী কে? ঐ যে অদূরে ভয়ার্ত্ত অন্নহীন কঙ্কাল-মূর্ত্তির "ভিক্ষা দে"—"মুষ্টিভিক্ষা দে" চীৎকার ও আর্ত্তনাদ শুনিতেছ—ঐ যে নীরব নিঃশ্বাসাপ্লুত অনুতপ্ত পাপীর অশ্রু-সিক্ত-বদনে নৈরাশ্যের ভয়াবহ চিহ্ন দেখিতেছ,—কে ইহার জন্য দায়ী? পুরাকালে খ্রীষ্টানদিগের সেই সুবিখ্যাত ধর্ম্মগ্রন্থে যে আদিম নরনারীর বিধাতার উদ্যানস্থ "ফল-হরণ" বৃত্তান্ত রহিয়াছে, তাহাতে যে বিধাতার আদেশ-উল্লঙ্ঘন-জনিত মানবজাতি-মধ্যে প্রথম দুঃখ ক্লেশের বীজ উপ্ত হইবার অতি মনোহর গল্প লিখিত আছে,—তুমি কি মনে কর, উহা উপন্যাস মাত্র? যদি তাহা মনে করিয়া থাক, তবে আমি বলিব, তুমি ভুল বুঝিয়াছ! আমি বলি, উহার প্রত্যেক অক্ষর সত্য। মানবই ত নিজে সাধ করিয়া—ইচ্ছাপূর্ব্বক—এই ধরাধামে—মঙ্গলময় ঈশ্বরের পরমমঙ্গলময়রাজ্যে—এই দুঃখবহ্নির বীজ নিজ হাতে রোপণ করিয়াছে। তাই ত এই ক্রন্দন! তাই ত এই হায়! হায়! রবে

দিগন্ত অহর্নিশ প্রতিধ্বনিত!! দুইটী ভিন্ন পথ ছিল না। মনুষ্যের চলিবার জন্য, বিধাতার এই রাজ্যে দুইটী মাত্র পথ ছিল। যথোপযুক্ত ক্ষমতার ও অভাব ছিল না; বিধাতা শক্তিও দিয়াছিলেন। তুমিই ত ভুল করিলে!! তুমিই ত ঈশ্বরদত্ত স্বাধীনতার অপব্যবহার করিয়া ফেলিলে!! এক পথ দিয়া চলিলে শান্তি পাইতে, দুঃখ থাকিত না, বিধাতার পুত্র বিধাতার নিকটেই পৌঁছিতে পারিতে। তখন তোমার হাস্যে এসংসার হাসিত, তোমার স্ত্রী পুত্র আত্মীয় হাসিত। তুমিই ত পথ বাছিয়া লইতে পারিলে না। সেই সুখের পথ ছাড়িয়া দিয়া, এই দুঃখের পথ দিয়া চলিতে আরম্ভ করিলে। যখন দুঃখ পথে, পাপ পথে ইচ্ছা পূর্ব্বক তুমি, পদ-নিক্ষেপ করিয়াছিলে, তখনই ত বিধাতা তোমার বিবেক (Conscience) দ্বারা ঐ পথে চলিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কৈ, তুমি ত তাঁহার আদেশ গ্রাহ্য করিলে না। সেই দিনই ত তোমার 'কপাল ভাঙ্গিয়াছিল'। সেই দিনই জানি, তোমার কপাল ভাঙ্গিয়াছিল'। সেই দিনই জানি, তোমার অদৃষ্ট পড়িল। তাই বলি মানব! তুমি দোষ দেও কাহাকে? নিজে যে পথ বাছিয়া লইয়াছ, কাহারও আদেশ না শুনিয়া, স্বাধীনতার অপব্যবহার করিয়া—যে পথ দিয়া চলিয়াছিলে, সে পথে আজ যদি তোমার পদে কণ্টক বিদ্ধ হয়, সে পথে আজ দস্যু-তস্কর তোমার সর্ব্বস্ব লুটিয়া লয় ও তোমার জীবনান্ত উপস্থিত করে—তবে সে জন্য দায়ী কে? সে জন্য কে দোষী?

অদৃষ্ট বল, কর্ম্মফল বল, ভগবদিচ্ছা বা বিধাতার লীলা, যাহাই বলনা কেন, একথা কিন্তু স্থির নিশ্চয় যে, মানব সংসারে বিজড়িত থাকিয়াও, উহার আপাততঃ মনোমুগ্ধকর লীলার বিষম পরাক্রমে আত্মহারা হইয়াও, যাঁহারা দৃঢ়চেতা,—যাঁহারা স্বাধীনতা ও শক্তির পরিচালনা করিতে পারেন, তাঁহারা জানেন যে না, না, সংসারের এ পদগৌরব, এ বিদ্যা-বিভব, এ ক্ষমতা-ঐশ্বর্য্য, এ সুখ-সম্পদ ইহারা কিছুই নহে। ইহাদের জন্য, অসারের পরিভোগের জন্য, প্রাণীরাজ্যের শ্রেষ্ঠ জীব মানব কখনই নির্ম্মিত হয় নাই। অবিদ্যার জন্য মানব নহে। মনুষ্য বিদ্যার জন্য। তাই বলি, নাই কি? তেমন মানুষ আছেন, যাঁহারা "জগতের" মনোমাদন বেণুনাদে মুগ্ধ হন না। তাঁহারা চান, সেই আত্মার— "ব্রহ্মের" স্ফুটতর বংশীরব। যাঁহারা দুইচারি দিনের সুখসম্পদে, ভোগ-বিলাসিতায়, গা ঢালিয়া দেন না; তাঁহারা চাহেন, সেইরূপ আনন্দ, যাহার আর কদাচ বিরাম ঘটিবেনা; যাহা পরিণামে বা ভোগে বিরস হইবে না; এবং যাহা পাইলে আর অন্য কোন আনন্দের অভিলাষ থাকিবে না।

সে আনন্দ কিরূপ? সে আনন্দ,—এক মাত্র ব্রহ্ম। এ নীরস জগতে সে আনন্দ মিলে না। ঐ বিশাল আনন্দের মহাসাগর সেই একমাত্র ব্রহ্ম। যাঁহা হইতে এ জগৎ প্রকটিত, অথবা যাঁহা ভিন্ন জগতে দ্বিতীয় কিছুই নাই,—সেই আনন্দে মজিলে আর কিছুতেই চিত্ত মজিতে চায় না। তাঁহাকে পাইলে আর মন কাহাকেও পাইতে চায় না।

সাংখ্য, ন্যায় ও বেদান্ত—সমস্ত দর্শনেরই এক মাত্র প্রয়োজন "নিরতিশয় আনন্দলাভ"। সেই নিরতিশয় সুখ কি? বেদান্ত বলেন— "নিরতিশয়ং সুখঞ্চ ব্রহ্মৈব"। আমরা এই প্রবন্ধের বিগত পাঁচ সংখ্যায় সেই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের সহিত জগতের সম্বন্ধ বিষয়ে

ত্রিবিধ দর্শনের ত্রিবিধ সিদ্ধান্ত দেখাইয়া আসিয়াছি। সেই প্রণালীত্রয় পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কিন্তু 'প্রণালীতে' যত মতদ্বৈধ থাকুক্ না কেন, 'ব্রহ্ম প্রাপ্তি' সম্বন্ধে ত্রিবিধ দর্শনের কোনও রূপ মতদ্বৈধ নাই। এখানে এক পথ। এখানে "ঋজু কুটিল নানা পথজুষাং নৃনামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব"। এখানে গম্য-স্থান একটী মাত্র। সমুদয় দর্শনের মতে, এ আনন্দলাভের উপায়—এ বিদ্যাপ্রাপ্তির এবং অবিদ্যা-পরিহারের—একমাত্র উপায় জ্ঞানার্জ্জন। একমাত্র "জ্ঞান' উপার্জ্জন করিতে পারিলেই সংসারাসক্তি আপনা আপনি শিথিল হইয়া যায়। তখন চিত্তবিক্ষেপ দূরে যাইয়া নিরতিশয় আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটে। একমাত্র জ্ঞানই, ব্রহ্মপ্রাপ্তির দ্বার স্বরূপ ও মোক্ষ জনক। "তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়'। এজ্ঞান কিরূপে লাভ করা যায় দর্শনশাস্ত্রে তাহারও মীমাংসা আছে। কিন্তু সে কথা আর একদিন বলিব।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

আসুর-যুদ্ধজয়ী বীরের কথা।

মানব জীবন এবং সংসার-প্রাঙ্গণ মহা সংগ্রামময়। অন্তরে এবং বাহিরে অবিরত মহা সংগ্রাম চলিতেছে। এই সংগ্রামে নর-নারী আকুল,ব্যাকুল এবং অস্থির। দুনির্বার্য্য তাহার আক্রমণ, দুরতিক্রমণীয় তাহার পরাক্রম, সূচিভেদ্য তাহার তীব্রতা। মহা-সংগ্রামে সকলে ত্রাহি ত্রাহি রবে ভুবন পূর্ণ করিতেছে। প্রজ্জ্বলিত চুল্লির তীব্র দাহন, মহা শঙ্কট। মানুষ অবিরত তাহাতে পুড়িয়া মরিতেছে। বুঝিবা এ সংসার রসাতলে যায়!

অন্তরে মহাসমর—শ্রেয় এবং প্রেয়ে,—নিবৃত্তি এবং প্রবৃত্তিতে, বৈরাগ্য এবং আসক্তিতে। শ্রেয়ের, নিবৃত্তির এবং বৈরাগ্যের মহা অস্ত্র—সংযম। প্রেয়ের, প্রবৃত্তির এবং আসক্তির মহা অস্ত্র—মোহ এবং অহঙ্কার। সংযম, ক্রমাগত, তরঙ্গায়িত মহা সমুদ্রের কর্ণধারের ন্যায়, স্বর্গের সোজাপথ মানুষকে দেখাইতেছে,—এক গতি, এক-লক্ষ্য, এক পরিণাম—একই মুক্তি। বলিতেছে—"চাঞ্চল্য বিনাশ কর,কঠোর হইতে কঠোর হও, রিপুকে সাধন-যূপ-কাষ্ঠে বলি দেও, তারপর সবলমনে সরল পথে চল। না-ই বা পাইলে লোকের প্রশংসা, না-ই বা পাইলে জগতের সম্মান, না-ই বা পাইলে ধন ঐশ্বর্য্য, তাতে কি? ঐ দেখ স্বর্গ, ঐ দেখ মুক্তি, ঐ দেখ ভক্তি, ঐ দেখ প্রেমময়ী মহাবিদ্যা—মা। কি ছার সংসার, উহা ক্ষণস্থায়ী, দুদিনের, এ শরীর অস্থায়ী, এরিপু সকল অস্থায়ী, ইন্দ্রিয়গণ অস্থায়ী। সার এবং নিত্য-কালস্থায়ী যে অবিনশ্বর প্রেম পুণ্য, যোগ ভক্তি, তাহার জন্য লালায়িত হও,—দেখ, দেখ, চাহিয়া দেখ,ঐ বিশ্ব-বিমোহিনী, অরূপ-রূপ-ধারিণী, নিরাকারে-সাকারা চিন্ময়ী মাতৃমূর্ত্তি। বল মাভৈঃ মাভৈঃ—কিসের ভয়? রিপুকুলকে বলি দেও, ইচ্ছা এবং বাসনা-দৈত্য সকলকে বিনাশ কর, নিবৃত্তি-নিরঞ্জনা-তটে স্বতন্ত্র ইচ্ছাকে বিসর্জ্জন

দিয়া, দেব-বসন পরিধান করিয়া, নিষ্কাম যোগীবেশে মহামায়ার মহা পবিত্র মন্দিরে প্রবিষ্ট হও।" শ্রেয়ের এই সুমহান, সুপবিত্র,অমোঘ উপদেশ নির্দ্দেশিত পথে চলিতে কাহার না সাধ হয়? মানব অন্তরে মহে শ্বরীর মহাবাণী শুনিয়া দলে দলে ছুটিতেছে। স্ত্রীপুরুষ,জ্ঞানী মূর্খ, ধনী দরিদ্র, বৃদ্ধ বালক, অবিভেদে সকলে দল বাঁধিয়া মঠপ্রাঙ্গণে ছুটিতেছে। একটী নয় দশটী নয়—কোটী কোটী নরনারী সমবেত, কোটী কোটী সম্প্রদায় একত্রিত। মানুষ ভেদাভেদ ভুলিয়া যেন মহাপ্রাণতায় বদ্ধ হইয়াছে। সকলে কণ্ঠে বলিতেছে মাভৈঃ মাভৈঃ। কিন্তু একি? আসিতে আসিতে সকলেই থামিয়া যাইতেছে কেন? কোটী কোটী লোক যাত্রা করিয়াছিল লক্ষ্যে আসিল কয়টী—লক্ষ্যধামে পৌছিল কয়টী? কে যেন সকলকে পথ হইতে ছিনাইয়া লইয়া যাইতেছে। সত্য সত্যই পথে মহা সংগ্রাম বাঁধিয়া গিয়াছে। মার-পিশুনের অত্যাচারে যাত্রীগণ অস্থির। প্রেয়ের মহাদূত মোহ এবং মায়া, পথিমধ্যে যাত্রীগণকে মধুস্বরে যেন জিজ্ঞাসা করিতেছে "কোথায় যাও? দুগ্ধ ফেননিভ সুখশয্যা ভুলিয়া, সুখের নিকেতন যুবতী ভার্য্যা পরিত্যাগ করিয়া কোথায় মরিতে যাইতেছ? মানব-শাক্য ফের, ফের, ফের। ঐ পথে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, রিপু-বিচ্যুতি, শরীর-পাত, বিপদ, বিপদ—কেবল বিপদরাশি। ক্ষুধার আহার নাই, পিপাসার জল নাই, শয়নের শয্যা নাই, ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি নাই—নাই, নাই, কিছুই নাই। সুখ নাই, তৃপ্তি নাই, ধন নাই, সম্পদ নাই, গাড়ী নাই, বাড়ী নাই, যশ নাই, সম্মান নাই, আছে কেবল কষ্ট, দুঃখ, এবং বিপদ। কেন মত্ত মাতঙ্গের মত ধাইতেছ, ফের, ফের। এ রাজ্যে আমি তোমাকে রাজা করিয়া দিব। রিপুর পরিচর্য্যার জন্য দাস দাসী দিব, বিলাসের উপযোগী আতর দিব, গোলাপ দিব, আর কি চাও? যশ দিব, মান দিব, গাড়ী দিব, বাড়ী দিব। ফের ফের, দশের মধ্যে এক মহাজন হওয়া থাক।" মানুষ চাহিয়া দেখিল,কি একটা মনোমুগ্ধকর মূর্ত্তি দাঁড়াইয়া মোহন স্বরে এই সব কথা বলিতেছে। আর কি পা চলে! কুহক-মন্ত্রে সে যেন হতজ্ঞান, আসিতে আসিতে দাঁড়াইতেছে, কেহ পলাইতেছে, কেহ অগ্রসর হইতে হইতেও ভাবিতেছে। এই স্থলে সংযম এবং অহঙ্কার ও মোহের ভীষণ যুদ্ধ হইতেছে। এই মহা সমরে—মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক,সব লোপ পাইতেছে। শেষে অনেক মানুষই পরাজিত হইতেছে। আসিতে আসিতে ফিরিয়া যাইতেছে পৌণে ষোল আনা লোক। লক্ষ্যে পৌছিয়াছে, এ জগতে কয় জন?—অঙ্গুলির কর গণিয়া তাহা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

এই ত গেল ভিতরের যুদ্ধ। বাহিরের যুদ্ধ ইহারই প্রতিরূপ,কিন্তু আরো ভীষণতর। ভিতরে যাহার উপদেশ,বাহিরে তাহার কাজ। দলে দলে লোক ধর্ম্ম-মন্দিরে আসিতেছিল, পথে কাহাকেও সুন্দরী স্ত্রীর প্রলোভনে, কাহাকেও অধর্ম্মের কুহক মন্ত্রে ভুলাইয়া নরকের পথে লইয়া যাইবার জন্য পাপ দস্যুগণ অবিরত চেষ্টা করিতেছে,টানাটানিতে সকলে অস্থির। কেহ বার আনা পথ আসিয়া বৃদ্ধ বয়সে শেষে যুবতীর প্রণয়ে পড়িয়া মারা গেল,কেহ বা টাকার মায়ায় দয়া মায়া বিসর্জ্জন দিয়া নিশ্মম-রাস্তায় গগনভেদী বড়মানুষী কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া ধনে মানে পুজিত হইতে লাগিল। ভিতরের যুদ্ধের আড়ম্বর নাই, শব্দ নাই—কিন্তু

বাহিরের যুদ্ধের আড়ম্বরে ও হুজুগ-শব্দে জগৎ পরিপূর্ণ। ভীষণ সংগ্রাম। কেহ গৈরিক জামা আঁটিয়া, গৈরিক পাগড়ী মাথায় দিয়া ধর্ম্মমন্দিরে যাইতেছিলেন, অমনি আসক্তি-সিপাই ও চৌকিদার তাঁহাকে কাণে ধরিয়া গাড়ীতে চড়াইয়া, প্রশংসা যশের মুকুট মস্তকে তুলিয়া মহাবাদ্য সহ আসক্তির রাস্তায় রাস্তায় ঘুরাইয়া বেড়াইতেছে; এবং জগৎকে দেখাইতেছে, কার শক্তি কত? কেহ স্ত্রীপুত্র পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ্যে যাইতেছিলেন—প্রবৃত্তি তাহাকে ছিনাইয়া লইয়া সহস্র নারীর এক-পতি করিয়া বিলাসের মধ্যে শোয়াইয়া দিতেছে! এবং দেখাইতেছে, কার শক্তি কত? কেহ ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া, চিরকৌমার-ব্রত লইয়া বক্তৃতার চোটে গগন ফাটাইত, আজ সংসার-যোগ-মন্দিরে তাহাকে রমণীর পদ-তলে লুণ্ঠিত করিতেছে, কেহ প্রতিবাদরূপ মহা অস্ত্র হস্তে করিয়া পাপী দমনের জন্য ধর্ম্মের সহরে ঢুকিয়া ছিলেন, আজ তিনি মত্তমাত-ঙ্গের ন্যায় পাপ-পঙ্কে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে-ছেন, এবং নিজ-স্বভাব দোষে, তবুও, আজও অন্যের নিন্দা করিয়াই স্বীয় স্বভাবের পরি-চয় দিতেছেন। মহারাজ্যে মহাসমর—মহা সংসার-চক্র-ব্যূহে শত শত অভিমন্যু মহারথী প্রাণ হারাইতেছেন! সংসারটা বুড়িয়া এখন যেন কেবল দেবাসুরের সংগ্রাম চলিতেছে। জয় পরাজয় বিধাতা অন্তরীক্ষে থাকিয়া লিখিতেছেন। মহাচক্রীর মহালীলা।

পাঠক, ক্ষণকাল ভাবিয়া দেখ—কথাগুলি সত্য কি না? তোমার অন্তরে বাহিরে মহা সংগ্রাম চলিয়াছে কি না? তুমি যাহা করিবে ভাবিতেছ, করিতে পারিতেছ, না পদে পদে বাধা পাইতেছ? পদে পদে তোমাকে প্রবৃত্তি-কুলের হস্তে লাঞ্ছিত এবং অপমানিত হইতে হইতেছে কি না? ভাবিয়া বলত, যাহা বলিতেছি, তাহা ঠিক কি না?

পৃথিবীর ধর্ম্ম-ইতিহাস একথা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, সন্দেহ নাই যে, যুদ্ধে পুণ্যবলেরই জয় হইতেছে। অসংখ্য জাতি এবং সম্প্রদায় আসুর-সংগ্রামে পরাজিত হইয়া মরণের পথে যাইলেও, এখনও পুণ্যবলের শক্তি অপরাজিত। কিন্তু সে পুণ্যরাজ্য এবং সে পুণ্যজাতি আজ কোথায়, সেখানে কেবল সংযমের জয়, মোহ এবং অহঙ্কারের পরা-জয়। আমি খুজিয়া খুজিয়া হয়রাণ হইলাম, সে রাজ্যের খোজ খবর পাই না। হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ খৃষ্টান, সব সম্প্রদায় খুজিয়া দেখিয়াছি, সেই অনাবিল, অপরা-জিত, বিমল পুণ্যজ্যোতি অতি অল্পই দেখি-য়াছি। নবোত্থিত ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের কথাই বল এবং পুনরুত্থিত হিন্দুসম্প্রদায়ের কথাই বল, পুণ্যজ্যোতিতে যাঁহার বদন উজ্জ্বল হইয়াছে, মহাসংযমে যাহার রিপুকুল ধ্বংশ হইয়াছে, চারত্রের অজেয় সিংহাসনে যে দৃঢ় এবং অটল, নির্ব্বিকার এবং নির্ম্মল, সদা প্রসন্ন এবং নিরলস, এমন লোকের সহিত অতি অল্পই সাক্ষাৎ হইয়াছে। গেরুয়া পরিয়া ধনের পুঁটুলি লইয়া বিলাস গাড়া হাঁকায়, এমন যোগী দেখিয়াছি, যুবতীর চরণে চরিত্র উৎ-সর্গ করিয়া মহাজনত্ব পায়, এমন ধার্ম্মিকও ?) দেখিয়াছি;—দীর্ঘ তিলকধারী নিরামিষ-ভোজী পর ধন লুণ্ঠনকারী বৈষ্ণব দেখিয়াছি, দীর্ঘ উপাসনা-সম্পন্ন হিংসুক, নিন্দুক, কপট, প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গকারী ভণ্ড তপস্বী দেখিয়াছি, কিন্তু এমন লোক কম দেখিয়াছি, পাপে পরা-জিত হওয়া যাঁহার পক্ষে অসম্ভব, যিনি খ্রীষ্টের ন্যায় বিশুদ্ধ চরিত্রে চিরকৌমার্য্য অবলম্বন

করিয়া, কেবল পরসেবায় এবং পরচিন্তায় জীবন কাটাইতেছেন। ধর্ম্ম কথায়, উপাসনায়, বক্তৃতায়,পোষাক পরিচ্ছদে, না চরিত্রে এবং জীবনে, তুমি ভাই বলিতে পার কি?

সুদীর্ঘ জীবনপথ খুঁজিয়া খুঁজিয়া দুই দশ জন আড়ম্বরহীন জীবন্ত, জয়ী সাধকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে মাত্র। আর যত দেখি, সব যেন সংসার-সংগ্রামের পরাজিত জীব। আজ এক বারের কথা বলিতেছি। একজন পবিত্র লোক—তিনি চিরকুমার—এখন তাঁহার কাল চুল দাড়ি শ্বেত হইয়াছে—এবার কলিকাতায় মাঘোৎসব দেখিতে আসিয়াছিলেন। যখন পূর্ণ উৎসাহে মাঘোৎসব চলিতেছে, এমন সময়ে তাঁহার একজন"বসুধৈব-কুটুম্বকম'' আত্মীয়ের দারুণ জ্বর হয়। মাঘোৎসব কোথা দিয়া চলিয়া গেল, তিনি ঐ রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া অহরহ কেবল শুশ্রূষা করিতেছেন। সভা হইল, সমিতি হইল, কত উপাসনায় কত জনের প্রাণ সরস হইল, কত বক্তৃতার স্রোত বহিল, কত ইভিনিং-পার্টিতে আমোদ চলিল, বৃদ্ধের উৎসব-ক্ষেত্র রোগীর শয্যা। আজ ফাল্গুন মাসের ১০ তারিখ, আজ তিনি "বসুধৈব-কুটুম্বকম"দেশে যাত্রা করিলেন !! উল্লাস নাই, নৃত্য নাই, বক্তৃতা নাই, কথা নাই,—নীরব আড়ম্বরহীন একটী বৃদ্ধ কেবল দরিদ্রের সেবা, কেবল পরসেবা করিয়া ধন্য হইতেছেন। সাধন তাঁহার পরসেবা,যোগ তাঁহার পরসেবা,বক্তৃতা তাঁহার পরসেবা—জীবন তাঁহার পরসেবা। খাটিয়া খাটিয়া, কেবল পরের জন্য খাটিয়া খাটিয়া জীবন প্রায় শেষ করিয়াছেন। তাঁহার নাম এদেশের বড় কেহ জানে না। তাঁহার কথা বড় কোন সংবাদপত্রে উঠে না। তিনি যে দলে, তাঁহাকে লইয়া সে দলও বড় উচ্চবাচ্য করে না। গাড়ী নাই, বাড়ী নাই, সহায় নাই, সম্বল নাই, তিনি গরিব, তিনি অতি গরিব। তাঁহার মান নাই, সম্মান নাই,তাঁহার আহার সামান্য—কেবল কতকগুলিশুধু ভাত বলিলেই হয়। পরিধান সামান্য—কেবল সামান্য থানের কাপড়। আকৃতি চেহারা, কিছুই ভাল নহে। তিনি বড় গরিব, তিনি বড় গরিব। কিন্তু তাঁহাকে দেখিলে, বোধ হয়, তিনি যেন জীবন-সংগ্রামের মহাসন্ধে জয় লাভ করিয়া আসিয়াছেন। আসুর-সংগ্রামে কেহ কখনও তাঁহাকে পরাজিত হইতে দেখে নাই। তাঁহাকে দেখিলে, বোধ হয় যেন, তাঁহার শ্বেত শ্মশ্রু ভেদ করিয়া কি এক স্বর্গীয় পবিত্রতার জ্যোতি বাহির হইতেছে। মুখে কথা নাই, তবু শাস্ত্র আছে; হাত নীরব, কিন্তু কাজে ভরা; সে জয়ী বীর মৃত্যুময় রাজ্য ছাড়িয়া এক অমৃত এবং অমর রাজ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। দেখিয়া দেখিয়া, আমি সে অপরূপ দেখিয়া দেখিয়া মজিয়াছি। তিনি দেশবিখ্যাত বিবেকানন্দ নহেন, তিনি অমর ভক্ত কেশবচন্দ্র নহেন, তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ নহেন, তিনি নেতা শিবনাথ নহেন,তিনি যোগী বিজয়কৃষ্ণ নহেন, তিনি বড় গরিব,তিনি বড় গরিব। তিনি যেন রিপু জয় করিয়া অমূল্য সংযমব্রতে দৃঢ় এবং বলিষ্ঠ। শুনিয়াছি, তিনি যেস্থানে থাকেন, সেখানকার লোকেরা ঋষী বলিয়া তাঁহাকে মান্য করে। ব্রাহ্মসমাজের আর সব লোককে যাহারা নিন্দা করে, তাহারাও তাঁহার নাম শুনিলে অবনত-মস্তক। তিনি চরিত্র-গুণে অমর ভুবনমোহনরূপে প্রতিষ্ঠিত। সে গরিব, এই ধরায় যেন কি এক নিত্যানন্দ লাভ করিয়া মহাবীর হইয়াছেন। তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে কোটী কোটী প্রণাম।

আমি সংসারে তাঁহাকেই শ্রেষ্ঠত্ব দি, যিনি অতীন্দ্রিয়ত্ব পাইয়াছেন; যিনি অসার ছাড়িয়া সার ধরিয়াছেন, যিনি নিজ ইচ্ছা এবং নীচবাসনাকে পরাজয় করিয়া দেব-ইচ্ছার অনুবর্ত্তী হইয়াছেন। তিনি রাম-কৃষ্ণই হউন, বা তিনি শাক্য-সিংহই হউন, তিনি মেরী-তনয় যিশুই হউন, বা তিনি ম্যাটসিনিই হউন, তাঁহাকে কোটী কোটী প্রণাম। আর আমি, তুমি, সে, যাহারা কেবলস্রোত-তাড়িত শৈবালের ন্যায় প্রবৃত্তি-তাড়নায় ভাসিয়া ভাসিয়া সংসারের ঘাটে ঘাটে, তটে তটে ফিরিতেছে, তাহারা নীচ হইতেও নীচ, দীন হইতেও দীন। আমরা প্রতিমুহূর্ত্তে সংসার সংগ্রামে পরাজিত হইতেছি এবং অহঙ্কারে জগৎ কাঁপাইয়া নিজ নিজ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিতেছি! আমাদের টাকা কড়ি, যশ মান, বিদ্যাবুদ্ধিতে ছাই পড়ুক। যাহাতে আমাদিগকে অমর করিতে পারে না, তাহাকে আদর করিয়া বৃথা জীবন কাটাইলাম! প্রবৃত্তি-সাগরে ভাসিলাম, কিন্তু নিবৃত্তি-হ্রদে ডুবিলাম না। মোহে মজিলাম, কিন্তু সংসারের অতীত হইতে পারিলাম না। পরাজিত হইতে জন্মিয়াছি, প্রবৃত্তিকুলের দ্বারা পরাজিত হইতেই লাগিলাম। আমাদের সাধন ভজন সবই ভণ্ডামী নহে কি? অটল ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া, প্রবৃত্তিকে পরাজয় করিয়া, সংযমকে এক মাত্র সহায় করিয়া যে ব্যক্তি যশ মানের অতীত ধামে নির্ব্বিকার, নির্লিপ্ত এবং নিরলস না হইতে পারিল, তাহার কার্য্য কি মহাছেলেমী নয়? কে বলিবে, নয়?

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

৩৬। আসাম প্রদেশের বিশেষ বিবরণ।—শ্রীশরচ্চন্দ্র দত্ত ও শ্রীগঙ্গাগতি দাস প্রণীত, মূল্য ।৵০; কলিকাতা, কলেজ ষ্ট্রীট, এম, এম, মজুমদারের দোকানে প্রাপ্তব্য। আমরা এই পুস্তক খানি পড়িয়া যারপর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছি। আসাম প্রদেশের সমস্ত জ্ঞাতব্য কথা ইহাতে সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে। এত সংক্ষেপে কোন দেশের সমস্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা যায়, আমাদের ধারণা ছিল না। লেখকগণের ক্ষমতা দেখিয়া আমরা মোহিত হইয়াছি। পুস্তক খানি শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ পাঠ্য-তালিকা ভুক্ত করিলে আমরা সুখী হইব।

৩৭। চরিত-মুক্তাবলী।—শ্রীকাশী চন্দ্র ঘোষাল প্রণীত, মূল্য ॥০। অশোক, মণিকা, থিওডোসিয়স ও কনষ্টান্সিয়া, তুকারাম, দয়ানন্দ সরস্বতী, সক্রেটিস, তেগ বাহাদুর, টেলিমেকাস এবং বলরাম হাড়িয় কথা ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কাশী বাবু কয়েক খানি ক্ষুদ্রপুস্তকে সাধু মহাজনদিগের জীবন-কথা লিখিয়া আমাদের বিশেষ ধন্যবাদই হইয়াছেন। তাঁহার নির্ব্বাচন ভাল, ভাষা প্রাঞ্জল। কাশী বাবু এইরূপ সংগ্রহের দ্বারা বাঙ্গলার প্রভূত উপকার করিতে পারিবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

৩৮। মর্ম্মগাথা।—শ্রীমতী নগেন্দ্র বালা মুস্তোফী প্রণীত, মূল্য ৸০। কোমল এবং মধুর-প্রকৃতি বালিকা এবং মহিলাগণ সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখিয়া প্রতিপন্ন করিতেছেন, স্ত্রীশিক্ষার প্রদেশে সুফল ফলিয়াছে। যাঁহারা স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্ত্তনে যত্নবান, তাঁহাদিগের আনন্দের সীমা নাই। বিধাতার কৃপায়, মাতৃজাতি অশিক্ষার ঘোরান্ধকার হইতে মুক্তি পাইতেছেন, ইহাপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি আছে? মর্ম্মগাথার গ্রন্থকর্ত্রী বালিকা, কিন্তু তিনি এই গ্রন্থে যে ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা প্রবীণার যোগ্য। তাঁহার লেখা এখনও দোষ-শূন্য হয় নাই বটে; কিন্তু আশা করা যায়, শক্তির অপব্যবহার না হইলে এবং সাধনা থাকিলে, কালে তিনি পরিচয়ের যোগ্য লেখিকা হইতে পারিবেন। বিধাতা এই কবির মস্তকে আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন।

৩৯। শিক্ষাপ্রবেশ।—শ্রীশম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত, মূল্য ।০। টেক্সটবুক কমিটী কর্ত্তৃক এই পুস্তক পাঠ্যতালিকা ভুক্ত হইয়াছে। শম্ভুচন্দ্র বয়সে এবং সুশিক্ষায়, দয়া এবং কার্য্যদক্ষতায় প্রবীণ ব্যক্তি। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ইনি উপযুক্ত ভ্রাতা। তাঁহার অনেক সৎগুণ ইঁহাতে আছে। লেখার শক্তি, তন্মধ্যে প্রধান। শিক্ষাপ্রবেশে অনেক অত্যাবশ্যকীয় বিষয় প্রাঞ্জল ভাষায়, নিপুণতার সহিত বিবৃত হইয়াছে। কৃষি কার্য্য সম্বন্ধীয় যে সমুদায় কথা ইহাতে আছে, তাহা বহুদর্শনের ফল। প্রাইমারী বিদ্যালয়ে এ পুস্তক পঠিত হইলে, ছাত্রদিগের বিশেষ উপকার হইবে।

৪০। ভারতীয় চরিতমালা — মহারাজ প্রতাপাদিত্য। – শ্রীসত্যচরণ শাস্ত্রী প্রণীত মূল্য ১৲। সংস্কৃত ডিপজিটরিতে প্রাপ্তব্য। ভারতীয় চরিতমালার প্রথম গ্রন্থ ছত্রপতি শিবজীর জীবনচরিত, দ্বিতীয় গ্রন্থ প্রতাপাদিত্য। প্রতাপাদিত্য বঙ্গবাসী কুলের গৌরব, কেবল তাহা কেন তিনি বঙ্গের এবং ভারতের গৌরব।

"যশোর নগর ধাম, প্রতাপ আদিত্য নাম
মহারাজ বঙ্গজকায়স্থ।
নাহি মানে পাতসায়, কেহ নাহি আঁটে তায়
ভয়ে যত নৃপতি দ্বারস্থ।
বরপুত্র ভবানীর প্রিয়তম পৃথিবীর,
বায়ান্ন হাজার যার ঢালী।
যোড়শ হলকা হাতী, অযুত তুরঙ্গ সাথী
যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী।"

ভারতচন্দ্রের এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে মহারাজের অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রতাপাদিত্যের কোন বিশেষ উল্লেখযোগ্য জীবনচরিত না থাকিলেও, এদেশে লোকের মুখে মুখে তিনি অমর। অসাধারণ প্রতিভা, ধর্ম্মভাব এবং বীরত্ব একাধারে সঞ্চিত থাকায় তিনি আমাদের সকলের পূজ্য।

স্বর্গে ইন্দ্র দেবরাজ, বাসুকী পাতালে,
প্রতাপ আদিত্য দাতা, অবনী মণ্ডলে।

এই প্রবাদে তাঁহার দয়ার অলিখিত ইতিহাস লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। প্রতাপের অসীম সাহস এবং নির্ভীকতার কথা সকলেই জানেন, ভারতের সম্রাটগণ তাঁহার ভয়ে সিংহাসনে প্রকম্পিত হইতেন; সুতরাং সে সম্বন্ধে অধিক কিছু লেখা বাহুল্য। তাঁহার ধর্ম্মভাব কিরূপ ছিল, শাস্ত্রীর ভাষায় তাহা উল্লেখ করিতেছি।

'প্রতাপ শক্তি উপাসক ছিলেন। তিনি এরূপ কঠোরতা সহকারে ভগবতীর অর্চ্চনা করিতেন যে, জনসাধারণ তাঁহাকে দেবীর, পরমানুগৃহীত ও বরপুত্র বলিয়া বিবেচনা করিত। তাঁহার ঈশ্বর নির্ভরতা অসাধারণ, কি ঘোরতর যুদ্ধস্থান অথবা নানা প্রকার ভোগ্য পরিপূর্ণ বিলাস ভবন, কোন স্থানেই তিনি মুগ্ধ হইতেন না, সকল সময়েই তাঁহার ঈশ্বর নির্ভরতা প্রকটিত হইত। তিনি শাক্ত হইলেও বৈষ্ণবদ্বেষী ছিলেন না। ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহার অসীম উদারতা ছিল। তিনি মুসলমান প্রজাদিগের জন্য আপন প্রাসাদের স্থানে স্থানে মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

প্রকৃত ধর্ম্মের উদয় উদয় হইলে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা তিষ্ঠিতে পারে না, মহাজনদিগের জীবন ইতিহাসে তাহা প্রকটিত রহিয়াছে। প্রতাপাদিত্য কেবল বীরত্বে নয়, ধর্ম্মেও মহাপুরুষ ছিলেন। এই মহাত্মার পুণ্যময় জীবন কাহিনী পাঠ করিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? শাস্ত্রী মহাশয় আপন অসাধারণ কৃতিত্ব এবং প্রতিভা, গবেষণা এবং বিজ্ঞতা সহ এই অমূল্য জীবনচরিত সংগ্রহ এবং লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের লেখনীতে পুষ্প চন্দন বর্ষিত হউক। তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক। শাস্ত্রী মহাশয় ভারতের লুপ্ত রত্নোদ্ধার করিতে যে কঠোর পরিশ্রম করিতেছেন, সময়ে সময়ে পুলিসের অত্যাচারে অত্যাচারিত হইয়াও আপন ব্রত পরিত্যাগ করিতেছেন না, ইহা আমাদের, এই হতভাগ্য ভারতবাসীদের, কথাসর্ব্বস্ব ব্যক্তিদিগের আদর্শ। শাস্ত্রী মহাশয় আমাদের সকলের প্রণম্য। তিনি ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া অকাতরে মাতৃসেবার জন্য খাটিতেছেন। ঘোর দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়াও তিনি দেশসেবায় ব্রত রহিয়াছেন। তাঁহার গভীর স্বদেশপ্রাণতা আমাদের অনুকরণীয়। তাঁহার জীবনের এই স্বদেশপ্রাণতা, এই গ্রন্থের পত্রে পত্রে, ছত্রে ছত্রে প্রতিফলিত। যেমন গবেষণা, তেমনি ভক্তিবিহ্বলতা। তিনি তন্ময় চিত্তে, তেজস্বী ভাষায় প্রতাপ-গুণকীর্ত্তন

করিয়াছেন। এখন এ দেশে তাঁহার এই বহু যত্নের ধন সাদরে গৃহীত হইলে হয়। কিন্তু তাহা কি হইবে না? আমাদের আশা আছে, যে দেশে মাইকেল এবং বিদ্যাসাগরের জীবনীর প্রথম সংস্করণ অতি অল্প সময়ে নিঃশেষ হইয়াছিল, সে দেশে,মহারাজ প্রতাপাদিত্যের ন্যায় অতি সুন্দর জীবনচরিত অতি অল্প সময়ে নিঃশেষ হইবে। গল্প, ছবি, উপকথা এবং কবিতার স্থলে এইরূপ সার গ্রন্থের আদর হইলেই বাঙ্গালীর মহত্ত্ব প্রকাশ পাইবে।

৪১। **শকুন্তলা-রহস্য।**—অর্থাৎ পদ্মপুরাণান্তর্গত শকুন্তলোপাখ্যান ও মহাকবি কালিদাস-কৃত অভিজ্ঞান শকুন্তলের আলোচনা। *শ্রীবিহারিলাল সরকার সঙ্কলিত,* মূল্য ১৲ এক টাকা। কালিদাসের শকুন্তলা, এদেশের অমর গ্রন্থ। যতদিন যাইতেছে, ততই পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট ইহার আদর বাড়িতেছে। বঙ্গভাষায় শকুন্তলা-তত্ত্ব লিখিয়া চন্দ্রনাথ অমর হইয়াছেন। চন্দ্রনাথের চিন্তা শক্তি, কাব্যানুরাগ, গভীর গবেষণা, তদীয় শকুন্তলা-তত্ত্বের প্রতি ছত্রে জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে। বিহারিলাল অভিনব প্রণালীতে শকুন্তলা-রহস্য ভেদ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পদ্মপুরাণের গল্প এবং কালিদাসের গল্প সমালোচনা করিয়া,এই গ্রন্থে, গ্রন্থকার অসাধারণ কৃতিত্ব সহকারে,কালিদাসের প্রতিভা, অসাধারণত্ব এবং বিশেষত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। পুরাতন কথা লিখিলেও যে তাহা নীরস হয় না, চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিলেও যে মিষ্টত্ব যায় না, কালিদাসের নাটক শকুন্তলা তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বলিলে মিথ্যার পুনরুক্তি হয় না যে, কালিদাস কেবল এই গ্রন্থ খানি লিখিলেও অমর হইতে পারিতেন। বিহারিলাল কালিদাস-প্রতিভা প্রতিষ্ঠার জন্য যে প্রভূত যত্ন ও কষ্টস্বীকার করিয়াছেন, এ জন্য সকলের নিকটই তিনি ধন্যবাদের পাত্র।

বিহারিলালের ক্ষমতা অসাধারণ, তাঁহার গবেষণা এবং পাণ্ডিত্যও অসাধারণ। তদুপরি তাঁহার ভাষাজ্ঞান আরো অসাধারণ। যে সকল প্রতিভাসম্পন্ন লেখকগণের মহীয়সী শক্তিতে এখন বাঙ্গালা ভাষা গৌরবান্বিত, বিহারিলাল তন্মধ্যে একজন। এই গ্রন্থের ভূমিকা স্বরূপ "নিজস্ব ও পরস্ব" প্রবন্ধে তাহার এই অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় রহিয়াছে। যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় পাঠযোগ্য উপযুক্ত পুস্তক নাই বলিয়া দুঃখ করেন, তাঁহাদিগকে আমরা হরপ্রসাদশাস্ত্রীর বাল্মীকির জয়, চন্দ্রনাথের শকুন্তলাতত্ত্ব ও অন্যান্য পুস্তক সমূহ,ভূদেবের প্রবন্ধ-পুস্তক সমূহ,রাজকৃষ্ণের বিবিধপ্রবন্ধ এবং জ্ঞানেন্দ্রলালের প্রবন্ধলহরী প্রভৃতি পড়িতে অনুরোধ করি। সেই সঙ্গে সঙ্গে বিহারিলালের এই শকুন্তলা-রহস্যও পড়িতে বলি। বঙ্কিমচন্দ্র এবং কালীপ্রসন্নের গ্রন্থ সকলের উল্লেখ করিলাম না, কেননা, তাহারা সুপরিচিত। বিহারিলালের এই গ্রন্থে যে অসাধারণ ক্ষমতা পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহা পড়িয়া আমরা মোহিত হইয়াছি আমাদিগকে এই পুস্তক উপহার দেওয়ার জন্য গ্রন্থকারকে বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি।

৪২। **Helps to Logic** by Kokileswar Bhattacharjea, M.A., মূল্য ৷৷৵০ কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট, বি, বানার্জির দোকানে প্রাপ্তব্য। Designed for F. A. Students, কোকিলেশ্বর বাবু নব্যভারতের পাঠকগণের নিকট বিশেষ পরিচিত ব্যক্তি। তাঁহার পাণ্ডিত্য, অতি অল্প সময়ের মধ্যে,পাঠকগণের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছে, অনুমান করি। এখানি তাঁহার ইংরাজি গ্রন্থ। এ পুস্তকে তাঁহার ঐ পাণ্ডিত্যের বিশেষ পরিস্ফূর্ত্তি পাইয়াছে। কোন জটিল বিষয়কে সহজ করিয়া বুঝান সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কাজ। দর্শন-সমুদ্র-মন্থন করিয়া কোকিলেশ্বর বাবু, সংক্ষেপে, সরল ভাষায় যে অমূল্যতত্ত্ব সকল প্রকাশ করিতেছেন, তাহা পড়িয়া বুঝিয়াছি, কঠিন বিষয় সহজ করিয়া বুঝাইবার শক্তি কোকিলেশ্বর বাবুর অসাধারণ। এই এক গুণে তিনি সকলের ধন্যবাদের পাত্র। মুন্সিগঞ্জ কলেজে-অধ্যাপনা কালে, বোধ হয়, তিনি লজিকের জটিল তত্ত্ব সমূহ পাঠকগণকে

বুঝাইবার সহজ উপায় ভাবিতেছিলেন। এই Helps to Logic সেই চিন্তার ফল। লজিক তত্ত্বকে সরল, সহজ করিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তকে কোকিলেশ্বর বাবু গভীর পাণ্ডিত্য শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। পুস্তক খানি এফ-এ পরীক্ষার্থী ছাত্রদিগণের বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। এই একখানি পুস্তক পড়িলে এই বিষয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সহজ হইবে, আমাদের বিশ্বাস। পরীক্ষার্থিগণ একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

৪৩। চণ্ডী।—শ্রীমহেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত, এবং চণ্ডী মাহাত্ম্য শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু এম্-এ বিরচিত, মূল্য ৮০। এই পুস্তক খানি উপহার পাইয়া আমরা যারপর নাই আনন্দিত হইয়াছি। বাল্যকাল হইতে চণ্ডী-পাঠ শুনিয়া আসিয়াছি। চণ্ডী-তত্ত্ব-মাহাত্ম্যে আমাদের প্রাণ পরিপূর্ণ। পিতৃদেব আমাদের ঘরে প্রতি মাসে চণ্ডীপাঠের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আমাদের দেশে এখনও সে বিধান আছে। যে সকল পরিবার শক্তি মন্ত্রে দীক্ষিত, চণ্ডী তাহাদের অন্ন, পান, জল। বাল্য হইতে আমাদের সমাদৃত চণ্ডী আজ বঙ্গ ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে, গৌরবের সীমা নাই। "পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের অনুবাদ এখন দুষ্প্রাপ্য। কবিবর নবীনচন্দ্রের অনুবাদ অক্ষরানুবাদ বলিয়া সাধারণের পাঠোপযোগী নহে।" নবীন চন্দ্রের অনুবাদ অপেক্ষা এই অনুবাদ যে বিশিষ্ট, তাহা প্রতিপন্ন করিয়া বাবু গোবিন্দ লাল দত্ত একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা নব্য-ভারতে মুদ্রিত করিতে এখনও ইচ্ছা আছে। সুতরাং সে সম্বন্ধে অধিক কিছু লিখিবার প্রয়োজন নাই। ফরিদপুরের ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু কালীপ্রসন্ন সরকার মহাশয় চণ্ডীর আর একখানি পদ্যানুবাদ সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন, সে গ্রন্থের উল্লেখ পর সংখ্যায় করিবার ইচ্ছা আছে। বঙ্গে চণ্ডীর আদর এত বৃদ্ধি পাইয়াছে, ইহা আমাদের বিশেষ আনন্দের বিষয়। মহেন্দ্র বাবুর এই গ্রন্থের পরিশেষে দেবেন্দ্র বাবুর চণ্ডী-মাহাত্ম্য প্রকাশিত হইয়াছে। দেবেন্দ্র বাবুর দার্শনিক জ্ঞানের গভীরতা এবং তত্ত্ব-জ্ঞানের প্রখরতা দেখিয়া আমরা মোহিত, স্তম্ভিত এবং অবাক্ হইয়াছি। উহা এতই সুন্দর হইয়াছে যে, বলিতে সঙ্কোচ হয় না, উহা বাঙ্গালা ভাষায় গৌরব স্বরূপ। পুস্তকে প্রকাশিত না হইলে উহা আমরা পাঠক গণকে উপহার দিতাম। বঙ্কিম বাবুর লেখনী নীরব হইয়াছে অবধি এমন সরস লেখা আমরা আর পাঠ করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। এই প্রবন্ধটী পুস্তকাকারে ছাপাইয়া বিনা মূল্যে বিতরণ করা উচিত। শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত এখন কোন ভক্ত এদেশে নাই কি, যিনি এই কাজ করিয়া ধন্য হইতে পারেন? মহেন্দ্র বাবুর বাঙ্গালা ভাষার ক্ষমতার প্রভূত পরিচয় এ গ্রন্থে পাইয়াছি, তজ্জন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদের যোগ্য। অধিক ধন্যবাদের যোগ্য এই জন্য যে, তিনি দেবেন্দ্র বিজয় বাবুর দ্বারা "চণ্ডী মাহাত্ম্য"রূপ অমূল্য রত্নের উদ্ধার করিয়াছেন। ঘরে ঘরে চণ্ডী এবং তৎসহ চণ্ডী মাহাত্ম্য,গীতার ন্যায়, পঠিত এবং প্রতিষ্ঠিত হউক।

৪৪। অপূর্ব্ব স্বপ্ন (কবিতা) শ্রীকাম পাল মিশ্র কর্ত্তৃক উৎকল ভাষায় রচিত। লেখক এখনও বিদ্যালয়ের ছাত্র। এই অবস্থায়ও তিনি যে প্রকার রচনা শক্তির পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে তাঁহার প্রশংসা করিতে হয়। প্রশংসা করিতে একটু ভয়ও হয়, কারণ অনেক ছাত্র এই প্রকার বাহবা পাইয়া অনেক সময়ে উদ্দেশ্য-বিমুখ হইয়াছেন, দেখিয়াছি। কবিতা লেখা ভাল, কিন্তু তাড়াতাড়ি পুস্তকাকারে ছাপাইবার প্রয়োজনীয়তা কি? নবীন লেখকদিগের পক্ষে একজন প্রবীণ সুলেখকের উপদেশের কথা উল্লেখ করিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন যে, কোন নবীন লেখক যেন কোন রচনা লেখার পর একবৎসর অতিবাহিত না হইলে তাহা প্রকাশ না করেন। এ উপদেশের সারবত্তা বয়স না হইলে বুঝিতে পারা যায় না।

হীরাঝিল।

সিরাজের সাধের হীরাঝিল ও তাহার উপরিস্থিত প্রাসাদ অনেকদিন হইতে কালগর্ভে নিমগ্ন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহার নিজ স্মৃতি যেমন বিস্মৃতির মহান্ধকারময় অনন্ত গর্ভে চিরনিদ্রিত রহিয়াছে, সেইরূপ তাঁহার প্রাসাদাদির চিহ্নও কালসমুদ্রে নিমগ্ন হইতে হইতে না জানি কোন্ অনিশ্চিত দেশে আশ্রয় লইতেছে। বিধাতার ইচ্ছা, মুর্শিদাবাদের সহিত সিরাজের সকল সম্বন্ধ ঘুচিয়া যায়। যে হতভাগ্য অতুলনীয় রূপরাশি ও অতুল সম্পত্তি লাভ করিয়াও সংসারে দুইদিন ভোগ করিতে পাইল না, তাহার আর স্মৃতিচিহ্ন থাকিবার প্রয়োজন কি? মুর্শিদাবাদ তাহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর হইলেও, হতভাগ্যের প্রদত্ত অলঙ্কার সে অনায়াসে ভাগীরথী জলে বিসর্জ্জন দিতে পারে। তাই কাল একে একে মুর্শিদাবাদের সকল অলঙ্কারগুলি খুলিয়া কতক বা ভাগীরথী জলে, কতক বা বসুন্ধরা-হৃদয়ে মিশাইয়া দিয়াছে। যদিও সকলের প্রদত্ত অলঙ্কার রাশি মুর্শিদাবাদনগরী একে একে উন্মোচন করিতেছে, তথাপি যাহার দ্বারা সিরাজ তাহাকে শোভাশালিনী করিয়াছিলেন, সেইগুলি কালপ্রবাহে ভাসাইয়া দেওয়া তাহার সর্ব্বতোভাবে যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে। কারণ সিরাজ যে তাহাকে প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসিতেন ও সৌন্দর্য্যময়ী করিবার জন্য প্রতিনিয়ত যত্ন পাইয়াছিলেন। সিরাজ বড় সাধ করিয়া হীরাঝিল ও তাহার উপরিস্থিত প্রাসাদের নির্ম্মাণ করেন। বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার অধীশ্বর হইয়া সেই প্রাসাদে মহানন্দে জীবন কাটাইবার ইচ্ছা তাঁহার হৃদয়ে অত্যন্ত বলবতী হইয়াছিল। কিন্তু সিংহাসনে আরোহণ করিবার কিঞ্চিদধিক এক বৎসর পরে তিনি ইহ জগৎ হইতে চিরবিদায় লইতে বাধ্য হন। সিরাজের যৌবরাজ্যকালে হীরাঝিলের প্রাসাদ নির্ম্মিত হয়। মোগল সম্রাটদিগের মধ্যে বাদসাহ সাহ জাহানের ন্যায় মুর্শিদাবাদের নবাবদিগের মধ্যে সিরাজেরও সৌন্দর্য্যপ্রীতির কথা শুনা যায়। মুর্শিদাবাদের দ্বিতীয় নবাব সুজা উদ্দীনেরও সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা ছিল বটে, কিন্তু সিরাজ তাঁহার সে প্রীতিকে অনেক পরিমাণে অতিক্রম করিয়াছিলেন। সৌন্দর্য্যপ্রীতি দেবতারও বাঞ্ছনীয়। যদিও সিরাজহৃদয়ে তাহা বিলাসাবরণে আচ্ছাদিত ছিল, তথাপি সময়ে সময়ে তাহাকে আবরণোন্মুক্তও দেখা গিয়াছে।

হীরাঝিলের প্রাসাদ মুর্শিদাবাদের মধ্যে অতি মনোরম দৃশ্য ছিল। হীরক-স্বচ্ছ ঝিলসলিলরাশি তাহার পদপ্রান্ত চুম্বন করিয়া বেড়াইত, এবং নিজ বক্ষে তাহার প্রতিচ্ছবি লইয়া ঈষৎ সমীর তাড়নেও কাঁপিয়া উঠিত। যখন জ্যোৎস্নালোকে বিধৌত হইয়া সেই সৌন্দর্য্যসারভূত প্রাসাদরত্ন হাসিতে হাসিতে ঝিলসলিলের ক্রীড়া নিরীক্ষণ করিত, সেই সময়ে কিছুদূরে ভাগীরথীবক্ষ হইতে তাঁহার অপূর্ব্ব শোভা দেখিলে মনঃপ্রাণ প্রফুল্ল হইয়া উঠিত। এই সুন্দর প্রাসাদে সিরাজ যৌবনসুলভ আমোদোপভোগ করিতে আরম্ভ করেন। আলিবর্দ্দি খাঁর সহিত প্রতিনিয়ত অবস্থান করায়, তাঁহার বিলাসোপভোগের তাদৃশ সুযোগ ঘটিয়া উঠিত না, হীরাঝিলের প্রাসাদে সেই পিপাসা মিটা-

ইতে তাঁহার অত্যন্ত ইচ্ছা হয়। অপ্সরাকণ্ঠ-বিনিন্দিত নর্ত্তকীবৃন্দ লইয়া তিনি সেই প্রাসাদে বিলাসতরঙ্গে ভাসমান থাকিতেন, এবং আসবপানে বিভোর হইয়া কলকণ্ঠী-গণের মধুর সঙ্গীতে আরও আবিষ্ট হইয়া পড়িতেন। সিরাজ সিংহাসন প্রাপ্তির পূর্ব্বে মাতামহের অনুরোধে সুরাপান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু যৌবনারম্ভে তাহাতে অত্যন্ত আসক্ত হইয়া পড়েন। কখনও বা মোসাহেব ও অনুচরবর্গের তোষামদবাক্যে এবং ভাঁড় বা কাহিনী-কথক-দিগের রহস্যালাপে বিমল আনন্দ অনুভব করিতেন। সময়ে সময়ে নর্ত্তকী ও মোসাহেববৃন্দ লইয়া সাধের তরণী আরোহণে হীরাঝিলের স্বচ্ছ সলিলরাশি আন্দোলিত করিয়া বেড়াইতেন। জ্যোৎস্নাপুলকিত যামিনীতে ঝিলবক্ষবিহারিণী তরণী হইতে যখন নর্ত্তকীগণের কণ্ঠধ্বনি দিগন্ত স্পর্শ করিতে ধাবিত হইত, তখন তাহাদের মধুর চুম্বনে ভাগীরথীর তরঙ্গলহরীও মূর্চ্ছিত হইয়া তীরক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িত। এই প্রাসাদেই সিরাজ উদ্দৌলা তাঁহার মনোমোহিনী ফৈজীর রূপসুধা পান করিয়া উন্মত্ত হইতেন, এবং অবশেষে তাহার বিশ্বাসঘাতকতায় তাহাকে জীবন্ত অবস্থায় গৃহাবদ্ধ করেন।* এই খানেই তিনি তাঁহার প্রিয়তমা মহিষী লুৎফ উন্নেসার সহিত পবিত্র প্রণয় উপভোগ করিয়াছিলেন এবং রাজ্যপ্রাপ্তির পূর্ব্ব হইতেই একে একে সকল প্রকার বিলাস বিভ্রম বিসর্জ্জন দিতে আরম্ভ করিয়া আলিবর্দ্দির সিংহাসনের পবিত্রতা রক্ষা করিতে যত্ন পাইয়াছিলেন।

হীরাঝিলের প্রাসাদকে দেশীয়গণ মনসুরগঞ্জের প্রাসাদ বলিয়া থাকেন। সিরাজ উক্ত প্রাসাদে মসনদ স্থাপন করিয়া দরবার-কার্য্য সমাধা করিতেন। ফলতঃ রাজকার্য্য হইতে সামান্য আমোদ প্রমোদ পর্য্যন্ত সিরাজের সমস্ত ব্যাপারই হীরাঝিলের প্রাসাদে সম্পাদিত হইয়াছিল। সিরাজের সেই সাধের হীরাঝিল এক্ষণে ভাগীরথীর সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, এবং তাহার উপরিস্থ প্রাসাদও কালগর্ভে নিমগ্ন হইয়াছে। দুই একটী চত্বরের ভিত্তিভূমি জঙ্গলাবৃত হইয়া এখনও তাহার স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে। আমরা এস্থলে হীরাঝিলের নির্ম্মাণ হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার সহিত সংসৃষ্ট প্রধান প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

আলিবর্দ্দি খাঁ ভাগীরথীর পূর্ব্ব তীরের প্রাসাদে বাস করিতেন। মুর্শিদাবাদের যে স্থানকে সাধারণতঃ কেল্লা বলিয়া থাকে, সেই খানে বহুদিন হইতে নাবিকদিগের প্রাসাদ ছিল। সিরাজ সৌন্দর্য্যপ্রিয় হওয়ায়, তথা হইতে অন্য কোন স্থানে একটী মনোরম প্রাসাদ নির্ম্মাণের কল্পনা করেন। ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে বর্ত্তমান জাফরাগঞ্জের সম্মুখ-ভাগে তাহার স্থাননির্ণয় হয়। হিন্দু ও মুসলমান গৌরবের সমাধিস্থল গৌড় হইতে নানাবিধ প্রস্তরাদি আনীত হইয়া প্রাসাদের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির চেষ্টা করা হইয়াছিল। প্রাসাদ সাধারণতঃ ইষ্টকে নির্ম্মিত হয়। কিন্তু স্থানে স্থানে প্রস্তর বসাইয়া সিরাজ তাহাকে শোভাশালী করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তরঙ্গায়িত পল তুলিয়া প্রাসাদের কার্ণিস-গুলি অপরিসীম সৌন্দর্য্য বিস্তার করিত। ভিন্ন ভিন্ন চত্বরে প্রাসাদ বিভক্ত হয়, অথবা এক একটী পৃথক চত্বরই এক একটী বিভিন্ন

*ফৈজির বিবরণ লুৎফ উন্নেসা নামক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

প্রাসাদেই পরিণত হয়। তাহারা এম্‌তাজ মহাল, বঙ্গমহাল প্রভৃতি নামে অভিহিত হইত। এই বিশাল প্রাসাদ এত দূর বিস্তৃত ছিল যে, কোন বিদেশীয় লেখক বলিয়াছেন যে, ইহাতে তিনটী ইউরোপীয় নরপতির আবাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইতে পারিত। * প্রাসাদের প্রান্তদেশে এক কৃত্রিম ঝিল খনন করিয়া তাহার নাম হীরাঝিল প্রদান করা হইয়াছিল, নওয়াজিস্ মহম্মদ খাঁর মতিঝিলের অনুকরণে সম্ভবতঃ সিরাজের হীরাঝিল হইয়া থাকিবে। † ঝিলের উভয় পার্শ্ব ইষ্টক দ্বারা বাঁধান হয়। এই সুচারু প্রাসাদের নির্ম্মাণ শেষ হইবার পূর্ব্বে সিরাজ মাতামহ আলিবর্দ্দি খাঁকে প্রাসাদ দর্শনার্থ নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। বৃদ্ধ নবাবের সহিত অনেক কর্ম্মচারী, রাজা, জমীদার ও জমাদারদিগের প্রতিনিধিগণও ভাবী নবাবের সুরম্য প্রাসাদ দেখিতে অগ্রসর হইলেন। নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ প্রাসাদ দেখিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হন। তাঁহার অনুচরবর্গও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া সিরাজের রুচির ভূয়সী প্রশংসা করিতে থাকেন। কেহ বা ভিন্ন ভিন্ন চত্বরের, কেহ বা সুরম্য কক্ষশ্রেণীর, কেহ বা পলতোলা কার্ণিসের এবং কেহ বা হীরাঝিলের প্রশংসায় সিরাজের বালকসুলভ অন্তরকে অধিকতর স্ফীত করিয়া তুলেন। যখন সকলে ভিন্ন ভিন্ন চত্বরে বা প্রকোষ্ঠে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, সেই সময় বৃদ্ধ নবাব কোন একটী প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, সিরাজ মাতামহের সহিত কৌতুকচ্ছলে তাঁহাকে সেই প্রকোষ্ঠমধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিলেন। নবাব দৌহিত্রের রহস্য বুঝিতে পারিয়া বলিলেন যে, আজ তোমার জয় হইয়াছে, এক্ষণে তোমাকে কি উপহার দিলে আমাকে মুক্ত করিয়া দিবে। সিরাজও হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন যে, আমার প্রাসাদের জন্য কোন বন্দোবস্ত না করিলে ইহার নির্ম্মাণশেষ ও সৌন্দর্য্যরক্ষা হইবে না। তজ্জন্য ইহার কোনরূপ উপায় বিধান করিতে হইবে। নবাবের প্রকোষ্ঠমধ্যে রুদ্ধ হওয়ার কথা শুনিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে তাঁহার সমস্ত অনুচরবর্গ আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। সিরাজ তাঁহাদিগকে দেখিয়া বলিলেন যে, এই সকল জমাদার ও জমীদারদিগের প্রতিনিধির নিকট হইতে একটী করের ব্যবস্থা করা হউক। নবাব সন্তুষ্ট চিত্তে তাহাতে সম্মত হইয়া হীরাঝিলের প্রাসাদের জন্য যে কেবল কর নির্দ্দেশ করিলেন, এমন নহে, কিন্তু সিরাজের জন্য একটী গঞ্জও স্থাপন করিয়া দিলেন। কথিত আছে, এই সময়ে ৫০১৫৯৭ টাকার আবওয়াব আদায় হয়। * মনসুর শব্দে বিজয়ী বুঝায়। সিরাজ মাতামহের উপর জয়লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার প্রাসাদের নাম মনসুরগঞ্জের প্রাসাদ ও নবস্থাপিত গঞ্জটীও মনসুরগঞ্জ আখ্যা প্রাপ্ত হয়। যে স্থলে গঞ্জটী স্থাপিত হয়, তাহাকে অদ্যাপি মনসুরগঞ্জ বলিয়া থাকে। দেশীয় গ্রন্থকারগণ সিরাজ উদ্দৌলার প্রাসাদকে মনসুরগঞ্জের প্রাসাদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। †

* Seir Mutuqherin Vol II P. 28. (Translator's note)

† ডাং হণ্টার প্রভৃতি মতিঝিল হীরাঝিলে এক মনে করিয়া ভ্রম করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে তাহারা বিভিন্ন, এক নহে। মতিঝিল ভাগীরথীর পূর্ব্ব তীরে ও হীরাঝিল পশ্চিম তীরে ছিল।

*Grant's Analysis of the finances Bengal 5th Report P. 285

† Mutaqherin, and Riyazu-s-salatin.

কিন্তু ইউরোপীয়গণ সাধারণতঃ তাহাকে হীরাঝিলের প্রাসাদ বলিয়াছেন। * হীরাঝিলের প্রাসাদ নির্ম্মাণ হইলে, যুবরাজ সিরাজ মুর্শিদাবাদে অবস্থান কালে সেই খানেই বাস করিয়া আমোদ প্রমোদে কালাতিবাহিত করিতেন। কেল্লার মধ্যে থাকিলে বিলাসোপভোগের তাদৃশ সুবিধা হইত না বলিয়া, তাঁহার হীরাঝিলের প্রাসাদে বাস করাই একটী প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তথায় তাহার সমস্ত জীবন অতিবাহিত হয়। তিনি নবাব হইলেও কেল্লা পরিত্যাগ করিয়া মনসুরগঞ্জ মসনদ স্থাপন পূর্ব্বক রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তাহার পর রাজ্যচ্যুত হইয়া প্রিয়তমা মহিষী লুৎফ উন্নেসার সহিত কিয়ৎ পরিমাণ সম্পত্তি লইয়া ১৭৫৭ খ্রীঃ অব্দের ২৪শে জুন শুক্রবার রাত্রিতে সাধের হীরাঝিলের প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া মুর্শিদাবাদ হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হন। তাহার পর আর সিরাজকে হীরাঝিলের প্রাসাদে পদার্পণ করিতে হয় নাই। মুর্শিদাবাদ ধৃত হইয়া আনীত হইলে তিনি জাফরাগঞ্জে নিহত হন।

সিরাজউদ্দৌলার পলায়নের পূর্ব্বেই মীরজাফর পলাশী প্রান্তর হইতে আসিয়া মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হন। তিনি সিরাজের পলায়নের কথা শুনিয়া মনসুরগঞ্জের প্রাসাদ অধিকার করিয়া বসেন। কিন্তু ক্লাইবের আগমনের পূর্ব্বে মসনদে উপবিষ্ট হন নাই। ক্লাইব পলাশী হইতে দাদপুরে, পরে বহরমপুরের নিকট মাদাপুরে শিবির সন্নিবেশ করেন। তাহার পর ২৯শে জুন পর্য্যন্ত কাশীমবাজারে অপেক্ষা করিয়া, ঐ দিবস মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হন। হীরাঝিলের উত্তর মোরাদবাগে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। মোরাদবাগ হইতে ক্লাইব মনসুরগঞ্জের প্রাসাদে মীরজাফরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। মনসুরগঞ্জের প্রাসাদের দরবার গৃহের উত্তর দিকে বিশাল নবাবী মসনদ স্থাপিত ছিল, সিরাজ সেই মসনদে বসিতেন। ক্লাইব মীরজাফরের হস্তধারণ করিয়া মসনদের উপর উপবেশন করাইয়া নূতন নবাবকে এক পাত্র মোহর নজর প্রদান করিলেন।* তাহার পর অন্যান্য ইংরাজ ও দেশীয় কর্ম্মচারী ও সম্ভ্রান্ত জনগণ তাঁহাকে যথারীতি নজর প্রদান করিলে, মীরজাফর সমস্ত নগরে বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব বলিয়া বিঘোষিত হইলেন। মীরজাফরের মসনদে উপবেশন করার পর, হীরাঝিলের প্রাসাদস্থিত সিরাজউদ্দৌলার ধনাগার লুণ্ঠনের ব্যবস্থা হইল। মীরজাফর, ক্লাইব, তাঁহার সহকারী ওয়ালস্, কাশীমবাজারের ওয়াট্‌স্, লশিংটন, দেওয়ান রামচাঁদ এবং মুন্সী নবকৃষ্ণ প্রভৃতি সেই কোষাগার লুণ্ঠনের সময় উপস্থিত ছিলেন। সিরাজউদ্দৌলার এই প্রকাশ্য ধনাগারে ১ কোটী ৭৬ লক্ষ রৌপ্য মুদ্রা, ৩২ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা + দুই সিন্দুক অমুদ্রিত স্বর্ণপিণ্ড, ৪ বাক্স অলঙ্কারখচিত হীরা জহরত, ও ২ বাক্স অখচিত চুণী পান্না প্রভৃতি প্রস্তর খণ্ড মাত্র থাকার উল্লেখ দেখা যায়। এই প্রকাশ্য ধনাগার ব্যতীত সিরাজউদ্দৌলার অন্তঃপুরস্থ আর একটী ধনভাণ্ডারের কথা কেহ কেহ উল্লেখ করিয়া থাকেন। তৎকালে অর্থশালী ভারতবাসী মাত্রেই নিজ নিজ

* Orme and Vansittart

* Mutaqherin Trans. Vol I. P. 772, also Orme, Vol II. P. 181.

+ হণ্টার ভ্রমক্রমে ২ কোটী ৩০ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রার কথা লিখিয়াছেন।

অন্তঃপুরে একটী স্বতন্ত্র ধনাগার স্থাপন করিতেন। নবাব বাদসাহের ত কথাই নাই। কথিত আছে যে, সিরাজউদ্দৌলার ধনাগার মধ্যে ৮ কোটী টাকা সঞ্চিত ছিল। ইংরাজেরা নাকি তাহার কোনই সন্ধান পান নাই। তাহা মীরজাফর, তাঁহার কর্ম্মচারী আমিরবেগ খাঁ, রামচাঁদ ও নবকৃষ্ণের মধ্যে বিভক্ত হইয়া যায়। রামচাঁদ পলাশীর যুদ্ধের সময় মাসিক ৬০ টাকা বেতনে কার্য্য করিতেন, কিন্তু তাহার দশ বৎসর পরে মৃত্যুকালে তিনি নগদে ও হুণ্ডীতে ৭২ লক্ষ টাকা, ৪০০ বড় বড় সোনার ও রূপার কলস, তন্মধ্যে ৮০টী সোণার ও অবশিষ্টগুলি রৌপ্য নির্ম্মিত। এতদ্ব্যতীত ১৮ লক্ষ টাকার জমীদারীও ২০লক্ষ টাকার জহরত রাখিয়া যান। নবকৃষ্ণও মাসে ৬০ টাকা বেতন পাইতেন, তিনিও মাতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে ৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন।* মীরজাফরের প্রিয়তমা ভার্য্যা মণিবেগম হীরাঝিলের প্রাসাদ লুণ্ঠনের জন্যই অগাধ সম্পত্তির অধিশ্বরী হন। তাঁহার যাবতীয় হীরা, জহরত এই লুণ্ঠন হইতেই লব্ধ।† রামচাঁদ, নবকৃষ্ণ যে সমস্ত অর্থ পাইয়াছিলেন, যদি ক্লাইব তাহা জানিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে আর তাহার অংশ পাইতে হইত না, সমস্তই সেই ব্রিটিশপুঙ্গবের হস্তগত হইত। মীরজাফরের নিকট হইতে ইংরাজেরা ৩৩৮৮৫৭৫০ টাকা লাভ করেন। কিন্তু একেবারে সমস্ত টাকা দেওয়া হয় নাই, ঐ টাকার কতকাংশ সিরাজের প্রকাশ্য ভাণ্ডার হইতে দেওয়া হয়। কথিত আছে যে, ধনাগার উন্মুক্ত হইবামাত্র তাহা হইতে ৮০ লক্ষ টাকা নৌকাযোগে কলিকাতায় রওনা হইয়াছিল।* ইংরাজ সাধারণের প্রাপ্য অর্থ হইতে একা ক্লাইব সাহেবই ২৩ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা লাভ করিয়াছিলেন। এইরূপে সিরাজের সমস্ত সম্পত্তি বিভক্ত হইয়া যায়। সিরাজের প্রাসাদ ধনে পরিপূর্ণ থাকায়, বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত এরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, ভগ্নাবশিষ্ট প্রাসাদের মধ্যে অনুসন্ধান করিলে এখনও অনেক অর্থ পাওয়া যাইতে পারে।

মীরজাফর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া প্রথমে হীরাঝিলের প্রাসাদেই বাস করিয়াছিলেন। তিনি তথায় চিরদিন বাস করেন নাই, কিছুকাল পরে ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে কেল্লামধ্যে আলিবর্দ্দির প্রাসাদে আসিয়া বাস করেন।† নবাব হইবার পূর্ব্বে জাফরগঞ্জের প্রাসাদ তাঁহার আবাস স্থান ছিল, কিন্তু মসনদে উপবেশন করার পর স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র মীরণকে জাফরাগঞ্জের প্রাসাদ দান করেন। মীরণের বংশধরেরা অদ্যাপি তথায় বাস করিতেছেন। মীরণের বংশধরেরা জাফরাগঞ্জের প্রাসাদ অধিকার করায়, নবাব পুনর্ব্বার তথায় গমন করেন নাই, এবং নিজে মুর্শিদাবাদ-কেল্লা মধ্যস্থিত প্রাসাদে আসিয়াই বাস করেন। তাঁহার রাজ্যচ্যুতির পূর্ব্বে যখন কলিকাতার গবর্ণর ভান্সিটার্ট মোরাদবাগে উপস্থিত হন, মুতাক্ষরীণে লিখিত আছে যে, সেই সময়ে নবাব মোরাদবাগে ভান্সিটার্টের সহিত সাক্ষাতের পর পুনর্ব্বার ভাগীরথী পার হইয়া তাঁহার প্রাসাদে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন।‡ মোরাদবাগ ভাগীরথীর

---

* রামচাঁদ আন্দুলরাজবংশের ও নবকৃষ্ণ শোভাবাজাররাজের আদিপুরুষ।

† Mutaqherin Trans. Vol. I. p. 773.

* Hunter's Statistical Account of Murshidabad P. 188.

† Mutaqherin. Trans Vol II P. 8.

‡ do do do P. 14

পশ্চিম তীরে হীরাঝিলের নিকটেই অবস্থিত ছিল। সুতরাং নবাব মীরজাফর খাঁ যে সে সময়ে পূর্ব্বতীরের প্রাসাদে বাস করিতেন, ইহা হইতে তাহা বিশদরূপে বুঝা যাইতেছে।* ভান্সিটার্ট মীরজাফরকে পদচ্যুত করিয়া মীরকাশীমকে মসনদ প্রদান করেন। ভান্সিটার্ট মীরজাফরকে হীরাঝিলের প্রাসাদে বাস করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন।† কিন্তু মীরজাফর তাহাতে সম্মত না হইয়া স্বীয় প্রিয়তমা ভার্য্যা মণি বেগমের সহিত কলিকাতা চিতপুরে আসিয়া বাস করেন।

মীরকাশীমের সহিত যখন ইংরাজদিগের বিবাদ আরম্ভ হয়, সেই সময়ে জগৎশেঠদিগকে ইংরাজদিগের পক্ষ জানিয়া, তাহাদিগকে বন্দী করিয়া মুঙ্গেরে পাঠাইবার জন্য মীরকাশীম বীরভূমের ফৌজদার মহম্মদ তকীখাকে আদেশ দেন। মহম্মদ তকীখাঁ শেঠদিগকে প্রথমতঃ হীরাঝিলের প্রাসাদে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। পরে মুঙ্গের হইতে নবাবের প্রেরিত লোক উপস্থিত হইলে তাহাদের হস্তে জগৎশেঠদিগকে সমর্পণ করেন।

ইহার পর হইতে আর হীরাঝিলের সহিত সম্বন্ধ কোন ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ দেখা যায় না। এক্ষণে সে প্রাসাদ কালগর্ভে অন্তর্হিত। জাফরাগঞ্জের পরপারে অদ্যাপি তাহার চিহ্ন রহিয়াছে। হীরাঝিল ভাগীরথীর সহিত মিশিয়া গিয়াছে; কেবল তাহার পোস্তার কিয়দংশ ও একটী পয়ঃপ্রণালীর নিদর্শন ভাগীরথীর জলাপসরণে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। সিরাজ উদ্দৌলার প্রাসাদকে সাধারণে লালকুঠী বলিত। সে প্রাসাদের অধিকাংশই বিলুপ্ত, কেবল এম্‌তাজ মহল নামক চত্বরের ভিত্তির কতক ভগ্নাবশেষ আজিও অবস্থিতি করিতেছে। তাহার পশ্চিম পার্শ্বের ভিত্তিটী সম্পূর্ণই আছে, পূর্ব্ব পার্শ্বের সমস্ত ভিত্তি ও উত্তর, দক্ষিণের কতকাংশ এক্ষণে ভাগীরথীগর্ভস্থ। এই ভিত্তি উত্তরদক্ষিণে দৈর্ঘ্যে প্রায় ১২৫ হস্ত হইবে, পূর্ব্ব পশ্চিমেও সম্ভবতঃ তাহাই ছিল, কিন্তু ভাগীরথীস্রোতে ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়, এক্ষণে কেবল উত্তর দক্ষিণে, দুই পার্শ্বেই প্রায় ৭৫ হস্ত মাত্র অবশিষ্ট আছে। এই চত্বরের মধ্যস্থলে একটী গৃহের ভিত্তি আজিও বিরাজ করিতেছে। তাহা দৈর্ঘ্যে প্রস্থে সমান, ও প্রায় ৩০ হস্ত হইবে। এই সকল ভিত্তি এক্ষণে নিবিড় জঙ্গলের দ্বারা আবৃত, আম্র প্রভৃতি দুই একটী বৃহৎ বৃক্ষও তাহাদের উপর জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এই একটী পথশ্রান্ত পক্ষী সময়ে সময়ে সেই সকল বৃক্ষের শাখায় বসিয়া, সিরাজের সাধের ভবনের ভগ্নাবশেষ দেখিবার জন্য বিষাদপূর্ণ কণ্ঠে পথিকদিগকে আহ্বান করিয়া থাকে। সিরাজ উদ্দৌলার সমস্ত চিহ্নই প্রায় মুর্শিদাবাদ হইতে লয় পাইয়াছে, কেবল ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে তাঁহার নির্ম্মিত মদীনাটী ও সিরাজ উদ্দৌলার বাজার প্রভৃতি দুই একটী স্থান অদ্যাপি তাঁহার ক্ষীণ স্মৃতি আনয়ন করিয়া দেয়। আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, হীরাঝিলের প্রাসাদ নির্ম্মাণের সময় ... আজি-

* হীরাঝিলের প্রাসাদ ভঙ্গ করিয়া মীরজাফর কেল্লামধ্যে পরে নূতন প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। মুতাক্ষরীণের অনুবাদক হীরাঝিলের প্রাসাদকে ভগ্নদশায় পতিত দেখিয়াছেন। তিনি আলিবর্দ্দির প্রাসাদেরও উক্ত দশা দেখিয়াছেন। আলিবর্দ্দির প্রাসাদকেও লোকে সিরাজ উদ্দৌলার প্রাসাদ বলিত।

† Vansittart's Narrative Vol I P. 124.

হীরাঝিলের অব্যবহিত দক্ষিণে একটী ভবনের কিছু কিছু চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। তথায় একটী গৃহের ভিত্তি ও দেওয়ালের কতক ভগ্নাবশেষ আজিও বিদ্যমান আছে। এই ভবনটী রাজা মহেন্দ্র বা রায় দুর্লভের। রায় দুর্লভ সিরাজের রাজত্ব কালে মন্ত্রীর কার্য্য করিয়াছিলেন, এবং মীরজাফরের সময়েও দেওয়ানের পদে অভিষিক্ত হন। হীরাঝিলের নিকটেই তাঁহার বাসভবন ছিল। গৃহটীর ভগ্নাবশেষ ব্যতীত ভবনের চতুর্দ্দিকেই ইষ্টকরাশি বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। ভূগর্ভে প্রোথিত সোপানাবলীর কয়েকটী সোপানও দৃষ্টিপথে পতিত হয়। মহেন্দ্র সাগর নামে একটী নাতিদীর্ঘ পুষ্করিণী রাজা মহেন্দ্র বা রায়দুর্লভের নাম ঘোষণা করিতেছে। বর্ষাকালে তাহার সহিত ভাগীরথীর সংযোগ হয়। রায়দুর্লভের সেই বাসভবনের ভূমি এক্ষণে কৃষক কর্ষণ করিয়া শস্য বপন করিতেছে। কালে সমস্ত মুর্শিদাবাদের যে উক্ত দশা না হইবে, ইহা কে বলিতে পারে?

শ্রীনিখিলনাথ রায়।

আত্ম বা নিগূঢ় বৈষ্ণব দর্শন। (৪)

৪২। অনেকের (তাহাদের মধ্যে সাধনাভিমানী ও সাধনাশ্রিত লোকেরও নিতান্ত অসদ্ভাব নাই) এরূপ ধারণা যে, যে-কোন পাত্র-বিশেষেই হউক, প্রেম জন্মিলে সর্ব্বার্থ সিদ্ধি লাভ হয়। শুদ্ধসত্ত্ব অথবা নিরঞ্জনাঙ্গা বিশ্বম্ভরের সঙ্গপ্রাপ্তির তাদৃশ কোন বিশেষ আবশ্যকতা নাই—অনুরাগ ভাবঘন অন্তরঙ্গ-সম্পন্ন ব্রহ্মাত্মা সজ্জন ভগবজ্জন সাধুর—সদ্গুরুর সঙ্গপ্রাপ্তিরও তাদৃশ কোন বিশেষ প্রয়োজনীয়তা নাই। স্ত্রী পুত্রাদি বহিরঙ্গ জাতীয় যে কোন এক বিষয় হউক, তৎপ্রতি প্রকৃত নিঃস্বার্থ প্রেম সঞ্চারিত হইলেই, সকলই সিদ্ধ হইল—সকলই করতলন্যস্ত হইল। অন্ধভাবে অবিচারে, এই প্রকৃত নিঃস্বার্থ প্রেম, যে কোন আধার বিশেষে উপরত হইয়া দাঁড়াইবে, সে আধার সমল হউক আর নির্ম্মল হউক, অসারগর্ভই হউক আর সারগর্ভই হউক, অসাধু অসতীই হউক আর সাধু সাধ্বীই হউক, ভগবদ্বেষীই হউক আর ভগবদ্ভক্তই হউক, ইতর প্রাণীই

হউক আর শ্রেষ্ঠ জীবই হউক, আধারগত কোন বিশেষত্বের অপেক্ষা নাই, সে আবার প্রাপ্ত প্রেমের বিনিময়ে সর্ব্বত্র, সর্ব্বকাল, সমভাবে পূর্ণফল প্রদান করিবে। এই ধারণা বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ, অশাস্ত্রীয় এবং পূর্ব্বগত প্রকৃত সাধুদিগের অভিজ্ঞতা মূলক জ্ঞান-সংস্কারের সঙ্গে অসঙ্গত। শুদ্ধ তাহা নহে, এই ধারণা নিরতিশয় দোষাবহ, অমূলক ও প্রকৃত সাধন-বিরোধী।

৪৩। রাসায়নিক সংযোগে অধমর্ণ ও উত্তমর্ণ বা ঘাতক ও মহাজন ভাবাপন্ন দুই বিরুদ্ধ সম্বন্ধ পদার্থে মিলিয়া, একাকার গত হইয়া যায়। উল্লিখিত বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন দুই স্বতন্ত্র মানুষও দৈব ঘটনায় পরস্পরে একত্রিত ও পরিচিত হইলে, সময়ে উভয়ে অন্তর্ম্মুখে তদেক হইয়া যায়। উভয়ের তখন এক মন এক প্রাণ। যখন উভয়ের এই অন্তর্ম্মুখিন্ তদেকত্ব বা প্রেমমিলন লাভ হয়; তাহাদের উভয়েরই তখন কাজে কাজেই একই স্বার্থ, একই শক্তি, একই উদ্দেশ্য একই ভাব। পরস্পরকে পরস্পরে স্বতঃই আত্মীয় বা আত্মীয়তর জ্ঞান করে, পরস্পরের দেখা সাক্ষাৎ হইলে উভয়েই অপূর্ব্ব তৃপ্তি লাভ করে, পরস্পরের সুখ দুঃখে পরস্পরে সুখ দুঃখ অনুভব করে। প্রেমে মিলিত দুই জনের নিজ নিজ স্বার্থ ও সুখ, তখন আত্মবিন্দু অবহেলা করিয়া, পরস্পরের পরকীয় বিন্দুগত হইয়া দাঁড়ায়। তখন উভয়ের কেহ, শুদ্ধ নিজের সুখে সুখানুভব করে না, শুদ্ধ নিজের স্বার্থে স্বার্থানুভব করে না, পরন্তু পরস্পরের সুখ ও স্বার্থে, সুখ ও স্বার্থানুভব করিয়া থাকে। প্রেম-প্রবীণ পদকর্ত্তা সুবিখ্যাত চণ্ডীদাস নিম্নোদ্ধৃত একটী পদাংশে প্রেমিকের ভাব অতি সুন্দররূপে ব্যক্ত করিয়াছেন—

"ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর॥"

প্রেমে মিলিত দুই জনের আবাস ভূমি নিজ নিজ দেহে নহে, কিন্তু পরস্পরের পরকীয় দেহে, এবং তাহাদের আপনার জন নিজে নিজে নহে, কিন্তু পরস্পরে—তাহাদের আপনার জন্যও অন্যান্য ব্যক্তিগত, তাহাদের আবাসস্থানও অন্যোন্য দেহগত। যেমন রাসায়নিক সংযোগে, তেমনি অন্যান্য ব্যাপারে মিলিত বস্তুদ্বয়ের মধ্যে কোন বিশেষ স্বরূপগত পরিবর্ত্তন (constitutional change) লক্ষিত হয় না। বিশেষ কোনরূপ স্বরূপগত উৎকর্ষসিদ্ধি বা তদভিমুখে সংক্রান্ত হইবার জন্য, পরস্পরের মধ্যে স্বরূপগত পরিণামসিদ্ধির সূচনা কুত্রাপি কখনও দেখা যায় না। যে কিছু পরিবর্ত্তন পরস্পরের মধ্যে লক্ষিত হয়, তাহা শুদ্ধ ঘাতকের স্বরূপে মহাজনের স্বরূপ-মিশ্রণ ফল, অথবা উত্তমর্ণ ও অধমর্ণ ভাবের যোগ-সমষ্টি ফল। তদতিরিক্ত আর কিছুই নহে! দুয়ের মিলনে অবশ্যই উভয়ের সামাজিক শক্তি ও বল বৰ্দ্ধিত হইয়া থাকে, কিন্তু স্বরূপ-গত কোন অতিরিক্ত উৎকর্ষ লক্ষিত হয় না।

৪৪। পাত্রান্তরের সঙ্গে মিলিত হইলে, মানুষ অজ্ঞাতসারে, অন্তর্ম্মুখে, তদাকারে আকারিত হইতে থাকে—তদীয় অন্তঃসত্ত্ব স্বকীয় স্বরূপে, স্বকীয় প্রকৃতিতে আশ্রয়দান করিতে থাকে। প্রেম সম্বন্ধের এবং সম্বন্ধ মাত্রেরই ইহা একটী অবশ্যম্ভাবী বৈজ্ঞানিক ফল। শৈশবকালে কোন কোন শিশু (কেহ কেহ তাহাদের মধ্যে তিন চারি বৎসর বয়স্কও হইয়াছিল) দৈব কর্ত্তৃক ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি জন্তুর হস্তে নিপতিত হইয়া, সেই সেই জন্তুর স্নেহে ও যত্নে যথানিয়মে প্রতিপালিত হইবার [illegible]

বাদ সময়ে সময়ে প্রামাণিক সূত্রে জনসমাজের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতেছে। আজকাল সভ্য জগতে এরূপ ঘটনা অসম্ভব বা অপ্রকৃত বলিয়া উড়াইয়া দিবার স্থল নাই। সেই সেই ব্যাঘ্রাদি জন্তুর সংসর্গে ও আনুগত্যে ২।৩ বৎসর মাত্র বাস করিয়া সেই সেই দুর্ভাগ্য শিশুগণের অবস্থা শীঘ্রই আশ্রয়জাতীয় পশ্বাদির প্রকৃতি ও চলন চর্য্যাতে পরিবর্ত্তিত হইয়া, তাহাদের ঈশ্বর-দত্ত মনুষ্য প্রকৃতির স্বতঃসিদ্ধ গতি, পরিণাম ও বিকাশ পর্য্যন্ত অবরুদ্ধ ও বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়। এরূপ অনেক গুলি ঘটনা লোকচক্ষে পতিত হইয়া, প্রামাণিক ইতিবৃত্তের পৃষ্ঠায় স্থান প্রাপ্ত হইতেছে। এথানে এই সকল শিশু শীঘ্রই আশ্রয়জাতীয় প্রতিপালক জন্তুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ স্নেহ-সম্বন্ধ-হেতু তাহার স্বভাবসিদ্ধ বস্তুত্বের যেমন এক দিকে বিলোপ হইতেছে, তেমনি অপরদিকে প্রতিপালক জন্তুর নিকৃষ্টজাতীয় বস্তুত্ব, সেই স্থানে শনৈঃ শনৈঃ সঞ্চারিত হইতেছে, এবং অবশেষে তাহাদিগকে পূর্ণপাশব প্রকৃতিতে পরিণত করিতেছে। অমৃতের অধিকারী স্বাধীনতার অভিমানী, নিজের ব্যক্তিত্বের গর্ব্বে পূর্ণগর্ব্বিত মানুষের, সংসর্গদোষে, কি পর্য্যন্ত না অধঃগতি, কি পর্য্যন্ত না দুর্গতি সংঘটিত হইল !!! এক সংসর্গ দোষে মানবপ্রকৃতি বহুনিম্নভূমিতে অধনীত হইয়া পাশব প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হইল !!! সংসর্গগুণে, সৎসংসর্গে, মানবপ্রকৃতি কি উন্নীত হয় না? আত্ম ও পরমাত্মতত্ত্ব-সম্পন্ন সাধু সজ্জনের সংসর্গে ও আনুগত্যে মানুষ কি কতদূর পর্য্যন্ত উচ্চ অবস্থায় উপনীত হইতে পারে না?

৪৫। "সংসর্গজা দোষা গুণা ভবন্তি" ইহা সম্পূর্ণ শাস্ত্রোক্তি না হইলেও, অবশ্যই বিশ্বাসনীয়-আর কোন অভিজ্ঞ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের উক্তি, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। "ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা।" ইহা বেদান্তদর্শন—ভাষ্যকার মহা শাস্ত্রজ্ঞ জ্ঞানতত্ত্বের পারদর্শী মহাপুরুষ ভগবান শঙ্করাচার্য্যের উক্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতবর কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী "সাধু সঙ্গ সাধু সঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়, লব মাত্র সাধুসঙ্গ সর্ব্বসিদ্ধি হয়" এই উক্তিতে সাধুসঙ্গের যৎপরোনাস্তি ও যথাযথ গুণ কীর্ত্তনই করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে "তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ" সাধুরা দর্শন মাত্রেই পবিত্র করেন, এই উক্তি অবশ্যই শাস্ত্র বাক্য বলিয়া বহুসংখ্যক লোকের কাছে আদরণীয় হইয়া থাকে। প্রাপ্য বরাণ্ নিবোধত" "তদ্ বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ" সদ্গুরু আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া নিবোধিত হও, পরম পুরুষের সম্যক জ্ঞান লাভার্থ তিনি গুরু সন্নিধানে গমন করিবেন, ইত্যাদি শ্রুত্যুপদেশ সর্ব্বজনমান্য বেদান্ত শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত। সর্ব্বকালের সাধু সজ্জনগণের ও সর্ব্ব শাস্ত্রের সদুক্তি সকল এক বাক্যে সাধুসঙ্গেরই মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় "যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি" হইতে "ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে" এই শ্রীকৃষ্ণ বাক্যে ভগবানের ধর্ম্ম স্থাপনার্থে সাধুরূপে অবতারণারই উল্লেখ হইয়াছে। এরূপ কথা কোন প্রকৃত শাস্ত্রে, কোন প্রকৃত অভিজ্ঞজনের উক্তিতে প্রকাশ নাই যে, অন্যসঙ্গে, "যার-তার-সঙ্গে" প্রেমসম্বন্ধ সংঘটনা হইলে, সর্ব্বার্থ সিদ্ধি লাভ হয়। সুতরাং সাধু সঙ্গ ভিন্ন সদ্গতি লাভের আর অন্য পথ নাই—"নান্যঃপন্থা বিদ্যতে অয়নায়" ইহা সাধুদের শাস্ত্র-উক্তিতে এক বাক্যে স্বীকৃত হইয়াছে।

৪৬। যেরূপ রাসায়নিক ব্যাপারে উত্তমর্ণ ও অধমর্ণ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ দুটী স্বতন্ত্র পদার্থপরস্পর সান্নিধ্য ও সাহিত্য প্রাপ্ত হইলে পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া, একাঙ্গভুক্ত হইয়া যায়, মনুষ্য বা জৈবিক ব্যাপারেও অনুরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মাক্রান্ত দুটী মানুষ বা জীব দৈব কর্ত্তৃক সান্নিধ্য বা সাহিত্য প্রাপ্ত হইলে, অন্তর্ম্মুখে পরস্পরের দিকে সন্নিহিত হইতে থাকে! মহাজন ধর্ম্মীর সস্নেহে ধন দান, এবং খাতকধর্ম্মীর সানুগত্যে ও সকৃতজ্ঞচিত্তে সেই ধন গ্রহণ, এই ভাবে, উভয়ে ধনাংশে সমান হইয়া, একত্র হইতে থাকে। একদিক্ হইতে মহাজন, খাতকের স্বরূপানুপ্রবিষ্ট হইয়া তৎসঙ্গে আত্মসাৎ হইতেছে, আর এক দিক্ হইতে খাতক তদ্ধনে ধনবান, এবং তদৈশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যবন্ত হইয়া, তদাকারে পরিণত হইতেছে—অন্তর্ম্মুখে একাকার প্রাপ্তি হইতেই—গাঢ় প্রেমের উৎপত্তি হয়। মহাজন সন্নিধানে তাহার খাতক, তাহারই একটী ধন ভাণ্ডার; যে ধন সে নিজেই; খাতক সন্নিধানে তাহার লব্ধ ধনৈশ্বর্য্য তাহার মহাজনেরই সম্পত্তি বা সেই মহাজন নিজেই এবং সে তাহার কাছে সেই ধন প্রাপ্তিহেতু অপরিশোধনীয় ঋণে ঋণগ্রস্ত। এই রূপে এখানে দুজনেরই আমিত্ব তুমিত্বগত হইয়া যাইতেছে। এইরূপে যখনই উভয়ে এক ভাবাপন্ন হইল, যখনই উভয়ে ধনাংশে ঐশ্বর্য্যাংশে স্বরূপাংশে সমান হইল, তখন প্রেম সম্পূর্ণ হইয়া উভয়ে, স্ব স্ব দেহগত প্রভেদ সত্ত্বেও, এক প্রাণ এক মন হইয়া দাঁড়াইল। প্রথম মিলনে হয়ত সচরাচর কোন প্রেম চিহ্ন প্রকাশ পায় না। শুক্ল প্রতিপদের চন্দ্রকলার ন্যায়, সেই প্রেম চিহ্ন অব্যক্ত ও অননুভূত থাকে, কিন্তু কিছু ব্যাপক কাল উত্তমর্ণ ও অধমর্ণ ধর্ম্মাক্রান্ত ব্যক্তিদ্বয় মিলিত হইতে হইতে তাহাদের অন্তরস্থ প্রেম চিহ্ন কলায় কলায় বর্দ্ধিত হইয়া, প্রকাশ পাইতে থাকে এবং সময়ে তাহা পূর্ণ মাত্রা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু মলিন হৃদয়ে এই ঋণজনিত প্রেম বীজ ক্ষেত্রের অপ্রস্তুত অবস্থা হেতু শীঘ্র অঙ্কুরিত হইতে পারে না।

৪৭। প্রকৃত প্রেম সুতরাং নিরবচ্ছিন্ন ঋণদায়ে অস্থির, সর্ব্বত্রই ঋণ ভারে ভারাক্রান্ত এবং নানা উপায়ে প্রাণান্ত স্বীকার করিয়াও সেই ঋণ পরিশোধের চেষ্টায় বিব্রত, সেই জ্বালায় সর্ব্বক্ষণ জ্বালাতন। যেখানে জ্ঞাতসারেই হউক আর অজ্ঞাতসারে হউক, এই ঋণদায়ের স্বভাবসিদ্ধ অস্থিরতা—এই ঋণভারের অবিশ্রান্ত পেষণ পীড়া, এই ঋণপরিশোধের স্বতঃসিদ্ধ চেষ্টা স্ফূর্ত্তি পাইতেছে, সেই খানেই প্রেমের বীজ প্রকৃত প্রস্তাবে অঙ্কুরিত হইয়াছে, বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। লৌকিক ভাবে উপকার ঋণ প্রত্যুপকারে পরিশোধ করিবার যে চেষ্টা, তাহা, প্রকৃত না হউক, কোন প্রকার কৃতজ্ঞতা হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তাহা তদতিরিক্ত আর কিছুই নহে। চেষ্টাসাধ্য বহু প্রকার প্রত্যুপকার চেষ্টা করিতে করিতে যখন খাতক দেখিতে পায় যে, তাহার ঋণ মাত্রা কোনক্রমেই হ্রাস হইতেছে না, এবং সহস্র সহস্র প্রত্যুপকার সাধনেও তাহার হ্রাস প্রাপ্তির কোন প্রকার সম্ভাবনা দেখিতে পায় না, তখনই সেই হৃদয়ে প্রকৃত প্রেমাঙ্কুর হইয়াছে বলিয়া মানিতে হইবে। যে ঋণ প্রত্যুপকারে পরিশোধিত হইল বা হইতে পারে, মনে হয়, তাহা প্রকৃত কৃতজ্ঞতাও নহে, প্রেমত নয়ই। ঋণ হইতে প্রকৃত কৃত-

জ্ঞতার উৎপত্তি এবং প্রকৃত কৃতজ্ঞতার মধ্যে প্রেমবীজ নিহিত থাকে। প্রেম দরদে প্রকাশ পায়,—ব্যথায়, বেদনায়—জ্বালায় প্রকাশ পায়। প্রেমিক আর ব্যথিত একই কথা। প্রেমিক দরদের দরদী, ব্যথার ব্যথিত, বেদনার বেদনী। যেখানে এই অকারণ ঋণ সম্বন্ধ ঘটে, সেখানে এই ঋণ প্রেমবীজ রূপে খাতকের অন্তরে নিপতিত হয়। যেখানে এই অকারণ ঋণ প্রাপ্ত হইয়াও খাতক সে সম্বন্ধ যথা-যথ অনুভব করিতে পারে না এবং প্রেমের কোন চিহ্ন সেখানে প্রকাশ পায় না, সেখানে ইহা নিশ্চয় যে, খাতকের হৃদয়গত কোন আবর্জ্জনায়, সেই প্রেমবীজ প্রাবৃত হইয়া পড়িয়াছে। অথবা তাহা প্রকৃত আশ্রয় স্থল প্রাপ্ত হইতেছে না। যেখানে প্রাপ্ত-ঋণের পরিবর্ত্তে কৃতজ্ঞতা-সূচক কোন প্রকার প্রত্যুপকার স্ফূর্ত্তি হওয়া দূরে থাকুক, অনিষ্ট ও অপকার চেষ্টা পর্য্যন্ত দেখা যায়, সেখানে ইহা নিঃসংশয় যে ক্ষেত্রটীতে হৃদয়মালিন্যের অবধি নাই। কিন্তু একবার এই অকারণ ঋণ সম্বন্ধ ঘটিলে খাতকের আর কোন ক্রমেই নিস্তার নাই। শীঘ্রই হউক আর বিলম্বেই হউক, ইহজন্মেই হউক আর জন্মান্তরেই হউক, জ্ঞাতসারেই হউক, আর অজ্ঞাত সারেই হউক, যখনই আত্মোন্নতির স্বাভাবিক হেতু পরম্পর ক্রমে সেই চিত্ত-মালিন্য ক্ষালিত বা অপসারিত হইয়া যাইবে, তখনই তাহার অন্তর্নিহিত প্রেমবীজকে অঙ্কুরিত হইতেই হইবে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে ঋণ-ভারে প্রপীড়িত হইয়া, সেই ঋণ-দায় হইতে অব্যাহতি লাভের স্বভাবতঃই আয়োজন করিতেই হইবে। দেহলীলা সম্বরণ করিয়া, অন্যত্র গমন করিলেও তাহার নিষ্কৃতি নাই। এই ঋণ-দায় সম্বন্ধে কোন বঙ্গীয় সাধক ভক্ত কবি বলিয়াছেন, যে।

> শমন সঙ্গে আছে তার, স্বর্গ গেলেও নাই নিস্তার,
> আসতে হবে পুনর্ব্বার, পরিশোধ দিতে।
> পলা'য়ে না পারে পার, এ ঋণ থাকিতে॥

৪৮। ইহারই নাম ঋণের দায়ে, প্রেমের জ্বালায় বিব্রত হওয়া। ঋণ দাতা, মহাজনের সন্নিধান হইতে যত দূরবর্ত্তী থাকুক না কেন, ঋণ-সম্বন্ধ সংঘটনার কাল হইতে যতকাল ব্যবহিত থাকুক ও গত হউক না কেন, তাহার চিত্তাবর্জ্জনা, তাহার অন্তর হইতে বিদূরিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে খাতক, প্রাপ্ত ঋণের পরিশোধ দায়ে বিষম দায়গ্রস্ত হইয়া পড়ে। তাহার সেই অপরিশোধিত ঋণ তখন দাবানল রূপ ধারণ করিয়া, তাহার অন্তরকে দগ্ধ করিতে থাকে। এই জ্বালা, মহাজনের সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া, কৃত ঋণ পরিশোধের উপায়-সুলভ না হইলে, কিছুতেই নিবারিত হইবার নহে। এই অপরিশোধিত ঋণদায় হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য,—এই দুঃসহ ঋণ ভার বিমোচন জন্য, খাতককে হয়ত ইহসংসারে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ পর্য্যন্তও স্বীকার করিতে হয়। এই জন্ম গ্রহণ তাহার ঋণদাতা মহাজনকে ধরিবার জন্য—তাঁহাকে অন্বেষণ করিয়া বাহির করিবার জন্য। তাঁহাকে পাইতেই হইবে। সেই ধনী মহাজন সমক্ষে আত্ম বিক্রয় করিবার জন্য—তাহার অলিখিত ঋণখৎ পরিশোধ করিবার জন্য, প্রেমদানে, প্রত্যুপকার দানে, তাহার পূর্ব্বকৃত ঋণভার কথঞ্চিৎ লাঘব করিবার জন্য, তাহার প্রাণ এখন প্রবল পরাক্রমে তাহার মহাজনাভিমুখে টানিতে থাকে, তাই। তাহাকে ইহ সংসারে পুনরাবর্ত্তন পর্য্যন্তও স্বীকার করিতে বাধ্য হইতে হয়। তদ্ভিন্ন অন্য কিছুতেই তাহার তৃপ্তি লাভ হয় না—

স্বর্গ-সুখ ভোগেও সে সুস্থির থাকিতে পারে না। ঋণী যদি কখনও জ্ঞাতসারে প্রত্যুপকার সাধনে, প্রাপ্ত ঋণের বিপরীত পরিশোধ দিয়া থাকে, তাহা হইলে এখন তাহার জ্বালা শতগুণ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। যখন তাহার তাদৃশ চিত্ত শুদ্ধি হয় নাই, তখন তাহার অবস্থা বরং ভাল ছিল, কিন্তু চিত্ত শুদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার যন্ত্রণাও ক্রমশঃ আধিক্য প্রাপ্তি হইতে লাগিল। কেবল নির্ম্মল চিত্তেই অনিচ্ছোৎপন্ন অকাম অনুতাপাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া থাকে।

৪৯। এই সংসার-ক্ষেত্রে কখন কখনও এমনও হয় যে, দুই জনের পরস্পর সাক্ষাৎ মিলন হইবা মাত্র, একজন আর এক জনের গাঢ় প্রেমে নিপতিত হইয়া পড়ে। একজন সম্বন্ধে অপরের এমনি মর্ম্মান্তিক বেদনা আচ্ছাদিত থাকে যে, হয় ত তাহার চাক্ষুষ মাত্রই সে অমনি মর্ম্ম-বেদনায় মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া পড়ে। এরূপ ঘটনা স্থলে সচরাচর দুইটী কারণ উপস্থিত হইতে পারে। তন্মধ্যে একটী এই যে, বিরুদ্ধ ধর্ম্মাত্মক দুই জনে পরস্পরের অজ্ঞাতসারে পরস্পরের জন্য ঈশ্বর কর্ত্তৃক বা প্রাকৃতিক কারণে সংসৃষ্ট হইয়া, দৈবযোগে বা হঠাৎ, মিলিত হইয়া, উভয়ে গাঢ় প্রেম সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়া পড়িল। আর একটী কারণ, এবং যাহা ইতিপূর্ব্বেই ইঙ্গিত হইয়াছে, তাহা এই যে, কোন জন্মান্তরে কোন ঋণ সম্বন্ধ সংঘটন হেতু অপরিশোধিত ঋণ-জ্বালা প্রজ্জ্বলিত হওয়াতে, তাহা যথানুষ্ঠানে কথঞ্চিৎ নিবারণ সঙ্কল্পে ইহ সংসারে আসিয়া, অনেক অজ্ঞাত অনুসন্ধানের পর দৈব কর্ত্তৃক কোন সুসময়ে তাহার প্রকৃত অথচ অজ্ঞাত মহাজনকে সহসা প্রাপ্ত হইয়া, ঋণী তদ্রূপ বিকারগ্রস্ত হইয়া পড়িল। অথবা পূর্ব্বজন্মের অপরিতৃপ্ত ও অপরিশোধনীয় প্রেম সম্বন্ধ, যাহা সহসা কোন দৈব বিচ্ছেদ ঘটনাতে অবরোধ প্রাপ্তি হেতু প্রেমিকের সংস্কার বা আতিবাহিক দেহে প্রসুপ্ত ছিল; এবং যে জন্য তাহার প্রেম-প্রবণ হৃদয়, এতদিন কোন ক্রমেই প্রসন্নতা লাভ করিতে সক্ষম ছিল না, তাহা যথা পাত্র দর্শনে সহসা প্রেমিক হৃদয়ে জাগ্রত হইয়া, সেইভাবে প্রেমোচ্ছ্বাস প্রাপ্ত হইল। যাঁহারা প্রকৃত কোন প্রেমের কিছু মাত্র তত্ত্ব বুঝেন, তাঁহাদের কাছে এই শেষোক্ত কারণটী নিতান্ত অজ্ঞেয়তার আবরণে আবৃত হইলেও, সুসঙ্গত বলিয়া অনুমিত হইবে। দুই কারণের অসদ্ভাবে সর্ব্বত্রই অদৃষ্ট কারণাই অনুমান সিদ্ধ হইয়া থাকে। প্রথমোক্ত কারণটীতে ঋণ বা প্রেম ব্যাপারের উল্লিখিত বেদনা, দরদ, জ্বালা, অস্থৈর্য্য ও মর্ম্মপীড়া প্রভৃতি স্ফূর্ত্তি পাইবার স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক কোন সম্ভাবনা দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রেমের দায়ে অস্থির হইবার, ঋণভারে ভারাক্রান্ত হইবার, যথেষ্ট যুক্তি প্রথমোক্ত কারণে সম্ভবপর বলিয়া অনুমান-সিদ্ধ হয় না। সে প্রেমে লোকে বিষম ঋণদায়ে, কেন অকারণে আপনাকে দায়গ্রস্ত মনে করিবে? সে প্রেমে পূর্ব্বপ্রাপ্ত ঋণের ভারত্ব ও গুরুত্ব লোকে কেন অকারণে সেরূপ অনুভব করিবে? সে প্রেমে স্থল বিশেষে "a debt immense of endless gratitude and endless obligation" লোকের অন্তরে অকারণে কি জন্য স্থান পাইবে? প্রকৃত প্রেমে, খাতক, মহাজনের কার্য্যসাধনে নিঃস্বার্থ ভাবে আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াও যেন আরও কত করিতে অবশিষ্ট রহিল, এরূপ অতৃপ্তি তাহার সকৃতজ্ঞ-চিত্তে সর্ব্বক্ষণ উদয় হইতে থাকে।

প্রথম কারণে এরূপ অকারণ অতৃপ্তি কেন জন্মিবে? প্রথম কারণটী এই সকল প্রশ্নের সদুত্তর দানে অপারক। দ্বিতীয় কারণে ঐ সকল প্রশ্নের এক প্রকার সঙ্গত উত্তর পাওয়া যায়। প্রাণ দিয়াও যে ঋণীর সম্যক্ পরিতৃপ্তি লাভ হয় না, অথচ তাহার যে কি ঋণ এবং কত ঋণ, তাহা তাহার কিছুই জানা নাই। ঋণ ত সম্পূর্ণ অজ্ঞাতই রহিল, অথচ তাহার দায়ে ঋণী যৎপরোনাস্তি বিব্রত হইয়া পড়িল। কি দিয়া যে সেই অজ্ঞাত ঋণ সে শোধ করিবে, তাহা সে ভাবিয়াই পায় না। এরূপ ভাবস্ফূর্ত্তি মূল কেবল দ্বিতীয় কারণেই অনুমান-সিদ্ধ হইয়া থাকে।

৫০। কিন্তু এই সমস্ত ঋণ অধিকাংশ স্থলে নির্ম্মল পাত্র কর্ত্তৃক বিতরিত না হওয়াতে, সেই ঋণ-সম্বন্ধ হইতে ঋণীর অন্তরে যে মহাজনজাতীয় তদাকারত্ব লাভ হয়, তাহা কোন ক্রমে তাদৃশাতীত বা তদতিরিক্ত নির্ম্মল হইবার কোন প্রকার সম্ভাবনা নাই। মহাজন যেখানে সাধু সজ্জন, নিরঞ্জন অন্তরঙ্গ সম্পন্ন ও কৃষ্ণপ্রেমে জরজর দেহ, সেইস্থলেই কেবল নির্ম্মল তদাকারত্ব প্রাপ্তি কৃষ্ণ বা বিশ্বজনীন প্রেম এবং আত্ম ও পরমাত্ম বা স্বরূপতত্ব স্ফূর্ত্তি সম্পাদিত হইতে থাকে। কেবল এই জাতীয় ঋণ সম্বন্ধে বা তজ্জনিত প্রেমসম্বন্ধে লোকের অন্তর্ম্মল ক্ষালিত হইয়া চিত্তনৈর্ম্মল্য লাভ হয়। অন্য ঋণে বা অন্য প্রেমে তাহার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। ঋণী যে জাতীয় ধন ঋণ-প্রাপ্ত হয়, সেই ধনের সারত্ব অথবা ঋণদাতা ধনীর প্রকৃতিগত সারত্বই অন্তর্নৈর্ম্মল্যের নিমিত্ত-কারণ হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন সেখানে অন্য কারণ প্রত্যক্ষ বা অনুমান-সিদ্ধ হয় না। প্রেম তাহার কারণান্তর হইতে পারে না। এই জন্য শ্রীচৈতন্য-পার্ষদবর প্রেমিক-শিরোমণি পূজ্যপাদ রায় রামানন্দ তাঁহার সুবিখ্যাত অগাধ জ্ঞানগর্ভ সাধ্য-সাধন নির্ণয় তত্বে বলিয়াছেন—যে "নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম সাধ্য কভু নয়। শ্রবণাদি (হেতু) শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়॥" অগ্রে শুদ্ধচিত্ত না হইলে, চিন্ময় ধনের ঋণ প্রাপ্তিতেও তখনই তখনই কৃষ্ণ প্রেমোদয় হয় না। তবে তাহার নিরন্তর সমাগমে চিত্তের আবর্জ্জনা যে তখন হইতে দগ্ধ হইবার সূত্রপাত হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সাধু সজ্জনের অন্তরঙ্গ নিরবচ্ছিন্ন কৃষ্ণ বা বিশ্বজনীন প্রেমে জর জর বলিয়া তদঙ্গ নিঃসৃত নিরঞ্জন, পরানন্দ ধন, মনুষ্য প্রকৃতি-নিহিত, নিত্যসিদ্ধ-কৃষ্ণপ্রেমের 'বিদেহ বীজকে সদেহ বীজে পরিণত ও অঙ্কুরিত করিয়া যথা সময়ে তাহাকে দেহব্যাপী কৃষ্ণপ্রেমাঙ্কে তদাকারিত করিয়া তুলে। এই নির্ম্মল চিত্ত-মলঘ্ন চিন্ময় ধনের মহাজনীতেও প্রেমোৎপত্তি হেতু চিত্তশুদ্ধি হইবার কোথাও কোন উল্লেখ নাই, কিন্তু সর্ব্বত্র চিত্তশুদ্ধিহেতু প্রেমোদয় হইবার কথাই আছে। সর্ব্ববিধ প্রেম-সঞ্চার স্থলে এ কথা সমান খাটিতেছে—যে, "প্রেমে চিত্ত-শুদ্ধি লাভ হয় না"; ঋণীর চিত্ত নির্ম্মল হইলে, সেখানে স্বতঃই সহজেই প্রেমবীজ অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। সাধু মহাজনের উক্তি প্রসিদ্ধই আছে যে "শুদ্ধচিত্তে উপজয় পিরীতি রতন।" সুতরাং চিত্তশুদ্ধি ও ঋণ প্রাপ্তি, এই কারণ দ্বয়ের মিলন হইতে সর্ব্বত্র প্রেম জন্মিয়া থাকে। পরানন্দঘন শ্রীকৃষ্ণ দেহের সংসর্গ কামনায় ও তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ অনুধ্যানে, চিত্ত-শুদ্ধিলাভ হওয়াতে ব্রজগোপীগণের প্রাকৃত কামও অপ্রাকৃত নির্ম্মল প্রেমে পরিণত হইয়াছিল, এবং অহরহঃ তাঁহার সভয় ভাবনা প্রযুক্ত তাঁহার

শত্রুগণেরও সঙ্গতি লাভ হইয়াছিল, ভাগবতাদি শাস্ত্রে এরূপ অনেক উল্লেখ আছে। অধ্যাত্ম রামায়ণে (?) কুম্ভকর্ণ সঙ্গে রাবণের সীতাহরণ সম্বন্ধে যে কথোপকথন হয়, তাহাতে রামচন্দ্রেরই রূপ পরিগ্রহ করিয়া সীতাহরণ কার্য্য সমাধা করিলে, এতাদৃশ কোন অনর্থোৎপত্তি হইতে পারিত না, এরূপ ভাব ব্যক্ত হইলে, রাবণ উত্তর করিলেন যে, সে রূপ পরিগ্রহণ কিরূপে করিব? তাহার পৌরাণিক আয়োজন স্বরূপ সেইরূপ ধ্যানে ধরিতে গিয়া দেখি যে, তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় সুখৈশ্বর্য্য ইন্দ্রত্ব ও ব্রহ্মত্ব পর্য্যন্ত আমার তুচ্ছজ্ঞান হইতে লাগিল, সীতাসহ বাসসুখ কোন ছার!!!

কু—'আনীতা ভবতা যদা পতিব্রতা সাধ্বী বিবশী সুতা
স্মৃতজাদাক্ষসমাযযা নচ কথং বামা সমর্জ্জাকৃতং।
রা—স্মৃত্বং চেতসি পুণ্ডরীক নয়নং দূর্ব্বাদল শ্যামলং,
তুচ্ছং ব্রহ্মপদং ভবেদনুদিনং পরবধূ সঙ্গ প্রসঙ্গঃ কুতঃ॥

নির্ম্মল চিন্ময় দেহের এমনি পবিত্রকারিতা শক্তিই বটে!!! মলিন দেহ সংসর্গের কি মোহপ্রদ, মালিন্যপ্রদ শক্তি নাই? মলিন জাতীয় প্রেম কি মোহোৎপাদক নহে? সে প্রেমের নাম কি মোহ নহে? স্ত্রী পুত্রাদিতে নিঃস্বার্থ ভাবে আসক্ত হইয়া কি জীব বদ্ধ হয় না? মৃগ-শিশুতে আসক্ত হইয়া কি ভরত রাজার সাময়িক দুর্গতি লাভ হইবার কথা শাস্ত্রাদিতে প্রচারিত নাই?

৫১। মানুষ যেখানে পরমাত্ম তত্ত্ব লাভ করিয়া, কৃষ্ণপ্রেমে দিবানিশি জর জর অঙ্গ, সেখানে সেই প্রেম কৃষ্ণপ্রেমিক মহাজনের ব্যষ্টিদেহ অতিক্রম পূর্ব্বক স্বভাবতঃই সর্ব্বব্যাপী—বিশ্বব্যাপী হইয়া বিশ্বজনীন প্রেমে পরিণত হয়। তখন তাহার নবীন পারমাত্মিক চক্ষে তাহার কৃষ্ণপ্রেমিক মহাজনের ব্যষ্টিগত ব্যবহারিক খণ্ডত্ব, সমষ্টিগত অখণ্ড সত্তাতে পরিব্যাপ্ত। তাহা তখন যাবতীয় ব্যষ্টি আধারগত—সর্ব্বাধারগত হইয়া প্রকাশ পায়। তখন তাহার ঋণভাবের গুরুত্ব কেবল এক মাত্র ঋণদাতা মহাজনের ব্যষ্টি আধার সম্বন্ধে উপলব্ধি হইয়া ক্ষান্ত হয় না, কিন্তু যাবতীয় আধার সম্বন্ধে তাহার উপলব্ধি হওয়াতে সেই প্রেম অনন্ত অসীম আকার পরিগ্রহণ করে। তখন তাহার ঋণভাবেরও সীমা নাই প্রেম বিস্তারেরও সীমা নাই। তখন সে ঋণ নিত্যকাল অপরিশোধনীয় আকার ধারণ করিয়া অব্যাহত থাকে। বিশ্বজনীন নিত্য দাসত্ব ব্রত অঙ্গীকার করিয়াও অনন্ত ভবিষ্যতে সেই দুরন্ত ঋণমোচনের কোন সম্ভাবনা থাকে না। ইহাই প্রকৃত কৃষ্ণ প্রেম।

ক্রমশঃ

শ্রীকালীনাথ দত্ত।

নবযুগ।

(১)

বেজেছে নূতন বাঁশী জীবন পুলিনে;
হৃদয়ে বিশ্বাস ভরি,
পুরাতনে পরিহরি,
এস সবে ত্বরা করি যে চাহ নবীনে,—
বেজেছে নূতন বাঁশী জীবন পুলিনে।

(২)

শুন, শুন প্রতিধ্বনি গম্ভীর বিশাল,
সুরে সুরে ছাইতেছে আকাশ পাতাল!
কলির কলুষ প্রাণ
হ'য়ে গেছে অবসান,
দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া পুন সত্যকাল।

(৩)
হের, ওই চরাচর উঠেছে জাগিয়া,
চৌদিকে আঁধার জাল পড়িছে খসিয়া।
আনন্দে অসীমে লুটে
ব্রহ্মাণ্ড চলেছে ছুটে,
নবযুগে নব গীতি গাহিয়া গাহিয়া।

(৪)
লাগিছে গানের ঢেউ আকাশের গায়,
অগণ্য তারকারাশি ফুটিতেছে তায়;
আহ্লাদে আপনা হাবা
নব জন্ম ল'যে তারা
কি-যে-কি করিবে সবে ভাবিয়া না পায়।

(৫)
লেগেছে ধরার গায়ে বাঁশীব লহবী,
পুলকেতে কায়া তার উঠিছে শিহরি;
রোমাঞ্চ-ফুলের হাসি
ফুটিতেছে রাশি রাশি
নব আশা, নব ভাব প্রাণের ভিতরি।

(৬)
গুহা হ'তে শুনিবারে পেযেছে তটিনী
জীবনের সমুখেতে নূতন কাহিনী;
গলিত নির্ঝর-ধারে
রোধিবারে নাহি পাবে,
চলিয়াছে, ছুটিয়াছে কূল-বিপ্লাবিনী।

(৭)
একেবারে শত পাখী উঠেছে মাতিয়া,
শত কবি অশ্রুধারা ফেলেছে মুছিয়া।
বিমুক্ত হয়েছে বন্ধ,
গাঁথিয়া নূতন ছন্দ
সরল উচ্ছ্বাস শুধু দিতেছে ঢালিয়া।

(৮)
একিরে নূতন যুগে নূতন উচ্ছ্বাস!
শিশু মুখে অর্থপূর্ণ বচনেব বাশ!
হেথা সখাগণ ভাষে,
হোথা সখীগণ হাসে,
বিশ্বপ্রাণে নবতর প্রেমের বিকাশ।

(৯)
দাঁড়ায়ে সমুদ্র তীরে মুগ্ধ কবিবব,
অসীমে বিস্তৃত তাঁর দৃষ্টির প্রসব,
পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞের মত
পড়িছেন অবিরত
বিশ্বের বিশাল কাব্যে সত্যের আঁখর!

(১০)
ছুটিয়াছে কোটী যাত্রী অনন্ত সঙ্গমে;
তীর্থযাত্রা নাহি শুধু বাঙ্গালী-ধরমে?
মোরা কি কীটের মত
ধূলি-আলিঙ্গনে রত
প'ড়ে রব মর্ম্মজ্বালা রুধিয়া মরমে?

(১১)
কোথা নব বৃন্দাবনে যমুনার তীবে
জগতের নাম ধ'রে কে ডেকেছে ধীরে;
জগৎ ছুটিছে তাই,
আমরাও চল যাই
ভাসায়ে এ মিথ্যারাশি বিস্মৃতির নীরে।

(১২)
গাও তবে, গাও আজি নূতনের জয়,
পুরাতন চ'লে য'াক্, হউক বিলয়;
পশ্চাতে মর্ত্ত্যের রাতি,
সমুখে স্বর্গের ভাতি,
এক ভাষা, এক ধর্ম্ম,—শান্তির আলয়।

শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু।

সুজা বাই

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর উষায় রাজপুতানা-বুঁদী রাজকুমারীর নির্ম্মম জীবন কাহিনী। বুঁদীরাজ্য তখন বীরত্বে বিখ্যাত, গৌরবগর্ব্বে উন্নত। এমন সময়ে রাজা নারায়ণদাসের গৃহে মাধুরীময়ী, কলহাস্য-পরায়ণা তন্বী সুন্দরী বালিকা সুজাবাই তাহার শৈশবের চঞ্চল সুন্দর শোভাখানি লইয়া পিতৃ গৃহের অন্তরঙ্গ অভিভাবক-আশ্রিত অনুগত সকলের সম্মুখে সর্ব্বদা ক্ষুদ্র পরী রাণীর মতন হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইত।

বুঁদীরাজ নারায়ণদাস গৃহে যেমন স্নেহময় ছিলেন, তেমনি যুদ্ধ প্রতিভার জন্য তাঁহার দেশব্যাপী সুনাম ছিল। অনেক রণক্ষেত্রে তিনি খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া কীর্ত্তিমান হইয়া গিয়াছেন। রাজপুত রমণীরা গোধুম পেষণ করিতে করিতে মধুরকণ্ঠে, উদ্বেল হৃদয়ে তাঁহার অদ্ভুত বীরত্ব গাথা গান করিত; রাজ্যের অবাধ্য উশৃঙ্খল মন্দ লোকেরা রাজা নারায়ণদাসের শাসন ভয়ে সংযত থাকিত। তাঁহার সাহসের কথা শোনে নাই, তখনকার দিনে দেশে এমন কেহই ছিলনা। ভয় কাহাকে বলে, তিনি জানিতেন না।

কিন্তু একাধারে অনেক গুণের সমাবেশ সত্ত্বেও সর্ব্বোপরি দোষ ছিল, অহিফেণ-সেবনাসক্তি। জীবনের ঐ এক কলঙ্ক ভিন্ন দ্বিতীয় দোষ কিছু ছিলনা। ইহারই বিষময় তন্দ্রালস প্রভাব তাঁহাকে সময়ে অকর্ম্মণ্য করিয়া রাখিত। শারীর মানস অনেক বিষয়ে তিনি আত্মসংযমী ছিলেন, কিন্তু এই মন্দ অভ্যাসটীর এত বশ হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, ক্রমেই মাত্রা অধিক হইতে অধিকতর হইয়া চলিতেছিল। তবে, রাজা নারায়ণদাসের চরিত্রের দোষগুণ একত্র করিলে গুণের ভাগই যে অনেক অধিক হইয়া পড়ে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সুজা বাইয়ের জননী চিতোর রাজ বংশের কুমারী কন্যাকে তিনি যেমন ঘটনায় লাভ করিয়াছিলেন, তাহা শুনিতে নিতান্তই কৌতুহলজনক। বুঁদী ও চিতোর, এই উভয় রাজবংশ তখন পরস্পর মধুর মিত্র-সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিল; একের আবশ্যকে অন্যে প্রাণপণেও সাহায্য করিতেন। চিতোরের রাণা রায়মল্ল একবার পাঠানদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া নিরুপায়ের ভরসা, অসহায়ের সহায় রাজ। নারায়ণকে সংবাদ দিবামাত্র তিনি সংস্রাদ্ধ মনোনীত সৈন্যসঙ্গে বন্ধুর উদ্ধারে চলিলেন। বুঁদীর নগরদ্বার হইতে শস্ত্র সজ্জিত গর্ব্বিত সৈন্যশ্রেণী দৃঢ়পদক্ষেপে ক্রমাগতঃ রাজপথ বহিয়া গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হইল। ক্রমে মধ্যাহ্ন সময়ে সৈন্যদের আহার ও শ্রান্তিদূরের জন্য একটি ছায়া-শীতল গ্রাম মনোনীত হইলে, তখন বিশ্রামের জন্য রাজাজ্ঞা প্রচারিত হইল। অশ্বারতারিত রাজা প্রথমেই তাঁহার প্রাত্যাহিক 'মৌতাতের' মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন। পরে সময়ে আহারাদি শেষ হইল। এদিকে মৌতাত ধরিয়া উঠিয়াছে, নিদ্রিত না হইয়া তিনি আর পারেন না। অদূরবর্ত্তী একটী বৃক্ষছায়াস্নিগ্ধ সুন্দর স্থানে রাজা তখন রাজ-শয্যায় শায়িত হইলেন। এমন সুখস্বপ্নের ঘোরে যখন তিনি পাঠান জয় করিতেছিলেন, তখন অধরোষ্ঠ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত এবং দন্তপাঁতি

ও শুষ্ক জিহ্বা নির্গত হইয়া পড়িয়াছে, কষ্ট শ্বাস একবার সশব্দে আর একবার নিঃশব্দে চলিতেছে এবং মক্ষিকাদল নিশ্চিন্তে রাজার মুখ ও ললাট অধিকার করিয়া বসিয়াছে। এমন সময় ঐ গ্রামস্থ তৈলকারের যুবতী স্ত্রী বৃক্ষতলবর্ত্তী কূপে জল আনিতে কলসী কক্ষে সেখানে উপস্থিত। যুবতী জল ভরিল, কলসী কক্ষে তুলিল, পরে সে বিখ্যাত রাজা নারায়ণদাসকে দেখিবার কৌতূহলটাও ত্যাগ করিতে পারিল না। কিন্তু দেখিবামাত্র রমণীর স্ফুরিত অধর ও বিস্ফারিত নয়নে বিদ্রুপবিস্ময় চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে, আবার তাহা যেন মলিন হইয়া গেল, ধীরে সে বলিল,—"পোড়া কপাল আমাদের রাণার, ইহারি ভরসায় আছেন, তবেই বিলক্ষণ।" কথাটী কহিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য সবে সে পা বাড়াইয়াছে, অমনি সর্ব্বনাশ, রাজা নারায়ণদাস শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া পলকের জন্য একবার সেই বিদ্রুপপরায়ণা, গমনোদ্যতা যুবতীকে তীব্র অপাঙ্গ ভঙ্গীর সঙ্গে দেখিয়া লইলেন। পরে তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"মর্দ্দানি, মৎ ভাগো!" ভয়-বিহ্বল রমণী আর অগ্রসর হইতে পারিল না, রাজা যাইয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন। তখন বিনা বাক্য-ব্যয়ে রাজা একখানি লৌহদণ্ড আনাইলেন। বুঝি মস্তক চূর্ণের ব্যবস্থায় অতবড় লোহার লাঠি আনা হইল, এই আতঙ্কের অতিশয্যে রমণীর মুখ ফুটিতেছিল না, শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিতেছিল। রাজা লৌহদণ্ড উঠাইলেন, পরে দুইদিকে দুইখানি হাত দিয়া অবলীলাক্রমে, অনায়াসে, লোকে যেমন নরম বেতের একখানি দীর্ঘ সরল লাঠির দুই প্রান্ত একত্র করে, তেমনি তিনি লৌহ-দণ্ড খানিকে ইচ্ছানুরূপ গোলাকার করিয়া ঠিক্ একটী হাঁসলীর মতন করিলেন। তাহাই রমণীর গলায় পরাইয়া দিয়া তাহাকে বলিলেন,—"আমার পুনরায় না আসা পর্য্যন্ত তুমি তোমারি যোগ্য এই সুন্দর অলঙ্কার পরিয়া থাক, আর ইহার মধ্যে যদি তোমার মনোনীত কোনও বীরপুরুষ ইহা খুলিতে পারেন, ভাল, রাজা নারায়ণদাস তাহাকে হাজার আসরফি এমদাদ্ দিবে।"—বিস্মিত, অনুতপ্ত, লজ্জিত রমণী রাজদত্ত অভিনব অলঙ্কার গলায় পরিয়া গৃহে গেল, এদিকে রাজা দ্রুতগতিতে চিতোরের দিকে অগ্রসর হইলেন। যথাকালে চিতোরের নিকটে উপস্থিত হইয়া তিনি দেখেন, দুর্দ্ধর্ষ পাঠানেরা দলে দলে চিতোর নগর ঘিরিয়া আছে; প্রজাসাধারণ উৎপীড়িত, ধনধান্য লুণ্ঠিত, রাণা রুদ্ধদ্বার নগরে আবদ্ধ। তখন বিনাবাক্যব্যয়ে রাজা নারায়ণ দাস তাঁহার সুশিক্ষিত,সাহসী সৈন্যদল সঙ্গে পাঠান সৈন্যের উপর পড়িলেন। চিতোর হইতে নগর প্রাচীরের বাহিরে হিন্দু-মুসলমান সৈন্যের দারুণ যুদ্ধ কোলাহল শোনা গেল। অল্প কালের মধ্যেই বুঁদীরাজ সৈন্যের অমানুষিক সাহস ও সমর কৌশলে পাঠান সৈন্যদলের জয়কোলাহল বিস্পষ্ট আর্ত্তনাদে পরিণত হইয়াছে। একদল পলায়িত পাঠানসৈন্য তাড়িত পশুপালের মত প্রাণ বাঁচাইল। চিতোরের রক্তাক্ত পথ তখন পরিষ্কার হইয়াছে। উপকারী বীরবন্ধু বুঁদীরাজের জন্য তখন চিতোর নগরদ্বার আনন্দ আপ্যায়িত উৎসবের সহিত উন্মুক্ত হইয়াছে। বুঁদীরাজ চিতোরে উপস্থিত হইলে কৃতজ্ঞ মহারাণা প্রেমা সিংহের সহিত তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার এই শুভাগমন উপলক্ষে সর্ব্বদায়

চিতোরনগরে উৎসবের উচ্ছ্বাস বহিতে লাগিল। রাজপথে পত্র পুষ্প-পতাকার শোভা, পণ্যবীথিকায় লোহিত বস্ত্র ও ফুলমালার শোভা, জনতা স্রোতে স্ত্রীপুরুষ সকলের মুখে আনন্দচিহ্ন, প্রাসাদ ও পর্ণকুটীর সমস্তই সজ্জিত। রাজা নারায়ণের বন্ধুর প্রতি কর্ত্তব্যের এই বীরোচিত দৃষ্টান্ত, তাঁহার সাহস ও সমর কৌশলের কথা অবিলম্বে রাজান্তঃপুরের রমণীরা বিস্ময়-আনন্দ একাগ্রতার সঙ্গে শুনিলেন। ভারতে তখন স্বাধীনতার দিন, তখনকার শিক্ষা, তখনকার সাধনা, তখনকার মানুষের মনের ভাবের সঙ্গে এখনকার তুলনা হয় না। কুলবালারা সে সময়ে গৃহকর্ম্ম করিতে করিতে বীরপুরুষের কীর্ত্তি কাহিনী গান করিত, কুমারী কন্যা সাহসী যোদ্ধাযুবকের কণ্ঠে বরমাল্য দান করাকে পরমলাভ মনে করিত। চিতোররাজান্তঃপুরে যখন সকলেই প্রশংসাকণ্ঠে রাজা নারায়ণের অপূর্ব্ব বীরত্বের কথা বলিতেছিল, তখন রাণা রায়মল্লের অনূঢ়া সুন্দরী ভ্রাতষ্পুত্রী প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন "আমি রাজা নারায়ণের রাণী হইব, নতুবা আমরণ কুমারী রহিব।" বুঁদীরাজ কোনসূত্রে একথা শুনিতে পাইলেন। এবার তাঁহার ভাগ্যে যে একযাত্রায় একাধিক লাভ লেখা ছিল, তাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। বীরবালার প্রতিজ্ঞা শুনিয়া রাজা নারায়ণ দাসের শুষ্ক হৃদয়ে সহসা কেমন অজ্ঞাতপূর্ব্ব সুখের হিল্লোল বহিতে লাগিল। তিনিও তাঁহাকে লাভ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। রাণা আনন্দের সহিত এ বিবাহে সম্মতি দিলে অবিলম্বে জয়োৎসবের সঙ্গে সঙ্গেই বিবাহোৎসবের মধুর বাদ্য বাজিয়া উঠিল। রাণার অভিপ্রায়ে বিবাহোৎসবের এক অঙ্গও অপূর্ণ রহিল না। ক্রমাগতঃ কয়েকদিন পর্য্যন্ত রাজবাটীর লুচি মণ্ডা, পায়স পিষ্টক লোভে চারিদিকে দেহি দেহি রব উঠিল। নৃত্যগীতবাদ্যে নগর অশান্ত হইয়া উঠিল। অবশেষে, যথাকালে, সকলের শুভ আশীর্ব্বাদ ও আনন্দ উচ্ছ্বাসের মধ্যে বুঁদী রাজ তাঁহার নবপরিণীতা রাণী সঙ্গে আপনার রাজধানীর দিকে অগ্রসর হইলেন। এইরূপে, এই উপলক্ষে রাজা নারায়ণদাস যে কুমারী তরুণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনিই সুজা বাইয়ের জননী।

যশস্বী বুঁদীরাজ নারায়ণদাস সুখে জীবন অতিবাহিত করিয়া ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ইহলোক হইতে বিদায় হইলে, তাঁহার একমাত্র পুত্র রাজা সুজা রাজ্যের ভার গ্রহণে বাধ্য হইলেন। পিতার ন্যায় যদিও অমন অসাধারণ গুণগ্রামে অলঙ্কৃত ছিলেন না, তথাপি সেই অপূর্ব্ব শারীরিক ও মানসিক শক্তি তাঁহাতেও যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চারিত হইয়াছিল। যে কেহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরিচিত ছিল, সেই আন্তরিক অনুরক্ত না হইয়া পারে নাই। তখনকার সমুদয় রাজপুত্রদিগের মধ্যে সকলে তাঁহাকে একজন সপ্রতিভ ও সৌজন্যপরায়ণ বলিয়া জানিত। আজানুদীর্ঘবাহু, কমনীয়কান্তি রাজা সুজার শরীর সৌষ্ঠবের কথা ইতিহাস একাধিকবার উল্লেখ করিয়াছে।

কিন্তু পরিতাপের বিষয়, তাঁহার সুলক্ষণ ও সদ্গুণে মুগ্ধ আত্মীয় অন্তরঙ্গ এবং প্রজাপুঞ্জ সকলেই তাঁহার শোচনীয় পরিণামে ভগ্নহৃদয় হইয়া গিয়াছিল। বড় ইচ্ছা ছিল, আশ্রিত অন্তরঙ্গদের সুখী করিবেন, কিন্তু করাল কাল তাহা অপূর্ণ রাখিয়াছে। তাঁহার মূল্যবান জীবন প্রস্ফুটিত হইতে না হইতে

অকালে ঝরিয়া পড়িয়াছিল; সেই সঙ্গে দেববালার স্থায় রূপগুণবতী, নিরপরাধিনী বালিকা সুজাবাইয়ের সহিত দুর্লভ সৌন্দর্য্যরাশি চিতাভস্মে পরিণত হইয়াছিল।

পিতার কথা মনে করিয়া রাজা সুজা চিতোর রাজবংশের সহিত পূর্ব্বভাব অব্যাহত রাখিতে অনিচ্ছা করিলেন না। চিতোরের তৎকালীন রাণা রত্নের একটী ভগ্নীকে তিনি সাগ্রহে গ্রহণ করিলেন এবং তাহারি পরিবর্ত্তে রাণা রত্ন বুঁদী রাজকুমারী সুজাবাইকে পত্নী রূপে লাভ করিয়া সুখী হইলেন। এই দাম্পত্যমিলনফলে প্রথম কিছুদিন বড় সুখেই কাটিল। দেবদুর্লভ রূপমাধুরীর অপূর্ব্ব আকর্ষণে সুজাবাইকে তাঁহার স্বামী তদ্গতচিত্তে ভালবাসিতে আরম্ভ করিলেন। কেবল তাহাই নয়, তাঁহার মধুর কৌতুকপরায়ণ বিশুদ্ধ প্রফুল্লস্বভাবে চিতোরের নবীন রাণা মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু হায়, সেই স্বভাবই যে কালস্বরূপ হইবে, কে জানিত? এ সুখভোগ যে অতি অল্প দিনের জন্য, তখন স্বপ্নেও কেহ ভাবে নাই। নিদারুণ নিয়তির নির্ম্মম মুহূর্ত্ত অবিলম্বে উপস্থিত হইল এবং আরও দুঃখের বিষয় সুজাবাইয়ের অকপট, সরল, স্বাভাবিক বিদ্রূপপরায়ণ অভ্যাসজনিত একটী সামান্য কথায় রাজস্থানে এই শোচনীয় বিয়োগান্ত নাট্যের অভিনয় শেষ হইয়া গিয়াছে;—তাঁহারি সদাস্নিগ্ধ, মধুর কৌতুকহাস্যে তিনি আপনি আত্মবিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হইয়াছেন।

একবার রাজা সুজা চিতোরে আসিয়াছেন। সুজাবাইয়ের আনন্দ উল্লেখ করা বাহুল্য। এই উপলক্ষে তখন চিতোরের সকলেই [illegible] আনন্দ প্রকাশ করিতেছে। ভ্রাতার এই আগমন উপলক্ষে সুজাবাইয়ের একদিন বড় সাধ হইয়াছে, অন্তঃপুরে স্বহস্তে আয়োজন করিয়া রাণা ও রাজা সুজাকে আহার করাইবেন। সেদিন শিশিরধৌত মল্লিকা ফুলের মতন প্রত্যূষেই স্নাত হইয়া সুজাবাই শুভ্রবস্ত্র পরিধান করিলেন; তাঁহার আর্দ্র আলুলায়িত কৃষ্ণকেশরাশি পৃষ্ঠদেশ ছাইয়া পড়িয়াছে; উৎফুল্ল উৎসাহমনে সুজা রন্ধনশালার ভারপ্রাপ্ত রমণীদের সঙ্গে যোগ দান করিয়া একাগ্রমনে রন্ধনশিল্পের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন। অন্তঃপুরের অন্যান্য মহিলা এবং পরিচারিকারা তাঁহাকে এত পরিশ্রম না করিয়া কেবল পর্য্যবেক্ষণ করিতে অনুরোধ করিলে হাস্যমুখে তিনি তাহা অগ্রাহ্য করিয়া ভাই ও স্বামী যে সব দ্রব্য ভালবাসেন, তাহা স্বহস্তে প্রস্তুত করিতে একবিন্দু ক্লান্তি প্রকাশ করিলেন না। রাজান্তঃপুরের সুবেশ সুন্দর পরিচারিকাগণ সযত্নে, সাগ্রহে তাহাদের রাজলক্ষ্মী রাণীর সঙ্গে ছায়ার ন্যায় থাকিয়া কাজ করিতেছে। মর্ম্মর-প্রস্তর-নির্ম্মিত সুদৃশ্য আহার গৃহে পুষ্পগুচ্ছ ও মালার শোভা অপূর্ব্ব দেখাইতেছিল। সুপরিচ্ছিন্ন আহার স্থানে মূল্যবান বস্ত্রাসন বিছাইয়া সম্মুখে, পার্শ্বে আর্দ্র, স্নিগ্ধ, সুবাসিত সুন্দর পত্রপুষ্পশোভিত ফুলদানী সাজাইয়াছে। যথাকালে রাণা ও রাজা সুজা অন্তঃপুরে আসিলেন। তখন যেন মূর্ত্তিমতী অন্নপূর্ণা সুজাবাই আপনহস্তে একে একে বিবিধ খাদ্যপূর্ণ সুবর্ণ রজত পাত্র সকল তুলিয়া আনিয়া উভয়ের সম্মুখে সাজাইয়া দিতে লাগিলেন। সৌভাগ্যবান শ্রীমন্ত গৃহের স্বর্গীয় পারিবারিক সুখদৃশ্য ফুটিয়া উঠিল। বাহিরের শুষ্ক কঠিন রাজনৈতিক অশান্তি উদ্বেগ কোলাহল হইতে অবসর লাভ করিয়া

গৃহের এই অপার্থিব পবিত্র শোভা শান্তি এবং নিঃস্বার্থ সরল সযত্ন স্নেহের স্নিগ্ধ সান্নিধ্যে আসিয়া তাঁহারা উভয়েই বিশুদ্ধ সুখানুভব করিলেন, উভয়েরই মুখশ্রী আনন্দোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কিন্তু রাণা অশ্রান্ত উৎসাহিত সুজাবাইয়ের স্বেদকণাসিক্ত সুন্দর মুখখানির দিকে একবার তাকাইয়া দেখিয়া পরক্ষণেই পার্শ্ববর্ত্তী রাজা সুজাকে সম্বোধনে একটু বক্রভাবে কহিলেন,—"দেখ, আজ তোমার জন্যে মহারাণী কেমন পরিশ্রম করিতেছেন।" শুনিয়া ভাই ভগ্নী দুইজনেই নিতান্ত সরল মনে শুধু মৃদু হাসিলেন। উভয়ে আহারে বসিলে মক্ষিকার ভয়ে সুজাবাই তাঁহাদের নিকটে বসিয়া ধীরে ধীরে সুবাসিত স্নিগ্ধ পুষ্পবৃন্ত ব্যজন করিতেছিলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই আহার গৃহে সুজাবাই গল্পেসল্পে উভয়ের মনোরঞ্জন করিতেছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে আহার পরায়ণ রাণা ও রাজার বাক্যালাপ ও সুজাবাইয়ের প্রফুল্ল কণ্ঠস্বর এবং মধুর হাস্যধ্বনি শুনা যাইতেছিল। কিন্তু সেই আনন্দই সকলের শেষ আনন্দ এবং সুজাবাইয়েরও তাহাই শেষ হাসি। আহার শেষ হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় সুজাবাই কিছু কৌতুকের ভাবে এবং কিছু বা নিশ্চয়ভাবে বলিলেন,—"সুজা সিংহের মতন বীরোচিত আহার করিয়াছেন, আর মহারাণা যেন ছেলেখেলা খেলিয়াছে!"—এমন কৌতুক কথা কতজনে বলিয়া থাকে, কেহই কিছু মনে করে না, কিন্তু সুজাবাইয়ের এই কথায় রাণারত্ন আপনাকে দারুণ অপমানিত বোধ করিলেন। মনের এই অবস্থা তিনি সংযত করিতে পারিলেন না। সুজার কথার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার মুখের ভাব আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে দেখিয়া সেখানে কাহারই বুঝিতে বিলম্ব হইল না, হিতে বিপরীত হইয়া উঠিয়াছে। রাণা ক্রোধারক্তিম নয়নে পত্নীর দিকে দেখিলেন, আবার তখনি ঘৃণার সঙ্গে দৃষ্টি অপসারিত করিয়া রাজা সুজার দিকে তাকাইলেন। রাণার ক্রোধোদ্রেকের এই কারণটিকে নিতান্ত তুচ্ছ মনে করিয়া রাজা সুজা হাসিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিলেন এবং তিনি রাণাকে বলিলেন, তাঁহার ভগিনীর এই কথার মধ্যে কোনও উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না। তাহা মনে করাও অস্বাভাবিক। সুজার কৌতুকপরায়ণ স্বভাবের উহা একটি অগ্র-পশ্চাৎবিবেচনাহীন উক্তি বৈ আর কিছু নয়। পরন্তু, বড় অপরাধ করিলেও সুজাবাইকে তাঁহার ক্ষমা করা কর্ত্তব্য। সরল ভাবে ইহাই বলিয়া তিনি রাণাকে নির্ব্বন্ধাতিশয়ে অনুরোধ করিতে লাগিলেন যেন এজন্য তিনি নিজগুণে সুজাকে ক্ষমা করেন। রাণা, অবশেষে স্বীকৃত হইলেন। স্বীকৃত হইলেন কিন্তু প্রাণের দারুণ জ্বালা জুড়াইল না। বাহিরে আপাততঃ শান্তমূর্ত্তি দেখাইলেন, কিন্তু রাজা সুজার সহিত তাঁহার তুলনার সেই কথাটী তাঁহাকে নিরন্তর দগ্ধ করিতে লাগিল। এই ঘটনার পর রাজা যে কয়দিন চিতোরে রহিলেন, রাণার পূর্ব্ববৎ আপ্যায়িত আলাপের কোনই ত্রুটি হইল না। রাজা সুজা ক্রমে সে দিনের সে কথা ভুলিলেন, কিন্তু কুটিলস্বভাব রাণা রত্ন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, প্রতিশোধ না লইয়া তিনি ছাড়িবেন না। 'সিংহের জীবনবিনিময়ে তাঁহার গৌরবগর্ব্ব রক্ষিত হইবে, নতুবা নহে।

অনুতপ্ত, ভ্রাতৃস্নেহময়ী সুজাবাইয়ের উদ্বেগের অন্ত নাই। "হায়, কেন বলিলুম;

যাইলাম” বলিয়া নিভৃতে নীরবে তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। স্বামীর ক্রুদ্ধ স্বভাবের কথা তিনি জানিতেন, তাই তাঁহার পিতৃ-গৃহের একমাত্র স্নেহাবলম্বন, সমুদায় বুঁদী রাজ্যের একমাত্র আশা ভরসাস্থল রাজা সুজার অমঙ্গল আশঙ্কায় প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। নিরপরাধিনী শতবার, সহস্রবার আপনি আপনাকে ধিক্কার দিয়াছেন। এই ভাবে ক্রমাগত কয়েক দিন অতীত হইলে, রাজা সুজা নিরাপদে চিতোর হইতে গৃহে ফিরিবার পর চিতোরে তাঁহার বুঁদী উপস্থিত সংবাদ আসিলে, সুজাবাই অপেক্ষাকৃত শান্ত হইলেন। তাঁহার প্রতি রাণার ব্যবহারেও কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই, পূর্ব্বেরই মতন তিনি স্বেচ্ছায় সুজার কক্ষে কাল কাটাইতে-ছিলেন। সুজাও ক্রমশঃ নিশ্চিন্ত হইতে-ছিলেন। আরও দিন গেল, ততদিনে ক্রমে সে কথা তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু, রাণার হৃদয়ের সেই বিদ্বেষবিষ বিলুপ্ত হয় নাই; অনুক্ষণ তাঁহার অভিসন্ধির সুযোগ অপেক্ষা করিতেছিলেন। এই নির্ম্মম প্রতিহিংসাপরায়ণতায় কি ভয়ানক ফল ফলিবে, তিনি বারেকের জন্যও ভাবিলেন না; এই অযোগ্য, অসঙ্গত ক্রোধের পরি-ণামে ভগ্নীটির কি অবস্থা হইবে, সে চিন্তাও মন হইতে মুহূর্ত্তের মধ্যে মুছিয়া ফেলিলেন। রাজ্যাধীশ্বর তিনি মোহের অধীন হইয়া স্বেচ্ছায় আপনি পুড়িয়া মরিলেন, অন্যকেও নিরপরাধে নষ্ট করিলেন;—সেই সঙ্গে সর্ব্ব-নাশের সহিত সহসা বিস্তীর্ণ রাজ্যময় একটী মর্ম্মভেদী করুণ ক্রন্দন-কোলাহল জাগিয়া উঠিল।—শীতাবসানে সুন্দর বসন্ত ঋতু আবার নবীন মধুর পরিপূর্ণ শোভাসম্পদ-রাশির সঙ্গে পৃথিবীতে দেখা দিল, কিন্তু হায় সেই বিবিধবিহঙ্গকাকলিগীতমুখরিত, সুবা-সিত, ফুল্লকুসুমিত বনভূমির অন্তরালে যেন অদূরবর্ত্তী ভবিষ্যতের কি একটী নিদারুণ বিষাদবেদনার মর্ম্মান্তিক করুণাপ্লুত আভাষ লুকাইয়া ছিল, কেহই দিন থাকিতে তাহা জানিল না।

এমন সময় রাণা রত্ন একদিন রাজা সুজার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন, “বসন্তোৎসব উপ-স্থিত, তিনি স্বীকৃত হইলে উভয়ে একত্রে কয়েক দিন মৃগয়ার আনন্দ ভোগ করিতেন। বুঁদীরাজের বিখ্যাত অরণ্যে এ অভিলাষ যথেষ্ট পরিতৃপ্ত হইতে পারে।”—সংবাদ পাইবা মাত্র উদারবুদ্ধি, সরলপ্রাণ রাজা সুজা আনন্দ আপ্যায়িতের সঙ্গে রাণা রত্নকে আহ্বান করিলেন। তাঁহারি অধিকার মধ্যে চম্বল নদীর পশ্চিম দিকে উচ্চ পর্ব্বতের পাশে পাশে বহুদূরব্যাপী মহারণ্যশ্রেণী রাজকীয় মৃগয়ার জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। সেই মহাবনে নানাবিধ ভয়ানক হিংস্রজীব জন্তুর অভাব ছিল না। নির্ভীক দুর্দ্দান্ত জন্তু হইতে নানা জাতীয় বিচিত্র সুন্দর হরিণ এবং খরগোস দলে দলে বিচরণ করিত। ইহাদের দিবা-নিশি অবিরাম সশব্দ ক্রীড়ায় সমুদায় বন প্রদেশ আন্দোলিত হইত। তাহারি মধ্যে সাহসী পুরুষেরা অস্ত্রসজ্জিত হইয়া মহানন্দে বারবিক্রমে সিংহ-শার্দ্দুল ভল্লুক বরাহমহিষ প্রভৃতি বিবিধ হিংস্রজন্তুকে কখন বা অস্ত্রে এবং কখন বা একাকী বাহুবলে বিনাশ করিতেন। মৃগয়াক্রীড়ায় রাজপুতের যেমন তন্ময়তা, এমন আর কিছুতেই নয়; এই উপ-লক্ষে তাহারা সকলই ভুলিয়া যাইত।

যথাসময়ে সেই বনের একস্থানে রাণা এবং রাজা সুজার উভয় দলে দেখা হইলে কোনও মনোনীত স্থানে শিবির সন্নিবেশের

জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল। সে দিন সেই মহারণ্য মধ্যে চারিদিকে সৈন্য ও শিবির বেষ্টিত স্থানে অস্ত্র সজ্জিত রাজাসুজা তাঁহার ভগিনী-পতিকে সাদর আহ্বানে গ্রহণ করিতে অশ্বারোহণে অগ্রসর হইলেন; তাঁহার বীরত্বোজ্জ্বল নবীন মুখশ্রীতে এই উপলক্ষে আনন্দ ও উৎসাহ চিহ্ন প্রকাশ পাইতেছিল। উভয়ে সাক্ষাৎ হইবামাত্র রাজাসুজার ন্যায় রাণা রত্নও আপ্যায়িত আনন্দ প্রকাশ করিলেন। পরদিন মৃগয়ার আনন্দ উপভোগ আশায় রাজাসুজা নিশাথে শিবির মধ্যে সুখকল্পনা করিতেছিলেন, আর এক-দিকে ক্রূর, ক্রুদ্ধ, দুর্ভাগা রাণা তাঁহার ঘৃণিত অভিসন্ধির কৃতকার্য্যতা অদূরবর্ত্তী ভাবিয়া অধীর আনন্দে নিদ্রাহীন রজনী অতিবাহিত করিতেছিলেন। ক্রমে নিশাবসানে সকলে জাগ্রত হইল। বুঁদী ও চিতোর রাজের সঙ্গে যে ক্ষুদ্র সৈন্যদল আসিয়াছিল, তাহাদিগকে অরণ্যের ভিন্ন ভিন্ন দিকে মৃগয়া করিবার অভিপ্রায় দিয়া রাজাসুজা ও রাণা-রত্ন নির্দ্দিষ্ট কয়েকটিমাত্র শরীর রক্ষক সঙ্গে অবিলম্বে প্রস্তুত হইলেন। দেখিতে দেখিতে অশ্বারোহী সৈন্যদের উৎসাহ শব্দ ও আলোড়নে ও তাহাদের দ্বারা পশ্চাদ্ধাবিত, আঘাতিত জীবজন্তুর আর্ত্তনাদে বনভূমি চঞ্চল হইয়া উঠিল। এই মহানন্দোচ্ছ্বাসের দিনে রাজা হইতে সামান্য সৈনিক পর্য্যন্ত সকলেই আপনাপন শীকারে ব্যস্ত ও অন্যমনস্ক, কাহারও দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই। যে কয়জন মুষ্টিমেয় অশ্বারোহী শরীররক্ষক রাণা ও রাজাসুজার সঙ্গে ছিল, তাহারা দুইজনের নিকটে থাকিয়াও, মৃগয়ার কোলাহলোচ্ছ্বাসে অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছে। সেই বিরাট বনভূমিমধ্যে যখন বীরবাঞ্ছিত মৃগয়ার এই মহামহোচ্ছ্বাস বহিতেছিল, তখন অল্পক্ষণের মধ্যে রাণা ও রাজা পরস্পর একটু সরিয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু তখনও সম্পূর্ণ দৃষ্টিরন্তরাল হইয়া যান নাই। ঠিক্ এমনি সময়ে রাণা তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী একজনকে উন্মত্তের মতন চীৎকার স্বরে বলিলেন,—"বড শীকারের এইত এখন সময়।" বলিয়াই সেই হিতাহিত বুদ্ধিহীন, ক্রূর, ক্রোধাতুর, পামর রাণা রাজাসুজাকে লক্ষ্য করিয়া তাহার অব্যর্থ শরসন্ধান করিল। রাজাসুজার ভাগ্যে নিরীহ হরিণ শিশুর ন্যায় ব্যাধহস্তে মৃত্যু লেখা ছিল না, তাই সৌভাগ্যবশতঃ সহসা তিনি বিস্ময় চকিত দৃষ্টিপাতে দেখিতে পাইলেন, রাণার নিক্ষিপ্ত শর মুহূর্ত্তে তাঁহাকে নষ্ট করে। নিমেষের মধ্যে রাজা সুজা আশ্চর্য্য কৌশলে হাতের ধনুক সম্মুখে উঠাইলেন, আর তখনি তাহাতেই সবলে প্রতিহত হইয়া বিষাক্ত তীক্ষ্ণ মারাত্মক শর ধূলায় লুটাইয়া পড়িল। তখনও, এমন ভয়ানক অবস্থাতেও, উন্নত উদারবুদ্ধি রাজা সুজা নিশ্চয় বোধ করিলেন, সহসা অন্যমনস্কতায় রাণার মনোবুদ্ধির অগোচরে ইহা ঘটিয়াছে, কিন্তু আবার—তখনি সুজা বিস্মিত, ব্যথিত, ব্যাকুল ভাবে দেখিলেন, কোন ভয়ানক চক্রান্তফলে আজ হত্যাকারীদের দ্বারা বেষ্টিত হইয়াছেন, হায়, রাণা-রত্ন তাহারি একজন!

দেখিতে দেখিতে আর একটী—আরো একটী তীর আসিয়া পড়িল। রাজা সুজা আপনাকে রক্ষা করিতে ব্যস্ত হইতেছেন, এমন সময় আর কালগৌণমাত্র না করিয়া বিমূঢ় রাণা উন্মত্ত ঝড়ের মতন ঘোড়া ছুটাইল, অমনি দেখিতে দেখিতে উলঙ্গ তরবারী [illegible] রাজাকে অতি- [illegible]

আঘাত করিল। রাণার এই অমানুষিক উদ্যম দেখিবামাত্র রাজা সুজা বিস্ময় এবং মনোবেদনায় ক্ষণেকের জন্য আত্মহারা হইয়াছিলেন, তিনি তাঁহার এতদিনের প্রিয় ভগিনীপতিকে একটী কথা জিজ্ঞাসারও অবসর পাইলেন না; অস্ত্রের দারুণ আঘাতে অবসন্ন, মূর্চ্ছিত ও অশ্বপৃষ্ঠ হইতে সশব্দে পড়িয়া গেলেন। কিন্তু মুহুর্ত্তের মধ্যে আবার জ্ঞানের সঞ্চার হইল; মারাত্মক আঘাতে কাতর, রক্তাপ্লুত, ধূল্যবলুণ্ঠিত রাজাধিরাজ বুঁদীশ্বর একবার চোখ মেলিয়া চারিদিকে তাকাইয়া দেখিলেন, অন্তিমকালে নিকটে তাঁহার কেহই নাই, অদূরে পরম শত্রু ভগিনীপতি অশ্বারোহণে পলায়ন করিতেছে। তখন তাঁহার জ্যোতিহীন নয়ন ও শোণিতশূন্য শুভ্রমুখে অব্যক্ত অনুতাপ যাতনা-চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল; সেই রক্তাক্ত অবসন্ন শরীরে সবলে উঠিতে চেষ্টা করিলেন, পারিলেন না। কিন্তু তখনি দারুণ কষ্টকর প্রয়াসের সঙ্গে তীব্রকণ্ঠে পলায়মান রাণাকে পাপী, কাপুরুষ সম্বোধনে তাহার বাহুবল পরীক্ষা করিতে চাহিলেন। রাণা রত্ন ফিরিয়া দেখিল। দেখিল সে যা চায়, তাহা তখনও শেষ হয় নাই। অশক্ত, দুর্ব্বল রাজা সুজা ভূমি শয্যায় অৰ্দ্ধোপবেশনে থাকিয়া তাহাকে তখনও অপমান বাক্য প্রয়োগ করিতেছে, ইহা তাহার অসহ্য বোধ হইল। পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া সে রাজা সুজাকে শেষ অস্ত্রাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছে, এমন সময় মৃতকল্প, প্রতিশোধ-পিপাসু রাজাসুজা তাঁহার অন্তিম কর্ত্তব্যের অনন্যসাধারণ প্রয়াসের সহিত অশ্বারোহী রাণাকে অতি বলে আকর্ষণ করিলেন। শত চেষ্টা করিয়া রাণা স্থির থাকিতে পারিল না, মাটির উপর পড়িয়া গেল। তখন উভয়েই ভূশয্যায়, কিন্তু রাণা আঘাতিত অথবা কোন অংশেই অবসন্ন নয়, তথাপি মুহূর্ত্ত মধ্যে রাজাসুজা কি এক অসম্ভব শক্তি অনুভব করিয়াছেন, তিনি হত্যাকারী, কাপুরুষ, বিভ্রান্ত রাণাকে নীচে ফেলিয়া তখনি তাহার উপরে যাইয়া পড়িলেন। যন্ত্রনা-কাতর তিনি অসীম ধৈর্য্য এবং কৃতনিশ্চয়তার সঙ্গে তখন রাণার বুকের উপর উঠিয়া বসিয়াছেন। রাণা দৈত্যবল প্রকাশ করিয়াও সে অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে পারিল না। তখন রাজাসুজা এক হস্ত রাণার কণ্ঠ আকর্ষণে, আর একহস্ত ছোরার জন্য প্রসারণ করিলেন। আলোক-রশ্মিপাতে সুশাণিত অস্ত্র জ্বলিয়া উঠিল, তখনি দৃঢ়হস্তে হতভাগ্য রাণার বক্ষে তাহাই আমূল বিদ্ধ করিলেন! বিকৃত মৃত্যু যাতনা-ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে হতভাগ্য ক্রোধাতুর চিতোরাধিপতির জীবন-রঙ্গমঞ্চের যবনিকা পতিত হইল। পরানিষ্ট সাধনের জন্য এত দিনের অস্থিরতা, উদ্বেগ এবং দুশ্চিন্তা এ সকলেরই অবসান হইয়া গেল। ঐ যে রাজা সুজার হাতের ছুরিকা হস্তচ্যুত হইয়াছে, আবার তিনি চক্ষে অন্ধকার দেখিয়াছেন, এবারে তাঁহারও প্রাণবায়ু উড়িয়া গেল; শান্ত, তৃপ্ত, প্রফুল্লমুখে তিনি ভগিনীপতির জীবনহীন দেহের উপর নীরবে পড়িয়া গেলেন। এইরূপে "সিংহের জীবন বিনিময়ে" রাণা রত্নের সব সাধ মিটিল।

সকলের মনোবুদ্ধির অগোচর এই নিদারুণ ঘটনায় উভয় রাজ্যের সমবেত হাহাকার ও ক্রন্দন কোলাহল বর্ণনার অতীত। এই অসম্ভব ভয়ানক দুর্ঘটনার সংবাদে দেশের বালক বৃদ্ধ যুবক যুবতী যে যেখানে ছিল, অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারিল

না। কিন্তু তাহারি মধ্যে দুইটি প্রাণীর মনোবেদনার সঙ্গে আর কাহার তুলনা? দারুণ শোকসন্তাপে তাঁহাদের হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। চিতোর ও বুঁদী রাজান্তঃপুরের দুইটি নিরপরাধিনী অবলা তাঁহাদের অকলঙ্ক জীবনের উষাকালে একই দিনে উভয়ে উভয়ের অনন্যঅবলম্বন প্রাণাধিক পতি ও ভাই হারাইয়া সংসারের অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইয়াও নিতান্ত আশ্রয়হীন ও মন্দভাগ্য বোধ করিতেছিলেন। সর্ব্বোপরি, হতভাগিনী সুজাবাইয়ের কোমল প্রাণ অসহ্য শোক সন্তাপের সঙ্গে অনুতাপে পুড়িয়া যাইতেছিল। কুক্ষণে অন্তঃপুরে সেই আহারের অনুষ্ঠান, কুক্ষণে সুজাবাইয়ের সেই কথা। না বলিলে নিতান্তই এমন সর্ব্বনাশ হইত না!

পরিতাপের এই খানেই অবসান হয় নাই। সুজাবাই প্রাণত্যাগে কৃতনিশ্চয়া হইয়াছেন। চির-আনন্দ-কৌতুকময়ীর উজ্জ্বল মুখশ্রী আজ গভীর বিষাদ ছায়ায় আচ্ছন্ন। জীবনের কেবল মধ্যাহ্নে তাঁহার সমুদায় সুখসাধ বিদায় দিয়া যে শৈলসঙ্কুল মহাবনে তাঁহার প্রাণাধিকেরা প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেইখানে, তাঁহাদের পার্শ্বে আপনাকেও বিসর্জ্জন দিতে অগ্রসর হইলেন। অপার্থিব মহিমাময়ী, কৃতনিশ্চয়া সুজাবাইকে সংকল্প হইতে নিবৃত্ত করিতে কাহারও সাধ্য হইল না। আর রাজা সুজার প্রেমময়ী পত্নী যিনি ভাগ্যক্রমে দেবোপম স্বামীকে তাঁহার ইহ পরকালের অবলম্বন মনে করিয়া সুখে দিনপাত করিতেছিলেন, তিনিও সহসা মর্ম্মভেদী অশ্রুপাতের সঙ্গে সুজাবাইকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"তোমার পায়ে পড়ি আমায় ফেলিয়া তুমি একাকিনী মরিতে যাইও না। এ অভাগীকেও সঙ্গে লইয়া যাও।"—রাজাসুজার সেই স্নেহ প্রেম-পুত্তলীকে সুজা ফিরাইতে পারিলেন না। দুই জনের নিকটই পৃথিবী তখন অন্ধকার, দুই জনেরই সাধ আহ্লাদ সব পুড়িয়া ভস্মীভূত: ধীরে ধীরে তাঁহারা তখন পতিগৃহ, পিতৃগৃহ, আত্মীয়, স্বজন, আশ্রিত, ভৃত্য সকলের নিকট নির্ম্মম বিদায় গ্রহণ করিলেন। সে দিনের শোকাশ্রু মুছিতে না মুছিতে আবার অভিনব অশ্রুজলে সকলের বুক ভাসিয়া গেল।

হায়, নন্দাত্যের মহাবন! যেখানে রাজাসুজা ও রত্নের দেহাবশেষ তখনও যেমন তেমনি ছিল, সেইখানে আর এক চিতাগ্নি সহস্র লোহিত লোল জিহ্বা বিস্তারে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সিঁথীতে সিন্দুরবিন্দু ও আভরণভূষিত দুইটী নিরপরাধিনী নিরুপমা অনায়াসে, অম্লানমুখে প্রাণাধিকের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। অপূর্ব্ব, অতুলনীয় রূপ যৌবন-মাধুরী মুহূর্ত্তে ছাই হইয়া গেল!

শ্রীকিশোরীমোহন রায়।

বিদেশী বাঙ্গালী। (৬)

লালা বাবু।

জন্মাবধি যে ব্যক্তি কাঙ্গাল, তাহাকে আর কাঙ্গাল সাজিতে হয় না। মাতৃগর্ভ হইতেই যে ব্যক্তি চক্ষুহীন হইয়া জন্মিয়াছে, তাহার আর অন্ধ সাজিয়া ফল কি? ভাগ্য দোষে বাল্যাবস্থা হইতেই যে ব্যক্তি নিঃসম্বল, কপর্দ্দকশূন্য এবং ছিন্ন কন্থাবৃত, তাহার পক্ষে বৈরাগ্য অবলম্বন করা বড় কঠিন কথা নহে;

দরিদ্রতা যাহাকে স্বাভাবিক বৈরাগী করিয়াছে, তাহাকে আর নূতন করিয়া বৈরাগ্যব্রতে দীক্ষিত হইতে হয় না; কিন্তু যে ব্যক্তি দুগ্ধফেণনিভ সুকোমল কুসুমশয্যায় উপবিষ্ট হইয়া সুবর্ণ মুকুটে মস্তকাচ্ছাদন পূর্ব্বক অতুল প্রতাপের সহিত রাজকীয় সুখ স্বচ্ছন্দতা ভোগ করেন, তাঁহার পক্ষে সহসা বৈরাগ্য অবলম্বন করা বাস্তবিক আশ্চর্য্য এবং অসাধারণ কথা বলিতে হইবে। যাঁহার প্রসূনতুল্য কোমল পদে কখনও কণ্টক স্পর্শ করে নাই, জগতের 'দুঃখ ও অভাব' যাঁহার কাছে অগ্রসর হইতে সমর্থ হয় নাই, তিনি কেন বৈরাগী হইবেন? খণ্ডসুখ পরিত্যাগ করিয়া যিনি অখণ্ডসুখের জন্য লালায়িত হয়েন, ক্ষণভঙ্গুর জীবনের তুচ্ছ সুখের দিকে না তাকাইয়া যিনি অনন্ত জীবনের অনন্ত সুখের দিকে আধ্যাত্মিক চক্ষু উন্মীলন করেন, তিনিই প্রকৃত বৈরাগী এবং তিনিই প্রকৃত ফকির। কোনও বিশিষ্ট ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সঙ্গীত-পুস্তকে জনৈক মহাপুরুষ গাহিয়াছেন—

"ফকিরি করবি? পারবি তো মন?
ফকিরি নয় সামান্য, হ'তে হয় দীন দৈন্য
ফকির ছিল শ্রীচৈতন্য,
যাঁর ধর্ম্মেতে জীবন।
ফকিরি কোর্ব্বি—কিন্তু পার্ব্বি তো মন?"

এই প্রস্তাবের শীর্ষদেশে যে প্রসিদ্ধ মহাত্মার নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তিনি বাস্তবিক এক প্রকৃত বৈরাগী ছিলেন। তীব্র বৈরাগ্য তাঁহার জীবনের রমণীয় ভূষণ ছিল; পারলৌকিক উন্নতির জন্য ইহলৌকিক সুখকে বিসর্জ্জন করিয়া তিনি তীব্র বৈরাগ্য ব্রতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। এরূপ মহাত্মা সচরাচর মিলে না, এমন আশ্চর্য্য "ফকির" সহজে পাওয়া যায় না। যাঁহারা বৃন্দাবনে গিয়াছেন, অথবা বৃন্দাবনের বিবরণের পাঠ করিয়াছেন, লালা বাবুর পরিচয় তাঁহাদের নিকট নূতন নহে। এই মহাত্মা অতুল ধন ধান্য, সুন্দর সম্পত্তি, ইন্দ্রাবতী তুল্য গৃহ, ইন্দ্রজিৎ তুল্য পুত্র, অতুলনীয় প্রভুত্ব, দেব-দুর্লভ সাংসারিক সুখ, গন্ধর্ব্বকুলবাঞ্ছিত সোণার সংসার, এ সকল অসার শুষ্ক তৃণের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া, দরিদ্রতর হইতে দরিদ্রতম অবস্থায় ধর্ম্মজীবন যাপন করেন। সুদূর অযোধ্যা এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশে লালা বাবু "অবতার" বলিয়া খ্যাত; বৃদ্ধা স্ত্রীলোকেরা এখনও বালক বালিকাদিগের সম্মুখে বসিয়া লালা বাবুর উপকথা, লালা বাবুর কাহিনী, লালা বাবুর "ভজন" (সঙ্গীত), লালা বাবুর দোঁহা, লালা বাবুর জীবনী প্রভৃতি শুনায়। ধন্য লালা বাবু! তোমার স্বর্গস্থিত আত্মায় পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদ পড়ুক!

এই প্রস্তাবের মহাপুরুষ লালা বাবু নামে বিখ্যাত হইলেও, তাঁহার আদি নাম লালা বাবু নহে। ইঁহার প্রকৃত নাম কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ। যে সুপ্রসিদ্ধ রাজবংশের ইনি বংশধর এবং যে প্রাচীন হিন্দুবংশের ইনি মুখোজ্জ্বল করেন, সেই বংশের কিছু পরিচয় না দিলে, লালাবাবুকে আমরা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিব না।

কলিকাতার উত্তরে প্রসিদ্ধ পাইকপাড়া পল্লীতে বহুপ্রাচীন কাল হইতে এক অতি সম্ভ্রান্ত কায়স্থ বংশ "পাইকপাড়ার রাজবংশ" বলিয়া সুপরিচিত। এই উত্তররাঢ়ী কায়স্থ বংশের আদিপুরুষ দিল্লীতে মোগল সম্রাটের অধীনে অতি উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন, ক্রমে এই বংশের লোকেরা দিল্লির সম্রাটের সহিত সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গালার নবাব

সাহেবের মন্ত্রিত্ব প্রভৃতি কর্ম্ম সম্পাদন করিতে থাকেন। ওয়ারেণ্ হেষ্টিংস সাহেবের (পার্লামেণ্টে) বিচার কালে সুমতি বর্ক সাহেবের মনোমোহিনী বক্তৃতামালায় যে অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন ও অতুলনীয় প্রভুত্বশালী দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের নাম বহুবার উল্লিখিত হইয়াছে, তিনি এই বংশ-আকাশের অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন, এবং সে দিন যে যুবাপুরুষ একটা মার্জ্জার ও মার্জ্জারীর বিবাহে তিনলক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া কলিকাতা নগরবাসীবর্গকে উচ্চহাস্য হাসাইয়াছিলেন, সেই উচ্ছৃঙ্খলচেতা যুবকও এই বংশের বংশধর। বলা বাহুল্য, সুপ্রসিদ্ধ লালা বাবু এই রাজবংশেরই অন্যতম নেতা ছিলেন। এই কায়স্থবংশ "সিংহ" উপাধিতে খ্যাত। এই বংশ চিরকালই ধনধান্যে পরিপূর্ণ এবং এই বংশের লোকেরা চিরকালই রাজসম্মানে সম্মানিত।

লালা বাবুর বাল্যকালের বিবরণী আমরা পাই নাই। যৌবনকালের জীবন সম্বন্ধে যাহা কিছু পাইয়াছি, তাহার মধ্য হইতে সত্য নির্দ্ধারণ করা বড়ই দুষ্কর। এই সময়ের কথা লইয়া অনেকে অনেক প্রকার অভিমত দিয়াছেন। যাঁহারা নিন্দাযোগ্য বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহারা এ পর্য্যন্ত নিন্দার কোনও বিশিষ্ট প্রমাণ দিতে পারেন নাই। এত বড় লোকের জীবনী সম্বন্ধে নিন্দার কথার বিশেষ বিশ্বাস যোগ্য সুপ্রমাণ না পাইলে, আমরা পত্রস্থ করিতে সম্মত নহি। শোনা কথা সোণার ন্যায় সহসা কেমন করিয়া গ্রহণ বা বিশ্বাস করিতে পারি? কিন্তু একথা বলা বাহুল্য, যাঁহারা দুই একটা কথা লইয়া নিন্দাযোগ্য বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহারাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন "লালা বাবুর নিষ্কলঙ্ক ধর্ম্মজীবন, বাঙ্গালী জাতির পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন এবং অতুল।"

লালাবাবুর সাংসারিক জীবন সম্বন্ধে কয়েকটা প্রয়োজনীয় কথা আমরা তাঁহার নিজের উক্তি হইতে সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। বৃন্দাবনে গিয়া বৈরাগীর জীবন যাপন করিবার সময়ে, তিনি নিজে বলিয়াছেন:—

"যে সময়ে আমি আমাদের বাটীর নেতা অর্থাৎ কর্ত্তা ছিলাম, সে সময়ে আমাকে সাহায্য করিবার কেহই ছিলনা, সকল কর্ম্ম নিজের হাতে করিতে হইত, নিজের চক্ষে দেখিতে হইত। আমিও নিজের হাতে কাজ করিতে ভাল বাসিতাম। দেওয়ান, নায়েব, গোমস্তা প্রভৃতি ছিল বটে, কিন্তু কাহারও হাতে কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া আমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতাম না। অন্দরের সাংসারিক কর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া বাহিরের কাছারীর এবং বিস্তৃত জমিদারীর সমুদয় কর্ম্মই আমি নিজে করিতাম। সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত গাধার ন্যায় খাটিতাম, মাথার স্বেদ পায়ে পড়িত, তথাপি কর্ম্মের শেষ হইত না, সুতরাং ধর্ম্মালোচনার অবকাশ ছিলনা। সায়াহ্নে মুখ হাত ধুইয়া শয্যার গদিতে বসিয়া তুলসী অথবা পদ্মকাষ্ঠের মালাটি লইয়া কয়েক মিনিট পর্য্যন্ত 'রাম' 'রাম' অথবা কৃষ্ণ কিম্বা হরি হরি উচ্চারণ করিতাম, তদনন্তর গৃহ দেবতার মন্দিরে গিয়া দেবমূর্ত্তি দর্শন করতঃ অন্দরে ফিরিয়া আসিতাম। কখন কখন ভাগবৎ বা রামায়ণ অথবা মহাভারত শুনিতাম, কখন বা বৈষ্ণবদিগকে ডাকাইয়া হরি সংকীর্ত্তন করিতাম।"

তিনি আরও বলিয়াছেন, "ধর্ম্মালোচনার সময় ছিল না বটে, কিন্তু তজ্জন্য চিন্তিত অন্তঃকরণে জীবন যাপন করিতাম। সময়ে সময়ে চিত্তের শান্তি নষ্ট হইত, কখনও বা গোপনে কাঁদিতাম, কখনও বা বিলক্ষণ দুঃখের সহিত আহার করিতে বসিতাম, ভাবিতাম, পশুর ন্যায় পেট ভরিতেছি, কিন্তু আত্মার জন্য কিছুই করিতেছি না।" ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এইরূপে তাঁহার সাংসারিক জীবন অতিবাহিত হইত।

আমাদের দেশের বড় বড় ধনবান তালুকদার বা জমিদারেরা স্বচক্ষে আপনাদের বিস্তৃত জমিদারী প্রায়ই দেখেন না। লালাবাবুও এ পর্য্যন্ত নিজের চক্ষে জমিদারী দেখেন নাই। বাটী হইতে অনেক দিন অনুপস্থিত থাকিলে কর্ম্মের বিশেষ ক্ষতি হইবে ভাবিয়া নিকটস্থ জমিদারী গুলি স্বচক্ষে দেখিবার জন্য তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। দেওয়ানকে ডাকাইয়া বলিলেন, "চব্বিশ পরগণার কয়েকটা প্রধান প্রধান জমিদারী দেখিবার ইচ্ছা আছে, অতএব আমার যাতায়াতের বন্দোবস্ত কর।" আজ্ঞা পাইবা মাত্র, দেওয়ানজী লালাবাবুর সম্মানযোগ্য বন্দোবস্ত সুসম্পন্ন করিলেন। যথা সময়ে লালাবাবু জমিদারী দেখিতে রওনা হইলেন। স্বপ্রিয়া সহধর্ম্মিণীর নিকট যথাবিধি বিদায় গ্রহণ করিয়া লালাবাবু শিবিকায় আরোহণ করিলেন। প্রমাদরূপী সহধর্ম্মিণীর "বামেতর নয়ন নাচিল।" লালা-সহধর্ম্মিনী বুঝিলেন না যে, এই বিদায়ই শেষ বিদায়; তিনি জানিতে পারিলেন না যে, তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর স্বামীকে তিনি আর দেখিতে পাইবেন না। লালাবাবু পাল্কীতে চড়িয়া চলিয়া গেলেন, পাল্কী অদৃশ্য হইল, সহধর্ম্মিণী অট্টালিকার ছাদ হইতে নীচে আসিয়া গৃহকর্ম্মে প্রবৃত্তা হইলেন। একমাস কাল পর্য্যন্ত জমিদারী দেখিয়া লালাবাবু পাইকপাড়ায় ফিরিয়া আসিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন, সহচর ও সেবকদিগকে যথাযোগ্য বন্দোবস্ত করিবার জন্য আদেশ দিলেন, আগমনের বন্দোবস্ত যথারীতি শেষ হইল। সঙ্গে পাল্কীবাহক আট জন বেহারা, চোপ্‌দার, আড়দানী, চপরাসী, চাকর, খানসামা, পাচক ব্রাহ্মণ, গোমস্তা, নায়েব, তরবারীবাহী হিন্দুস্থানী পাইক, লাঠিবাহী গ্রাম্যলাঠিয়াল প্রভৃতি মেদিনী কাম্পিত করিয়া চলিল। সুবর্ণ ও রৌপ্য-খচিত মনোমোহক শিবিকায় আরোহণ করিয়া গৃহাভিমুখে কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ রওয়ানা হইলেন। বৈশাখ মাস, গ্রীষ্মকাল, অত্যন্ত গ্রীষ্ম, অনেক দিন বৃষ্টি হয় নাই, সুতরাং প্রাতেঃ, অপরাহ্নে এবং রাত্রিতে পাল্কী চলিত, রৌদ্রের সময় যাত্রীরা বিশ্রাম লাভ করিত। পাল্কী আসিতে আসিতে হঠাৎ একস্থানে থামিয়া গেল, শিবিকাস্থ হইতে লালাবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "পাল্কী থামিল কেন?" ভৃত্যেরা বলিলেন, "হুজুর। পাল্কী যাইবার পথ নাই।" ঘুরাইয়া লইয়া গেলে অন্য পথ দিয়া যাইতে হয়।" লালাবাবু আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "এখানে কি মোটেই রাস্তা নাই?" নায়েব উত্তর দিল "মহাশয়। একটা রাস্তা আছে কিন্তু রাস্তা দিয়া যাইতে হইলে জনৈক গৃহস্থের বাটীর ভিতর দিয়া যাইতে হয়।" লালাবাবু বলিলেন, "গৃহস্থটা কে, তাহার অনুসন্ধান কর।" অনুসন্ধানে জানা গেল, যাহার বাটীর ভিতর দিয়া রাস্তা, সে লোকটা একজন রজক অর্থাৎ ধোবা। শিবিকাভ্যন্তর হইতে হুকুম হইল, "ক্ষতি নাই, এই বাটীর অন্দরস্থ পথ দিয়াই পাল্কী লইয়া চল, দেখিও তোমরা কোনরূপ অত্যাচার অথবা গোলমাল কিম্বা অভদ্র ব্যবহার করিও না।" মুহূর্ত্ত মধ্যে ঐ বাটীর মধ্যে শিবিকা প্রবেশ করিল। তখন অপরাহ্ণ শেষ হইয়াছে, সন্ধ্যার প্রথম অবস্থায় প্রকৃতি সুন্দরীর মলিন মুখ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। রজকের বাটীতে পাল্কী প্রবেশ করিলে লালাবাবু দেখিলেন, তিনদিকে কয়েকটা

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্থাৎ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কুটীর, এক দিক থালি, মধ্যে এক অনতিবিস্তৃত অথচ প্রশস্ত সমতল ভূমি খণ্ড, ইহার স্থানে স্থানে কদম্ব, বকুল, পলাশ, টগর, রঙ্গণ প্রভৃতি ফুলের গাছ; ইহাই ধোবার বাটীর "উঠান" (yard) অথবা "ছত্র"। এই রমণীয় এবং পরিষ্কার ভূমিথণ্ড দেখিয়া লালাবাবু পান্ধী হইতে নামিলেন এবং একটা গাছের তলে গালিচা প্রসরণ করিয়া তদুপরে উপবেশন পূর্ব্বক ধূম্রপানের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। চাকরেরা সুবর্ণ-নির্ম্মিত মুখ-নল এবং রৌপ্য নির্ম্মিত আল্‌বোলা লইয়া নিকটস্থ সরোবরে ভরিতে গেল, কেহবা সেকালের প্রথা মত চকমকি প্রস্তরের সহিত লৌহের বিবাদ ঘটাইয়া সর্ব্ব-ভুকের দর্শনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ক্রমে প্রায় সন্ধ্যা দেখা দিল। লালাবাবু দেখিলেন, এই উঠানখণ্ডের এক পার্শ্বে এক সুদৃশ্য স্থলপদ্ম ফুলের গাছের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া একটী দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকা আপন পিতাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতেছে "বাবা! দিন গেল, সন্ধ্যা হ'লো, বাসনায় আগুন দে।" এই কন্যা এই গৃহস্বামী রজকের একমাত্র দুহিতা। পল্লীগ্রামের অনেক স্থানে ধোবার (বস্ত্র সিদ্ধ করিবার) "ভাটী"কে "বাসনা" বলে, বিশেষতঃ চব্বিশপরগণায় এই 'বাসনা' শব্দ 'ভাটী' অর্থে ব্যবহৃত হয়। বৃদ্ধ ধোবা আফিম্‌-খোর ছিল, আফিমের নেশায় হুকা হাতে করিয়া ঝিমাইতেছিল, এই জন্য কন্যা স্মরণ করিয়া দিল "বাবা! দিন গেল, সন্ধ্যা হলো, বাসনায় আগুন দে।" রজক-কন্যা যে অর্থে এস্থলে "বাসনা" শব্দ ব্যবহার করিয়াছে, পাঠক মহাশয়কে আমরা তাহা বুঝাইয়াছি, কিন্তু এই কয়েকটি কথা ইন্দ্রের বজ্রাপেক্ষা অধিক তেজে লালা বাবুর অস্থিতে অস্থিতে প্রবেশ করিল। লালাবাবু ভাবিলেন, "দিন যাইতেছে, সন্ধ্যা হইতেছে, আবার দিন যাইতেছে, আবার সন্ধ্যা হইতেছে, কিন্তু বাসনায় কি আমরা আগুন দিয়াছি? এ ঘোরতর সংসার-রূপী বাসনাকে তীব্র-বৈরাগ্য-রূপী অগ্নি ভিন্ন কে জ্বালাইতে পারে?" পাঠক মহাশয় দেখিবেন, যে অর্থে রজক-কন্যা 'বাসনা,' শব্দ ব্যবহার করিয়াছিল, লালাবাবুর হৃদয়-সরোবর সেই শব্দের অন্য অর্থ দ্বারা আলোড়িত হইতেছিল। লালা বাবু আবার ভাবিলেন, "জীবন-দিন গত হইতেছে, সন্ধ্যা-মৃত্যু নিকট প্রায় পরকালের জন্য কি প্রস্তুত হইতেছি? কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি রিপু-ছাগদিগকে কি বলি দিয়াছি? মায়ামরিচাকায় মন-মৃগ নিত্য জ্বালাতন হইতেছে, কিন্তু তবুও সংসারের অসার মায়াকে ত্যাগ করিতে পারিলামনা; সুখের বাসনাকে বৈরাগ্যের জ্বলন্ত অগ্নিতে জ্বালাইতে পারিলামনা।" লালাবাবুর জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হইল, দিব্য-চক্ষু খুলিয়া গেল, তিনি পরিবর্ত্তিত হইলেন; সেই রজকের গৃহের উঠানে সায়াহ্ন সমীরণের সঙ্গে সঙ্গে লালা বাবুর মন-পাখী যেন উড়িয়া গেল, তিনি যেন নূতন জীবন, নূতন মন, নূতন ধন পাইয়া সুখে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার যেন স্মরণ হইল—

"দিবা অবসান হ'লো, কি কর বসিয়া মন।
এ ঘোর ভব-নদী উত্তরিতে, করেছ কি আয়োজন?"

যাহা হউক, রজক-কন্যাকে পুরস্কার দিয়া লালা বাবু আপন সেবক ও সহচরদিগকে পাল্কীর সম্মুখে দাঁড় করাইয়া বলিলেন, "তোমরা পাইকপাড়ায় ফিরিয়া যাও; বলিও কৃষ্ণচন্দ্র "কৃষ্ণচন্দ্রের" অনুগামী হইয়াছে

আর তিনি পাইকপাড়ায় আসিবেন না।" চাকরেরা অনেক মিনতি করিল, কিছুতেই লালা বাবুর মন ফিরিল না, সুতরাং সেবকেরা এই অত্যাশ্চর্য্যজনক অথচ অসুখকর সমাচার জানাইবার জন্য দ্রুতপদে পাইকপাড়ার দিকে দৌড়িল। তাহারা অদৃশ্য হইলে, লালা বাবু আপনার পোষাক খুলিয়া ফেলিলেন এবং ধুতির এক পার্শ্ব ছিঁড়িয়া কৌপীন মাত্র সম্বল করিয়া সেস্থান পরিত্যাগ করিলেন। মূল্যবান পোষাক তথায় পড়িয়া রহিল। রাত্রি দশটার সময় একটা ক্ষুদ্র গ্রামে যাইয়া পৌঁছিলেন, এক ব্রাহ্মণ তাঁহাকে আহার দিল, পর দিবস সেকালের নবাবী রাস্তা ধরিয়া পদব্রজে বৃন্দাবন অভিমুখে প্রয়াণে প্রবৃত্ত হইলেন। অনেক মাস কষ্ট ভোগ করিয়া খ্রীষ্টীয় ১৭৯২ অব্দের এপ্রেল মাসে, লর্ড কর্ণওয়ালিসের শাসনকালে, লালা বাবু শ্রীবৃন্দাবনে পৌঁছিলেন। পাইকপাড়ায় হাহাকার ধ্বনি উঠিল, কলিকাতায় তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল, নানা লোকে নানা উপকথা উড়াইল; কিন্তু কেহই লালা বাবুর সন্ধান পাইল না। বৃন্দাবনে গিয়া তিনি সংবাদ দিলেন, সে সংবাদ পাইকপাড়ায় পৌঁছিল, সমগ্র সহর তাঁহাকে ধন্য ধন্য বলিতে লাগিল।

শ্রীবৃন্দাবনে কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ আর কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ রহিলেন না। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ধনবান কায়স্থের সম্মানিত উপাধি স্বরূপে "লালা" শব্দ ব্যবহৃত হয়। এই লালা শব্দের প্রকৃত অর্থ—যে লালন করে, অর্থাৎ যাহার দ্বারা অপরে প্রতিপালিত হয়, সুতরাং ইহা অত্যন্ত বড়লোকের খেতাব। এখন এই প্রাচীন উপাধি উত্তর পশ্চিম, অযোধ্যা, পঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি সমুদয় হিন্দু ধনবান পুরুষের সম্মানার্থ ব্যবহৃত হয়, সুতরাং ব্রজধামে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ লালা বাবু উপাধিতে সম্মানিত হইলেন, তাঁহার বাঙ্গালীত্বের চিহ্ন স্বরূপ 'বাবু' উপাধিও 'লালা' উপাধির সহিত সংযুক্ত হইয়াছিল, কেহ কেহ "রাজা বাবু" বলিয়া তাঁহাকে ডাকিতেন, কিন্তু লালা বাবু উপাধিতেই তিনি এখন ভারত-বিখ্যাত।

বৃন্দাবনে তিনি মস্তক মুণ্ডন করাইলেন এবং বৈরাগ্য-ব্রতে দীক্ষিত হইয়া বৈরাগী বৈষ্ণব সম্প্রদায়-ভুক্ত হইলেন। প্রার্থনা, উপাসনা, পূজা, দ্বারে দ্বারে হরি-সঙ্কীর্ত্তন, ভিক্ষা দ্বারা জীবন যাপন, দুঃখীর দুঃখ মোচন, হরিকথা শ্রবণ ইত্যাদি দ্বারা বৃন্দাবনে তাঁহার নিষ্কলঙ্ক জীবন যাপিত হইতে লাগিল। যতটুকু খাদ্য হইলে তাঁহার ক্ষুধার শান্তি হইতে পারে, ততটুকু পকান্ন মাত্র ভিক্ষা করিতেন। ভিক্ষা দ্রব্য প্রাপ্ত হইলেই যমুনার ঘাটে বসিয়া ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়া তাহা ভক্ষণ করিতেন, সঙ্গে জলপাত্রও রাখিতেন না, কর দ্বারা যমুনার জল উঠাইয়া পান করিতেন। ক্রমে ক্রমে লোকে জানিতে পারিল, তিনি সামান্য লোক নহেন, লালা বাবু কলিকাতার একজন বড় ধনবান রাজা। সমগ্র ব্রজধাম লালা বাবুকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল, সমগ্র উত্তর পশ্চিম প্রদেশে তাঁহার ধর্ম্মজীবনের কথা প্রচার হইয়া পড়িল। এ দিকে কলিকাতা হইতে লালা বাবুর সেবক, কর্ম্মচারী ও গৃহের লোকেরা আসিয়া পৌঁছিল, লালা বাবুর অনুজ্ঞা ও ইচ্ছামত যাহা কিছুর আদেশ হইল, তাহা প্রদত্ত হইল, লালা বাবু টাকা লইয়া ব্রজধামে এক সুবিস্তৃত জমিদারী খরিদ করিলেন, ঐ জমিদারী এখনও বর্ত্তমান, উহা লালা বাবুর ষ্টেটনামে

খ্যাত, ইহার বার্ষিক আয় প্রায় দেড় লক্ষ টাকা। এই জমিদারী চালাইবার জন্য রীতিমত ট্রষ্টি, দেওয়ান, নায়েব ও কাছারী আছে, বৃন্দাবনে ইহার হেড্ কোয়ার্টর। লালা বাবু এই সম্পত্তি খরিদ করিয়া হুকুম দিলেন "এই জমিদারীর আয়ের একটি পয়সাও আমার বাটীতে যাইবে না, ইহা দেবসেবা ও পরোপকারের জন্য ব্যয়িত হইবে।" এপর্য্যন্ত ঐ নিয়ম অবাধে রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। বৃন্দাবনে ছয় বর্ষকাল অধিবাস করিবার পরে লালা বাবু এক প্রকাণ্ড মন্দির প্রস্তুত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, ঐ মন্দির প্রস্তুত হইয়াছে। উহা নির্ম্মাণ করিতে নয় বর্ষকাল ব্যয়িত হয়। ঐ মন্দিরে কৃষ্ণচন্দ্রের বিগ্রহ স্থাপন করেন, তদনন্তর গোবর্দ্ধন-গিরিতে গমন করিয়া তপঃ অবলম্বন পূর্ব্বক একাকী ভগবৎ ভজনে নিযুক্ত হয়েন। গোবর্দ্ধনে সপ্তবর্ষকাল অবস্থান কালের পরে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়। গোবর্দ্ধনে তাঁহার রমণীয় সমাধি এখনও বর্ত্তমান, প্রতি বৎসর মহাসমারোহে উহার উৎসব হইয়া থাকে। প্রবাদ আছে, ভিক্ষা করিয়া যমুনা তটে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে একটা দ্রুতগামী (পলায়িত) তেজস্বী অশ্বের সম্মুখে পড়িয়া তিনি তুরঙ্গ কর্ত্তৃক পদদলিত হয়েন, তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। লালা বাবু ব্রজধামে "অন্যতম অবতার নামে প্রসিদ্ধ, তাঁহার সম্বন্ধে অসংখ্য কাহিনী শুনা যায়, প্রস্তাব বাহুল্য ভয়ে সে সকল কথার উল্লেখ করিব না। তিনি যে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন, ইহাতে বহু সংখ্যক ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, অতিথি, পরিব্রাজক, কাঙ্গাল প্রভৃতির অন্ন সংস্থান হয়। বন্দোবস্ত আরও ভাল হইলে আরও উপকার হইতে পারে। *

লালাবাবুর ধর্ম্ম জীবন বিনয়, নম্রতা, সুশীলতা, ভক্তি, প্রেম, পরোপকার প্রভৃতিতে যাপিত হয়। তাঁহার ধর্ম্মজীবন প্রকৃত বৈরাগীর—প্রকৃত বৈষ্ণবের ধর্ম্মজীবন ছিল। এখনকার কালে পেটে অন্ন না থাকিলেই লোকে বৈরাগী হয়, এই জন্য এত বড় "বৈরাগী" বা "বাবাজী" কথাগুলা এখন বাঙ্গালা দেশে তামাসার শব্দ বলিয়া পরিগণিত হয়। লালাবাবুর বৈরাগ্য-জীবন ভক্তি ও প্রেমমাখা ছিল, তাঁহার বৃন্দাবন জীবন যথার্থ ধর্ম্মের জীবন ছিল। আবার, বিচার জ্ঞান, বিবেক, বিজ্ঞান, ভদ্রতা প্রভৃতি বিষয়ে তিনি মহাসিদ্ধ ছিলেন; অসাধারণ প্রেম ও ভক্তিবলে তিনি পাষাণহৃদয় ব্যক্তিরও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেন। খালি পায়ে, খালি গায়ে, খালি মাথায় তিনি দ্বারে দ্বারে যখন মধুর স্বরে হরি সংকীর্ত্তন করিতেন, তখন রাস্তায় লোকের শতাধিক জনতা হইত, হিন্দুস্থানীরা অবাক হইয়া এই অসাধারণ বাঙ্গালী সন্ন্যাসীকে দেখিত। শুনা যায়, লালাবাবুর কেশ-শূন্য মাথায় কখনও কখনও খাদ্য দ্রব্য থাকিত, পক্ষীরা আসিয়া তাহা খুঁটিয়া খাইত। আমরা লালাবাবুর জীবনী সমাপ্ত করিলাম, এমন মহাপুরুষের জীবন লিখিতে লিখিতে আমাদের যে আনন্দ হইয়াছে, অনেক ধনবানের ধনভোগে তাহা হয় না। ধন্য লালাবাবু! বঙ্গের বাহিরে তুমি বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছ, তোমার আত্মায় ভগবানের আশীর্ব্বাদ পড়ুক।

শ্রীগোপালচন্দ্র শাস্ত্রী।

* এই প্রবন্ধের কোনও কোনও অংশের সমাচার জন্য বৃন্দাবনস্থ লালাবাবুর ষ্টেটের বর্ত্তমান ম্যানেজার বাবু শিবকৃষ্ণ রায় মহাশয়ের নিকট আমি কৃতজ্ঞ আছি।—লেখক

রাজগৃহ। (৩)

স্থান-মাহাত্ম্য সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের মহাজনেরা কীর্ত্তন করিয়াছেন। ভারতবর্ষে স্থান-মাহাত্ম্যাপেক্ষা তীর্থ-মাহাত্ম্যেরই আদর অধিক। কাশী-বৃন্দাবন, পুরুষোত্তম-কামাখ্যা যাইতে এদেশের বহু লোকের আগ্রহ আছে, কিন্তু বুদ্ধের জন্মস্থান, বিহারস্থল, এবং কীর্ত্তিস্থল, শ্রীচৈতন্যের জন্মভূমি, রামমোহন এবং বিদ্যাসাগরের জন্মভূমি দেখিতে কাহার সাধ? অকীর্ত্তির অন্ধকারময় স্থান সমূহ আজ মহা ধুমধামে পূর্ণ, আর এদেশের মহাজনদিগের জন্মভূমি, বিহার-ভূমি বনে, জঙ্গলে পরিপূর্ণ!! বলিলে কি হইবে?—এদেশ হুজুগের জন্যই মুক্ত-হৃদয়।

রাজগৃহে পদার্পণের পর হইতেই আমাদের হৃদয় মনকে দারুণ চিন্তা-জ্বর আক্রমণ করিল। যে দিকে চাই, কেবল ধ্বংসাবশেষ! কিন্তু সব ব্যাঘ্র ভল্লুকের বিহার-ক্ষেত্র। কোন মহাত্মা বলিয়া গিয়াছেন, "যে দেশে একজন মহাপুরুষও জন্মিয়াছে, সে দেশ ধন্য।" মহাপুরুষ বলিয়া মহাপুরুষ নহে—বুদ্ধদেবের ন্যায় মহাপুরুষ এই ধরায় বড় অধিক জন্ম গ্রহণ করেন নাই। এহেন মহাপুরুষের বিহার এবং সাধন স্থল রাজগৃহের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিলে এমন লোক নাই, যাহার অশ্রুপতন না হয়। কিন্তু দেখে কে? দেখিবার লোক এ ভারতে অধিক মিলে কি? অকীর্ত্তি-কীর্ত্তনের লোক এদেশে অনেক মিলে, ভণ্ড মহাজনের গাড়ী টানার লোক অনেক জুটে, কিন্তু প্রকৃত মহাপুরুষের গুণাবলী ও স্থান-মাহাত্ম্য ঘোষণা করিবার লোক মিলে না! মিলে না প্রকৃত মহতের মহাপূজা—প্রকৃত সাধুর সম্মান। পঞ্চপাহাড় বেষ্টিত রাজগৃহে দেখিবার কি আছে? ভগ্ন অট্টালিকা রাশির ইষ্টক-স্তূপ আছে, ভগ্ন প্রাচীরের চিহ্ন আছে, অসংখ্য পুষ্করণীর শুষ্ক বক্ষ আছে—আর রাস্তাহীন জঙ্গল, জঙ্গল—কেবল জঙ্গল আছে। হোসেঙ্গবাদের নবাবের জঙ্গলে বিনা পয়সায় কাঠ কটিতেছে অসংখ্য লোক, কিন্তু তবুও জঙ্গল নিঃশেষ হয় না। কণ্টকে কণ্টক, শাখায় শাখা মিশাইয়া অসংখ্য কণ্টকীবৃক্ষ পূত-মহাজন চরণরেণু সুরক্ষা করিতেছে। পাখীগণ মধুর হইতেও মধুরতর সুরে, নানা ভঙ্গিতে গাইয়া, গাম্ভীর্য্য আরো গাম্ভীর্য্য মিশাইতেছে, এক শব্দ প্রতিধ্বনিতে শত শব্দ হইয়া প্রাচীনত্বের ঔদাস্য ঘোষণা করিতেছে এবং বন্য জন্তুদল এই মাহাত্ম্যময় স্থানে বিহার করিয়া প্রাচীন মাহাত্ম্যের গৌরব সুরক্ষা করিতেছে! পঞ্চ পাহাড়ের মধ্য দিয়া সরস্বতী মৃদু মৃদু বহিতেছে—কিন্তু একখানি কৃষকেরও কুঁড়ে ঘর নাই! নিবিয়াছেও নির্ব্বাণই ভাল, নীরব হইয়াছেত উদাসীনতাই ভাল, প্রকৃতি দিবারাত্রি যেন এই কথাই বলিতেছে। কদাচিৎ পথশূন্য কণ্টকাবৃত জঙ্গলে আমাদের ন্যায় কোন হতভাগ্য যদি কখনও যায়, তাহার কাণে কাণে কে যেন এই কথাই বলে—"কেন আসিয়াছ, যে দেশ ডুবিয়াছে, তাহার পূর্ব্বস্মৃতির উদ্দীপনায় আর কাজ কি? নির্জ্জনতা ছাড়িয়া সহরে যাও, সহরে যাও।" একদিন নয়, দুদিন নয়, প্রায় এক মাস কাল, দিবসে এবং রজনীতে—বিজন প্রদেশের এই মহা উদাস

সঙ্গীত, মহা ইঙ্গিত আমাদিগকে উত্তেজিত করিয়াছে। আমরা রাজগৃহে যাহা যাহা দেখিয়াছি, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিব, প্রতিশ্রুত হইয়াছি। কিন্তু পরিচয় দিয়া লাভ কি? যাহা ডুবিয়াছে, তাহা কি এ ভারতে আর জাগিবে? বুদ্ধদেবের মহা সাধনার মাহাত্ম্য এদেশে আর কি প্রতিষ্ঠিত হইবে? নালন্দা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মহা শিক্ষা আর কি পুনরুদ্দীপিত হইবে? ধর্ম্ম এখন কথায়, চরিত্র এখন বাহ্যপোষাকে, জাঁকজমকে, হিতৈষণা এখন ভণ্ডামি এবং কপটতায় আচ্ছন্ন,এই হুজুগপ্রিয় মহাযুগে এ সকল কাহিনী বর্ণনায় ফল কি? এক বৎসর পর্য্যন্ত ভাবিয়া ভাবিয়া বুঝিতেছি, কোনই ফল নাই। রাজগৃহের গভীর নীরবতা আমাদিগকে নীরব থাকিতে ইঙ্গিত করিতেছে, রাজগৃহের কুহক-স্বপ্ন আমাদিগকে জগৎ হইতে ক্রমাগতই অন্ধকারের দিকে যাইতে আদেশ করিতেছে। নির্ব্বাণ, নির্ব্বাণ—মহা নির্ব্বাণই যেন ভাল, বলিতেছে। তবে কেন প্রতিশ্রুতির কঠোরতা স্মরণ করিয়া আবার রাজগৃহের কথা লিখিতেছি? বিড়ম্বনা, মহা বিড়ম্বনা।

বিহার হইতে রাজগৃহাভিমুখে যে রাস্তা আসিয়াছে, তাহা ডাক-বাঙ্গলা পর্য্যন্ত আসিয়াই একরূপ শেষ হইয়াছে। আর একটু দক্ষিণে যাইয়াই, সরস্বতী উপকূলে, অথবা কুণ্ড সমূহের তীরে শেষ হইয়াছে। তারপরও একটী রাস্তা, পাহাড়ের মধ্য দিয়া, চলিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তার দুই দিকেই জঙ্গল। এই রাস্তা জরাদেবীর মন্দিরকে পশ্চিমে রাখিয়া, বাণ-গঙ্গার উপর দিয়া" দক্ষিণে—আরো দক্ষিণে, নোয়াদার দিকে চলিয়া গিয়াছে। ডাক-বাঙ্গলার উত্তরে কীর্ত্তি স্তূপ—প্রাচীর-বেষ্টিত বৃহৎ প্রাঙ্গণ। এই প্রাঙ্গণ বহু বিস্তৃত। ইহার তিন দিকের প্রস্তর এবং মৃণ্ময়,এবং সুদৃঢ় পাহাড়-সম উচ্চ প্রাচীর অদ্যাবধিও দণ্ডায়মান। উত্তরের প্রাচীর আধুনিক রাজগৃহ গ্রামের দস্যুরা লুটিয়া লইয়াছে,তাহার চিহ্নও নাই। এই প্রাচীর-বেষ্টিত প্রাঙ্গণ ভূমিতে একটী প্রাচীন শিব মন্দির আছে, মহামায়ার মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে, দুই তিনটী পুকুরের চিহ্ন আছে, আর আছে অসংখ্য ইষ্টক এবং প্রস্তর খণ্ড। শুনিলাম, এই প্রাঙ্গণ হইতে ইষ্টক খুড়িয়া লইয়া আধুনিক ভেঙ্গান (?) রাজগৃহ গ্রাম মস্তক তুলিয়াছে। বহুস্থানে মৃত্তিকা খনিত রহিয়াছে, দেখিলাম, ছোটছোট ইট এবং ছোলেট প্রস্তর রাশি লোকেরা ফেলিয়া গিয়াছে,বড় বড় সব অপহরণ করিয়াছে। যেখানে খনন করা যায়, কেবল ইট এবং পাথর পাওয়া যায়। এতটা জমী পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু চাষ করার উপায় নাই, কেবল ইট, কেবল পাথর। লোকেরা বলে, এখানে কোন রাজার বাড়ী ছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা ইহাকেই রাজা বিম্বসরের বাড়ীর ভগ্নাবশেষ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যাঁহারই বাড়ী হউক, এ যে এক মহা সমস্যাপূর্ণ, মহাকীর্ত্তিপূর্ণ স্থান, তাহাতেই আর সন্দেহ নাই। সায়ংকালে কতবার এই প্রাঙ্গণ-প্রাচীরের উপরে উঠিয়া ভাবিয়াছি, হায়, সোণার প্রতিমা বিসর্জ্জিত হইয়াছে, মহাকালের গর্ভে এই ভগ্ন প্রাচীর, প্রাচীন-কাহিনী বক্ষে ধারণ করিয়া মহা স্বপ্ন মানব-প্রাণে জাগাইতে আজও কেন বিদ্যমান? এই দেশের লোকেরা সাধারণতঃ অশিক্ষিত, কোন চিন্তা নাই। চিন্তা—পশুদিগের ন্যায় কেবল আহার এবং রিপুচালনা, তাহারা ভাবে না, জানে না,

এই প্রাচীর কতকাল ধরিয়া ধরিত্রী বক্ষে দাঁড়াইয়া মহাযুগের মহাকাহিনী ঘোষণা করিতেছে। বিস্মৃতি এবং স্মৃতি, দুই যেন এখানে জাগ্রত। চৈতন্য এখানে বিস্মৃত; জড় এখানে জাগ্রত স্মৃতিতে প্রজ্বলিত। প্রস্তর স্তূপ নয়—যেন স্মারক-লিপিরাশি। মানবাপেক্ষা এই প্রাচীন জড়-প্রাচীর, নীরব ভাষায়, আমাদিগকে অনেক কথা বলিয়াছে, শিখাইয়াছে। সে সকল তত্ত্ব কথা কতক কতক "পুণ্যপ্রভা" নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। সরস্বতী নদী, পঞ্চ-পাহাড়-বেষ্টিত প্রাঙ্গণ পরিত্যাগ করিয়া বৈতরণীর দিকে * যাইতেছিল, কেহ তাহার পথ রুদ্ধ করিয়া, ডাক বাঙ্গালার পূর্ব্বদিক দিয়া, কৃষির উৎকর্ষ সাধনের জন্য নূতন পথ কাটিয়া লইয়া গিয়াছে। তাই এখন ডাক বাঙ্গালার পূর্ব্বে কর্ত্তিত সরস্বতী। এইখান দিয়াই বার মাস জল চলে; পশ্চিমের পথ রুদ্ধ। তবে বর্ষার সময় পাহাড়ে নদী রোধ করে, কাহার সাধ্য? সেই সময়ে পশ্চিম দিকের স্রোত বহমান হয়। ডাকবাঙ্গালার কতকটা পশ্চিমে বৈতরণী তীর্থ, সেখানে অনেক কৃত্রিম কুণ্ড আছে। কৃত্রিম এই অর্থে বলি, পয়সার খাতিরে পাণ্ডারা তাহা করিয়াছে, বোধ হয়। উষ্ণপ্রস্রবণ সকল মানুষে করে নাই। পাহাড় সকল মানুষে করে নাই। আরো যে সকল কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ আছে, তাহাও আমাদের ন্যায় মানুষে করে নাই। তাহা নর-দেবতার সৃষ্টি। তাহা অকৃত্রিম, পুণ্য-প্রবাহ। ডাকবাঙ্গালার পূর্ব্ব-দক্ষিণে অনেক দরগার ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। আরো পূর্ব্ব দক্ষিণে মুকদুম কুণ্ড। দক্ষিণে, সরস্বতীর পূর্ব্ব-কূলে, বিপুলাচলের নীচে, সূর্য্যকুণ্ড প্রভৃতি। সরস্বতীর পশ্চিম উপকূলে, বৈভার পাহাড়ের একটু উপরে, ব্রহ্ম ও সপ্তঋষি কুণ্ড প্রভৃতি। ডাকবাঙ্গালা আম্রবৃক্ষরাজিতে বেষ্টিত। স্থানটী সুশীতল, কবিত্বপূর্ণ, স্মৃতিপূর্ণ, ভীতিপূর্ণ, নির্জ্জন—মহানির্জ্জন। এই কবিত্বের খনি নির্জ্জন কুটীরে আমরা এক মাস কাটাইলাম। কি সুখ-স্বপ্নে উৎসাহ-মদিরায় আমাদের দিন কাটিয়াছিল, একমাত্র অন্তর্যামীই জানেন। নির্জ্জনতার মহাপ্রাণ যিনি, তিনি যেন আমাদিগকে কোলে করিয়া এই স্বপ্নময়, স্মৃতিময়, মাহাত্ম্যময় রাজ্যে রাখিয়াছিলেন। যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা লিখিতে লেখনি কম্পিত হয়। আমরা রক্ত মাংসধারী মানুষ হইয়াও একমাস মহাযোগে যেন যুক্ত ছিলাম। স্থান-মাহাত্ম্য, পাঠক, তোমরা মান আর না মান, আমি মানি। আমি মানি, স্থান-মাহাত্ম্যে মাটী সোণা হয়, বিষ্ঠা চন্দন হয়, পাপী উদ্ধার হয়। ভক্তের পূত চরণ রেণু স্পর্শে আর কি হয়, তাহা ভক্তগণই জানেন। আমি তাহা কি লিখিতে পারি? ডাকবাঙ্গালার পেয়াদা রামলাল হইল আমার উপদেষ্টা, সামান্য পাণ্ডা লোকনাথ হইল যেন গুরু, ভৃত্য হইল বন্ধু, দিবসে মধুকর এবং রজনীতে ভল্লুক-দল হইল সাথী। ঘুরিয়া, ঘুরিয়া, বসিয়া বসিয়া, শুইয়া শুইয়া, অস্পষ্ট এবং অস্ফুট কত তত্ত্বই যে শুনিয়াছি, মহা নীরব আকাশ তাহার সাক্ষী রহিয়াছে। স্থান-মাহাত্ম্য তুমি পাঠক, না মান, আমি মানি। কিন্তু স্থান-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে পারি, সে শক্তি আমার নাই। আমি বাঙ্গালী, আমি হুজুগপ্রিয় অধম বাঙ্গালী।

আমাদের যোগ কুটীরের কিঞ্চিৎ দক্ষিণেই দুই প্রকাণ্ড পাহাড়। পাঠক ম্যাপের

* উৎকলের বৈতরণী নয়, এখানেও বৈতরণী তীর্থ আছে। পরে তাহার কথা বলিব।

প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। পূর্ব্বে বিপুল,পশ্চিমে বৈভার। মধ্যে সরস্বতী নদীতে একটী কুণ্ড করা হইয়াছে; এখানে পদধৌত করিয়া পশ্চিমের বৈভার পাহাড়ের উপরে উঠিতে হয়। ইহাই প্রথম কুণ্ড। ইহার নাম সরস্বতী কুণ্ড।

যে দিন আমরা রাজগৃহে পৌঁছিলাম, তাহার পর দিন বড়গাঁয়ে মেলা বসিয়াছিল। প্রতি পর্ব্ব উপলক্ষে সেখানে মেলা বসিয়া থাকে। তা ছাড়া প্রতি বৃহস্পতিবারেই মেলা বসে। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় এখন যেন মেলার সমাধি। এখানে কোন সময়ে যে কিছু ছিল, অসভ্য লোকেরা বংশপরম্পরায় তাহা স্মৃতিতে বহিয়া বহিয়া আনিয়াছে। লোকেরা এই স্থানের মায়া ছাড়িতে পারে না। প্রতি দিনই লোক আসিতেছে, প্রতি সপ্তাহেই মেলা বসিতেছে, প্রতি মাসেই,প্রতি বৎসরেই কত নরনারী সাজিয়া দলে দলে মিলিতেছে। আমরা দেখিলাম, প্রতি দলের সঙ্গেই দুই একটী ঢাক বাজিতেছে, আর নর নারী মহা উৎসাহে মাতিয়া চলিয়াছে। বড়গাঁয়ের মেলার পর দিন রাজগৃহে প্রাতে মেলা বসিল। কত দূর দূর—অতি দূরতর স্থান হইতে প্রত্যুষ হইতে কত নর নারী সমবেত; প্রতি দলের সঙ্গেই ঢাক। ঢাকের বাদ্যে পাহাড় প্রতিধ্বনিত, আজ প্রকম্পিত। সূর্য্যকুণ্ড আজ লোকে পূর্ণ, এখানে আজ স্নান করিলে মহা-পুণ্য। সরস্বতী কুণ্ডের পূর্ব্বধারে বিপুলের নীচে সূর্য্যকুণ্ড, রামকুণ্ড, গণেশ কুণ্ড, চন্দ্রমা কুণ্ড (সোম-কুণ্ড) সীতাকুণ্ড। একটী ছাড়া আর সকলের জলই উষ্ণ, বোধ হয় যেন একটী উষ্ণ ঝরণা বিভক্ত হইয়া এই সকল কুণ্ড উৎপন্ন করিয়াছে। ইহার নিকটেই একটী প্রাচীন মন্দিরে হাটকেশ্বর শিব-লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। আমরা প্রত্যুষে মেলা দেখিতে গেলাম। সে জনতা ভেদ করে, কাহার সাধ্য? রাজগৃহের কনষ্টেবল আমাদিগকে জনতা ভেদ করিয়া লইয়া চলিল। অতিকষ্টে সূর্য্যকুণ্ডের ধারে পৌঁছিলাম। সূর্য্য কুণ্ড প্রায় ১২হাত চওড়া,১২ হাত দীর্ঘ; এই সঙ্কীর্ণ স্থানে অসংখ্য লোকের স্নান। নির্ম্মল উষ্ণ জলরাশি আজ কর্দ্দমময় হইয়া গিয়াছে। সেই কর্দ্দমে অসংখ্য নরনারী সানন্দে এবং সোৎসাহে ডুব দিতেছে। নারীদিগের হস্তে মোয়া এবং পিষ্টক। কুণ্ডের চৌবাচ্চার পূর্ব্ব প্রাচীরে সূর্য্যের মূর্ত্তি, সেখানে দুই চারিটী প্রদীপ জ্বলিতেছে. কয়েকজন পাণ্ডা দাঁড়াইয়া পিষ্টক ও মোয়া মূর্ত্তিকে স্পর্শ করাইয়া কতক ফেরত দিতেছে, কতক রাখিতেছে। কুণ্ডের চতুর্দ্দিকে অসংখ্য পাণ্ডা পয়সা রোজগারের চেষ্টা করিতেছে। স্নান হইলে বাদ্য বাজাইয়া দলে দলে নরনারী আর্দ্র বস্ত্রে নিজ নিজ গ্রামাভিমুখে যাইতেছে। প্রায় দশটা পর্য্যন্ত এই মেলা দেখিলাম। কি জানি যেন অনেকেই আমাদিগকে খুব আদর অভ্যর্থনা করিল। নানকসাহীর দুই চারি জন বাবাজি আমাদের চেহারা দেখিয়া বড়ই প্রশংসা করিলেন। কনষ্টেবলের সঙ্গে আমরা এই দিনই মুকদুম কুণ্ড দেখিতে গেলাম। ইহা বিপুলাচলের উত্তর গাত্রে; সূর্য্যকুণ্ডের পূর্ব্বে, ডাকবাঙ্গালার পূর্ব্বদক্ষিণ কোণে সংস্থাপিত। পূর্ব্বে ইহাকে শৃঙ্গীঋক কুণ্ড বলিত। উষ্ণ জল প্রবল ধারায় পাহাড় ভেদ করিয়া ইহাতে অবিরত পড়িতেছে। মুসলমান সাধু মুকদুম সাহ ইহাকে আশ্রয় করা অবধি ইহার নাম মুকদুম কুণ্ড হইয়াছে। এখানে যাহা যাহা দেখিলাম এবং অন্যান্য স্থানে যাহা দেখিলাম, পরে বিবৃত করিব। এই দিন রাত্রে একটী ঘটনায় আমরা বড়ই আশ্চর্য্য হইলাম! আমাদের ডাকবাঙ্গালার পেয়াদা রামলালের স্ত্রী স্বামীর জন্য ১৭ ক্রোশ

পথ হাটিয়া উৎসবের পিষ্টক লইয়া উপস্থিত হইয়া ছিল। কি জীবন্ত ভালবাসার আকর্ষণ। অসভ্য মহিলা স্বামীসেবার জন্য অম্লানচিত্তে তীব্র রৌদ্র এবং উন্মত্ত ধূলির বন্যা মাথায় বহিয়া কতদূর হইতে আসিয়াছে! স্বামী এই উপাদেয় তণ্ডুল ও গুড়মিশ্রিত মালপোয়া না খাইলে সব যেন ব্যর্থ হয়, তাই এতদূর আসিয়াছে। পথ কষ্টে ডাকবাঙ্গালায় আসিয়াই রাত্রে ভেদ বমি আরম্ভ হইয়াছে। রাত্রে রামলাল হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া বলিল, তাহার স্ত্রী মারা যায়। আমি ছুটিয়া গেলাম। যাইয়া দেখি, বাস্তবিকই ওলাউঠার লক্ষণ, হাতে পায়ে খিল ধরিয়াছে। মৃত্তিকা শয্যায় রামলাল স্ত্রীকে কোলে করিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতেছে। ডাক্তার নাই, ঔষধ নাই, পথ্য নাই—আমাদের সঙ্গে অধিক লোকও নাই! গ্রাম অনেক দূর, কাকী ভৃত্য রাত্রে গ্রামে যাইতে সাহস পায় না, রাত্রে ব্যাঘ্র ভল্লুক বাহির হয়। কি করা যায়, ভাবিতে লাগিলাম। আমি বিধাতার উপর নির্ভর করিয়া গ্রামে যাইব, স্থির করিলাম। ইতিমধ্যে হঠাৎ একটা প্রক্রিয়া মনে হইল। কুণ্ডের পরিষ্কার জল ঘরে ছিল, বিধাতার নাম স্মরণ করিয়া ৫ মিনিট অন্তর অন্তর ঐ জল দিতে বলিলাম। ঐরূপ দিতে দিতে, বিধাতার কৃপায়, রোগী একটু ভাল হইল। ভেদ বমি থামিল। জল ত জল নয়, আজ যেন বিধাতার কৃপারূপে রামলালের স্ত্রীর শরীরে প্রবেশ করিতেছে। কিসে কি হয়, কে জানে? সামান্য শীতল জলে দারুণ ওলাউঠা আরোগ্য হইতে লাগিল। শেষ রাত্রে দেখা গেল, রোগীর পেট ফুলিয়াছে; তখন জল বন্ধ করিলাম। পর দিন রোগী একই অবস্থায় রহিল। ১ কি ২টা বাজে, তবুও প্রস্রাব হয় নাই। এক মাত্র উপায় ঐ শীতল জলের পটী তলপেটে দেওয়া গেল এবং শিলাওর সরু চিড়া ভিজাইয়া তাহার জল রোগীকে পথ্য দিলাম। কি আশ্চর্য্য, এক কি দেড় ঘণ্টা পরেই রোগীর প্রস্রাব হইল। দুই দিন পর রোগীকে অন্ন দিলাম। আরো চারি দিন রাখিয়া, শেষে সঙ্গীসহ রোগীকে বাড়ী পাঠান গেল। বিধাতার কৃপা যখন অবতরণ করে, তখন সামান্য জিনিস মহা ঔষধের কাজ করে। রামলালের কুটীরে ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেল। দাম্পত্য প্রেমের যে গভীর মনোমুগ্ধকর নীরব অভিনয় দেখিলাম, তাহা কখনও ভুলিব না। ভালবাসা বড় লোকের ঘরে, না কাঙ্গাল গরিবের কুটীরে, তাহা কে জানে?

ক্রমশঃ

বঙ্গ-ভাষা ও সাহিত্য।

প্রথম ভাগ।

শ্রীদীনেশচরণ সেন, বি-এ, প্রণীত।

বহুদিন হইতে আমরা দীনেশ বাবুর এই গ্রন্থখানির অপেক্ষা করিতেছিলাম। রয়াল আটপেজী ৪৩০ পৃষ্ঠায় প্রথম ভাগ সমাপ্ত হইয়াছে। ছাপা ও বাঁধাই উৎকৃষ্ট হইয়াছে। দেখিলে বুঝা যায়, বাঙ্গালার ছাপাখানার কত উন্নতি হইয়াছে। কুমিল্লা চৈতন্য-যন্ত্রে পুস্তকখানি মুদ্রিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, মফঃস্বলের ছাপাখানায় ভ্রম সংশোধনের উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত নাই। এজন্য বিস্তর মুদ্রাপ্রমাদ গ্রন্থ মধ্যে রহিয়া গিয়াছে।

ছয় বৎসর পরিশ্রম করিয়া গ্রন্থকার এ পুস্তকখানি রচনা করিয়াছেন। পুস্তকে

প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের আলোচনা করা হইয়াছে। ছয় বৎসরেও যে মফঃস্বলে বসিয়া প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাস সংগ্রহ করা যাইতে পারে, ইহা কেবল অসীম ধৈর্য্য, একান্ত অনুরাগ, অবিরাম পরিশ্রম ও অটল অধ্যবসায়ের নিদর্শন।

পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন ও শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত বঙ্গভাষার ইতিহাসের বীজ বপন করেন। সেই বীজ হইতে দীনেশ বাবুর এই প্রকাণ্ড কাণ্ড। তাঁহার গ্রন্থে বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণ ভিন্ন বাঙ্গালার ধর্ম্ম,সমাজ ও আচার ব্যবহারের ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায়। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য হইতে বাঙ্গালার এই অপূর্ব্ব ইতিহাস দীনেশ বাবু সংগ্রহ করিয়াছেন। এই ইতিহাস সংগ্রহ করিতে প্রাচীন পুস্তকের অনুসন্ধানে পর্ব্বতে জঙ্গলে তাঁহাকে কতদিন অনাহারে অনাশ্রয়ে ভ্রমণ করিতে হইয়াছে। একাকী, অসহায়, বৃহৎ পুস্তকালয় বা সুশিক্ষিত সাহিত্যবিৎ হইতে দূরে থাকিয়া,জটিল সাহিত্য-রহস্যের মীমাংসায় কতদিন নিরুদ্যম ও ভগ্নোৎসাহ হইতে হইয়াছে। ইহার উপর তাঁহার নিজের তাদৃশ সচ্ছলতা ছিল না,—এত যত্নে সংগৃহীত ইতিহাসখানি কেবল হাতের লেখা পুঁথিতে আবদ্ধ থাকিয়া কীটের ভক্ষ্য হইবে; কি কোন দিন মুদ্রিত হইয়া বিদ্বৎ সমাজের সম্মুখে উপহার দিতে পারিবেন। আবার সে সমাজ পূর্ব্ব বঙ্গীয় অজ্ঞাত অপরিচিত লেখকের লেখায় কোন দিন কি স্নেহের পক্ষে দৃষ্টিক্ষেপ করিবেন? সহস্র বাধা,সহস্র বিড়ম্বনা বাঙ্গালা-লেখকের —বিশেষতঃ যাহারা মৌলিক ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত। সেই সহস্র বাধা দীনেশ বাবু অতিক্রম করিয়াছেন; বাঙ্গালা ভাষার অনেকগুলি গুপ্তরত্ন তিনি আবিষ্কার করিয়াছেন এবং এই সুবৃহৎ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য আমাদিগকে উপহার দিয়াছেন। কিন্তু শুনিয়া আমরা ত্রাসিত হইয়াছি, তিনি শয্যাগত হইয়াছেন। ভগবান তাঁহার মঙ্গল করুন। শিক্ষিত বাঙ্গালীর পুস্তকাগারে "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' আসন সংগ্রহ করিবে, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই।

একাকী এক বৃহৎ গ্রন্থ প্রস্তুত করিতে হইলে পুনরুল্লেখ, অসমীকরণ, মতবিপর্য্যয়, রীতিভঙ্গ প্রভৃতি দোষ অনতিক্রমণীয়। আহ্লাদের বিষয়,এ গ্রন্থে আমরা মত বিপর্য্যয়ের কোন নিদর্শন পাই নাই। কিন্তু ঐতিহাসিক ক্রম-ভঙ্গে দুঃখিত হইয়াছি।

আমরা গ্রন্থখানিকে বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং বাঙ্গালা সাহিত্য হইতে তাহার প্রামাণিকতা প্রতিপন্ন হইবে, আশা করিয়াছিলাম। আমাদের সে আশা সফল হয় নাই। বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস লিখিবার জন্য দীনেশ বাবু বহু-ভাণ্ডার সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু ইতিহাস লেখেন নাই। মাসিক পত্রিকার কতকগুলি প্রবন্ধ একত্র করিয়া দিলে যেমন দেখায়, তাঁহার গ্রন্থখানি সেইরূপ হইয়াছে। ভাষাও ইতিহাসের উপযোগী হয় নাই, গাম্ভীর্য্য ও ওজস্বিতাকে বিসর্জ্জন দিয়া মাধুর্য্য ও চটুলতাকে আশ্রয় করা হইয়াছে। বিশেষতঃ ইংরাজী গ্রন্থের তুলনা বা ইংরাজী শব্দের ব্যবহার একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারিলে ভাল হইত।

বঙ্গভাষার ইতিহাসের এখন উপকরণ সংগ্রহের সময়। ইতিহাস লিখিবার এখনও সময় হয় নাই। সঞ্জয়, কবীন্দ্র, খেলারাম প্রভৃতি গ্রন্থকারগণের গ্রন্থ এখনও সম্পূর্ণ

রূপে সংগ্রহ হয় নাই, হইয়া থাকিলেও মুদ্রিত হয় নাই, মুদ্রিত হইলেও সাধারণ্যে প্রচারিত হয় নাই। সুতরাং সেই সকল গ্রন্থের সমালোচনা ভাল কি মন্দ হইল, পাঠকগণের বিচার করিবার অধিকার নাই। পক্ষান্তরে তাঁহাদের রচনা-কাল-নির্দ্ধারণে ঐতিহাসিক যথেচ্ছ ব্যবহার করিলেন কি না, তাহারও বিচার হইতে পারে না। অথচ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, এইরূপ গ্রন্থ সকলের সমালোচনায় পরিপূর্ণ। গ্রন্থকারের জীবনী সংগ্রহে প্রয়াস তাদৃশ দেখা যায় না, গ্রন্থ-সমালোচনায় আয়াস যত অধিক। বঙ্গদেশের প্রাচীন গ্রন্থকারের জীবনীসংগ্রহ গ্রন্থকারের (অতি দুরূহ ব্যাপার, কিন্তু দীনেশ বাবুর মত উপযুক্ত লোকও শীঘ্র মিলিবে না। আবির্ভাব কাল নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন না হইলে, ভাষার ক্রমবিকাশে তাঁহাদের স্থান কোথায়, নির্ণয় করিবার উপায় নাই। অন্য দিকে যে সকল কথা পরিত্যাগ করিলে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের আলোচনার কোন ত্রুটী হইত না, তাহার আলোচনা যথেষ্ট আছে। বিদ্যাপতির আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে গ্রন্থকার কোন স্বাধীন মত প্রকাশ করেন নাই, বিদ্যাপতির দানপত্র জাল বলিয়া এক কথায় উড়াইয়া দিয়াছেন, দানপত্রের তারিখটী কীটদষ্ট হইয়া থাকিবে ও পরে নূতন তারিখ বসান হইয়া থাকিবে, ইত্যাদি আরোপ করিয়া এবং তাম্রশাসন কীটদষ্ট [illegible] দ্রব্য নহে, স্মরণ না করিয়া, তাড়াতাড়ি বিদ্যাপতির জীবন বৃত্তান্ত সমাপন করিয়াছেন। চণ্ডীদাস বা গোবিন্দদাস, কেতকী বা জ্ঞানদাসের জীবনবৃত্ত জানিবার জন্য আমরা উন্মুখ হইয়াছিলাম, তাহা পাই নাই। কিন্তু চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী বিস্তৃতভাবে বর্ণনা [illegible] হইয়াছে। এইরূপ ত্রুটী সত্ত্বেও বলা যাইতে পারে, দীনেশ বাবুর গ্রন্থখানি বাঙ্গালা ভাষার একটী অমূল্য রত্ন। কাব্য সমালোচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত। আমরা একটী চিত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।

"কৃষ্ণকমল গোস্বামীর রাই-উন্মাদিনীই বিশেষ প্রসংশনীয় কাব্য। এই পুস্তকের প্রতি পত্রেই চৈতন্যদেবকে স্মরণ করাইয়া দেওয়ার বিষয় আছে। যাঁহারা চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি পুস্তক পড়েন নাই, তাহারা রাই উন্মাদিনীর স্বাদ ভাল করিয়া পাইবেন না। অঙ্কিত চিত্রখানা বৃন্দাবনের উন্মাদের নামে নবদ্বীপের উন্মাদের। কৃষ্ণকমল পুস্তকের সূচনায় বলিয়াছেন "স্বাদিতে নিজ মাধুরী, নাম ধরি গৌরহরি, হরি বিরহেতে হরি, কাঁদি বলে হরি হরি।" আমরা আত্মরূপে মুগ্ধ হইয়া প্রাণ দিয়া থাকি, বাহিরের বস্তুতে কে কবে আত্মসমর্পণ করিয়াছে? বাহিরের বস্তু উপলক্ষ করিয়া আমরা স্বীয় আদর্শরূপেরই সত্ত্বা অনুভব করিয়া থাকি; এইরূপের আদর্শ ব্যক্তিগত, রূপ বস্তুগত হইলে সুন্দর ফুল স্নিগ্ধ পল্লবটী দেখিয়া মানুষের ন্যায় ইতর প্রাণীগণও মুগ্ধ হইত, জাতিগত হইলে চীনদেশের ক্ষুদ্রপদ দেখিয়া আমরা সুখী হইতাম, সমাজগত হইলে দুই প্রতিবাসীর রুচি স্বতন্ত্র হইত না। আমরা প্রত্যেকে নিজের মাধুরী দেখিয়া পাগল, সুতরাং ভালবাসাকে একার্থে আত্মরমণ বলা যাইতে পারে, নিজের কামনার প্রতিবিম্বই রূপ ধারণ করিয়া আমাদিগকে অনুসরণ করিয়া থাকে। গৌর অবতারে এই প্রেমলীলা অতি পরিস্ফুট, নিজকে দুই ভাবিয়া এই প্রেমের উদ্ভব, তখন—"দুটী চক্ষে ধারা বহে অনিবার, দুঃখে বসে বার বার, স্বরূপ দেখাবে একবার, নতুবা এবার মরি। ক্ষণে গোরাচাঁদ হৈয়ে দিব্যোন্মাদ, উদ্দীপন ভাবে ভেবে কালাচাঁদ, ধর্‌তে যায় করিয়া দৈন্য।"

কৃষ্ণকমলের চক্ষে এই বিরহী গৌরচন্দ্রের মধুর মূর্ত্তি প্রতিভাত হইয়াছিল, তাহাই তিনি রাই উন্মাদিনীরূপ উৎকৃষ্ট রূপ চিত্রে পরিণত করিয়াছেন। কৃষ্ণ কমল এই প্রেমস্নিগ্ধ গোরারূপের তুলনায় অন্য সমস্ত রূপ অপকৃষ্ট মনে করিয়াছিলেন।

চাঁদে যে কলঙ্ক আছে
ছি ছি চাঁদকি গোরাচাঁদের কাছে।

প্রেমিক নিজেই পূর্ণ, তবে বিরহ কেন? গোস্বামী মহাশয় বলিয়াছেন।

"তবে যে গোপীকার হয় এতই বিষাদ,
তার হেতু প্রোষিত ভর্ত্তৃকা রসাস্বাদ।"
স্ফূর্ত্তিরূপে মূর্ত্তি যখন দেখেন নয়নে।
তখন ভাবেন বুঝি এল বৃন্দাবনে॥
অদর্শনে ভাবেন কৃষ্ণ গেছেন মধুপুরী॥"

এই মিলন-বিরোধী পথের অন্তরায় যমুনা, যাহা অদ্বৈত ভাবটীকে দ্বৈতভাবে দ্বিখণ্ড করিয়া বিরহের সৃষ্টি করিতেছে, তাহা আত্মবিস্মৃতি মাত্র।

কৃষ্ণ ধনদের রাধিকা চৈতন্য দেবের ছায়া। তাঁহার প্রেমের আবেগ নির্ম্মল, নিষ্কাম ও আত্মবিস্মৃতি পূর্ণ। রাধিকা এই প্রেমের আবেশে জড় জগতের স্তরে স্তরে কৃষ্ণ সত্ত্বা অনুভব করিতেছেন। তাঁহার প্রেম বিলাপ প্রলাপের ন্যায় অসম্বদ্ধ, মধুর ও আত্মবিহ্বলতার কারুণ্য মাখা। কবি প্রেমচিত্রের মোহিনী মুগ্ধ, রাধিকাকে তিনি কৃষ্ণপ্রেমে সুন্দরী করিয়া গড়িয়াছেন। তাঁহার মধুমাখা কণ্ঠধ্বনি ও প্রেমাশ্রু উদ্বেলিত চক্ষুর সৌন্দর্য্য বুঝাইতে কম্বু কি কমলের তুলনার আবশ্যক নাই। চন্দ্রাবলী মূর্চ্ছাপন্ন রাধিকার রূপ দেখিয়া বলিতেছেন—

"যখন বঁধুর বামে দাঁড়াইত,
আবার হেসে হেসে কথা কত,
তখন এই না মুখে,
মুখের কতই যেন শোভা হত,
তা নৈলে এমন হবে বা কেন,
বঁধু থেকে আমার বক্ষঃস্থলে,
বেদে উঠিত রাধা বলে,"

এইরূপ মৌলিক সমালোচনায় বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রত্যেক পৃষ্ঠা পরিপূর্ণ। দীনেশ বাবু নিজে কবি। সহানুভূতি গুণে কাব্য-সমালোচনায় তিনি সহজ-সিদ্ধ। আর্য্য-লিপির উৎপত্তি, বঙ্গভাষার জননী কে, বঙ্গভাষা ও বঙ্গলিপির আবির্ভাব কাল নির্ণয়, ইত্যাদি বিষয়ে দীনেশ বাবুর সহিত আমাদের মতের ঐক্য নাই, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতির বৈষ্ণব কবিগণের জীবন বৃত্তান্ত সম্বন্ধে এবং অন্যান্য বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট মতভেদ আছে। যদি অবসর পাই, সে সকল কথার সমালোচনা সময়ান্তরে করা যাইবে। এই সকল মতভেদ আমাদের দৃষ্টি অন্ধ করিতে পারে নাই। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, এই গ্রন্থগুণে দীনেশ বাবু অমরত্ব লাভ করিবেন। বীজ ও প্রফুল্ল কুসুমে যত প্রভেদ, পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের গ্রন্থ ও দীনেশচন্দ্র সেনের গ্রন্থে ততই প্রভেদ।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

সাহ আকবর এবং শ্রীমচ্চৈতন্য সম্প্রদায়। (১)

(শ্রীধাম নীলাচলবাসী শ্রীযুক্ত ভগবন্ত দাস মোহান্ত মহারাজের পত্রের উত্তর।)

হিন্দি ভক্তিমালা প্রভৃতি গ্রন্থ এবং পদ সমুদ্র হইতে উদ্ধৃত।

৪০০ শত বৎসরের পূর্ব্বে অর্থাৎ যবনাধিকার সময়ে যবন কর্তৃক ধর্ম্মপরায়ণ হিন্দুদিগের সনাতন ধর্ম্মের প্রতি ঘোরতর অত্যাচার এবং যতদূর আততায়িতার কার্য্য সংঘটিত হইতে হয়, তা হইয়াছিল।

যবন সৈন্যগণ যবন-সম্রাটের প্রশ্রয় পাইয়া, গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে দলে দলে উপস্থিত হইয়া, হিন্দুধর্ম্ম উচ্ছেদ মানসে এক হস্তে শাণিত

তরবারি অস্ত্র হস্তে কোরাণ লইয়া হিন্দুদিগের ধন প্রাণ, মান সম্ভ্রম, এ সমুদায় হরণ, দ্বিতীয় হিন্দুদিগের পবিত্র তীর্থস্থানের দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি ও দেবমন্দির ধ্বংস, তৃতীয় ধর্ম্মপুস্তক সকল জলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ ও ভস্মরাশি এবং হিন্দুদিগের অতি পূজ্য গৃহপালিত গো, এবং বৎস্য প্রভৃতি হিন্দুর গৃহেই হত্যা এবং সেই মাংস হিন্দুর পবিত্র গৃহেই পাক এবং আহার করিয়া সেই উচ্ছিষ্ট এবং নিষ্ঠীবন হিন্দুদিগের গাত্রে নিক্ষেপ করিয়া অনেক হিন্দুর জাতি নষ্ট করিয়াছিল। সেই ধর্ম্মবিপ্লবে ঈশ্বর ব্যতীত দ্বিতীয় রক্ষাকর্ত্তা কেহই ছিলেন না। ইতিহাসের ইহাই সংক্ষেপ বিবরণ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় স্বয়ং ভগবান বলিয়াছেন ;—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাং
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

ঈশ্বরের এই বচনানুসারে মহাজনে বলেন, যিনি সাধুদিগের পরিত্রাণ, অসাধুগণের বিনাশ আর ধর্ম্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। বেদ, উপনিষদে, শ্রীমন্নারায়ণের ধ্যানে ;—

"ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃ মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী
নারায়ণ ; সরসিজাসন সন্নিবিষ্টঃ
কেয়ূরবান্ কণককুণ্ডলবান্ কিরীটিধারী
হিরণ্ময় বপু" ধৃত শঙ্খ চক্র॥

অর্থাৎ বেদের যে অংশে ঈশ্বর নিরূপণ ও গুণাবতারের যেরূপ নির্দ্দেশ আছে, সেই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বদেবাত্মক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু হিরণ্ময় নরবপু ধারণ করিয়া ১৪০৭ শকে গৌড়দেশান্তর্গত শ্রীধাম নবদ্বীপে (মায়াপুরে) অবতীর্ণ হইয়া সন্ন্যাসীবেশে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গাদি দেশ পরিভ্রমণ করত সাঙ্গোপাঙ্গ সমভিব্যাহারে হরিনাম জোরডঙ্কায়, জগৎ কাঁপাইয়া ও মাতাইয়া, দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন এবং যুগধর্ম্ম স্থাপন করিয়াছিলেন। যথা পুরাণে আছে ;—

"কলেঃ তদ্ধো র কীর্ত্তনাৎ"

কেবল হরিনাম। এই যুগধর্ম্ম স্থাপনান্তে ১৪৫৫ শকে তাঁহার অন্তর্দ্ধানের ৯ বৎসর পরেই, ১৪৬৪ শকে আকবরের জন্ম হয়। তিনি ১৬ বৎসর বয়ঃক্রমে অক্ষুণ্ণ প্রতাপের সহিত ভারতের রাজা হইয়া, ৬৩ বৎসর নির্ব্বিঘ্নে রাজ্যসুখ ভোগ করণানন্তর, ১৫২৭ শকে ইহলোক ত্যাগ অর্থাৎ পরলোকে গমন করিয়াছিলেন। যে সময়ে সম্রাট সাহ আকবর বিবিধরত্ন-খচিত দিল্লীর রাজতক্তে উপবিষ্ট, সেই সময়ের কিছু পূর্ব্বে কলিযুগ-পাবনাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর কৃপাপাত্র গৌড়-পাতসাহের প্রশংসনীয় মন্ত্রী শ্রীমৎ সনাতন এবং শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী (দুই ভাই) কর্ত্তৃক শ্রীবৃন্দাবনের লুপ্ততীর্থ সমুদায় উদ্ধার এবং সম্রাটের প্রিয় সুহৃৎ শ্রীযুক্ত মানসিংহ কর্ত্তৃক শ্রীমদ্রূপ গোস্বামীর স্থাপিত শ্রীবৃন্দাবনে যোগপিঠে বিরাজিত শ্রীশ্রীগোবিন্দজীর প্রস্তর-নির্ম্মিত শ্রীমন্দির সম্রাটের অনুমোদনেই ১৩ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে প্রস্তুত হইয়াছিল। সে সম্বন্ধে ভক্তিমালা গ্রন্থেও জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ আছে।

সম্রাট আকবর যদিও যবনকুলে উদ্ভব হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার অধিক আস্থা ছিল। এমন কি, তৎপূর্ব্বে কোন বিজাতীয় রাজা তাঁহার ন্যায় হিন্দু সমাজে পূজিত হন নাই। তিনি প্রকৃত জনকের ন্যায় প্রজাদিগকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন।

পক্ষপাত রূপ কলঙ্ক কখনই তাঁহার হৃদয়কে

কলুষিত করিতে পারে নাই। প্রজার মঙ্গল কামনা এবং হিতসাধন তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। হিন্দু কি বৈষ্ণব শাস্ত্র কখনও অবজ্ঞা করিতেন না। আদ-দের সহিত সর্ব্বতোভাবে মান্য, এবং বর্ণ বা ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া লোকের গুণানুরূপ এবং পুরস্কার স্বরূপ রাজকার্য্যে নিয়োগ ও সম্মান করিতেন। হিন্দুদিগের ন্যায় কৃতজ্ঞ জাতি অতি বিরল, তাঁহারা তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিতে কখনই ত্রুটী করিতেন না। তিনি এ পর্য্যন্ত আমাদিগের প্রাতঃস্মরনীয়।

কথিত ও প্রসিদ্ধি আছে—"দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা।" কিছু কম ৩০০ শত বৎসর হইল সম্রাটের মৃত্যু হইয়াছে,তথাপি অনেক হিন্দু "শ্রীরামচন্দ্রি মোহরের ন্যায়" আকবরের স্বর্ণ মোহরের পূজা করেন। সাধারণের ইহা বিশ্বাস যে, উহা গৃহলক্ষ্মীর হাঁড়ির ভিতর থাকিলে লক্ষ্মী অচলা হয়েন।

দিল্লীশ্বর, সুযোগ্য অমাত্য মৌলবী ফৈজু ও আবুল ফজল এবং মিত্র রাজা তোড়লমল, ও মান সিংহ প্রভৃতি সভা-সদ্বর্গকে লইয়া সর্ব্বদাই রাজ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। এবং মিত্র রাজাগণের মন্ত্রণা মতে প্রায় সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

ধর্ম্মশাস্ত্র এবং ঈশ্বরের স্তুতিপাঠ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ এবং সঙ্গীতানুশীলনে তাঁহার অধিক যত্ন ও অনুরাগ ছিল। তাহারই চর্চ্চায় অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। আরব্য ও পারস্য বিদ্যায় অতি সুদক্ষ ও সুলেখক ও সুপণ্ডিত বলিয়া গণ্য ছিলেন। সকল ভাষাই জানিতেন। সংস্কৃত নল দময়ন্তি ও লীলাবতী প্রভৃতি অনেক গুলি গ্রন্থ পারস্যভাষায় অনুবাদিত করিয়াছিলেন।

তাঁহার দরবারে সঙ্গীত-বিদ্যাবিশারদ বিখ্যাত "কালোয়াৎ" মিঞা তানসেন ও সঙ্গীত-অধ্যাপক সরিমিঞা প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ গায়ক ও অনেকানেক যন্ত্রবিৎ বিজ্ঞ বিজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহারা সময়ে সময়ে সময়োচিত রাগ রাগিণী সঙ্গীত আলাপ ও বীণাদি যন্ত্র বাদন দ্বারা সম্রাটের চিত্ত বিনোদন করিতেন।

একদিন, রাজার দরবারে সঙ্গীত চর্চ্চা কালীন তানসেনের গানে রাজা মুগ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করেন,হে কিন্নর! আপনার সুকণ্ঠ-নিসৃত বহু প্রকার ঈশ্বরের স্তোত্র-পাঠ-গীত শুনিয়াছি, কিন্তু বর্ত্তমান কালের গৌড়ের ঈশ্বর সঙ্গীত-গুরু শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর স্তুতি-পাঠ শুনি নাই কেন? তাঁহার শিষ্য শ্রীসনাতন গোস্বামী দেব ভাষায় অর্থাৎ সংস্কৃতে যে একখানি গীতাবলী লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছেন,এক সময় পাঠ করিয়া দেখিয়াছি, তাহা অতি মধুর এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট। সেই পরমার্থ ভাবের কোন গীত কি আপনার শিক্ষা আছে? সেই গীত শুনিতে আমার অধিক বাসনা। সম্রাট কর্ত্তৃক এই আদেশ হইবা মাত্রই রাজার ইচ্ছা পরিপূরণার্থে তানসেন শিষ্যদিগকে লইয়া তান, মান,লয়,এবং সুর সংযোগে;—

রাগিণী কেদার, তাল ধামার।

অখিল কলিমল নাশক। পরদেব। সেবক পালক।
নব কুমীশ। হে শ্রীগৌরাঙ্গ। নিখিল যুগভয়-হারক॥
জয়তু মানব, ব্যাস-মুনিকৃত, লুপ্তধর্ম্ম বিকাশকঃ।
গোষ্ঠীং বিভো। কুরু সদানন্দং জন-মনোরথপূরকঃ॥
পাদপদ্মে বাঞ্ছ ভৃঙ্গ, স্তব নিমজ্জতু, শীতলে,
দুষ্ট সঙ্গ; হে হরে! জহি পাতু বর্ব্বর শোধকঃ॥
যাচমের মেজচ্ছ কুন্তন, ভাব যাচক শর্ব্বদঃ।
বিলসতু সদ মম মানসে কলি দুরিতে ভব তারকঃ॥

(গীতাবলী।)

রাগ রাগিণীর কৌতুক তরঙ্গ দেখাইবার কালেই সম্রাট ভাবে বিহ্বল হইয়া গদ্গদ কণ্ঠে তানসেনকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন ;—হে সঙ্গীতবিৎ! আপনার সঙ্গীত গুরু কে? তিনি কোথায় থাকেন, এখন কি কাজে লিপ্ত? তাঁহাকে সঙ্গীত সভায় আহ্বান করিলে উপস্থিত হইতে পারেন কি না? তানসেন উত্তর করিলেন :— হে নরেন্দ্র! আমার গুরু শ্রীশ্রীবঙ্কুবিহারী দেবের কৃপা পাত্র "আজমার নিবাসী" স্বামী হরিদাস। তিনি এখন শ্রীবৃন্দাবনে যমুনা-তটে পর্ণকুটীরে বাস করেন। শুনিয়াছি, মহা শক্তিসম্পন্ন অতিবদান্য শ্রীমৎ সনাতন ও শ্রীমদ্রূপ এবং শ্রীমৎ গোপাল ভট্ট প্রভৃতি গোস্বামী প্রভু পাদগণের অনুগত। তাঁহাদের সঙ্গলাভে, এখন কোথাও যাইতে ও কাহারও সহিত আলাপ করিতে ভালবাসেন না। তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীহরিরাম ব্যাস এবং কনিষ্ঠ শ্রীআনন্দ ঘন এবং মধ্যম স্বয়ং শ্রীহরিদাস স্বামী, অতুল ঐশ্বর্য্য ও বিষয় কার্য্য ত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। এখন তাঁহারা অবধূত বেশে অর্দ্ধ-উন্মীলিত লোচনে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ নাম গান ভজনে উন্মত্ত। আনন্দ ঘন (মিরাবাই তুল্য) একজন বিখ্যাত সঙ্গীত কবি অর্থাৎ পদকর্ত্তা। জ্যেষ্ঠ হরিরাম রঙ্গ মহলে থাকিয়া শ্রীশ্রীকিশোর কিশোরী জীর সেবা করেন। হরিরামের সেবা হস্তে পিকদানী ; আনন্দ ঘনের সেবা পাদ-সম্বাহন এবং স্বামীজীর সেবা চামর-ব্যজন।

এস্থলে শ্রীমন্নাভাজী হিন্দি ভক্তমালে দোহাছন্দে লিখিয়াছেন,—

"নবকুমার চক্রচুড়া নৃপতি সামুয়ো।" ইত্যাদি।

বঙ্গানুবাদে শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজী পদ্য ভক্তমালে লিখিয়াছেন,—

ব্যাসজীর সেবা, সদা পিকদানী হাতে।
থাকেন যুগল পার্শ্বে, রঙ্গ মহলেতে॥
হরিদাস ঠাকুরের চামর ব্যজন।
আনন্দ ঘনের সেবা, পাদ সম্বাহন॥
এতেক শুনিয়া রাজা, আনন্দ হইল।'

(ভক্তমাল)

প্রভু শ্রীসনাতন গোস্বামী যে মহা প্রভাবশালী, সম্রাট তা পূর্ব্বেই রাজা মানসিংহের প্রমুখাৎ সমস্ত অবগত হইয়াছিলেন। তানসেনের মুখে তাঁহার আবার প্রতিষ্ঠা এবং হরিদাস স্বামীর গুণ গান শুনিয়া তাঁহাদের দর্শন ও গীত শ্রবণের নিমিত্ত অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইলেন। পরন্তু মনের ভাব কাহারও নিকট প্রকাশ করিলেন না।

পরদিন, শ্রীবৃন্দাবন গমনের নিমিত্ত রাজ পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব সজ্জায় সজ্জিত হইয়া বহু মূল্য মণিমাণিক্য গু ভাবে সঙ্গে লইয়া মিয়া তান সেন সম ভিব্যাহারে পদব্রজে আগ্রা রাজধানী হইতে শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন। অন্যান্য শি কাদি যান, হস্তী, অশ্ব, পদাতি পা গমন করিল। সঙ্গে মণি মাণিক্য গুপ্ত লইবার তাৎপর্য্য, কোন দেবালয়ে সাধুর নিকট গমন করিতে রিক্তহস্তে নাই ; প্রভু সনাতন যদি কোন স্থাপনের ইচ্ছা করেন, রাজা ম কর্তৃক শ্রীশ্রীগোবিন্দ জীর শ্রীমন্দি নির্ম্মাণ হইয়াছে, ততোধিক টাকা মন্দির স্থাপন করিবেন, রাজার ইচ্ছা। কিন্তু সে কথা অপরের অপ্রকাশ্য। ত

শ্রীহা

স্বামীজীর সহিত কথোপকথন।

নেথরয়ের যুদ্ধে বিখ্যাত বাবু সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস। ইনি থার্ম্মপলীর যশোগৌরব ম্লান করিয়া জগতে যশস্বী হইয়াছেন। ধর্ম্মাধিকরণের অত্যুজ্জ্বল রত্ন ৺ দ্বারকা নাথ মিত্র ও শ্রীযুক্তেশ্বর রমেশচন্দ্র মিত্রের কথা কে না জানে? বিজ্ঞান-বিভাগে বাবু জগদীশ চন্দ্র বসু আজ সমস্ত জগতে খ্যাত। ধর্ম্ম ও কর্ম্ম-ক্ষেত্রে অতীব যশস্বী বাবু রমেশ চন্দ্র দত্ত আমাদের জন্য বিদ্যুতগতিতে যে প্রকার সমুদয় ঋক্ বেদের অনুবাদ এবং সমুদয় হিন্দু শাস্ত্রের মূলানুবাদ সহ সার সংগ্রহ—ওল্ড ও নিউ টেষ্টেমেণ্টের ন্যায়—সমুদয় শাস্ত্রের সার সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, ইতিহাস লিখিয়া ব্যাসের মহাভারতের ন্যায় আপন মহাভারত সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার তুল্য নাম ভারতে আর দ্বিতীয় নাই। কিন্তু আমরা যে কায়স্থ সন্তানের কৃতিত্বের বিষয় উল্লেখ করিতেছি, তাঁহারও ধীশক্তি কম .হ। ইনি পেচ্ছন্ন নামে খ্যাত স্বামী বিবেগানন্দ। ইহার প্রকৃত নাম নরেন্দ্র নাথ ত্ত। ইনি কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের পাধিধারী—এমেরিকা ও ইউরোপে ধর্ম্ম 'র করিয়া সম্প্রতি গৃহে প্রত্যাগত হইয়া। ইহার সহিত বসুমতী-সম্পাদকের াপোকথন হইয়াছিল. তাহাই আমাদ্যকার আলোচ্য বিষয়। ঐ কথোপ-কঁতকাংশ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত 'ছি

ইউরোপে খ্রীষ্টধর্ম্ম এখনও আছে কেন?
ই কারণে। খ্রীষ্টধর্ম্মে যেরূপ প্রকৃতির উপ-রূপ সরলবিশ্বাসী অনেক মহাত্মা আছেন ° উহা পৈত্রিক ধর্ম্ম বলিয়া এখানে আজকাল ষ ছুঁই ছুঁই ধর্ম্ম—শাস্ত্রীয় ধর্ম্মবোধে সরল শ্রেণীর লোক তদনুরূপ অনুষ্ঠান করে, ইহা না মানিলেও পৈত্রিক আচার 'রে মাত্র।

গ কি এরূপ ছুঁই ছুঁই ভাব ছিল. না? ঋগ্বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া অতি পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া দেখুন, শাস্ত্রে বর্ণের পাচক শূদ্রই ছিল। এখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের স্পৃষ্ট অন্ন গ্রহণ করেন না। আপনারা কি মনে করেন—বাঙ্গালার এত লোক মুসলমান হইয়াছিল কেবল তরবারীর জোরে? বাঙ্গালী মুসলমান জাতিকে সকল নাটকের বদমাইসের স্থানীয় করিয়া মুসলমান চিত্র বড়ই বিকৃত করিয়া আঁকিয়াছে। মুসলমানের সদংশ বাঙ্গালী আদৌ দেখিতে পায় না। মুসলমানধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের ইতর শ্রেণীর পক্ষে জুড়াইবার আশ্রয় স্থান স্বরূপ হইয়াছিল বলিয়া এত মুসলমান হইয়াছিল। আমি দেখিয়াছি, মান্দ্রাজে ব্রাহ্মণ যে পথে যান, চণ্ডাল সে পথে যাইতে পায় না, কিন্তু সেই চণ্ডাল খ্রীষ্টান হইলে অবাধে সেই পথে যাইতে পারে।

প্র। যে হিন্দুধর্ম্মে অদ্বৈতবাদ রহিয়াছে, সে হিন্দু ধর্ম্মে এত ছুঁই ছুঁই ভাব দেখি কেন?

উ। খ্রীষ্টধর্ম্মের স্রোতে আমাদের জাতীয়তা নাশ করিতেছিল, মহাত্মা রাজা রাম মোহন রায় সেই জাতীয়তা বজায় রাখিয়া তাহার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, কিন্তু সেই মহান উদ্দেশ্য সম্যক উপলব্ধি করিতে না পারিয়া জনকয়েক লোক পাশ্চাত্য মত প্রচার দ্বারা আমাদিগকে জাতীয়তাশূন্য করিতে প্রয়াসী হইয়াছিল, এখনও দুই এক জন করিতেছে। ইহারই বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়া এখন চলিতেছে। এই ভাব নষ্ট করিবার জন্য কয়েক বৎসর ধরিয়া এক বিপুল আন্দোলন স্রোত চলিতেছে। তাহাতে শাস্ত্রীয় তত্ত্ব প্রচারের সঙ্গে স্থানীয় আচার-প্রসূত জাতি-বিদ্বেষও প্রচারিত হইতেছে। তাই আপনি এ সময়ে এই ছুঁই ছুঁই ভাবের এত প্রাখর্য্য দেখিতেছেন। এখনও ঠিক সাম্যাবস্থা হয় নাই। আমাদের পরেই যে বংশাবলী আসিতেছে, তাহারা ঠিক শাস্ত্রীয় পন্থার অনুসরণ করিবে। তখন আর ছুঁই ছুঁই ভাব থাকিবে না, অথচ সকলে পূর্ণ হিন্দু হৃদয় লাভ করিবে। এই প্রতিক্রিয়া না থাকিলে আমরা এতদিন জাতীয়তা হারাইতাম।

প্র। সকল বর্ণের কি সন্ন্যাসে অধিকার আছে?
উ। আছে।

ইউরোপে এখনও খ্রীষ্টধর্ম্ম আছে কেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া তিনি যে প্রকারে হিন্দু ধর্ম্ম-সংস্কারের ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহা তাঁহারই নামের উপযুক্ত; আর বোধ হয় যদি বুথ সাহেব হিন্দু হইতেন, তবে তিনিও ঐরূপ উত্তর করিতেন।